ইতি-ভারতী



4460
29.6.

পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরার সকল বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর জন্য নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী
লিখিত পর্ষদ—বিজ্ঞপ্তি নং সিল/৮৬/২ তারিখ—১. ৮. ৮৬

ইতি-ভারতী

নবম শ্রেণী

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

প্রাক্তন অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়,
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়

সহায়ক সম্পাদক

মুরলীধর রক্ষিত

অধ্যাপক রঘুনাথপুর কলেজ, পুরুলিয়া

দি পাইওনিয়ার পাবলিকেশনস্

৮/১ এ. শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক ঃ
শ্রীদুলালচন্দ্র বল
৮/১ এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য ঃ পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য

মুদ্রক ঃ
শ্রীপ্রফুল্লকুমার বক্সী
জয়দুর্গা প্রেস
৫৩, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট
কলকাতা-৭০০০০৯

ভূমিকা

ইতিহাস পঠন-পাঠনের ধারা ইদানীং বদলে গেছে ও যাচ্ছে। বর্তমান কালের ইতিহাসবিদরা মনে করেন যে বিভিন্ন রাজবংশের বিবরণ অর্থাৎ দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাস এবং যুদ্ধ-বিগ্রহ প্রভৃতি ঘটনা থেকে এখন সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া উচিত। ইতিহাসের এই নব রূপায়ণের কথা ভেবে তার প্রকৃত লক্ষ্য অনুসারে নবম দশম শ্রেণীর পাঠক্রম রচিত হয়েছে। পাঠক্রমের সেই উদ্দেশ্য ও নির্দেশ অনুযায়ী এই বইটি লিখতে চেষ্টা করেছি। এখানে বলে রাখি কয়েক জায়গায় কিছু আগে পরে কোনও কোনও পরিচ্ছেদ সরিয়ে আনতে হয়েছে ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এই রকম ছোটো খাটো পরিবর্তনের প্রয়োজন বোঝেন ও জানেন। বিদেশীদের আক্রমণ নির্দিষ্ট পরিচ্ছেদেই বর্ণিত হয়েছে। তবে ছাত্রছাত্রীদের বুঝতে আরও সুবিধা হবে ভেবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য-প্রসঙ্গে আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ আলোচনা করেছি। তেমনি গুরু গোবিন্দের সময় থেকে ডালহৌসির আমলে পাঞ্জাব অধিকার,—এর মাঝখানে একটি বড় ফাঁক রয়েছে। শিখদের উত্থান ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাই রণজিৎ সিংহের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাটি খুব সংক্ষেপে বলতে হল। আবার গোড়ার দিকে মৌর্যদের পতন ও শুঙ্গ রাজাদের এবং মহম্মদ ঘুরীর কথার উল্লেখ নেই সিলেবাসে। তাই এই তিনটি প্রসঙ্গ "পরিশিষ্টে" খুব সংক্ষেপে বলেছি। প্রয়োজন বোধে শিক্ষক-শিক্ষিকারা এগুলি ছাত্রছাত্রীদের জানিয়ে দিতে পারবেন।

পরিশেষে বলে রাখি আমার বইটির পাণ্ডুলিপি রচনা সমাপ্ত হওয়ার পরেই আমার গুরুতর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। তখন শেষ দিকের আনুষঙ্গিক কাজ বেশ কিছু বাকি ছিল যেমন, পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন অংশগুলি যথাস্থানে অধ্যায়ে সন্নিবদ্ধ করা, পরিচ্ছেদগুলিকে ক্রমানুসারে সংবদ্ধ করা এবং 'পরিশিষ্ট' ঠিক মত তৈরি করে সাজানো। এই সময়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার প্রাক্তন প্রিয় ছাত্র অধ্যাপক মুরলীধর রক্ষিত স্বেচ্ছায় এগিয়ে এসে এই শ্রমসাধ্য দায়িত্বপূর্ণ কাজ যে যত্ন ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করলেন, সেজন্য তাঁকে মৌখিক কৃতজ্ঞতা না জানিয়ে আমার সহায়ক সম্পাদকরূপে তাঁর নাম স্বীকার করে রাখলাম। আশা ও ভরসা করি, তিনি ভবিষ্যতে যোগ্যতা অর্জন করে নিজেই বই লিখতে উদ্যমী ও সফলকাম হবেন।

বইটি প্রকাশ করা হল বিশেষ চাপের মধ্যে। তাই মুদ্রণ প্রমাদ এবং কিছু কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। সহৃদয় শিক্ষক-শিক্ষিকারা যদি সেই ত্রুটিগুলি জানিয়ে দেন, তা হলে সত্যই উপকৃত হব। আমার প্রকাশক প্রীতিভাজন শ্রীদুলাল বল প্রচুর পরিশ্রম করে বইটি ছেপে বার করেছেন। সেজন্য তাঁকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

কলকাতা :
বুদ্ধপূর্ণিমা
২৭শে বৈশাখ, ১৩৯৪

HISTORY SYLLABUS FOR CLASS IX

CHAPTER—I

Geography & History :

(a) Chief physical features of the Indian subcontinent and its main ethnic elements ;

(b) Influence of Geograph on history ;

(c) The Fundamental unity ;

(d) Source of ancient Indian History

CHAPTER—II

Dawn of Indian Civilisation :

(a) Palaeolithic, Mesolithic and Neolithic stages of cultures ;

(b) Harappan Civilisation (Chalcolithic) chief features —its antiquity (with special reference to its extent, urban character, town planning and social, economic and religious life), relations with outside world.

CHAPTER—III

The Vedic Age :

(a) The "Aryans"—their original homeland ; Their first literary work in India—the Rig-Veds ;

(b) Vedic literature ; Later **sambitas, Brahmins, Aranyakas, Upanishadas and Sutras ;**

(c) Life of the people as reflected in the Vedic literature

(i) Social, economic and religious life and political and administrative activities of the people as known from the Rig.Veds ;

(ii) Later developments ;

(d) Expansion of Vedic culture in the subcontinent ;

(e) Beginning of the Iron Age.

CHAPTER—IV

Protest Movement :

(a) Social, economic and religious causes of the beginning of the movements protesting against the dominance of the age old Vedic or Brahmanical culture :

(b) Jainism and Buddhism ;

(c) Lives and teachings of the Buddha and Mahavir.

CHAPTER—V

The Age of Imperialism and Political Unification

(a) Reference to sixteen Mahajanapadas ;

(b) A bare outline of the history of the growth of the power of Magadha from the days of Bimbisara to the rise of the Mauryas ;

(c) History of the Maurya empire with special reference to the periods of Chandragupta (his achievements, administration of the age as known from the account of Megasthenes and Arthasastra of Kautilya dated generally to the Maurya Age) and Asoka (his conquest of Kalinga, limits of his empire, propagation of Buddhism and his own Dharma, his humanitarian work, his contacts with outside world and his place in world history).

(d) Invasions of India by foreigners—

(i) Reference only to the extension of the Achaemenid empire to parts of the Indian subcontiment Alexander's invasion and its effects

(ii) after the fall of the Mauryas reference to the rule of the Indo-Greeks, Sakas and Pahlavas ;

(iii) Social and economic condition with reference to agriculture, trade and industry-foreign elements in the population-contacts with the outside world-Mauryan Art.

(e) History of the Kushana empire with special reference to the reign of Kaniskha (his probable date, his conquests, limit of his empire, his patronage of Buddhism and Indian art and culture) and to India's contact with the outside world in the Kushana age ; cultural importance of the Kushana period in Indian History ;

(f) the Satavahana empire

(i) its extent,

(ii) the achievements of its greatest ruler-Gautamiputra Satkarni ;

(g) History of the Gupta empire with special reference to

(i) the periods of Sumudragupta (his conquests and achievements; war against the Saka Kashatraps ; (his other achievements) Chandragupta II a legendary figure. Evidence

of Fa-Hien ; Kumargupta I and Skandhagupta (his success against the Hunas)

(ii) Causes of the downfall of the Gupta Empire. Distinctive features of the Gupta culture.

CHAPTER—VI

Struggle for Domination :

(a) North India

(i) Reference to the Hunas-yasodharman ;

(ii) Rise of Gauda under Sasanka. His relations with Bhaskarvarman of Kamarupa and Harshavardhana of Thaneswar and Karauj ;

(iii) Conquests of Harshavardhana, limits of his kingdom, account of Huan-tsang ;

(iv) Rise of the Pratihara and Pala empires-brief reference to the tripartite struggle and its outcome ;

(v) Important Pala and Sena rulers-Dharmapala, Devapala, Mahipala I, Ramapala, Vijayasens and Lakshmansens.

(b) Deccan

(i) the early Chalukyas of Badami ;

(ii) Achievements of Pulakesi II ;

(iii) the Rashtrakutas

(iv) Achievements of Govinda III and Krishna III. Later Chalukyas of kalyans ; and achievements of Vikramaditya VI (c. A. D, 1076-1128)

(c) South India

(i) The Pallavas of Kanchi-some notable rulers and their achievements the Longdrawn conflict between the Pallavas and Chalukyas.

(ii) The Cholas of Tanjore ;

(iii) Achievements of Rajaraja I and Rajendra I with special reference to their overseas campaigns.

CHAPTER—VII

(a) Social, economic and cultural life from the 7th Century to the 12th Century A. D. under the Palas, the Senas, the Chalukyas, the Rashtrakutas. the Chandellas, the greater Gangas of Orissa and the Pallavas and the Choals of the far South ;

(b) Commercial and cultural contacts with outside world.

MEDIEVAL INDIA 80 pages till 1707

(1) Why should we call it 'Medieval India' rather than Muslim India ?

(2) A brief note on the types of sources ; the Sultanate period.

(3) Advent of Islam in India : the Arab conquest of Sind its impact negligible.

(4) Beginning of Muslim rule : condition of Northern and Western India on the eve of the Muslim invasion-Sultan Mahmud Results of his invasions All-Biruni on Indian culture and civilisation.

(5) From Invasion to Empire-building ; Foundation of the Delhi Sultanate by Qutbuddin—Iltutmish and Balban : nature of the external and internal threats—consolidation of the Sultanate.

(6) Khalji Imperialism ; growth of the empire under Alauddin (no detailed account of his campaigns) his attempts at consolidating the authority of the Central Government his economic measures and their results.

(7) A short assessment of Muhammad bin Tighluq's rule —Nature of the changes during Firuz Shah's rule : some of his beneficient measures.

(8) Invasion of Timur effects disintegration of the Sultanate : the Sayyids and Lods (only a brief outline).

(9) Rise of some regional powers :

(a) Bengal under Ilias-Sahi rulers : Hussian Shah and Nasarat Shah ; cultural developments.

(b) The Bahmani Kingdom (no detail) split up into five kingdoms.

(c) The nature of the Bahamani-Vijayanagar conflict (details of the wars to be omitted).

(d) Vijaynagar empire-Dev Rai and Krishna Rai special emphasis on the administrative system and the social, cultural and a economic life.

(10) Impact of Islam on India during this period with particular stress on the impact on the cultural life—the initial

orthodox reaction ; gradual synthesis of cultures the Bhakti cult Sufism Religious reference their message. Art and architecture development of vernacular literature and regional art and culture patronage of literature etc. by the ruling groups growth of Urdu.

THE MUGHAL AGE : 1526-1707

(1) A brief note of the types of sources.

(2) Origins of the Mughals : foundation of the Padshahi by Babar,—Panipath, Khanna and Ghogra—(detail of wars to be omitted) Babar's memoris.

(a) Mughal Afgan contest its nature a brief narrative of the building up of an empire by Shershah—special stress on the administrative and revenus systems. Sher Shah's contributions a brief reference to the re-establishment of the Mughal power.

(b) Widening of the empire and its consolidation by Akbar : Stress on the methods by which Akbar achieved it ; (detail of the wars to be omitted)—foundation of a new administrative system—Jagirdari system—revenue—system —cultural life ; Din-I-Ilahi Akbar's Court—His building activities.

(c) Jahangir and Shahjahan : assessment as rulers : particular stress on their patronage of art and architecture—Their policy towards European traders.

(d) Aurangazeb : a short not on the wars of succession —stress on two developments in the political sphere : further widening of the empire on the one hand, and the emergence on the other of certain conditions which tended to weaken the imperial authority ; Roots and nature of his troubles in Northern and North-western India ; the Deccan policy-Shivaji and the first phase of the Mughal-Maratha conflict—organisation of the civil and military administration by Shivaji—assessment of Shivaji as a ruler—the far reaching consequences of Aurangazeb's Deccan wars—organisation by Aurangazeb of the civil and military administration—His religious policy—his character and personality—a brief estimate as a ruler.

(e) Activities of the European Trading companies (a brief outline).

3. India under the Mughals: Political unification of a large part of India measures in connection wirh the assertion of the Central Authority—the Mughal rulers and Jagirdars—land revenue spstem—the rular society of India in the eyes of foreigners—trade, industry and commerce—European traders—special emphasis on the cultural life: art, architecture, paintings literature—history writing—music—some reference to some distinctive regional culture.

HISTORY OF INDIA: 1707-1947

1. Decline and disintegration of the Mughal Empire—beginning of the process during Aurangazeb's time—threats to the Mughal Empire from different quarters—drain on the imperial finances due to wars—implications of the first increasing jagirs, while the revenue income did not increse—increased functionalism in the Mughal Court—different parties and functions—Weakness of the successors of Aurangzeb—power struggle—the nobles etc. further consolidated their powers—Central control over the different Subas and regions gradually disappeared—effects of the invasion of Nadir Shah.

2. **Growth of regional powers** (emphasis on those whose encounters with the British affected the later political scene).

(i) The regions to be particularly studied Bengal, Hyderabad, Mysore, Awadh, the rise of the Sikhs upto Guru Govind—

(ii) Growth and decline of the Marathas (till 1761)—Expansion of the Maratha Power—Third battle of Panipath (1761)—its impact.

3. Growth of European Commerce and conflict among European trading Companies—Anglo French conflict—Carnatic: the first area of conflict—Effects of the Anglo-French rivaly in Europe and elsewhere—War of Austrian succession and Seven Year's War—Reaction of Carnatic rules to the growing conflict—Result of the Wars—causes of French failure.

4. Growth of English East India Company's Commerce

and political power in Bengal till 1765—Growth of English trade in Bengal in the first half of 18th Century—Framan of 1717—frictions with the Nawabs—conflict between the English and Siraj from 1756 to Plassey its results—conflict with Mir Qasim : Buxar (1764)—Dewani (1765).

5. 1767—1857

British Imperial Expansion : (The War operations to be described as briefly as possible. The main stress Should be given on (a) The British Motives. (b) The decisive factors in the British victory)—

(a) Marathas (one long narrative)
(b) Mysore (—do—)
Subsidiary Alliance (1798) as an instrument of British political control.

(c) Other conquests, (Excluding relationship with the Sikhs-Anglo-Sikh relations till the death of Ranjit Singh.

(d) Annexation of the Panjab.

(e) Dalhousie and British imperial expansion—Novel features.

6. **Administrative Foundations**

(i) Noture of the growth of British political power till 1765 (two short paragraphs—Implications of Diwani of 1765 —and of Diarchy in 1772.

(ii) Growth of centralisation : (Hasting to Cornwallis)

(iii) Organisation of a new and judicial and police system.

(iv) Need for an increased income from land-revenue—Tupes of arrangements in this connection—Their broad effects.

7. **Industry and Trade**

Expansion of India's foreign trade and decline of some Indian industries—(To stress, cotton-goods during the period, 1765-1857)

8. The Cultural Scene

(i) Brief note on the old educational system: The changes: English Education—Decline of Vernacular Education. Contact with western culture:

(ii) A history of social and cultural Movements with special reference to Bengal and Maharashtra.

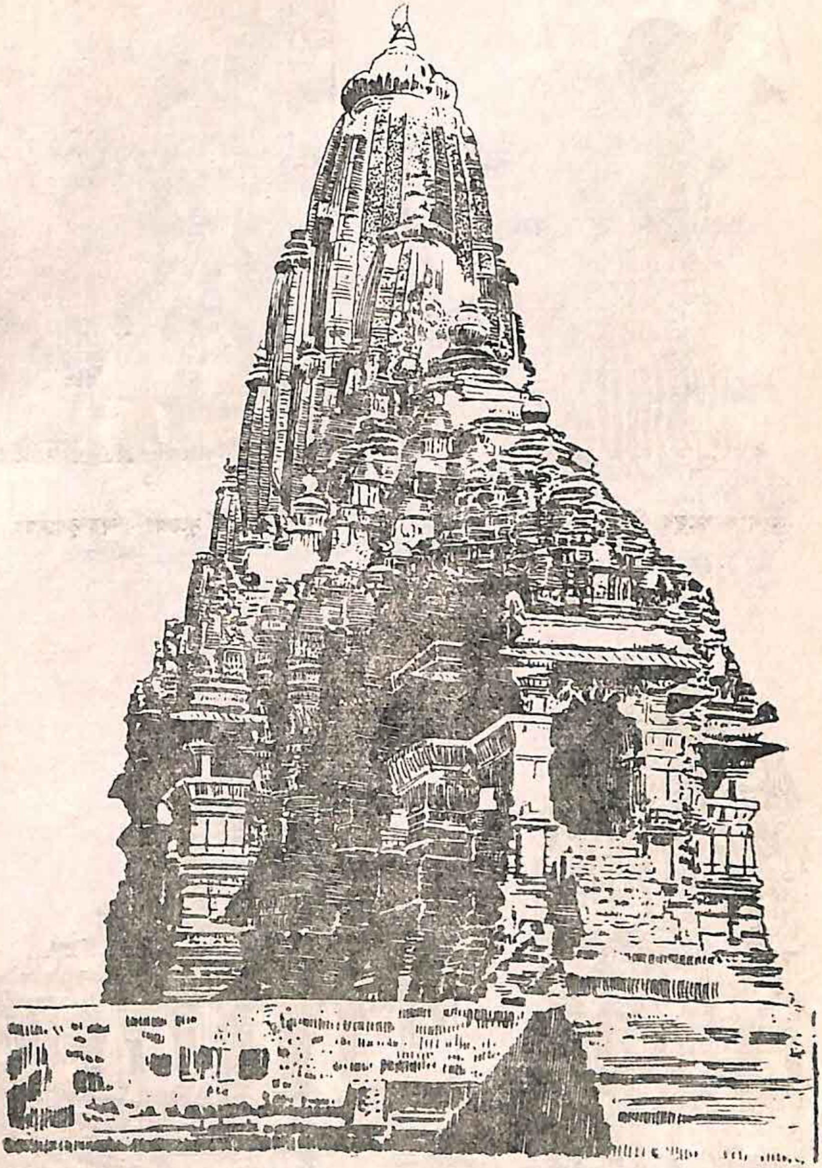
9. Peasant unrest and uprisings

(a) Peasant Rebellions—Ferazi—Wahabi Movement;
(b) Tribal Movements—Kols Santhals.

10. The Revolt of 1857—causes—

Extent of popular participation—leadership—Nature of the Revolt.

———



কাণ্ডারিয়া মহাদেব মন্দির খাজুরাহো



২

অশোক স্তম্ভের শীর্ষদেশে বৃষমূর্তি



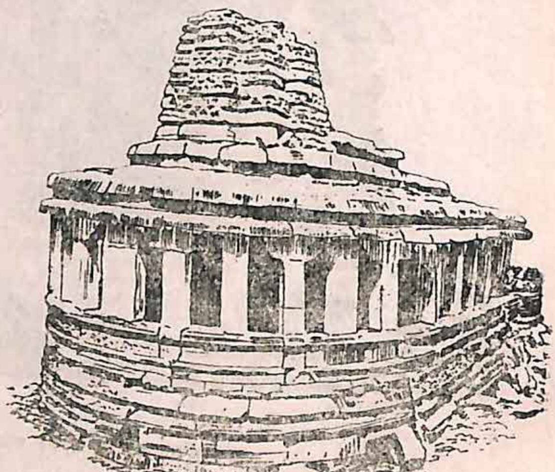
১

নাগিনী মূর্তি মুক্তেশ্বর মন্দির ভুবনেশ্বর,



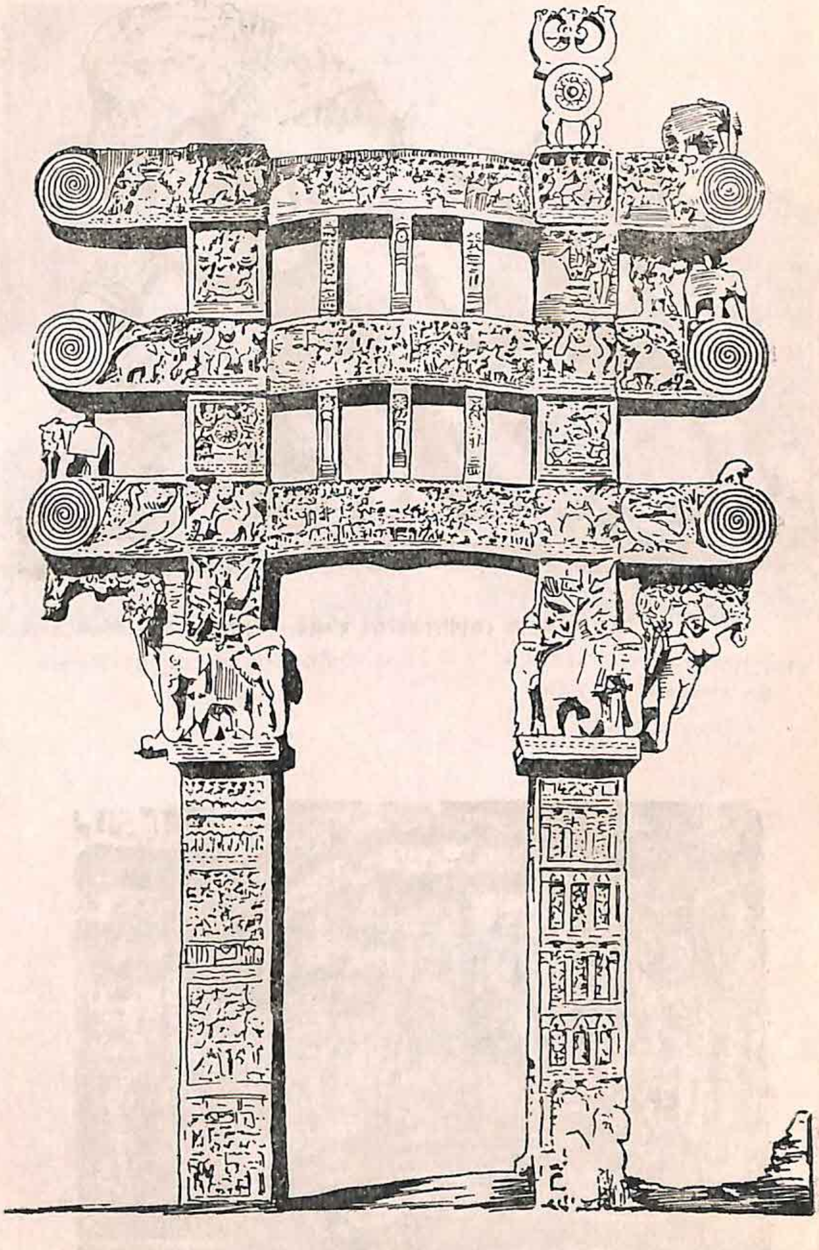
৪

দক্ষিণ ভারতে ব্রহ্মামূর্তি
একাদশ শতাব্দী

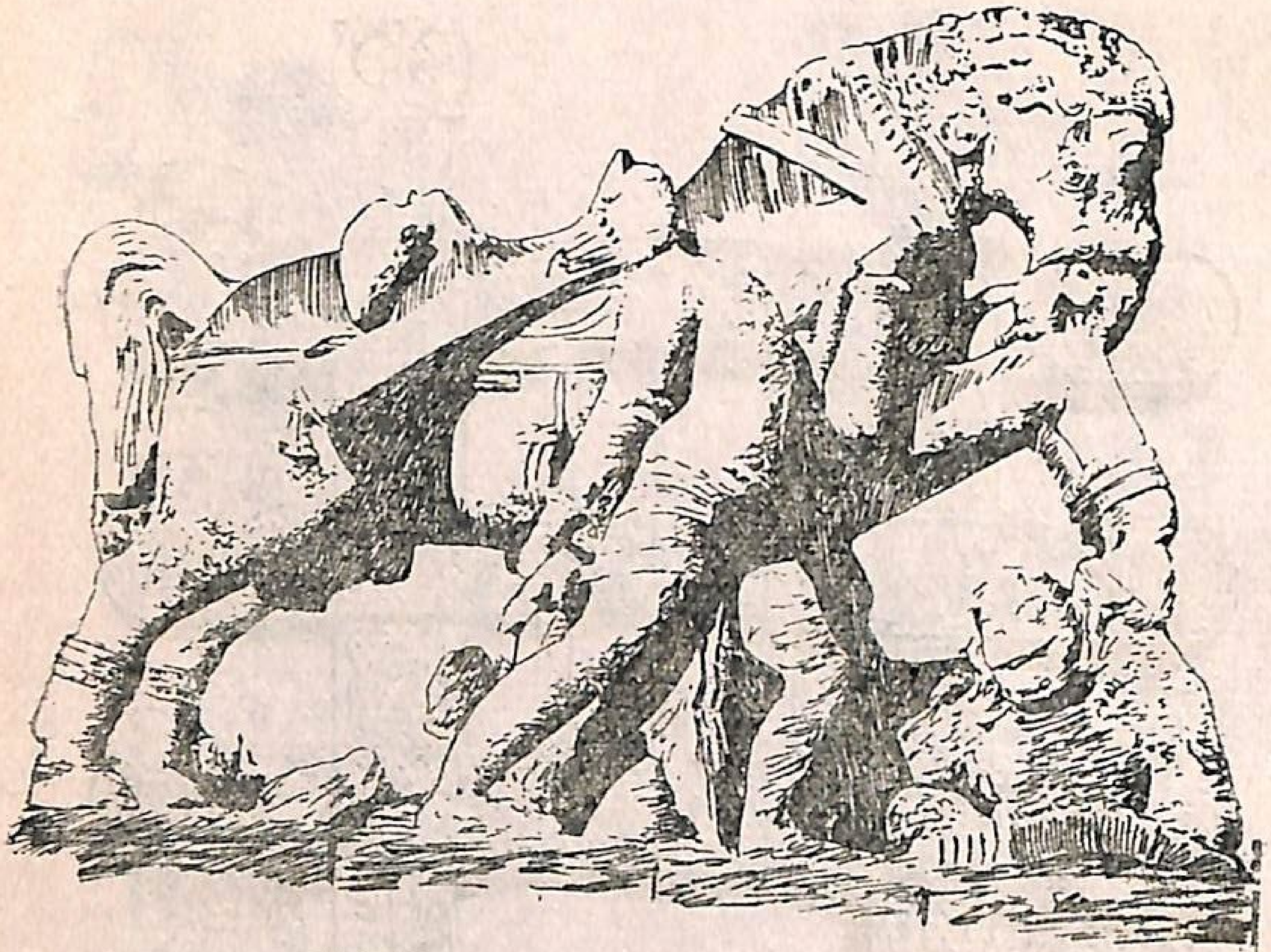


৩

দুর্গা মন্দির আইহোল খ্রীষ্টীয়
ষষ্ঠ শতাব্দী



সাঁচী স্তূপের উত্তর তোরণ



ত্রয়োদশ শতকে কোণারকের সূর্য মন্দিরের অশ্বমূর্তি



খাজুরাহো বামন মন্দিরে অপ্সরাদল

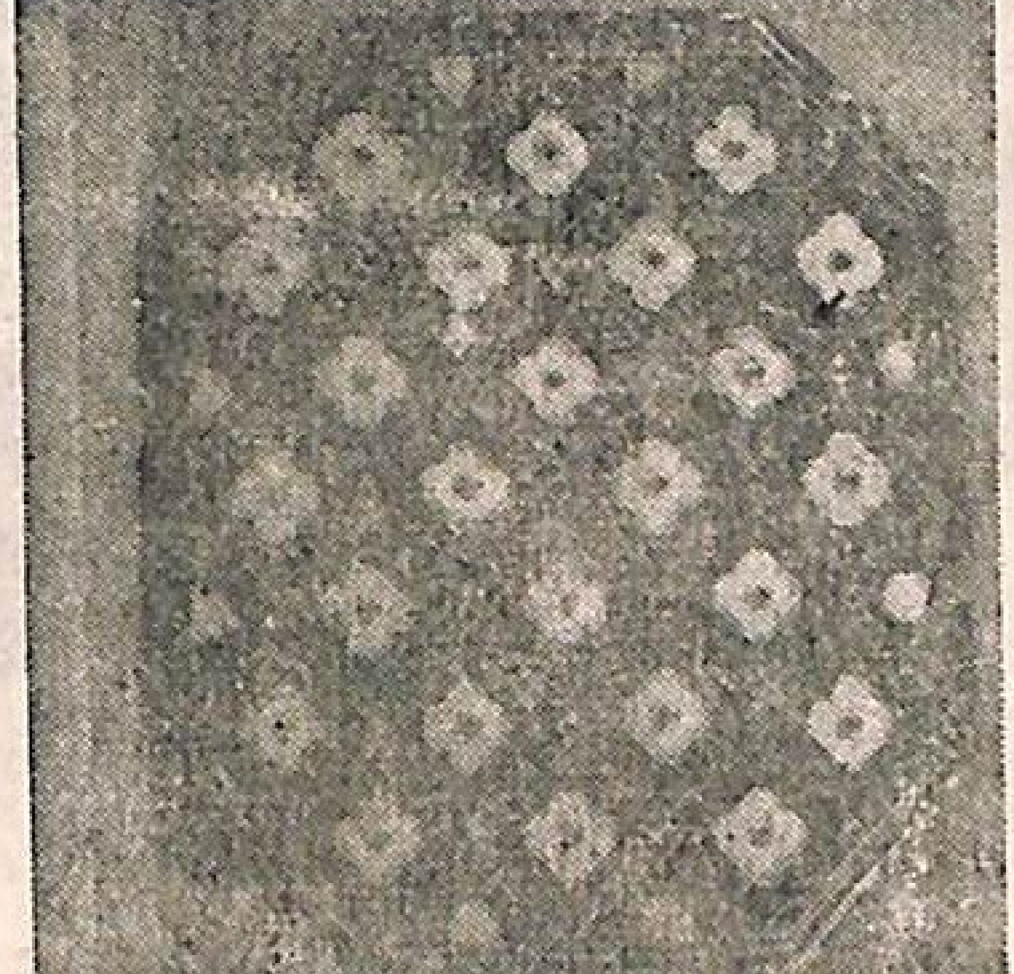
মুঘল যুগের শিল্পকলা



কারুকার্য করা মুঘল যুগের একটি গালিচা



শাহজাহান ও মমতাজের সমাধিক্ষেত্রের
একটি অপূর্ব শ্বেত পাথরের পলা
তোলা ফুলের কাজ



মুঘল যুগের জেড পাথরের তৈরী আয়নার পৃষ্ঠদেশ

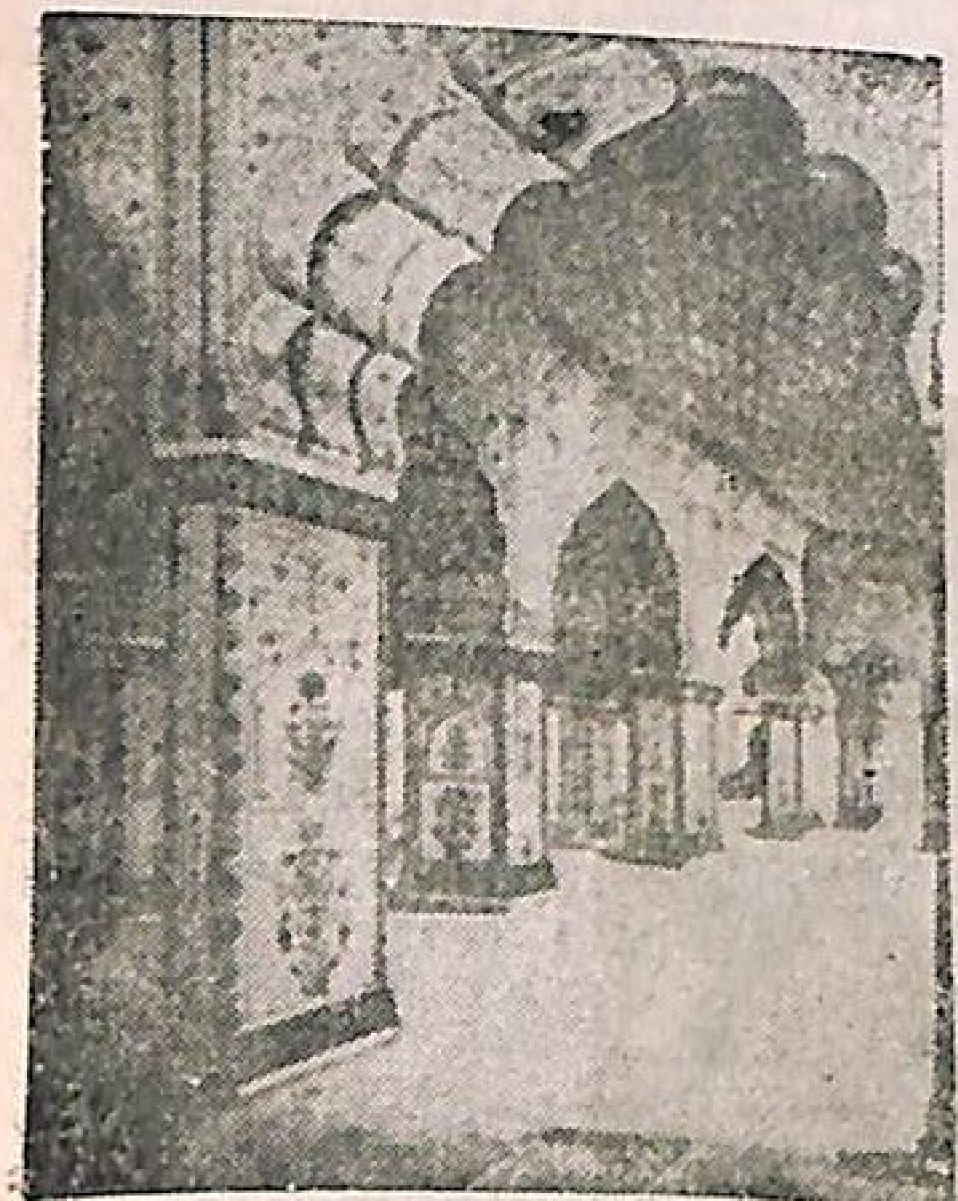
মুঘল যুগের শিল্পকলা



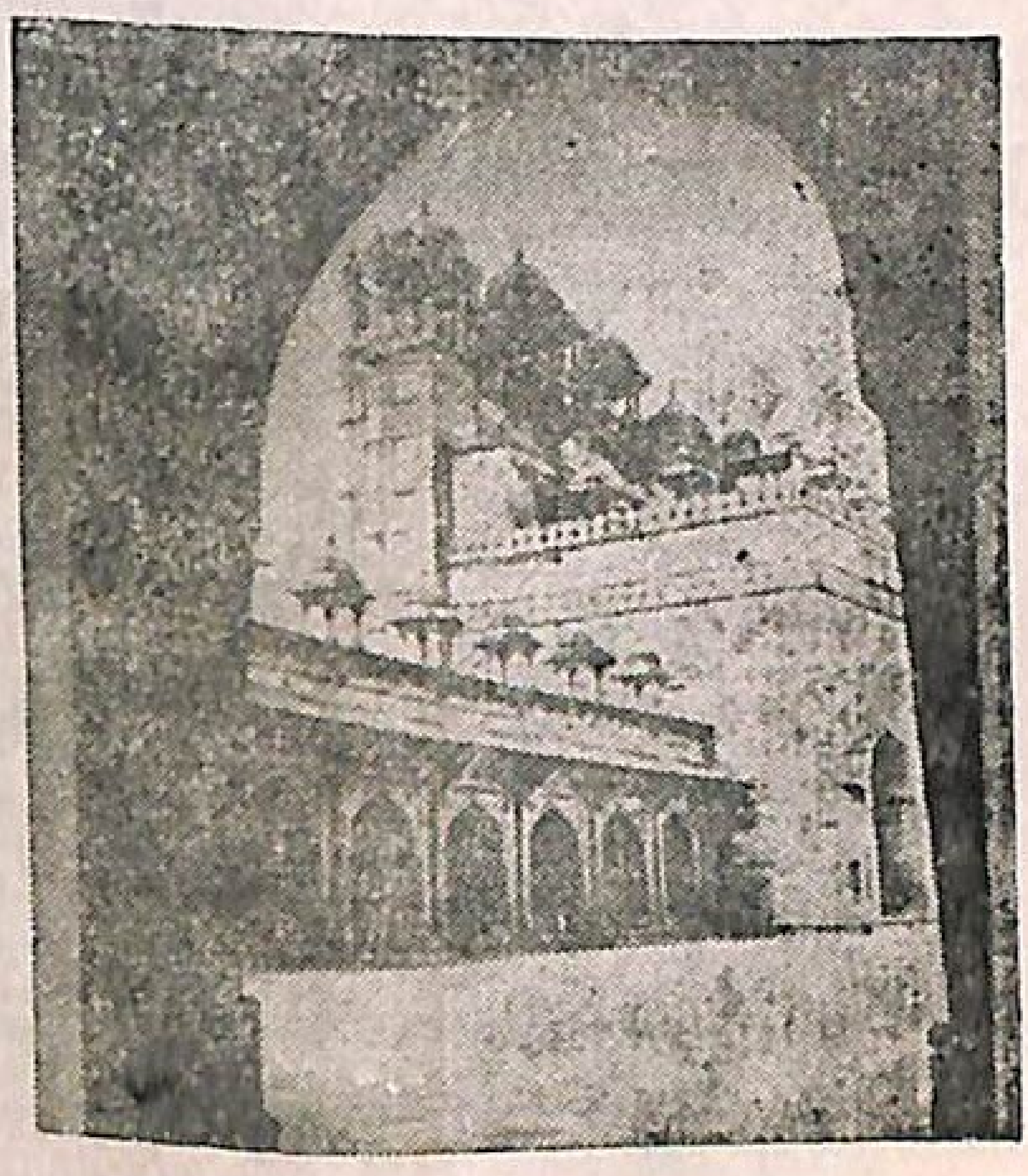
মুসম্মন বুরুজ আগ্রার দুর্গ



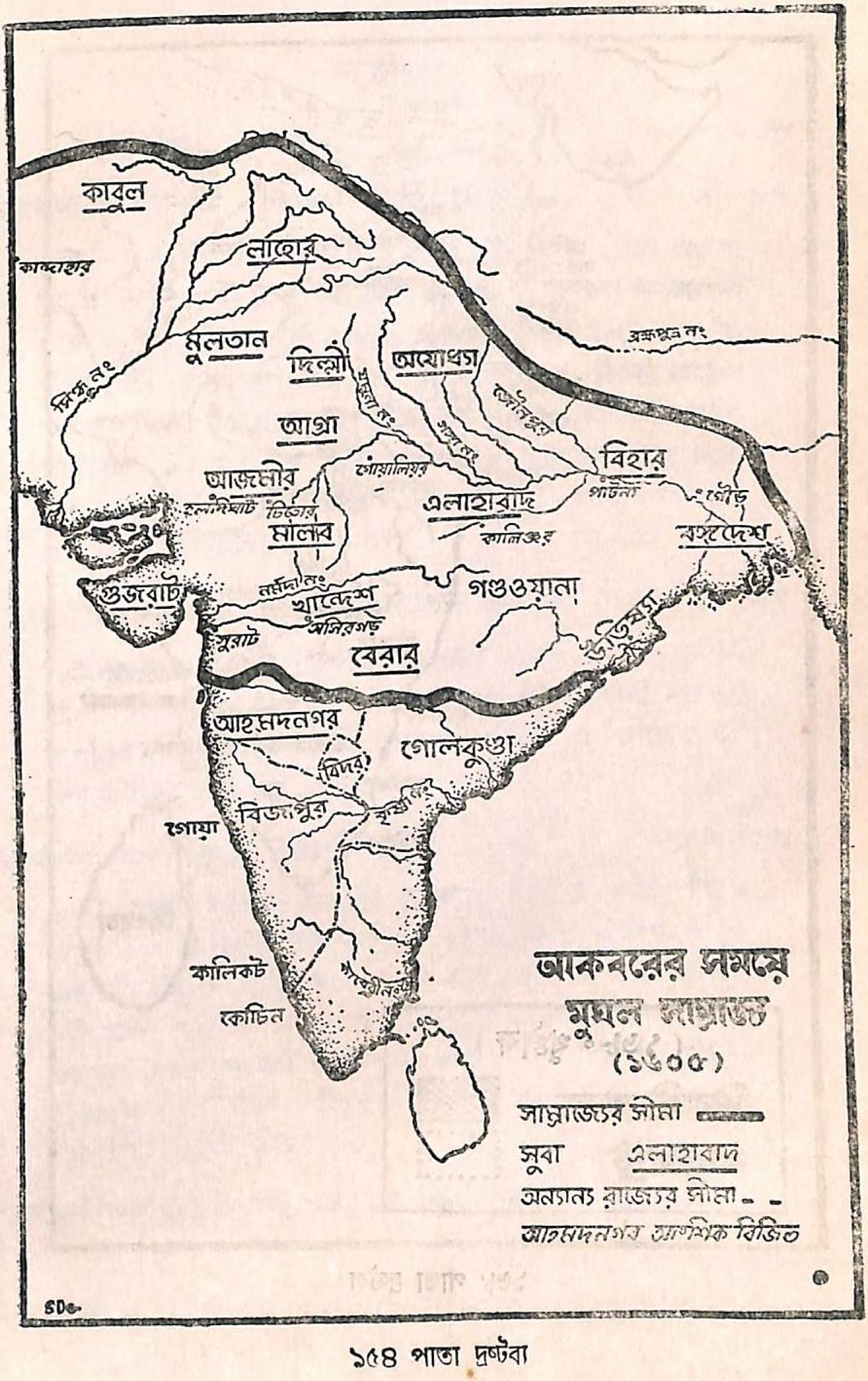
দেওয়ানির আমের দরবার গৃহে
সম্রাটের বসার স্থান



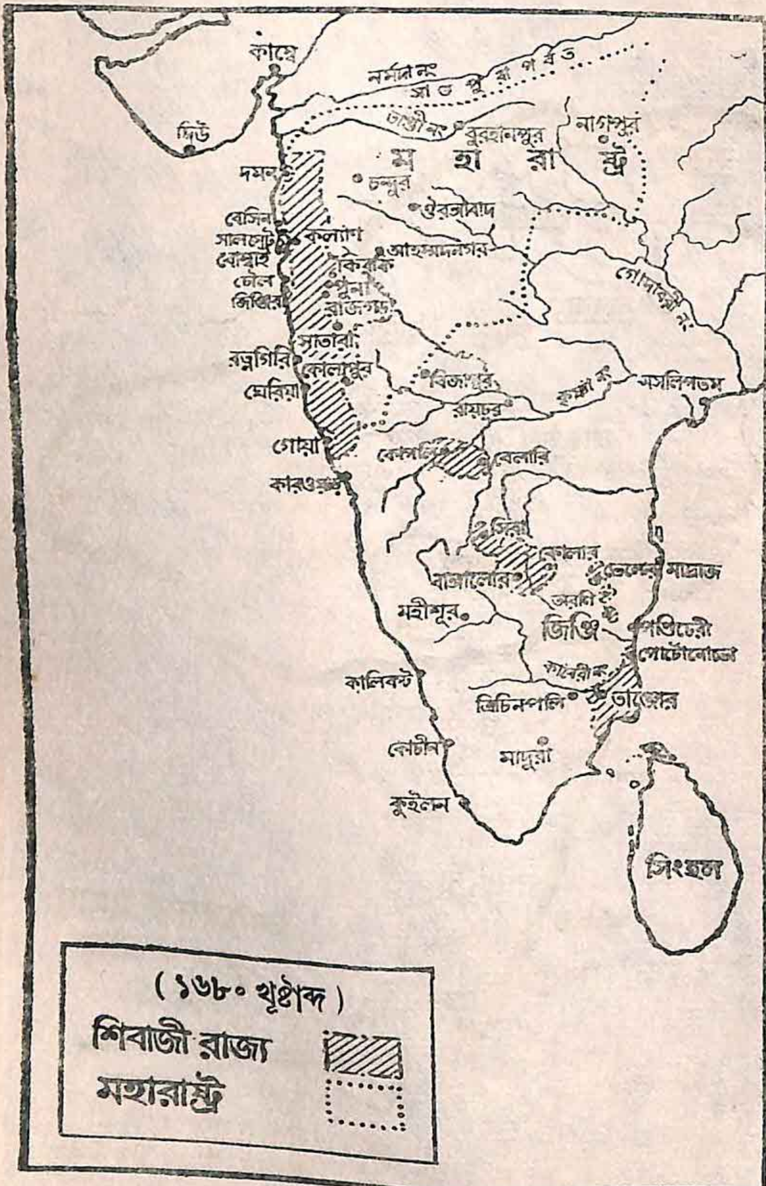
দেওয়ানি খাসের অভ্যন্তর দৃশ্য



ফতেপুর সিক্রির প্রবেশ চত্বরের দৃশ্য



১৫৪ পাতা দ্রষ্টব্য



১৬৮ পাতা দ্রষ্টব্য

সূচীপত্র

বিষয় — পৃষ্ঠা

———

প্রথম অধ্যায়
ভূগোল ও ইতিহাস

অতীতের বিবরণ না পড়লে কোনও দেশের প্রকৃত পরিচয় জানা যায় না এবং ইতিহাসের জ্ঞান না জন্মালে প্রাচীনের সঙ্গে বর্তমান কালের যোগাযোগ এবং বিভিন্ন সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঠিক মত বোঝা যায় না।

ঐতিহ্যের মূল্য

লৌকিক অথবা সাধারণ অর্থে ইতিহাস হচ্ছে বিগত দিনের কাহিনী। কিন্তু ইতিহাসের সংজ্ঞা আরও ব্যাপক। মানুষের যাবতীয় কর্ম, চিন্তা এবং উন্নতির প্রয়াস, এমনকি মানবমনের বিশ্বাস ও সংস্কার পর্যন্ত ইতিহাসের বিষয়বস্তু। কারণ, ইতিহাস সমাজ-বিদ্যার একটি প্রধান অঙ্গ। কোন্ প্রাকৃতিক প্রভাবে, কোন্ আর্থিক প্রয়োজনে, কোন্ সামাজিক পরিবেশে একটি কৌম (tribal) সম্প্রদায় বা গোষ্ঠী একটি উপদল বা জাতিতে পরিণত হয়ে আপনার বর্তমান ইতিহাস রচনা করেছে—এ সমস্তই সমাজ বিজ্ঞানের এলাকা। ইতিহাস শাস্ত্র তারই অন্তর্ভুক্ত। অতএব ইতিহাস বলতে শুধু বিভিন্ন রাজবংশের নাম-ধাম, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ঘটনাবলীর সাল তারিখ অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় উত্থান পতনের কাহিনী বোঝায় না।

ইতিহাসের অর্থ

ইতিহাসের মূল—সমাজ বিজ্ঞান

এইখানেই ভূগোলের সঙ্গে ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ধরা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেকখানি ইতিহাস গড়ে তোলে, সেই দেশের মানুষের আকৃতি-প্রকৃতি ও রীতি-নীতির উপর বড় প্রভাব বিস্তার করে। মিশর, গ্রীস, রোম, চীন, ভারত ও আরব প্রভৃতি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাস এই ভাবেই ভূগোলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। যেমন বলা যায়, মিশরের নীলনদ এবং উভয় দিকের মরু অঞ্চল তার ইতিহাস গঠন করেছে। তেমনি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস এই দুই নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকা সুমের ও ব্যাবিলনের সভ্যতা সৃষ্টি করেছে। গ্রীসের ছোট ছোট পাহাড় ও উপত্যকা অজস্র দ্বীপ-পুঞ্জ এবং সর্বত্র সমুদ্রের সান্নিধ্য গ্রীক ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। আবার চীনে ইয়াংসি ও হোয়াংহো, ভারতের সিন্ধু ও গঙ্গা-যমুনা প্রভৃতি নদী, ওদিকে আরবের বিস্তৃত মরুভূমি এইভাবে এক একটি দেশের বা অঞ্চলের সমাজ ও অর্থ ব্যবস্থাতে বিশিষ্টতা দান করেছে।

ইতিহাস ও ভূগোলের পারস্পরিক সম্পর্ক: কয়েকটি দৃষ্টান্ত

তারই ফলে এদের প্রত্যেকের ইতিহাস স্বতন্ত্রতা অর্জন করেছে। বিখ্যাত আরব পণ্ডিত ইবন্ খলদুন্ই (১৩৩২—১৪০৬) প্রথম মনীষী যিনি ভূগোলের সঙ্গে সমাজ অর্থ-নীতি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক ধরে আরব ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম অঞ্চলের উপর তার বিরাট ইতিহাস-গ্রন্থ 'মকদ্দমা' রচনা করেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথও দেশের

প্রকৃতি ও জলবায়ু, সমাজ, ধর্ম ও আচার-ব্যবহারকে মানব-ইতিহাসের অঙ্গ বলে গণ্য করতেন।

[এক] ভারতের প্রাকৃতিক বিভাগ ও তাদের বৈশিষ্ট্য ঃ প্রাচীন ঋষি-কবিকূল থেকে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের ভারত-বন্দনায় ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ ও বৈশিষ্ট্যের কথা ধ্বনিত হয়েছে। ভূতত্ত্বের বিশিষ্ট লক্ষণগুলি দেখে ভারতকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা হয় ঃ—

(ক) উত্তর অঞ্চলের পার্বত্য ভূখণ্ড ঃ হিমালয়-বেষ্টিত ও বাইরের জগত থেকে বিচ্ছিন্ন এই ভূ-ভাগকে 'হিমালয় প্রদেশ' বলা হয়। কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, ভূটান এরই অন্তর্গত। উত্তর পশ্চিমে পামির পর্বত-গ্রন্থি থেকে শুরু করে পূর্ব প্রান্তে আসাম ও উত্তর পূর্ব অঞ্চল পর্যন্ত এই বিশাল তুষার-প্রাচীর ভারতকে এক নিরাপদ বিস্তৃতি দিয়েছে। উত্তর পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমন পর্বতশ্রেণী ভারতকে রাশিয়া, আফগানিস্থান ও ইরাণ থেকে পৃথক করেছে। আবার উত্তর-পূর্ব সীমায় এই হিমালয় তিব্বত, চীন ও ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতকে স্বতন্ত্র করে রেখেছে। কিন্তু এ স্বাতন্ত্র্য নিশ্ছিদ্র নয়, কারণ উত্তর-পশ্চিমের সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়ে একাধিক বার ভারত-আক্রমণ সম্ভব হয়েছিল। তাই প্রতিবেশী রাষ্ট্রদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রেখে গেলেও সতর্কতা ও সীমান্ত রক্ষার একান্ত প্রয়োজন। বর্তমানে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু উত্তর ও উত্তর-পূর্ব দুই সীমান্তই দুষ্প্রবেশ্য নয়। উত্তর দিকে কাশ্মীর, লাডাক প্রভৃতি অঞ্চল আর উত্তর-পূর্বে অরুণাচল, আসাম প্রভৃতি অঞ্চলগুলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হিমালয় প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য

সীমান্তের গুরুত্ব

(খ) সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের সমতল ভূমি ঃ এই বিশাল সমতল ক্ষেত্র 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত। সিন্ধু উপত্যকা এখন পাকিস্তানের মধ্যে। দক্ষিণে বিন্ধ্য ও সাতপুরা পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত সমভূমি। পশ্চিমমুখী নর্মদা ও পূর্ববাহিনী মহানদী এই ভূ-ভাগের দক্ষিণ প্রান্ত চিহ্নিত করেছে। এই হিন্দুস্থানের পশ্চিমে পাঞ্জাবের সমভূমি ও রাজস্থানের মরুভূমি আর মধ্যস্থলে গাঙ্গেয় উপত্যকা। আরাবল্লী পর্বতমালার পূর্ব দিক থেকে বিশাল উর্বর গাঙ্গেয় ভূমির আরম্ভ। তারপর রাজমহল পাহাড় পার হলে দক্ষিণ-পূর্বে গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের ব-দ্বীপ আর উত্তর-পূর্ব কোণে ব্রহ্মপুত্রের অনায়ত উপত্যকা।

হিন্দুস্থানের আয়তন

(গ) মধ্য ভারতের অধিত্যকা ও দাক্ষিণাত্যের মালভূমি ঃ গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণে এক বিস্তীর্ণ অধিত্যকা দেখা যায়। তার উপরিভাগ অর্থাৎ উত্তর অংশ মধ্যভারতের উচ্চ ভূমি। সাতপুরা পর্বতশ্রেণী থেকে এই মালভূমি হিন্দুস্থানের দিকে ক্রমশঃ ঢালু হয়ে গিয়েছে। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণ দিকে দাক্ষিণাত্যের বিশাল অধিত্যকা। তার পশ্চিমদিকে পশ্চিমঘাট ও পূর্ব দিকে পূর্বঘাট পাহাড়ের শ্রেণী এবং দুই পাশেই সমুদ্রউপকূল ও

বিন্ধ্য, পশ্চিম ও পূর্বঘাট

পর্বত-মালার মধ্যস্থিত নিম্নভূমি। গোদাবরী কৃষ্ণা-তুঙ্গভদ্রা ও কাবেরী নদী এই অঞ্চলকে সমৃদ্ধ করেছে।

বর্তমান কালে বিন্ধ্য পর্বত এমন কিছু বড় বাধা নয়। কিন্তু এক কালে হিমালয়ের চেয়ে প্রাচীন, এই বিন্ধ্য পর্বত-মালা শুধু দুটি পৃথক ভৌগোলিক অঞ্চল সৃষ্টি করে নি, বৈদিক যুগ থেকে আওরঙ্গজেবের আমল পর্যন্ত আমাদের ইতিহাসের গতিপথ নিয়ন্ত্রিত করেছে। ভারতে মূলগত ঐক্য ভাবটি না থাকলে আর্যাবর্ত (হিন্দুস্থান) ও দাক্ষিণা পথের ইতিহাস হয়তো পৃথক ও স্বতন্ত্র পথে চলত।

ভূ-প্রকৃতি অনুসারে এই তিন ভাগে বিভক্ত হলেও সাধারণতঃ ভারতবর্ষকে উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ অর্থাৎ আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য এই দুই ভাগেই চিহ্নিত করা হয়। বিন্ধ্যের উত্তর অংশ নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, তাই সুপ্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি।

আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্য

আর দক্ষিণে ত্রিভুজের মতো তিন দিকে সমুদ্র ঘেরা বিশাল উপদ্বীপ গ্রীষ্মমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিত। তবে কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে যে মালভূমি ভারতের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত. তাকে অনেক পণ্ডিত 'সুদূর দক্ষিণ' বলে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করেন। সেই হিসাবে আর্যাবর্ত, দাক্ষিণাত্য ও সুদূর দক্ষিণ, এই তিন ভাগে ভারতবর্ষ বিভক্ত। প্রতি খণ্ডেরই অস্তিত্ব ও বিশিষ্ট সংস্কৃতি আমাদের ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন মানুষ ঃ জাতি ও ভাষা ঃ আদিম কালের প্রাচীন প্রস্তর যুগ, নব্য প্রস্তর যুগ ও তাম্র যুগের সময় থেকে ঐতিহাসিক কালের হিন্দু-মুসলিম

বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ

যুগ ও বর্তমান যুগ পর্যন্ত বিভিন্ন জাতি ভারতে এসেছে এবং রক্ত মিশ্রণ ঘটিয়েছে। বিন্ধ্যপর্বত শ্রেণীর উত্তরে একদা সমুদ্রের অস্তিত্ব ভূতত্ত্ববিদ্‌রা স্বীকার করেন। তাঁরা বলেন, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনত্ব

সর্বাপেক্ষা প্রাচীন গণ্ডোয়ানা মহাদেশের অন্তর্গত ছিল এবং সেই সূত্রে আফ্রিকার সঙ্গে একদা যুক্ত ছিল। সেখানকার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে ভারতের প্রাক্-আর্য যুগের আদি অধিবাসীদের সংযোগ ছিল।

ভারতের দুই প্রধান জাতি আর্য ও দ্রাবিড়। আর্যরা বহিরাগত। দ্রাবিড়রাও,

মূলজাতি ঃ আর্য ও দ্রাবিড়

কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, পশ্চিম এশিয়া থেকে বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারতে আসে। আর্যদের সঙ্গে সংঘর্ষের ফলে ভারতের আদিম সন্তানরা, যেমন দাস, অসুর, কিরাত, শবর, পুক্কস, পুলিন্দ প্রভৃতি জাতিরা নিশ্চিহ্ন হয় অথবা অরণ্য পর্বতে আশ্রয় নেয়। কিছু অংশ সমুদ্র পারে দ্বীপপুঞ্জে পালিয়ে গিয়ে বসতি স্থাপন করে।

খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে পারসীকরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত জয় করে এবং সেখানে বসতি স্থাপন করে। তারপর আসে গ্রীক বা যবন জাতি। তা ব্যাক্‌ট্রিয়া বা বহ্লীক প্রদেশে এবং পরে পাঞ্জাবেও বসবাস শুরু করে। এর পর

পারসীক যবন, শক পহ্লব, কুষাণ ও হুন

শক, পহ্লব, ইউচি, কুষাণ প্রভৃতি জাতি মধ্য এসিয়া ও চীন থেকে এসে ভারতে ঢুকে পড়ে। গুপ্তযুগে এবং তার পরেও হূণ গুর্জর জাতি গুজরাট থেকে উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত স্থানে প্রবেশ করে। কালক্রমে এই শক, যবন, হূণ, গুর্জর প্রভৃতি বিদেশী জাতিরা ভারতবাসী-রূপে এখানকার ধর্ম ও সভ্যতা গ্রহণ করে। ফলে তাঁদের পৃথক অস্তিত্ব লুপ্ত হ'য়ে যায়।

মধ্যযুগে আরব, তুর্কী ও মুঘল

মধ্যযুগের শুরুতে মুসলিম বিজয়ের ফলে ইরাণ থেকে জরথুষ্ট্রবাদী পারসীক জাতির একটি শাখা ভারতে বোম্বাই, গুজরাট ও সিন্ধু অঞ্চলে আশ্রয় নেয়। ক্রমশঃ 'পার্শী' নামে এরা ভারতেরই সন্তান-রূপে গণ্য হয়। তারপর আসে আরব (সিন্ধু-প্রদেশে), তুর্ক-আফগান (উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও পাঞ্জাবে), তাতার ও মুঘল। এই সব বিভিন্ন বিদেশী জাতি ভারতীয়দের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে এক বর্ণসঙ্কর মুসলিম জনতার সৃষ্টি করে। ওদিকে পূর্ব সীমান্তপথে মোঙ্গলীয় জাতি চীন, তিব্বত ও ব্রহ্মদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করে। তারা লাডাক থেকে আসাম ও ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ডে ছড়িয়ে পড়ে। এই সব বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ধারায় ভারতবাসী পুষ্ট হ'য়েছে।

পূর্ব সীমান্তে মোঙ্গলীয় জাতি

রিজলি সাহেবের জাতিবিভাগ

ভারতীয় জাতি-তত্ত্ব বিষয়ে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত উনিশ শতকের শেষ ভাগে। স্যার হার্বার্ট রিজ্‌লি, জে. এইচ. হাটন্‌, রমাপ্রসাদ চন্দ, রুগোরি, এইচ্‌. সি. চাকলাদার, বি. এস গুহ প্রভৃতি বিদেশী ও স্বদেশী পণ্ডিত গত ৭০-৮০ বছর ধরে এ বিষয়ে বিভিন্ন অনুমান ও সিদ্ধান্ত খাড়া করেছেন। ডাঃ বি এস. গুহ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দেখিয়ে ভারতবাসীদের মোট ছয়টি বিভাগের সূচনা করেন যথা—(১) নেগ্রিটো, (২) প্রোটো-অস্ট্রেলয়ড, (৩) মোঙ্গলীয়, (৪) ভূমধ্য-সাগরীয়, (৫) ব্র্যাকিসিফেলিক বা প্রশস্তশির জাতি (৬) নর্ডিক বা আর্য ভাষা-গোষ্ঠী। অবশ্য কোনও জাতিবিভাগই সম্পূর্ণ ও শুদ্ধ নয়। ভারতবাসীর মধ্যে এত বিভিন্ন রক্তধারার মিশ্রণ ঘটেছে, যে স্বতন্ত্র গোষ্ঠীবিভাগ প্রায় অসম্ভব। ভাষা ও ধর্মের মধ্যেও এই রকম মিশ্রণ জটিলতা সৃষ্টি করেছে।

ডাঃ বি. এস. গুহের জাতি-নির্ণয়

জাতি, ভাষা ও ধর্মের জটিল মিশ্রণ

[দুই] **প্রকৃতি-পরিবেশের বা ভূগোলের গুরুত্ব** : নদী পর্বত আর সমুদ্র নিয়ে ভারতবর্ষ গঠিত। তাই এ দেশের ইতিহাসে সব ক'টিরই প্রভাব লক্ষ্য কর যায়। হিমালয়ের গলিত তুষার আর নানা শাখা-প্রশাখায় প্রবাহিত নদীগুলি আর্যাবর্তকে উর্বর ও শস্যসমৃদ্ধ করেছে। নদী-গুলির উপকূলে জনবহুল বসতি, উত্তরাপথের সহজ বিস্তার এবং সাম্রাজ্যের প্রসার এই কারণেই উত্তর ভারতের ইতিহাসকে বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। আবার দাক্ষিণাত্যের উভয় দিকে সমুদ্রের তীর থাকায় উপকূলের বন্দরগুলি এ যাবৎ

নদী মাতৃক দেশের ঐশ্বর্য

সামুদ্রিক বাণিজ্যের সহায়তা করেছে। ফলে দাক্ষিণাত্যের ও সুদূর দক্ষিণের রাজ্যগুলি নৌশক্তি গঠন করেছিল। ভারতের দক্ষিণ অংশ একটি উপদ্বীপের আকার, আর্যাবর্তের মতো প্রশস্ত নয়। তাই এখানে বিভিন্ন স্থানীয় সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন এবং সমুদ্র বাহিত বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকতর যোগাযোগ। দাক্ষিণাত্যের অধিত্যকাটি সমগ্র অধিকারে আনার জন্য তাই সাত-বাহন, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চোল প্রভৃতি রাজবংশের নিরন্তর প্রচেষ্টা চলেছিল।

সমুদ্র-প্রভাব

এই প্রাকৃতিক পরিবেশ শুধু বিভিন্ন রাজ্য স্থাপনের উদ্যম ও সুযোগ যোগায় নি। নদীমাতৃক দেশের উর্বরতা, প্রচুর খনিজসম্পদ এবং বাণিজ্যের প্রসার ভারতের রাজন্যবর্গকে বংশ-গৌরব ও কীর্তি-বিস্তারে প্রেরণাও দিয়েছে। সেই প্রভূত ঐশ্বর্যের কিছু অংশ স্থানীয় স্থাপত্য ও শিল্পকলার চর্চায় নিযুক্ত হয়েছে। স্বচ্ছন্দ জীবন-যাপনের ফলে ভারতীয়গণ প্রাচীনকাল থেকে জ্ঞান-চর্চা, শিল্প ও ধর্ম সাধনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছে।

প্রাচুর্য ও অবসর

ভারতীয় সমাজ সভ্যতার একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ভারতবাসীর সঙ্গে বিদেশীর সমন্বয়। শক, যবন, পহ্লব, কুষাণ, তুর্কী-মুঘল প্রভৃতি যে-সব বিদেশী জাতি ভারতে অনুপ্রবেশ করেছে, এমন কি দেশ বিধ্বস্ত করেছে তারাও প্রাকৃতিক পরিবেশের গুণে ভারতের উদার অঙ্গনে মিশে গেছে, ভারতীয় আচার ও সংস্কৃতি গ্রহণ করে দেশবাসীর সঙ্গে একাত্ম হয়েছে।

বিদেশীদের সাথে সমন্বয়

ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশেও অনেক বৈচিত্র্য ও তারতম্য দেখা যায়। মরুভূমি থেকে উর্বরতম অঞ্চল, গ্রীষ্ম-প্রধান থেকে নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল, বেলাভূমি থেকে পার্বত্য প্রদেশ, সব জায়গায় জনপদ গড়ে উঠেছে। প্রাকৃতিক প্রভাবে বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের প্রকৃতিও ভিন্ন। পার্বত্য ও মরুময় অঞ্চলে মানুষ কর্মঠ, খাদ্য সংস্থানের নিরন্তর চেষ্টায় শ্রমশীল, কষ্টসহিষ্ণু ও সাহসী। আবার সীমান্তবাসী মানুষেরা আত্মরক্ষার তাগিদে রণ-কুশল ও কঠোর প্রকৃতির। গাঙ্গেয় সমভূমির অধিবাসীরা সচ্ছল জীবন-যাত্রায় অভ্যস্ত থাকায় অনেকটা ভোগী ও আরাম-প্রিয়।

প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের ফল

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান এক হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ। ইউরোপে ভূমধ্য সাগরের মধ্যস্থলে ইটালির মতই ভারত দক্ষিণ এসিয়ার মধ্যমণি। পূর্বদিকে ব্রহ্ম, শ্যাম, চীন, মালয় ও ইন্দোনেশিয়া, তেমনি পশ্চিমে ইরান, আরব এবং আফ্রিকার পূর্ব-উপকূল। ভারত এই দক্ষিণ এসিয়া আর মধ্যপ্রাচ্যের মাঝখানে আছে বলে বহুদিন থেকেই উভয় দিকে বাণিজ্য সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং বিশ্ব বাণিজ্যের একটি কেন্দ্রস্বরূপ গড়ে উঠে। একদা বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করে ভারতবাসীরা বাণিজ্য ও সংস্কৃতির

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান

বিস্তার সাধন করেছে এবং ভারত মহাসাগরের পূর্ব-প্রান্তের ভূখণ্ডে—চম্পা-কম্বোজ, সুবর্ণভূমি অঞ্চলে কয়েকটি রাজ্যও প্রতিষ্ঠা করেছে।

সামুদ্রিক বাণিজ্য

গুপ্ত আমল থেকে দক্ষিণে চোলদের রাজত্বকাল পর্যন্ত এই প্রচেষ্টা চলেছিল।

এখানে মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন যুগে ভারতে একাধিক সাম্রাজ্য অথবা বড় বড় রাজ্য স্থাপিত হলেও, কেউই দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে নি। প্রত্যন্তের রাজ্যগুলি কেন্দ্রশক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, দূরত্বের সুবিধা নিয়ে মাঝে মাঝে তারা আপনার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। বঙ্গ, কাশ্মীর, গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলে অনেকবার স্বাধীন রাষ্ট্র স্থাপিত হয়েছে। সম্রাটরা দুর্বল হয়ে পড়লে দেশে অরাজকতা দেখা দিত এবং বিস্তৃত সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃংখলা রক্ষা করা কঠিন হ'ত। এই ভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতে কেন্দ্রশক্তি দৃঢ় ও স্থিতিশীল হতে পারে নি। ভৌগোলিক ও প্রাকৃতিক অবস্থার জন্যই ভারতীয় কেন্দ্রশক্তি বহুবার খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সাম্রাজ্যের স্বল্পস্থায়িত্ব

[তিন] **ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য ও মূলগত ঐক্য:** ভারতের মূলগত ঐক্য সম্বন্ধে কোনও সংশয়ের অবকাশ নেই। তবে ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনবচ্ছিন্ন পরম্পরা থাকলেও রাষ্ট্রীয় ঐক্য কতটা কার্যকরী হয়েছিল, তা বিচারের বিষয়। দেশের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে যে ধারাবাহিকতার অভাব, তার একটি বড় কারণ, সমগ্র ভারত একটি সর্বময় কর্তৃত্বের অধীনে ঐক্যবন্ধ হ'য়ে দীর্ঘকাল থাকেনি। মৌর্যযুগ, আলাউদ্দিন খলজী ও আওরঙজেবের রাজত্বকাল ছাড়া অন্য কোনও সময়ে প্রায় সমগ্র ভারত জুড়ে একটি সার্বভৌম শক্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় নি।

রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অভাব

আপাত-দৃষ্টিতে ভারতের বৈচিত্র্য ভারতকে যেন এক আশ্চর্য চিত্রশালায় পরিণত করেছে। এখানকার বিভিন্ন ভাষা, জাতি, ধর্মমত ও সামাজিক আচার ব্যবহারের পার্থক্য নৈসর্গিক তারতম্য উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের বিচিত্র নমুনা, আদিম অধিবাসী থেকে সুশিক্ষিত মানব-সভ্যতার বিভিন্ন পর্যায় বিশ্বের মানুষকে বিস্মিত করে। ভূ-তত্ত্ব, নৃ-তত্ত্ব, ভূগোল ও সমাজ-বিজ্ঞানের এমন দৃষ্টান্ত ও প্রয়োগস্থল বোধ হয় আর কোথাও নেই।

বৈচিত্র্যের নমুনা

যাই হোক, নানা বিরোধ-বিভেদ সত্ত্বেও ভারতের মূলগত ঐক্য অক্ষুন্ন ছিল ও আছে। এর কারণ, প্রথমতঃ, ভারতীয় সভ্যতার মধ্যে এমন কয়েকটি বন্ধন আছে যা সমগ্র হিন্দু সমাজকে সমন্বয়ের সূত্রে বেঁধে রেখেছে।

মূলগত ঐক্য : কয়েকটি বিশেষ বন্ধন

দ্বিতীয়তঃ, সব হিন্দুই বেদ মানেন; গীতা, উপনিষদ ও সংহিতাগুলিকে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বলে শ্রদ্ধা করেন এবং রামায়ণ-মহাভারতকে জাতীয় মহাকাব্য হিসেবে সমাদর করেন।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থের প্রভাব

তৃতীয়তঃ, দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় একদা যে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তারের ফলে 'গ্রেটার ইন্ডিয়া' বা বৃহত্তর ভারত আর উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে 'ইণ্ডিয়া মাইনর' বা 'অনু-হিন্দুস্থান প্রতিষ্ঠিত হয়, তা'ও সর্বভারতীয় সংহতির ও ঐক্য-চেতনার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বৃহত্তর ভারত ও অনু-হিন্দুস্থান

চতুর্থতঃ, ভাষাতত্ত্বের বিচারেও দেখা যায়, অধিকাংশ প্রাদেশিক ভাষার আদি উৎস সংস্কৃত। এমন কি সুদূর দক্ষিণেও প্রাচীন শিলালিপি ও সাহিত্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত। কাজেই সংস্কৃত ভাষা নিঃসন্দেহে ভারতবাসীর মনে ঐক্যবোধ বৃদ্ধি করেছে।

সংস্কৃত ভাষা

পঞ্চমতঃ, বৈদিক সাহিত্যে 'একরাট', 'সম্রাট', বৈরাট প্রভৃতি পদগুলির উল্লেখ এবং রাজসূয় ও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান থেকে বোঝা যায় 'রাজচক্রবর্তীর' আদর্শ সম্পর্কে সেকালের ধারণা অস্পষ্ট ছিল না। এগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, বৈদিক যুগ থেকেই ভারতে একচ্ছত্র শাসনব্যবস্থা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু হয়েছিল; মুঘল ও ব্রিটিশ যুগে এই ঐক্যের আদর্শ বাস্তব রূপ লাভ করে। এই ঐক্যবোধ আরও শক্তিশালী হয় ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে এবং তা চূড়ান্ত বাস্তবরূপ পায় স্বাধীন ভারতের আত্মপ্রকাশে।

রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ

পরিশেষে, ভারতীয় সভ্যতা মুখ্যতঃ হিন্দু সংস্কৃতির হলেও আসলে একটি মিশ্র পদার্থ। একাধারে প্রক্রিয়া ও পরিণতি। বহুদিন ধরে নানা জাতির সংমিশ্রণে, এমন কি তুর্কী, মুঘল ও ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশী শাসক-সমাজের দানে এই সভ্যতা সমৃদ্ধ। মুসলিম আচার-ব্যবহার, সংস্কৃতি ও শিল্প-রীতি, ভাষা ও বেশ-ভূষা ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতাকে কম প্রভাবিত করে নি। মুসলমান ও খৃস্টানদের সাথে রাষ্ট্রীয় বিরোধ সত্ত্বেও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারত চিরদিনই সমন্বয়ে বিশ্বাসী। তাই এদেশে ভাষা, ভাব ও জীবিকা এবং ধর্ম আচার ও সংস্কারগত অসঙ্গতি, বিরোধ বা বৈচিত্র্য থাকলেও মৌলিক একতার অভাব কখনও হয়নি এবং এখনও নেই। ভারতের এই মৌলিক ঐক্য তথ্য হিসেবে ঐতিহাসিক শক্তি, আদর্শ হিসেবে জাতীয় প্রয়োজন।

সমাজ ও সভ্যতার সমন্বয়

[চার] প্রাচীন যুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান ঃ ভারত-ইতিহাসের বিষয়বস্তু যেমন বিশাল, উপাদানও তেমনই প্রচুর ও বিক্ষিপ্ত। তবে প্রাচীন যুগের ইতিহাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়। মধ্যে মধ্যে অনেক ফাঁক আছে, যা এখনও ভরাট করা সম্ভব হয় নি, গবেষণার অপেক্ষায় আছে।

প্রাচীন ইতিহাস পুণ-র্গঠনে অসুবিধা

প্রাচীন যুগের ভারত ইতিহাসের উপাদানগুলিকে সাধারণতঃ তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়—(১) প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান, (২) সাহিত্য, পুরাণ ও প্রচলন এবং ইতিহাস আশ্রয়ী রচনাবলী এবং (৩) বিদেশী পর্যটকদের লেখা বিবরণ। এগুলি প্রাচীন ভারত ইতিহাসের মৌলিক উপাদান।

উপাদানের শ্রেণীবিভাগ

১। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

[ক] **শিলালেখ ঃ** প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সব চেয়ে নির্ভরযোগ্য উপকরণ হ'ল শিলালেখ তাম্রশাসন। হিন্দুযুগে হরিষেণ কৃত সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ প্রশস্তি, রবিকীর্তি রচিত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল প্রশস্তি কিংবা সাতবাহনরাজ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির বিখ্যাত নাসিকপ্রশস্তি অতি মূল্যবান দলিলের পর্যায়ে পড়ে। আর্যদের আগমন ও তাদের কোনও কোনও দেবতার প্রাচীনতম উল্লেখ পাই পশ্চিম এসিয়ায় প্রাপ্ত বোঘজ-কোই লিপিতে। পারস্যের বেহিস্তান লিপি পারসীকদের ভারত সীমান্ত জয়ের কাহিনী জানতে সাহায্য করে। তবে অশোকের শিলালিপি সবচেয়ে প্রামান্য ও মূল্যবান মুখ্য ও গৌণ শিলালেখ, স্তম্ভ অনুশাস এবং গুহালিপি গুলি অশোকের জীবন-কথা ধর্মপ্রাণতা, সাম্রাজ্য সীমা ও বিচিত্র কর্মসূচীর গৌরব পরিচয় বহন করে চলেছে। পরবর্তী কালে কলিঙ্গরাজ খারবেলের কাহিনী ও সৌরাষ্ট্রের শকক্ষত্রপ রুদ্রদামনের কথা যথাক্রমে হাতিগুম্ফা শিলালিপি ও জুনাগড় শিলালিপি থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। দাক্ষিণাত্যের পল্লব, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট এবং চোল রাজাদের অনেক শিলালেখ ও তাম্রশাসন পাওয়া গেছে। অসংখ্য বহির্ভরতীয় লিপিও প্রাচীন ভারত ইতিহাসের মৌলিক উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

শাসনলিপি

প্রশস্তি

বিভিন্ন লেখমালার প্রয়োজনীয়তা

অশোকের শিলালিপি

হাথিগুম্ফা ও জুনাগড় শিলালিপি

দাক্ষিণাত্যের শিলালেখ ও তাম্রশাসন

[খ] **মুদ্রা ঃ** প্রাচীন কালের মুদ্রাগুলিও প্রাচীন ইতিহাস রচনার যথেষ্ট্য সাহায্য করে। দাক্ষিণাত্যে ৫৭টি জায়গায় রোমক মুদ্রা-ভান্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে। সহজেই অনুমান করা যায় যে প্রাচীনযুগে রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে দক্ষিণ ভারতের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য ছিল। উত্তর ভারতেও অনেক কুষান ও গুপ্ত স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া গেছে। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজাদের বহু রকমের রৌপ্যমুদ্রা এবং গ্রীক, শক, পারদ প্রভৃতি বিদেশী রাজাদের বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা সমকালীন রাজ্যের নাম, রাজার উপাধি এবং কীর্তিকথা জানতে সাহায্য করে। সুতরাং প্রাচীন মুদ্রা না পাওয়া গেলে ভারত-ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায় অসম্পূর্ণ থাকত। তবে শিলালিপির মত মুদ্রা অতটা নির্ভরযোগ্য নয়। তাই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে মুদ্রার সতর্ক ব্যবহার বাঞ্ছনীয়।

দাক্ষিণাত্যে রোমক মুদ্রা

উত্তর ভারতের বিভিন্ন মুদ্রা

উপাদান হিসাবে মুদ্রার গুরুত্ব

[গ] **প্রত্নতাত্ত্বিক নমুনা ঃ** মাটির নীচে ধ্বংসস্তূপ থেকে এমন অনেক জিনিস পাওয়া যায় যা ইতিহাসের অমূল্য উপকরণ। মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ থেকে প্রাগঐতিহাসিক সভ্যতার অস্তিত্বের একমাত্র প্রমাণ আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী

কালে মাটির উপরেও অনেক মন্দির, প্রাসাদের ভগ্ন বা অবিকৃত নমুনা প্রাচীন ভারতের স্থাপত্যরীতি ও ভাস্কর্য শিল্পের পরিচয় বহন করে। নালন্দা, মহাস্থানগড ও পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারগুলির ধ্বংসস্তূপ থেকে প্রাচীন কালের বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্বরূপ জানা যায়। সুদূর দক্ষিণে মহাবলিপুরম্ নগরে পল্লব রাজাদের অপূর্ব স্থাপত্য-কীর্তি, মধ্যভারতে চান্দেল্ল রাজাদের খাজুরাহো মন্দির গুচ্ছ, চোলরাজাদের আনুকূল্যে তৈরি আকাশচুম্বী বিশাল 'গোপুরম' গুলি উত্তর ভারতের সাঁচী, সারনাথের স্তূপ প্রভৃতি শুধু স্থাপত্য নয়, প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্য শিল্পেরও উৎকর্ষের নিদর্শন। অতএব প্রত্নতত্ত্বের কৃপায় ভারতের অনেক সুপ্ত বা বিস্মৃত গৌরব ইতিহাসে অমর হ'তে পেরেছে।

প্রত্নতত্ত্বের মূল্য প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনা

২. সাহিত্য, পুরাণ ও প্রচলন এবং ইতিহাস আশ্রয়ী রচনাবলী

প্রাচীন ইতিহাসে প্রচলন সাহিত্যের গুরুত্ব

বৈদিক যুগ থেকে প্রাক্ মৌর্য যুগ পর্যন্ত ভারত ইতিহাসে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের যথেষ্ট অভাব। এ ক্ষেত্রে দেশীয় সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ—এককথায় প্রচলনের উপর নির্ভর করতেই হয়।

বৈদিক সাহিত্য

বৌদ্ধ সাহিত্য

বেদ ও বৈদিক সাহিত্য থেকে আর্যদের সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, দর্শন চর্চা, সামাজিক রুচি ও রাজাবলীর কথা জানা যায়। বৌদ্ধ জাতকমালা থেকে তৎকালীন সমাজ এবং সিংহলী বৌদ্ধ গ্রন্থ 'মহাবংশ' 'দিপবংশ' ও 'দিব্যাবদাল' থেকে সম্রাট অশোকের অনেক কথা জানা যায়। বৌদ্ধ মহাকবি অশ্বঘোষ, দার্শনিক নাগার্জুন, আর্যসঙ্গ ও বসুবন্ধুর রচনায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির স্বরূপ প্রতিফলিত হয়েছে।

পুরাণ

মহাকাব্য

আবার অষ্টাদশ পুরাণে ভারতের ভৌগোলিক, বিভিন্ন রাজবংশের তালিকা, এবং সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা জানা যায়। রামায়ণ ও মহাভারত এই মহাকাব্য দু'খানি প্রাচীনকালের সমাজচিত্র ও জীবনাদর্শ তুলে ধরেছে। এ ছাড়া, শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিক', মহাকবি কালিদাসের 'মালবিকাগ্নিমিত্রম্', বিশাখদত্তের 'মুদ্রারাক্ষস' প্রভৃতি সংস্কৃত নাটক এবং হিন্দুযুগের স্মৃতি ও ধর্মশাস্ত্র, নীতি ও অর্থশাস্ত্র গুলি আমাদের প্রাচীন ইতিহাস ও সমাজের অনেক বিস্মৃত অধ্যায়ের উপর আলোকপাত করেছে। বিশেষজ্ঞ কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে প্রাচীন কালের রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনীতির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।

সংস্কৃত নাটক

ধর্মনীতি ও অর্থশাস্ত্র

হিন্দু ইতিহাস-গ্রন্থ

ভারতের ইতিহাস গ্রন্থগুলিও মূল্যবান তথ্যের সংগ্রহ। কলহনের রাজতরঙ্গিনী, বিহ্লনের বিক্রমাঙ্কচরিত বাণভট্টের হর্ষচরিত, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত' এবং বাক্পতিরাজের গৌড়বহো আর চাঁদবরদই-কৃত পৃথ্বীরাজ চরিত প্রভৃতি 'চরিত-গ্রন্থ' থেকে আমরা কাশ্মীর, চালুক্য,

থানেশ্বর, বাংলা এবং রাজপুতানার প্রসিদ্ধ রাজা ও রাজবংশের অনেক মূল্যবান তথ্য জানতে পারি।

৩. বিদেশী পর্যটকদের লেখা বিবরণ

যুগে যুগে বিভিন্ন বিদেশী পর্যটক ভারত-ভ্রমণে এসে ভারতের গৌরব ও ঐশ্বর্যের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন। এই প্রসঙ্গে মেগাস্থিনিসের 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই গ্রন্থে মৌর্যযুগের ইতিহাস পাওয়া যায়। পরবর্তী কালের লেখক স্ট্রাবো, অরিয়ান ডিওডোরাস, টলেমি, কার্টিয়াস, প্লুটার্ক ও প্লিনি প্রভৃতি গ্রন্থকারের ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক বিবরণ বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। খৃস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এক অজ্ঞাতনামা গ্রীক নাবিকের লেখা 'পেরিপ্লাস' নামক গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের বন্দরগুলির এবং রপ্তানি ও আমদানির নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। চৈনিক পর্যটকদের মধ্যে গুপ্ত আমলের ফা-হিয়েন, হর্ষবর্ধনের সময়ের হিউয়েন-সাঙ এবং তারপর ই-সিং-এর ভ্রমণকাহিনী সমধিক প্রসিদ্ধ।

ভারত অতিথিদের বিবরণী

গ্রীক ও রোমান গ্রন্থকারের বিবরণ

চৈনিক পর্যটকগণ

———

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতে সভ্যতার উন্মেষ

১. প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য

ভূতত্ত্বের পণ্ডিতেরা বলেন, মানব ইতিহাসের আদিতে পুরাতন-প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age)। তারপর আসে নব্য-প্রস্তর (Neolithic Age), তাম্র (Chalcolithic বা Copper Age) ও লৌহ যুগ (Iron Age)। পুরাতন-প্রস্তর যুগে ভারতের আদিম অধিবাসীরা ধরনের জীবন যাপন করত, সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তারা পাথরের ভোঁতা অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করত। তারা ধাতুর ব্যবহার শেখেনি, কৃষির কাজ জানত না এবং বনের পশুপক্ষী খেয়ে জীবনধারণ করত। বোধ হয়, আগুনের ব্যবহার তাদের জানা ছিল না এবং বসবাসের কোন নির্দিষ্ট জায়গাও তাদের ছিল না।

পুরাতন প্রস্তরযুগ

পণ্ডিতেরা পুরাতন প্রস্তর যুগ ও নব্য প্রস্তরযুগের মধ্যবর্তী সময়ে 'মেসোলিথিক' (Mosolithic) সভ্যতা নামক নামে একটি পর্ব চিহ্নিত করেছেন। ('Meso' শব্দটি গ্রীক এবং এর অর্থ 'মধ্য')। এই সভ্যতার বৈশিষ্ট্য হল এই যে এ যুগের যন্ত্রপাতিগুলি আকারে খুবই ছোট (প্রায় ২½ সেঁমি মাত্র) এবং এগুলির নির্মাণ কৌশলও পুরাতন প্রস্তরযুগের নির্মাণ কৌশল থেকে স্বতন্ত্র।

পাথরের মসৃণ অস্ত্র ও মাটির তৈরি জিনিসের ব্যবহার, কৃষিকর্ম ও পশুপালন নব্য-প্রস্তর সভ্যতার বৈশিষ্ট্য। এই যুগের মানুষ থেকেই বোধহয় ভারতের বন্য ও পার্বত্য আদিম জাতিগুলির উৎপত্তি।

নব্য-প্রস্তর যুগ

তাম্র ও লৌহযুগে মানুষ আরও সভ্য হয়। তারা ধাতুর ব্যবহার, বিশেষতঃ তামা ও তারপর লোহার জিনিষের ব্যবহার শেখে। নব্য-প্রস্তর এবং তাম্রযুগের সংযোগস্থলে আসে তাম্র-প্রস্তর যুগ। পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা বলেন, এই সন্ধিকালে পাথরের ব্যবহার টিকে থাকলেও তামার ব্যবহার বাড়তে থাকে।

তাম্র-প্রস্তর যুগ

এই সময়েই ভারতের সিন্ধু উপত্যকায় এক প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতার জন্ম হয়। সিন্ধু থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-ভাগের নানা জায়গায় এই সভ্যতার ভগ্নস্তূপ ছড়ানো আছে। তাই একে সিন্ধু উপত্যকার সভ্যতা, সংক্ষেপে সিন্ধু সভ্যতা বলা হয়। বর্তমানে পণ্ডিতরা এর নামকরণ করেছে 'হরপ্পা সভ্যতা'। কারণ সিন্ধুনদের

সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা

পাশাপাশি উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত ভূখণ্ডে মহেঞ্জোদড়ো, হরপ্পা ও আরো কয়েকটি অঞ্চলে এই হরপ্পা সভ্যতার বহু ধ্বংস চিহ্ন ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে।

১. তাম্রপ্রস্তর যুগের হরপ্পা সভ্যতা

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার

প্রায় ৬৫ বছর পূর্বে ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ববিভাগের কর্তা স্যার জন মার্শাল এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার বা পুনরুদ্ধার করেন। পূর্বে ধারণা ছিল বৈদিক আর্যদের সভ্যতাই ভারতের সবচেয়ে প্রাচীন সংস্কৃতি। কিন্তু মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার বসতি চিহ্ন আবিষ্কৃত হলে প্রমাণ পাওয়া গেল যে প্রাক্-আর্য যুগে সিন্ধুনদের তীরে একটি সুপ্রাচীন সভ্যতার জন্ম ও প্রসার ঘটেছিল। ম্যাকে, মর্টিমার, হুইলার, পিগট, ননীগোপাল মজুমদার প্রভৃতি দেশী ও বিদেশী পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে হরপ্পা সভ্যতা সম্বন্ধে এখন অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার ঃ মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার মধ্যে কয়েক শ' মাইলের ব্যবধান রয়েছে। এই দুটি মৃত শহরে যে সভ্যতার অতীত চিহ্ন মাটির গর্ভ থেকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাতে বোঝা যায় এটা কোন ভূঁইফোড় সভ্যতা নয়। বরং বেশ পরিকল্পিত একটি বড় অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত কোনও বিশিষ্ট সভ্যতার উদয়, উন্নতি ও পতনের প্রমাণ রয়েছে। সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলা থেকে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারি জেলার হরপ্পা পর্যন্ত সিন্ধুনদের অববাহিকা ধরে একটি বিশাল ভূ-খণ্ডে এই প্রাগৈতিহাসিক বিশাল সভ্যতার বিকাশ ও প্রসার ঘটে। আমরি, ঝাঙর, চানহুদড়ো প্রভৃতি সংলগ্ন স্থানেও এ সভ্যতার একাধিক ধ্বংস চিহ্ন পাওয়া গেছে।

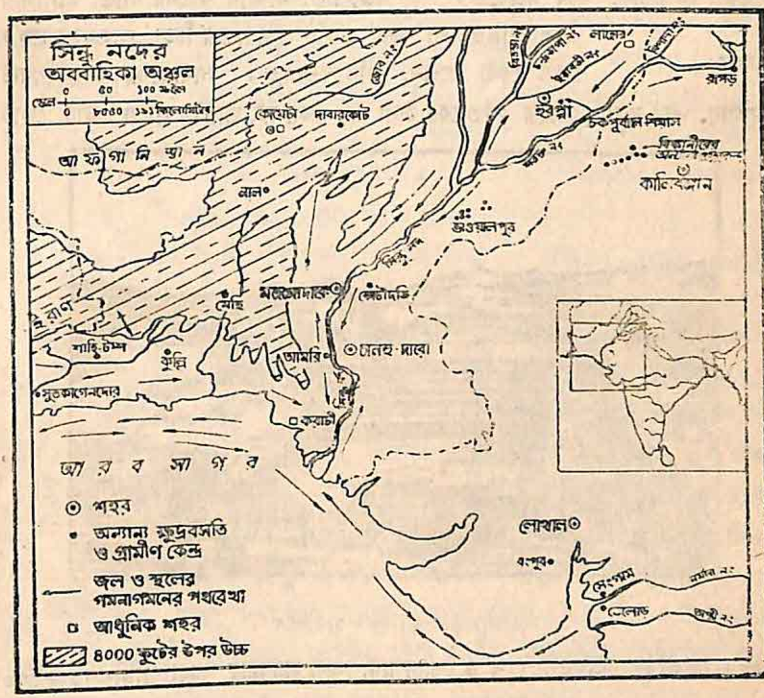
হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃতি

ভারত সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ গুজরাটে লোথাল ও রংপুর প্রভৃতি জায়গায় সম্প্রতি খননকার্য চালিয়ে সিন্ধু সভ্যতার চিহ্ন পেয়েছেন। সিন্ধু প্রদেশে ঝুকর, পূর্ব পাঞ্জাবে রুপার, রাজস্থানে বিকানীরের কাছে ও মীরাটের অন্তর্গত আলমগীরপুর নামক স্থানে এমন কি উত্তর গঙ্গা-উপত্যকার হরপ্পা সভ্যতার অনেক নিদর্শন, বিশেষ করে ছাইরঙা মৃৎপাত্রের ভাঙা অংশ পাওয়া গেছে। হয়তো একদিন জানা যাবে, আর্য সভ্যতার প্রথম কেন্দ্রস্থলেও সিন্ধু সভ্যতার স্পর্শ ও বিস্তার হয়েছিল। তখন উভয় সভ্যতার সংযোগ ও মিলনকাল ক্রমে আরও স্পষ্ট ও নির্দিষ্ট হয়ে উঠতে পারে।

সাম্প্রতিক খনন কার্য

হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীনত্ব ঃ মাটি খুঁড়ে হরপ্পা সভ্যতার যে সব নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তাদের স্তরবিন্যাস লক্ষ করে এক একটি স্তরের কালপর্ব নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। ভূপৃষ্ঠের নিচেই অর্থাৎ ধ্বংসস্তূপের সবচেয়ে উপরের স্তর খৃস্টপূর্ব ২৫০০ বছরের বলে অনুমান করা হয়। তার নিচে মধ্য স্তরের বয়স

খৃস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খৃস্টপূর্ব ৩০০০ বছরের কাছাকাছি। আর সর্বনিম্ন স্তর যেটি সবচেয়ে প্রাচীন, তার অস্তিত্বকাল খৃস্টপূর্ব ৩০০০ বছরেরও আগে বলে ধরা হয়। অবশ্য এই সময়সীমাগুলি আনুমানিক। তবে সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীনত্ব অন্ততঃ খৃঃ পূঃ ৩০০০ থেকে খৃঃ পূঃ ২০০০ পর্যন্ত বলে স্বীকার করা হয়।



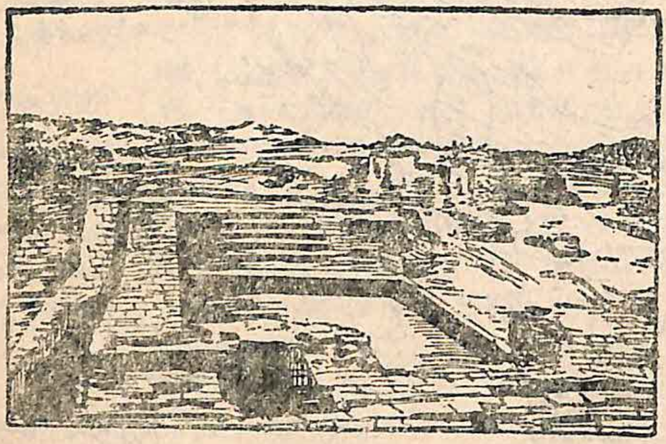
কোনও কোনও ভারতীয় পণ্ডিত বৈদিক সভ্যতার কালকে খৃঃ পূঃ ১৫০০ থেকে আরও অনেক পিছনে সরিয়ে দিয়ে সিন্ধু সভ্যতার চেয়ে বৈদিক সভ্যতা যে আরও প্রাচীন তা প্রমাণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু এই অনুমানের কারণগুলি যুক্তিসিদ্ধ নয়। সিন্ধুসভ্যতার স্রষ্টা কারা এ বিষয়ে পণ্ডিতদের বিস্তর মতভেদ আছে।

হরপ্পা সভ্যতার নগর জীবন ঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যমে মহেঞ্জোদড়ো এবং হরপ্পার ধ্বংস স্তূপ থেকে বহু প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে। মাটি খুঁড়ে যে মৃৎশিল্প, অলংকার এবং পূর্ত কার্যের নমুনা পাওয়া গেছে, সময়ের বিচারে তা সত্যই বিস্ময়কর। দেখা গেল, মাটির অনেক নিচে পুরাতন শহরের স্তর বিশিষ্ট ভগ্নাবশেষ রয়েছে। পোড়া মাটির তৈরি অনেক জিনিস—পাত্র, জলাধার, পুতুল ও ক্ষুদ্র নারীমূর্তি পাওয়া গেছে, যাদের কারুকার্য অতি সুন্দর। এখানকার আবিষ্কৃত সীলগুলির উপর অজানা হরফে যে সব লেখা আছে, তাদের পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয়নি।

মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পার প্রাচীন নগর পরিকল্পনা, বিশেষভাবে শহরের বাড়িঘর, পথে আলোর ব্যবস্থা ও রাস্তার ছক্ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় হরপ্পা সভ্যতা মুখ্যতঃ নাগরিক সভ্যতা, বৈদিক সভ্যতার গ্রাম-জীবনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি। ইমারৎগুলি ভালো জাতের ইঁটে তৈরি, খুব মজবুত। বড় বড় বাড়ি, মাঝারি ধরনের বাড়ি, স্নানাগার এবং থামওয়ালা মস্ত একটি হল-ঘরের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কেউ কেউ বলেন, ওটি সভাগৃহ। সাধারণের জন্য বিরাট স্নানাগার, তার মধ্যে বোধহয় সাঁতারের জন্য এক জলাশয়, তারই পাশে ছোট ছোট

নাগরিক সভ্যতার নিদর্শন

স্নানাগার



মহেঞ্জোদড়োর আবিষ্কৃত স্নানাগার

কক্ষে গরম জলের ব্যবস্থা, কূপ ও শৌচাগার, জল সরবরাহ এবং স্নানাগার থেকে জল নিকাশের বন্দোবস্ত দেখলেই বোঝা যায়, পৌর-জীবনের সুখ সুবিধার অভাব ছিল না। চওড়া বাঁধানো রাজপথগুলির আশে পাশে শহরের বিভিন্ন পল্লী। পল্লীগুলিতে অনেক বড় বড় ইমারৎ শোভা পেত। বাড়িগুলি ছিল কয়েকতল উঁচু ও চক মিলান। উপরে ওঠবার সিঁড়ি কিছু সংকীর্ণ। ভিতরে বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, স্বতন্ত্র রন্ধনশালা, জল নিকাশের চাপা নালী ও স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য পাকা নর্দমার ব্যবস্থাও ছিল। নগরজীবনের উপকরণ দেখে মনে হয়, প্রয়োজন ও আয়োজন সম্পর্কে নাগরিকদের যথেষ্ট চেতনা ও অভিজ্ঞতা ছিল। নগরে বড় বড় পথ ছাড়া সরু সরু রাস্তাও ছিল। যাতায়াতের গলিগুলি বাড়ির পাশ দিয়ে বড় রাস্তায় মিশেছিল। গৃহস্থরা অনেকটা যেন বর্তমান কালের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। মনে হয়, ক্রীটের নাগরিকদের মত এরা স্বাধীনভাবে জীবিকা নির্বাহ করত। বড় দালান-গুলিতে কোথাও রাজকীয় চিহ্ন নাই, দাস প্রথারও কোনও স্বাক্ষর পাওয়া যায় না।

নগর পরিকল্পনা

বাসগৃহ

জল নিকাশের ব্যবস্থা

পথঘাট

হরপ্পা সভ্যতার সমাজ জীবন ও অর্থনৈতিক জীবন ঃ সিন্ধু উপত্যকার নগরবিন্যাস থেকে ধারণা হয়, হরপ্পা সভ্যতার সমাজের শীর্ষে ছিল শাসক শ্রেণী। হুইলারের মতে এরা ছিল হয় পুরোহিত-রাজা অথবা অন্য কোন ক্ষমতাশালী গোষ্ঠী। নগরগুলির চতুর্দিকেই ছিল শস্যক্ষেত এবং কৃষকদের গ্রাম। শহরগুলিতে যে ধরনের গৃহস্থালীর যন্ত্রপাতি এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি পাওয়া গেছে তা দেখে মনে হয় শহুরে মানুষের একটি বিশাল অংশে ছিল শিল্পী ও কারিগর শ্রেণীর লোক। গ্রামের কৃষকদের এবং নগরের শ্রমিক ও কারিগরদের দুর্গগুলি থেকে শাসন করা হত। শাসকশ্রেণী ও শ্রমিক-কৃষক শ্রেণীর মাঝে ছিল বণিক শ্রেণী বা সমৃদ্ধ মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়। সেকালে শ্রমিক ও কারিগররা অনেক বেশি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করত। তারা ইঁটের বাড়িতে বাস করত এবং তামার জিনিসপত্র ও সোনার গহনা ব্যবহার করত।

শাসক শ্রেণী

কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণী

মধ্যবিত্ত শ্রেণী

বেশ-ভূষা ঃ হরপ্পা সভ্যতায় স্ত্রী ও পুরুষরা ভালো ভালো পোশাক ও অলংকার পছন্দ করত। স্ত্রীলোকরা হাতির দাঁতের ও সোনা রুপোর গহনা ব্যবহার করত। দামী পাথরের জড়োয়া অলংকারও প্রচলিত ছিল। গহনার মধ্যে আংটি, কানের দুল, নাকছাবি, মল, হার এবং বাজুবন্ধের নমুনা পাওয়া গেছে। মাথার সাজ ও চুলের পরিচর্যার দিকে যথেষ্ট নজর দেওয়া হত। বাড়ির জিনিসপত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র তৈরি হত ধাতু ও পাথর দিয়ে। ধাতুর মধ্যে সোনা, রুপো, তামা ও টিনের যে প্রচলন ছিল তার অনেক নিদর্শন আছে। যে সব চৌকো সীল ধ্বংসস্তূপের মধ্যে পাওয়া গেছে সেগুলি বোধ হয় বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের জন্য ব্যবহার হত।

বেশভূষা ও অলঙ্কার

ধাতু দ্রব্য

জীবিকা ও শিল্প কাজ ঃ সে যুগের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষিকাজ, চাষের গমই ছিল প্রধান খাদ্য। এ ছাড়া মাছ, মাংস, ডিম ও দুধ খাদ্য হিসাবে প্রচলিত ছিল। তুলো থেকে সুতো কাটা ও কাপড় বোনা আর পশমের ব্যবহারও ছিল, তার প্রমাণ আছে। মাটির নিচে খেজুর, তরমুজ, গম ও যব প্রভৃতি শস্যের বীজ দানা পাওয়া গেছে। এখানকার মানুষ লিখতে জানত। পালিশ-করা পোড়ামাটির উপর নানা গৃহপালিত জীবজন্তু, যেমন গরু, মোষ, কুকুর, শুয়োর, ভেড়া, আবার মানুষের মূর্তি, ফুল লতাপাতা ও পাখির ছবি রঙ দিয়ে সুন্দর করে আঁকতে পারত। গৃহস্থালী জিনিসের মধ্যে পাওয়া গেছে সুচ, বঁড়শি, ক্ষুর, তামার ও ব্রোঞ্জের তৈরি ছুরি ও কুঠার, অনেক রকম মাটির পাত্র, অসংখ্য পোড়ামাটির খেলনা, কুমোরের চাকা, ছোট ছোট কেদারা, চাকাওয়ালা গাড়ি আর নানাবিধ তৈজস সামগ্রী। মাটির পুতুলগুলি

জীবিকা ও খাদ্য

লিখন ও অঙ্কন

গৃহস্থালী দ্রব্য

খুব যত্ন করে তৈরি। বামদিকে পা-ওঠানো নৃত্যরত পুরুষমূর্তি বোধ হয় আমাদের নটরাজের সর্ব প্রথম নমুনা। আর এক নর্তকী রমণীমূর্তির যে শিল্পসৌন্দর্য, তা প্রায় নিখুঁত। এ সব মূর্তির মধ্যে একটা বলিষ্ঠ জীবন্ত ভাব আছে। বিশেষ করে, সীলগুলিতে যে কুঁজ-ওয়ালা ষাঁড়ের মূর্তি দেখা যায় তা অত্যন্ত সজীব। একটি সীলে মাস্তুলহীন জাহাজের প্রতিমূর্তি আছে, তাই থেকে অনুমান করা হয় যে এখানকার মানুষদের সঙ্গে বিদেশের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল সমুদ্রপথে।

মাটির পুতুল

বাণিজ্য সম্পর্ক

ধর্মবিশ্বাস ঃ যে সব প্রত্যক্ষ প্রমাণের কথা বলা হল, তা থেকে বুঝতে পেরেছ সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা কতটা উন্নত ও সভ্য ছিল। আর দুটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা দরকার। প্রথমত এখানে কোনও মন্দির বা উপাসনা-গৃহ পাওয়া যায়নি, সুতরাং এদের ধর্ম সম্বন্ধে কিছু স্থির করে বলা যায় না। তবে ষাঁড়, কুমির, সাপ ও কতকগুলি গাছকে পবিত্র মনে করা হত। আর পোড়ামাটির তৈরি মাতৃকা-মূর্তি এবং পশুবেষ্টিত যোগাসনে বসা পুরুষমূর্তি দেখে পন্ডিতরা অনুমান করেছেন, এখানকার সমাজে জগন্মাতা দেবীর ও জগদ-পিতা পশুপতিনাথের পূজা প্রচলিত ছিল।



পশুপতিনাথ

মৃতদেহ কবর দেওয়া এবং দাহ করা, দুই প্রথারই প্রচলন ছিল। মাটির নিচে শোওয়া অবস্থায় অনেক কঙ্কাল পাওয়া গেছে, পাশেই খাদ্য পানীয়ের পাত্র রাখা আছে। এ ছাড়া ভিত ও দেওয়াল খুঁড়তে গিয়ে দেখা গেল, একত্র অনেক কঙ্কাল এবং সেকালের নানা রকম অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন, হয়তো বিদেশীর আক্রমণে এই নগর নষ্ট হয়ে যায়। সিন্ধুসভ্যতার বিলোপের কারণ হিসেবে কেউ কেউ বা বলেন, সিন্ধুনদের বন্যায় কিংবা খাত বদলের ফলে এই অঞ্চল ক্রমেই জনশূন্য ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

বৈদিক যুগের আর্য সভ্যতাই যে আমাদের সবচেয়ে প্রাচীন গৌরব, সে ধারণা নির্ভুল নয়। সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার হওয়াতে এখন ভারতীয় সভ্যতার বয়স কম করে আরও দেড় হাজার বছর বেড়ে গেল। আর্যদের কাছে গাভীর কদর ছিল বেশি। ঘোড়া তাঁদের প্রধান বাহন আর লোহা ছিল প্রধান অস্ত্র। তাঁদের কাছে পিতৃপুরুষ ও পুরুষ-দেবতারাই বড়। কিন্তু সিন্ধু উপত্যকায় পাচ্ছি বৃষমূর্তি, তামা ও পাথরের ব্যবহার এবং নারী-শক্তির উপাসনা, যেগুলি আরও প্রাচীন। সুতরাং ইতিহাসে আর্য সভ্যতাকে যদি প্রথম অধ্যায় বলে ধরা যায়, তা হলে ভারতের সিন্ধু সভ্যতা হল সেই ইতিহাসের পূর্ব ভূমিকা।

বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ ঃ সুমের অঞ্চলে ও মহেঞ্জোদড়োতে প্রাপ্ত সীলমোহর, বৃষমূর্তি ও মৃৎপাত্রগুলির মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। তা' দেখে অনেকে সাব্যস্ত করেন যে শুধু স্থলপথে নয়, পারস্য উপসাগরের পথে সিন্ধুউপত্যকা ও সুমেরের বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল। একটি সীলমোহরের উপর মাস্তুলহীন জাহাজের প্রতিমূর্তি লক্ষ্য করে ম্যাকে সাহেব এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সিন্ধু-উপত্যকায় প্রাপ্ত চোঙ-এর মত সীলমোহর মেসোপটেমিয়ার বহু স্থানে আবিষ্কৃত হয়েছে। আক্কাদেও সিন্ধু-অঞ্চলের সীলমোহর পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদড়োতে মিশরের অনুকরণে তৈরি টুল ও দীপাধার পাওয়া গেছে। এ থেকে অনুমান করা যায় মিশরীয় সভ্যতার সঙ্গেও হরপ্পা সভ্যতার আদান-প্রদান ছিল। ঐতিহাসিক গর্ডন চাইল্ড বলেন যে টাইগ্রীস ও ইউফ্রেটিস নদের উপকূলের বাজারগুলির সঙ্গে সিন্ধু অঞ্চলের বণিকদের বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল।

———

তৃতীয় অধ্যায়

বৈদিক যুগ

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

[এক] আর্য সভ্যতা ঃঃ আর্যদের পরিচয় ঃ ভাষাপণ্ডিতেরা বলেন যে সংস্কৃত, গ্রীক, ল্যাটিন, পারসীক প্রভৃতি প্রাচীন ভাষাগুলি একই মূল ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে এবং যাঁরা এই আদি ভাষা ব্যবহার করতেন, তাঁরাই আর্য। এই আর্যদের আদি নিবাস কোথায় ছিল, তা নিয়ে মতভেদ আছে। কেউ বলেন দক্ষিণ রাশিয়া, কেউ বা বলতে চেয়েছেন উত্তর মেরু অঞ্চল। এ বিষয়ে কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তবে এখন মোটামুটি স্বীকার করা হয়েছে, মধ্য এসিয়া থেকে আর্যরা আসেন। উত্তরাঞ্চল ছেড়ে তাঁরা দক্ষিণ-পশ্চিম মুখে অগ্রসর হন জমির সন্ধান ও স্বচ্ছন্দ জীবন-যাত্রার তাগিদে। আর্যরা যখন পিতৃভূমি ছেড়ে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েন, তখন একদল প্রাচীন পারস্যে ইরান-সভ্যতার গোড়াপত্তন করেন, আর একদল ভারতে প্রবেশ করেন উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ দিয়ে এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

উৎপত্তি

আদি বাসভূমি

বিস্তার

আর্য ও অনার্য ঃ এখন আর্যরা কোন সময়ে ভারতে এসে বসবাস শুরু করলেন, তা নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ আছে। তবে খৃষ্টের জন্মের প্রায় দু-হাজার বছর আগে তাঁরা এ-দেশে প্রবেশ করেন, এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত মনে হয়। প্রথমে তাঁরা কাবুল থেকে সরস্বতী নদী পর্যন্ত 'সপ্তসিন্ধু' নামক জায়গায় অধিষ্ঠিত হন। উত্তর ভারতে তাঁদের বসতি বিস্তারে যথেষ্ট সময় লেগেছিল। খৃঃ পূঃ ১৫.০ থেকে খৃঃ পূঃ ৮০০ পর্যন্ত সময়ে আর্যরা ক্রমশঃ পূর্বদিকে অগ্রসর হন এবং সেখানে কুরু, পাঞ্চাল, মৎস্য, শূরসেন, কোশল ও তারপর গণ্ডক নদী পার হয়ে কাশী ও বিদেহ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেন। কিন্তু এ কাজ নির্বিঘ্ন ছিল না। স্থানীয় অধিবাসীরা যথেষ্ট বাধা দেয়, অবশেষে পরাজয় স্বীকার করে। আর্যদের সাহিত্যে এরা যজ্ঞবিঘ্নকারী কৃষ্ণবর্ণ 'অনার্য' বলে অভিহিত 'দাস' ও 'দস্যু' নামে পরিচিত। কিন্তু ঐ 'অনার্য' দ্রাবিড় জাতি সত্যই অত অসভ্য ছিল না। তাদের সমাজ, আচার-ব্যবহার আর্যপ্রথা থেকে আলাদা হলেও তারা দুর্গনির্মাণ ও যুদ্ধবিগ্রহে কম নিপুণ ছিল না। আর্য সমাজে নিম্নস্থান পেলেও তারা আর্য সমাজ ও সভ্যতার উপর কিছু কিছু প্রভাব বিস্তার করে। দীর্ঘকাল পাশাপাশি বাস করার ফলে একটা যোগসূত্র গড়ে উঠে। আর্যরা যাগযজ্ঞ করতেন, দেবতার স্তব উপাসনা করতেন। 'অনার্যরা' পূজা করত, মূর্তি গড়ত, পশু বলি দিত। কালক্রমে ঐ সব আচার প্রথা আর্য ধর্মও সমাজে

ভারতে আগমন

সময়কাল

অনার্য প্রতিরোধ

আর্য-অনার্য সংস্পর্শের ফল

ঢুকে যায়। বর্তমানে হিন্দু-ধর্ম ও পূজাদি ব্যাপারে যে-সব লৌকিক রীতি-নীতি আছে, তার কিছু কিছু অংশ 'অনার্য'দের কাছ থেকে এসেছে। তাছাড়া আর্যরা যখন অনার্য ভূমিতে অধিকার বিস্তার করেন, তখন বিভিন্ন বর্ণ ও জাতির মিশ্রণ হওয়াতেও ঐ সব মিশ্র জাতি হিন্দুসমাজভুক্ত হল। এখানে জেনে রাখো, আর্যরা 'অনার্য'দের কাছে কৃষিকাজের পদ্ধতি, 'পুর' বা নগর তৈরি, দলপতি বা রাজার নেতৃত্ব, এই রকম কয়েকটি বিষয়ে ঋণী ছিলেন।

ধর্মীয় ও সামাজিক ফল

বর্ণসংকর সৃষ্টি ও সংস্কৃতির মিশ্রণ

আর্যদের বসতি বিস্তার : প্রথমে আর্যরা কুরু, যদু, দ্রুহ্য, তুর্বসু ও ভরত প্রভৃতি কয়েকটি শাখায় বা গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিলেন। পরস্পরের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলত। এদের মধ্যে কুরুরাই পরে প্রবল হয়ে ওঠে। আর্যরা ক্রমে উত্তর ভারত অধিকার করলে সমগ্র অঞ্চলটি আর্যাবর্ত নামে পরিচিত হল। প্রাচী বা পূর্বভারত অনেক পরে আর্য সভ্যতার এলাকায় এসেছিল। প্রধান কারণ, বর্তমান বিহার-ওড়িশার অনেক অংশ এবং বাঙলা অঞ্চল ছিল বিস্তৃত জলাভূমি, বাসের অযোগ্য। আর্যরা এখানকার বাসিন্দাদের শবর, পুলিন্দ, নিষাদ প্রভৃতি আখ্যা দেন। তাঁদের ধারণা ছিল, পূর্বদিকে গিয়ে যাঁরা বসবাস করেন তাঁরা 'ব্রাত্য' বা পতিত হন।

বিভিন্ন গোষ্ঠী ও জনপদ

আর্যাবর্ত

পূর্বে ও পশ্চিমে প্রসার

মধ্য এবং পশ্চিম ভারতেও এই ভাবে আর্য বসতির বিস্তার হয়। পরবর্তী, বৈদিক যুগে আর্যরা বিদর্ভ ও চেদি রাজ্য, পশ্চিমে অবন্তী, সৌরাষ্ট্র, সৌবীর প্রভৃতি কয়েকটি আর্য জনপদ আর গোদাবরীর তীরেও দুটি রাজ্য স্থাপন করেন। বোঝা যায়, বিন্ধ্যপর্বত অতিক্রম করে আর্যরা ধীরে ধীরে দক্ষিণা-পথে প্রবেশ করেন এবং 'অনার্য'দের সঙ্গে যুদ্ধ করে সেখানে কয়েকটি জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন। দাক্ষিণাত্যে বিন্ধ্য ও নর্মদার মধ্যবর্তী অরণ্যভূমিতে, ওড়িশার পর্বতময় অঞ্চলে এবং গোদাবরী থেকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগে তখন 'অনার্য' জাতিরা বাস করত। রামায়ণের কাহিনী থেকে বোঝা যায়, সুদূর দাক্ষিণাত্যে তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত আর্য প্রভাব কিভাবে ছড়িয়ে পড়ে। বিন্ধ্য অতিক্রম করে অগস্ত্য ঋষির যাত্রা আর্যদের দাক্ষিণাত্যে অভিযান ও বসতি বিস্তারের কথাই প্রকাশ করে।

দাক্ষিণাত্যে বিস্তার

[দুই] **বেদ ও বৈদিক সাহিত্য :** আর্য সভ্যতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ হল তাঁদের প্রাচীনতম রচনা, বেদ—যার অর্থ 'জ্ঞান'। বেদের রচনাকাল নিয়ে অনেক মতভেদ আছে। কোনও পণ্ডিত বলেন খৃঃ পূঃ ৪৫০০, আবার কারুর মতে খৃঃ পূঃ ২৫০০। তবে আনুমানিক খৃঃপূঃ ১৫০০, এই সিদ্ধান্ত মোটামুটি এখন গ্রাহ্য হয়েছে। হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের মূল উৎস হচ্ছে বেদ। হিন্দুদের ধারণা, বেদ ঈশ্বর-নিঃসৃত বাক্য। মানুষের

বেদের সংজ্ঞা ও রচনাকাল

রচিত নয়, শ্রুত বাক্য। তাই বেদের অপর নাম 'শ্রুতি'। ঋষিরা' দিব্য দৃষ্টিতে এইসব শ্লোক গান ও কণ্ঠস্থ করে তাদের প্রচার করেন। বেদ চারটি—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। ঋক্ বেদই সব চেয়ে প্রাচীন. এতে আছে নানা মন্ত্র, স্তব। অনেকগুলি মন্ত্র নিয়ে গানের স্বরে রচিত হয়েছে সাম বেদ। যজুর্বেদে আছে যজ্ঞের ক্রিয়াকাণ্ড ও তার উপযোগী বিধিমন্ত্র। আর শেষ বৈদিক ধর্মগ্রন্থ হল অথর্ব বেদ যার মধ্যে সৃষ্টি-রহস্য, চিকিৎসা, বিপদ নিবারণ, শত্রু দমন প্রভৃতি বিষয়ের মন্ত্র আছে। প্রতি বেদের দুটি অংশ—পদ্যে রচিত 'সংহিতা' আর প্রধানতঃ গদ্যে লেখা 'ব্রাহ্মণ'। পরবর্তী বৈদিকযুগে 'উপনিষদ' ও আরণ্যক নামে আরও দুটি ধর্মতত্ত্ব বা দর্শনশাখার সৃষ্টি হয়। এ ছাড়া আছে 'সূত্র' অর্থাৎ বেদ বা শ্রুতির সংক্ষিপ্তসার। এই সূত্র সাহিত্যের মধ্যে পড়ে ষড় দর্শন—কপিলের সাংখ্য, গৌতমের ন্যায়, পতঞ্জলির যোগ, জৈমিনির পূর্ব মীমাংসা, ব্যাসের উত্তর মীমাংসা বা বেদান্ত এবং কণাদের বৈশেষিক। আর বেদ পাঠ ও বেদ রক্ষার জন্য ছয়টি প্রয়োজনীয় বিদ্যার নাম বেদাঙ্গ, যথা—শিক্ষা (উচ্চারণ), কল্প (যজ্ঞ), জ্যোতিষ, ছন্দঃ, ব্যাকরণ ও নিরুক্ত (শব্দের ব্যুৎপত্তি)।

চতুর্বেদ

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক উপনিষদ

সূত্র-সাহিত্য ষড়দর্শন ও বেদাঙ্গ

এই সব নিয়ে বৈদিক সাহিত্য একটি বিরাট চক্র বা মণ্ডলের মত গড়ে উঠেছে। তার মধ্যে পাওয়া যায় যাগযজ্ঞের পদ্ধতি, গার্হস্থ্য জীবনের নিয়ম এবং সমাজ-শাসনের বিধি-ব্যবস্থা। উত্তরকালে পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যরা আরও কয়েকটি শাস্ত্র রচনা করেন, যেমন আয়ুর্বেদ, ধনুর্বেদ, হস্তিশাস্ত্র বাস্তুবিদ্যা, সংগীত, শিল্প ও নাট্যশাস্ত্র। ঋগবেদের যুগ থেকে পরবর্তী বৈদিককাল পর্যন্ত প্রায় হাজার বছর ধরে নানা জ্ঞানগর্ভ বিষয় নিয়ে অনেক শাস্ত্রগ্রন্থ লেখা হয়েছিল। এই রচনাবলী শুধু হিন্দুদের কাছে শ্রদ্ধা পায়নি, বিদেশী পণ্ডিতরাও বৈদিক সাহিত্যকে সমাদর জানিয়েছেন।

অন্যান্য শাস্ত্র

ঋক্‌বেদের স্তোত্র ঃ ঋক্‌বেদ পদ্যে রচিত, অধিকাংশ শ্লোক অতি মধুর ও কাব্যময়, সুখশান্তি প্রার্থনা করে প্রাণের উচ্ছ্বাসে দেবতাদের স্তুতি। প্রাচীন মিশরের রাজা ইখনাটন যেমন সূর্যমণ্ডলের দেবতা আটনকে উদ্দেশ করে স্তোত্র রচনা করেছিলেন, ঋক্‌বেদে আর্যরাও তেমনি নানা ভাবে জীবনদাতা সূর্যের বন্দনা করেছেন। সূর্যেরই বা কত রূপ, কত নাম। তিনি 'সবিতা', তিনিই 'পূষণ' আবার বিবস্বান্, অর্থাৎ উজ্জ্বল, ভাস্বর। ঋক্‌বেদে ঊষা বা প্রথম প্রভাতের স্তবটি কত সুন্দর ও গম্ভীর, পড়ে দেখো ; "হে বিচিত্র দীপ্যমান ঊষা! আমরা নিকট বা দূর থেকে তোমাকে বুঝতে পারিনা। হে স্বর্গের কন্যা! তুমি অন্ন নিয়ে এস, আমাদের ধন দাও। হে অমর ঊষা! উজ্জ্বল আকাশের উপর থেকে তুমি শোভাময় পথ দিয়ে এস, অরুণ-রাঙা রশ্মিগুলি তোমাকে নিয়ে আসুক। হে অর্জুনি ঊষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করে কিরণ দিয়ে জগৎকে প্রকাশ কর।" ঊষার আগমন নিত্য

দিনের একটি প্রাকৃতিক ঘটনা। কিন্তু প্রথম উদয়ের দিব্য শোভা আর্যদের বিস্ময় মুগ্ধ করেছিল। জীবনের প্রয়োজনে, অন্ধকার থেকে আলো ও উত্তাপের আবির্ভাবকে তাঁরা সরল মনের আবেগে দেবীরূপে কল্পনা করে কাব্যের ভাষায় রূপ দিয়েছিলেন।

বৈদিক সাহিত্য উপনিষদ ঃ মানুষের সুখ দুঃখ, জগতের কারণ, ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান ও মুক্তির পথ প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করে বেদের উপনিষদ নামে অংশ রচিত হয়। উপনিষদের অর্থ 'নিকট বসিয়া' অর্থাৎ গুরুর কাছে বসে শিষ্য যে সব তত্ত্বকথা শেখেন। অনেকগুলি উপনিষদ আছে যথা কঠ, কেন, ঈশ, মণ্ডূক ইত্যাদি। এই সব গ্রন্থে গল্পের আকারে অনেক জ্ঞান ও শিক্ষার কথা বলা হয়েছে। স্বামী যাজ্ঞবল্ক্য ঋষি যখন একাকী বনে যেতে চাইলেন, তখন পত্নী মৈত্রেয়ী তাঁকে বললেন, 'পৃথিবীর ধন ও সুখ নিয়ে আমি কি করব যদি অমৃতের জ্ঞান না পেলাম! আবার এক কাহিনীতে বালক নচিকেতা মৃত্যুর পরে কি আছে, মানুষ কোথায় যায়, কি হয়, এসব জানবার জন্য যমপুরীতে হাজির হয়ে যমরাজকে নানা প্রশ্ন করেছিলেন, এই মৈত্রেয়ীর কাহিনী ও নচিকেতার গল্প শুধু সুন্দর নয়, মানুষের অনন্ত জিজ্ঞাসা ও সত্য অন্বেষণের কথাই ব্যক্ত করে।

[তিন] বৈদিক ধর্ম ও যজ্ঞকথা ঃ বেদের যুগে আর্যরা বহু দেবতার আরাধনা করতেন। প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিকে তাঁরা দেব-দেবী রূপে কল্পনা করে তাঁদের উদ্দেশে স্তব করতেন, প্রার্থনা জানাতেন। এইভাবে অনন্ত আকাশের দেবতা দ্যোঃ, বজ্রবৃষ্টির অধীশ্বর ইন্দ্র, আর অগ্নি, মরুৎ (বায়ু), বরুণ, বৃহস্পতি, পৃথিবী, নাসত্য (অশ্বিনী কুমার দ্বয়) এবং সূর্য অথবা মিত্র প্রভৃতি দেবতাদের উপাসনা হত কখনও একত্র, কখনও পৃথকভাবে; এইসব দেবতার স্তুতি করে ঋক্ মন্ত্রগুলি রচনা করা হয়। যজ্ঞের সাহায্যেই আর্যরা দেবতাদের প্রীতি সাধন করতেন, তাই যজ্ঞ হল বৈদিক ধর্মের প্রধান অঙ্গ। এখন কি ভাবে যাগযজ্ঞ হত, সেই কথা বলছি। প্রথমে বেদী তৈরি করে তাতে সমিধ বা পবিত্র জ্বালানী কাঠ দিয়ে আগুন করা হত এবং দেবতার আবাহন করা হত। তার পর ঘি ও খাদ্যদ্রব্য দিয়ে হোম করা হত। সে যুগে এই রকম অনেক যজ্ঞ করা হত, যেমন হবিষ্টোম, পুরোডাশ ইত্যাদি। যবের ছাতু ও দই দিয়ে পিঠে তৈরি করে সেগুলি যজ্ঞে আহুতি দেওয়া হত। কোনও কোনও যজ্ঞে পশুবলির প্রচলন ছিল। যাঁর কল্যাণে যজ্ঞ, তিনি হলেন যজমান। যিনি যজ্ঞ অনুষ্ঠান করতেন, তিনি ঋত্বিক। যিনি যজ্ঞের নিয়ম বলে দিতেন, তাঁকে বলা হত অধ্বর্যু আর যিনি সামগান করতেন, তিনি হলেন উদ্গাতা। মোট কথা, যজ্ঞই ছিল আর্যধর্মের পবিত্র অঙ্গ।

দেবতা স্তুতি

বেদবিদ্

রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা ঃ এইবার বৈদিক যুগের শাসনব্যবস্থা ও সমাজজীবনের

কথা বলি। সেকালের সমাজ ও রাষ্ট্র ছিল একটি বৃহৎ পরিবারের মত। পরিবারের ভিত্তি ছিল একটি দৃঢ় ও স্থায়ী এবং তার সদস্যরা এক একজন গৃহপতির কর্তৃত্বে যৌথভাবে বাস করত। সংসারে যেমন কর্তা বা 'গৃহপতি', গ্রামেও তেমনি গ্রামণী, যিনি গ্রামের প্রধান ব্যক্তি। কয়েকটি পরিবারের সমষ্টি হল গ্রাম, তেমনি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 'জন' বা 'বিশ'। তার অধিপতি হলেন 'রাজন্' বা 'বিশপতি'। সমাজে পিতৃ পুরুষের প্রাধান্য থাকায় গৃহপতির মত রাজাও ছিলেন রাজ্যের সর্বশক্তিমান কর্তা।

পরিবার ও সমাজ

রাজন

তবে বৈদিক যুগের গোড়ার দিকে ছোট ছোট রাজ্যগুলিতে রাজার কর্তৃত্ব অত প্রবল ছিল না। রাজ্যের প্রবীণ নেতাদের পরামর্শ নিয়ে রাজ্যশাসন চলত। সিংহাসনে বসার সময় রাজাকে পুরোহিত, সোনালী, গ্রামণী প্রভৃতি পদস্থ নায়কদের সামনে ভালোভাবে রাজ্য চালাবার প্রতিজ্ঞা করে শপথ নিতে হত। এই নেতাদের বলা হত 'রাজকৃত'। এছাড়া বৈদিক সাহিত্য 'সভা' ও 'সমিতি' নামে জনগণের প্রতিষ্ঠানের কথা পাওয়া যায়। এখানে সময়ে সময়ে রাজ্যের বিজ্ঞ ব্যক্তি ও অনান্য লোকেরা মিলিত হয়ে মত প্রকাশ করতেন। রাজা অত্যাচারী হলে প্রজারা তাঁকে পদচ্যুত করে অন্য কোনও যোগ্য দলপতিকে রাজা হিসাবে নির্বাচন করতে পারত। বৈদিক যুগের শেষ ভাগে অবশ্য রাজার ক্ষমতা অনেক বেড়েছিল। এখানে মনে রেখো, আর্য সমাজে পুরোহিত খুব পদস্থ ছিলেন, তাঁকে রাজা প্রজা সকলেই খুব মানতেন। আর্যাবর্তে যখন ক্রমশঃ জনপদ ও রাজ্যসংখ্যা বাড়তে থাকে, তখন ক্ষমতা প্রসারের জন্য একজন রাজা অন্যান্য রাজাদের উপর আধিপত্য করে আপনাকে 'রাজচক্রবর্তী' বলে ঘোষণা করতেন। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রচলন থেকে বোঝা যায়, সে যুগে একরাট অর্থাৎ সার্বভৌম নরপতি হওয়ার ইচ্ছা ও আদর্শ বলবৎ ছিল। মোটের উপর বলা যায়, রাজদণ্ড নেবার সময় রাজার শপথ গ্রহণ আর্য ধর্ম ও সমাজের শাসন, রাজ্যরক্ষা ও প্রজাপালনের দায়িত্ব আর পদচ্যুতির ভয় —এই সব কারণে বৈদিক যুগের রাজা স্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না।

রাজকৃত

সভা ও সমিতি

পরবর্তী বৈদিকযুগে রাজকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধি

রাজচক্রবর্তী

রাজতন্ত্রের স্বরূপ

জীবিকা ও আর্থিক ব্যবস্থা ঃ আর্যরা আগে গ্রামে, পরে নগরে বাস করতেন। তাঁদের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষির কাজ, পশুপালন, তারপর বাণিজ্য। পুরুষরা চাষবাস করতেন আর স্ত্রীলোকরা বেশির ভাগ ঘরের কাজ। প্রথমে জমি কারুর নিজস্ব সম্পত্তি ছিল না, পরিবারের ও গ্রামের সমস্ত লোকই তা ভোগ করতেন। পরে ব্যক্তিগত মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে জমি দান—বিক্রীর প্রথা চালু হয়। ধার দেওয়া, কর্জ নেওয়ার প্রথারও চলন ছিল। সেযুগে ধাতুশিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতি হাতের কাজ ও অন্যান্য জীবিকার উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যরা কাপড়

কৃষি ও ভূমি

শিল্প বাণিজ্য

বোনা, রঙ করা ও নকসার কাজও জানতেন। ব্যবসা বাণিজ্যের অস্তিত্ব ছিল, কিন্তু সমুদ্র পথে বাণিজ্য হত কিনা ঠিক বলা যায় না। বৈদিকযুগে জিনিস পত্রের লেন-দেন হত বিনিময় প্রথায়, গোধনের মাধ্যমে। মনে হয়, তখন স্বর্ণখণ্ডের প্রচলন ছিল আর আর্যরা 'অয়স' বা লোহার ব্যবহারও জানতেন।

খাদ্য-পানীয় ও বেশভূষা

আর্যদের প্রধান খাদ্য ছিল ক্ষেতের শস্য, গরুর দুধ ও পশুমাংস। 'সুরা' ও সোমরস ছিল উপাদেয় পানীয়। এই সোমরস যজ্ঞেও উৎসর্গ করা হত। সে যুগে সুতোর ও পশমের জামাকাপড় এবং সুগন্ধি ফুলের ব্যবহার ছিল। সাধারণ পরিচ্ছদ ছিল নীবি (কোমর বাঁধার জন্য), পরিধান (পরনের কাপড়) আর অধিবাস (উত্তরীয়)।

আমোদ প্রমোদ

আমোদ-প্রমোদের মধ্যে নাচগান ও বাজনা এবং পাশা খেলার রেওয়াজ ছিল। ঘোড়দৌড়ে মাঝে মাঝে বাজিও রাখা হত। আর্য নারীরা বেশভূষায় যত্ন নিতেন, অলংকার পরতেন। পুরুষদের পক্ষে ঘোড়ায় চড়া, রথচালনা ছিল আবশ্যিক শিক্ষা। যুদ্ধকালে ধনু, তূণ ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করা হত।

নারীর মর্যাদা ঃ বৈদিক যুগে মেয়েরা সাধারণতঃ ঘরে থেকে কাজ করতেন, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল। সংসারেও তাঁরা কর্ত্রী ছিলেন। কন্যারা বাপের বাড়িতে রীতিমত শিক্ষা পেতেন এবং বিয়ের পর সহধর্মিনীরূপে স্বামীর সঙ্গে একত্র যজ্ঞ করতেন। উপনয়ন ও শাস্ত্র চর্চায় তাঁদের অধিকার ছিল।

ব্রহ্মবাদিনী

বৈদিক সাহিত্যে অনেক মহীয়সী নারীর উল্লেখ আছে। কেউ কেউ বৈদিক মন্ত্রও রচনা করেছিলেন, যেমন ঘোষা, অপালা, বিশ্ববারা, লোপামুদ্রা প্রভৃতি। এঁদের 'ব্রহ্মবাদিনী' বলা হত। পরবর্তী বৈদিক যুগে গার্গী ও মৈত্রেয়ী নামে দু'জন মনস্বিনী নারীর নাম পাওয়া যায়। আর্য রমণীরা গৃহের কাজ কিংবা লেখাপড়া করলেও শরীরচর্চার দিকে লক্ষ্য রাখতেন, নৃত্য ও অস্ত্র চালনা শিখতেন।

নারীর শিক্ষা

অল্প বয়সে কন্যাদের বিবাহ প্রথা ছিল না। সুশিক্ষিত স্বামীই তাঁরা পছন্দ করতেন এবং অনেক সময় নিজের ইচ্ছামত পতি নির্বাচন করতেন। বিয়ের সময় কন্যাকেই পণ দেওয়ার রীতি ছিল। যাঁরা বিবাহে অনিচ্ছুক, সেই সব 'পিতৃষদ' কন্যা পিতার কাছে থেকে লেখাপড়া করতেন। কেউ কেউ আবার অধ্যাপনা করে উপাধ্যায় হতেন।

পিতৃষদ

পরবর্তী বৈদিকযুগে নারীর মর্যাদা হ্রাস

সুতরাং নারীর উত্তরাধিকার, স্বামীনির্বাচন, শাস্ত্রচর্চা ও যজ্ঞ করার অধিকার যখন বেদ থেকে প্রমাণিত হচ্ছে, তখন আর্য সমাজে নারীর কতটা মর্যাদা ছিল, তা সহজেই বোঝা যায়। তবে পরবর্তীকালে পুরুষশাসিত সমাজে নারীর উচ্চ সম্মান ক্রমশঃ কমতে থাকে।

বৈদিক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য ঃ বৈদিক সভ্যতার এই আলোচনা থেকে বুঝতে পারবে, সেকালে ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টিজীবন এবং সমাজের সমগ্র কল্যাণ ও প্রয়োজনকেই

বেশি গুরুত্ব দেওয়া হত। সম্পত্তি বা অধিকারবোধ গোড়ায় ছিল না, আর্য ধর্মই সংসার ও সমাজকে ধরে থাকত। সমাজে নারীর আসন উচ্চ ছিল। বৈদিক কালের প্রথম দিকে সভ্যতা তৈরি হয়েছিল গ্রাম ও কৃষিকে কেন্দ্র করে, যেখানে গোষ্ঠীর জনগণ ছিল প্রধান। পরবর্তী বৈদিক যুগে সমাজ ও শাসন ব্যবস্থায় ক্রমশঃ পরিবর্তন দেখা দেয়।

বর্ণাশ্রম ঃ এইবার আর্য সমাজে বর্ণাশ্রমের কথা বলি। ঋক্‌বেদে আর্য ও অনার্যদের মধ্যে শ্রেণীভেদ ছিল। পরে গুণ ও কর্ম বা বৃত্তি অনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্র ও বিশ্—এই তিন বর্ণ আর অনার্য শ্রেণী নিয়ে চতুর্থ বর্ণের সৃষ্টি হয়। তখন যজ্ঞশীল শাস্ত্রজ্ঞরা ব্রাহ্মণ, অস্ত্র-নিপুণ বীর শাসকরা ক্ষত্রিয়, কৃষি ও বাণিজ্য-ব্যবসায়ীরা বৈশ্য আর দাস ও শ্রমিকেরা শূদ্র নামে পরিচিত হল। এই জাতি বিভাগের বীজ বৈদিক যুগে পাওয়া গেলেও, তখন জাতিভেদ কঠোর হয় নি। আপনার বৃত্তি ছেড়ে অপরের বৃত্তি নেওয়া, অন্য বর্ণে বিবাহ করা নিষিদ্ধ ছিল না। পরে অবশ্য সমাজে বিধি-নিষেধ বাড়তে থাকে এবং উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিচু বর্ণের প্রভেদ বেঁধে দেওয়া হয়।

বর্ণভেদ-চতুবর্ণ

চতুরাশ্রম

চতুর্বর্ণের পর চতুরাশ্রম হল আর্য সমাজের আর একটি বৈশিষ্ট্য। 'আশ্রম' বলতে বোঝায় জীবনের এক একটি অবস্থা বা পর্ব। ব্রহ্মচর্য অবস্থায় উপনয়নের পর গুরুগৃহে বাস ও সংযত ছাত্রজীবন, গার্হস্থ্য আশ্রমে বিবাহ ও সংসার-জীবন, বাণপ্রস্থ অবস্থায় সংসার ত্যাগ ও নির্জন অরণ্যবাস আর সন্ন্যাস আশ্রমে যতি বা ভিক্ষাবৃত্তি এবং ঈশ্বর-চিন্তা। এই হল চারটি আশ্রমের লক্ষণ ও আদর্শ।

[চার] পরবর্তী বৈদিক যুগ ঃঃ রাষ্ট্রনৈতিক পরিবর্তন ঃ পরবর্তী বৈদিক যুগে সাম্রাজ্যবাদের সূচনা হয়। মধ্যদেশে কুরু, পাঞ্চাল, বৎস, কাশী প্রভৃতি কয়েকটি শক্তিশালী রাজ্যের সৃষ্টি হয়। রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আর্যাবর্তে যখন ক্রমশঃ জনপদ ও রাজসংখ্যা বাড়তে থাকে তখন একজন রাজা অন্যান্য রাজাদের উপর আধিপত্য করে আপনাকে 'রাজচক্রবর্তী বলে ঘোষণা করতেন। অশ্বমেধ ও রাজসূয় যজ্ঞের প্রচলন থেকে বোঝা যায়, সে যুগে 'একরাট্' অর্থাৎ সার্বভৌম নরপতি হওয়ার ইচ্ছা ও আদর্শ বলবৎ ছিল। রাজতন্ত্র ক্রমশঃ স্বৈরতান্ত্রিক চরিত্র গ্রহণ করে এবং 'সভা' ও 'সমিতির' ক্ষমতাও কিছু খর্ব হয়।

রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি

একরাট্

'সভা' 'সমিতির' ক্ষমতা-হ্রাস

সামাজিক পরিবর্তন ঃ পরবর্তী বৈদিক যুগে সামাজিক অনুশাসনে কঠোরতা দেখা যায়। জাতি ও বর্ণভেদ প্রথা কঠোর হ'য়ে উঠে। অস্পৃশ্যতার চিন্তাধারার সূচনা হয়। সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বৈশ্যদের সামাজিক মর্যাদা হ্রাস পায় এবং শূদ্রশ্রেণীকে অপবিত্র বলে গণ্য করা হয়। নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রচলন থাকলেও সমাজে তাদের মর্যাদা হ্রাস পায়। তাদের

জাতি ও বর্ণভেদে কঠোরতা, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণীর প্রাধান্য

নারীর মর্যাদা-হ্রাস

বেদপাঠের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সমাজে বাল্যবিবাহ ও পণপ্রথা স্বীকৃতি লাভ করে।

অর্থনৈতিক পরিবর্তন: বৈদিক যুগের শেষভাগে গ্রামীন ও কৃষিকেন্দ্রিক অর্থনীতির পাশাপাশি নাগরিক জীবনের সূচনা হয়। হস্তিনাপুর, কৌশাম্বী, কাশী, কাম্পিল প্রভৃতি নগর গড়ে ওঠে। লৌহ-ব্যবহারের প্রচলন হয় এবং কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বিভিন্ন বৃত্তি ও শিল্পকর্মের প্রসার ঘটে। ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতি সাধিত হয় এবং বণিক-সংঘ গড়ে উঠে।

নগরের উদ্ভব
লৌহের প্রচলন
বণিক সংঘ

ধর্মীয় জীবনে পরিবর্তন: আদি বৈদিক যুগে ইন্দ্র ছিলেন আর্যদের প্রধান দেবতা, কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগে প্রজাপতি ব্রহ্মা, রুদ্র ও বিষ্ণু প্রাধান্য অর্জন করেন। এ যুগে অনার্য প্রভাবে পশু-বলি ও মূর্তিপূজা আর্য ধর্মাচারে স্থান পায়। বৈদিক মন্ত্রাদি ও যাগ-যজ্ঞ পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হ'য়ে পড়ে, ফলে প্রতিপত্তিশালী পুরোহিত শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

প্রধান দেবতা
পশুবলি ও মূর্তিপূজা
পুরোহিত

মহাকাব্যের যুগ: বৈদিক যুগের কোথায় শেষ আর মহাকাব্যের যুগ কোথায় শুরু তা সাল তারিখ দিয়ে নির্দেশ করা যায় না। বৈদিক কালের সমাজ ও সংস্কৃতি ধীরে ধীরে মহাকাব্যের যুগে এসে মিশেছে এবং হিন্দু সভ্যতার বুনিয়াদ শক্ত ও স্থিতিশীল করেছে। মহাভারত ও রামায়ণ এই দুই মহাকাব্য সর্বজন প্রিয়। গ্রীসের ইলিয়াড এবং ওডিসির মত ভারতের এই দুটি মহাকাব্যে এদেশের প্রাচীন সভ্যতার ছবি পরিষ্কার ভাবে ফুটেছে। ভারতের মূল সাহিত্য ও সভ্যতা বুঝতে গেলে ঐ দুই গ্রন্থ অনেক বার ভালো করে পড়া দরকার। কাহিনী ও রচনার দিক থেকে মহাভারত, রামায়ণের চেয়ে প্রাচীন, পণ্ডিতেরা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন। লক্ষ শ্লোকে তৈরি মহাভারত এক সময়ের রচনা নয়, কয়েক শ' বছর ধরে এই মহাকাব্যে নানা সংযোগ করা হয়। মোটের উপর এই দুই মহাকাব্য থেকে বোঝা যায়, ভারতীয় সমাজেও রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা আরও দৃঢ় হয়েছে। এই দুই গ্রন্থ আদর্শচিত্র, সন্দেহ নেই, কিন্তু সেযুগে কি আদর্শ ছিল ও তা কি ভাবে পালন করা হত, সে কথা জানা দরকার। প্রাচীন ভারতের রাজনীতি ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কার, রাজধর্ম ও প্রজাপালনের চরম কর্তব্য শিক্ষাদীক্ষা, শৌর্যবীর্য, জনকল্যাণ, পিতৃপুরুষের সম্মান, বর্ণাশ্রমের পবিত্রতা এবং পারিবারিক সম্পর্কের আদর্শ বুঝতে হলে এই দুই মহাকাব্য মনোযোগ দিয়ে পড়া দরকার। বিশেষ করে মহাভারত, কারণ এই বিপুল গ্রন্থ একাধারে কাব্য, গল্প, ইতিহাস। কথায় কাছে—যা নেই 'মহাভারতে' তা নেই ভারতে। অর্থাৎ মহাভারতে সব কিছু শিক্ষা ও জ্ঞানের বিষয় একত্র পাওয়া যাবে।

মহাকাব্যের যুগকে পৌরাণিক যুগও বলা হয়। সেকালের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায় মহাভারত ও রামায়ণ থেকে। রাজার সঙ্গে প্রজাদের পিতা-পুত্রের সম্পর্ক ছিল। প্রজাবৎসল রামচন্দ্রের স্বার্থসুখ ত্যাগের জন্যই আমরা বলে

থাকি 'রামরাজ্য' সেখানে প্রজাদের মঙ্গল সুখ ও সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ হয় না। তা ছাড়া লক্ষ্মণ ও ভরতের ভ্রাতৃপ্রেম, সীতার পাতিব্রত্য, যুধিষ্ঠিরের সত্যনিষ্ঠা, কর্ণ ও অর্জুনের বীরত্ব, ভীষ্মের মহৎ চরিত্র, এগুলি ভারতবাসীর কাছে আদর্শ হয়ে আছে। সে সময় স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত ছিল, তবে শক্তির পরিচয় দিয়ে কন্যা লাভ করতে হত। পৌরাণিক যুগে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশ কঠোর হতে থাকে, সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের শাসন কায়েম হয়। উচ্চ বর্ণের আধিপত্য আর নীচ বর্ণের প্রতি অবজ্ঞা প্রকট হতে থাকে 'জাতি' তখন কর্মের বদলে জন্মগত হয়ে পড়ে। বৈদিক যুগের ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদের স্থলে এইযুগে ব্রহ্মা, বিষ্ণু শিবের পূজা অর্থাৎ পৌরাণিক ধর্ম প্রচলিত হল। নানা রকম আড়ম্বর-অনুষ্ঠান, যাগযজ্ঞে পশুবধ ইত্যাদি ধর্মজীবনে প্রধান স্থান অধিকার করল।

রামায়ণের রামচন্দ্র আর মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ ক্রমে ঈশ্বরের অবতাররূপে গণ্য হলেন। একজন আদর্শ রাজা, অপর জন পরম বিজ্ঞ নায়ক পুরুষ। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ঠিক আগে অর্জুন যখন নিকট আত্মীয় ও বন্ধুবান্ধবদের প্রাণহানির আশংকায় যুদ্ধ করতে নারাজ হলেন, তখন কৃষ্ণ তাকে বোঝান যে ন্যায় ও ধর্মের জন্যই অস্ত্রধারণ করা উচিত। সেই সূত্রে শ্রীকৃষ্ণের অমূল্য উপদেশগুলি নিয়ে 'গীতা' রচিত হয়েছে। মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদ্‌গীতা এক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ, একাধারে ক্ষাত্রিয় ধর্মের ব্যাখ্যা, উচ্চাঙ্গের ধর্মতত্ত্ব, যোগ ও দর্শন।

প্রাক্-ঐতিহাসিক, বৈদিক ও পৌরাণিক অথবা মহাকাব্যের যুগে প্রাচীন ভারতের সভ্যতার তিনটি ধারা একত্র হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি রচনা করেছে।

[পাঁচ] **লৌহ যুগের সূচনা ঃ** ঋগ্বেদের যুগে লৌহের প্রচলন ছিল না, পরবর্তী বৈদিকযুগে 'অয়স' শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। 'অয়স্' শব্দের অর্থ লৌহ। সম্ভবত ঃ পরবর্তী বৈদিক যুগেই (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ১০০ থেকে) লৌহের ব্যবহার শুরু হয়।

———

চতুর্থ অধ্যায়

প্রতিবাদ আন্দোলন—ধর্মে ও সমাজে

মহাকাব্যের যুগ শেষ হবার কিছু আগে ভারতীয় চিন্তায় একটি নতুন অন্দোলন জাগল যাকে বলা হয় প্রতিবাদ আন্দোলন অর্থাৎ প্রচলিত ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজ ব্যবস্থা ও প্রথাগত ধর্মীয় সংস্কারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

ধর্মীয় ও দার্শনিক কারণ

প্রথমতঃ সমাজে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের প্রাধান্য যতই স্থায়ী ও প্রবল হল, ধর্ম ততই ক্রিয়াকলাপের আড়ম্বরে পূর্ণ, অনুষ্ঠান সর্বস্ব হয়ে উঠল কিন্তু উপনিষদের যুগ থেকে অরণ্যবাসী সন্নাসীরা যাগ-যজ্ঞ, পশুবলি প্রথার প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন। তাঁরা বলেন কর্মফল মানুষকে ভোগ করতেই হবে, যাগ-যজ্ঞের মাধ্যমে কর্মফল থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। এই প্রতিবাদী চিন্তাধারা নতুন ধর্মের প্রেরণা যোগায়।

অর্থনৈতিক কারণ

দ্বিতীয়তঃ লোহার তৈরি লাঙ্গল ব্যবহারের ফলে সূত্র যুগ থেকে কৃষির উৎপাদন ক্ষমতা যথেষ্ট বেড়ে যায় এবং সমাজে সম্পন্ন কৃষক শ্রেণীর উদ্ভব হয়। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসারের ফলে কারিগর শ্রেণীর আর্থিক অবস্থা উন্নত হয় এবং বৈশ্য শ্রেণী সম্পদশালী বণিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। আধুনিক পণ্ডিতরা মনে করেন জাতিভেদ প্রথার জন্য এই নবোদিত ধনশালী শ্রেণী বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। এই সঙ্গে যুক্ত হয় নিম্ন বর্ণ ও বিত্তহীন জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ, ফলে নতুন ধর্মমত প্রচারের ক্ষেত্র প্রস্তুত হ'তে থাকে।

সামাজিক কারণ

তৃতীয়তঃ সামাজিক দিক থেকে বিভিন্ন পরিবর্তন আসে। নারী জাতি বেদপাঠের অধিকারে বঞ্চিত হয়। তাদের সম্মান ও অধিকার ক্ষুন্ন হয়। বর্ণভেদের কঠোরতা মানুষে মানুষে ব্যবধান রচনা করে। গুণ ও যোগ্যতা অনুসারে বৃত্তি নির্বাচনের স্বাধীনতা লোপ পায়। ব্রাহ্মণ শ্রেণী সমাজে শ্রেষ্ঠত্ব কায়েম করার জন্য নিত্য নতুন বিধিনিষেধ রচনা করে। কিন্তু এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গী অর্জনের ফলে ক্ষত্রিয় শ্রেণী ব্রাহ্মণদের সমান মর্যাদা দাবী করে এবং তারা ব্রাহ্মণ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করে।

এইভাবে বৈদিক ধর্মের উপর অনাস্থা আসায় অনেকেরই মনে প্রশ্ন ও সন্দেহ জাগল, আড়ম্বর-অনুষ্ঠান কি ধর্মের মূল কথা? জীবহত্যায় কি ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ হয়? তখন কয়েকজন চিন্তাশীল পুরুষ প্রকৃত জ্ঞানলাভে মন দিলেন। দুঃখ, ভোগতৃষ্ণা ও মৃত্যুভয় এড়াবার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ সংসার ছেড়ে সত্যসন্ধানে

বের হলেন। মানুষকে সাধনার উপায় বোঝাতে লাগলেন। এদের বলা হত 'পরিব্রাজক'। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ভারতে এই রকম দু'জন মহাপুরুষের আবির্ভাব হয়। এঁরা নতুন ভাবে লোককে ধর্ম শিক্ষা দিয়েছিলেন একজন জৈন তীর্থঙ্কর বা ধর্ম প্রবর্তক, নাম মহাবীর ; অপর জন বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, গৌতমবুদ্ধ। দুজনেরই জন্মস্থান প্রাচীন মগধ এবং সেখান থেকেই সমাজ শাসনের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদের আন্দোলন।

মহাবীর ঃ যে সব তীর্থঙ্কর জৈন ধর্মের সূচনা ও প্রবর্তন করেন, তাঁদের মধ্যে শেষ দুজনের নাম পার্শ্বনাথ ও মহাবীর। পার্শ্বনাথ খৃস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দীর লোক এবং তিনিই সত্যকারে জৈন সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত করেন। তারপর মহাবীরে আবির্ভাব। পূর্বে তাঁর নাম ছিল বর্ধমান। প্রথমে যশোদা নামে এক কন্যাকে বিবাহ করে তিনি সংসারী হন, কিন্তু ত্রিশ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করে পরিব্রাজক হন। বৈশালীর কাছে 'জ্ঞাতৃক' নামক এক ক্ষত্র-বংশে খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে তার জন্ম। গৌতম বুদ্ধের সমকালীন হলেও তিনি বয়সে কিছু বড় ছিলেন। দীর্ঘ বারো বছর কৃচ্ছ্রসাধনে ও তপস্যায় দিব্যজ্ঞান পেয়ে তাঁর নাম হল 'জিন' অর্থাৎ বিজয়ী ও মহাবীর। তাঁর ধর্মমতকে সেজন্য জৈনধর্ম বলা হয়। অনেক দিন ধরে ধর্মপ্রচার করার পর বাহাত্তর বছর বয়সে পাটনা জেলায় পাবা-পুরীতে তাঁর দেহান্ত হয়।

জীবনী



মহাবীর

জৈনধর্ম ঃ মহাবীরের প্রতিষ্ঠিত ধর্ম-সম্প্রদায়কে প্রথমে 'নির্গ্রন্থ' অর্থাৎ গ্রন্থি বা বন্ধনহীন বলা হত। এর অপর নাম 'দিগম্বর' সম্প্রদায়। জৈনরা 'শ্বেতাম্বর' ও 'দিগম্বর' এই দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। জৈন মতে পাপপুণ্য নিজ কর্ম অনুসারেই হয়ে থাকে, আর মানুষ সেই পাপপুণ্যের ফলভোগ করে। পবিত্র এবং জিতেন্দ্রিয় থেকে যিনি আপনার মধ্যে অনন্ত শক্তির পূর্ণ বিকাশ করতে পারেন, তিনিই 'জিন' বা সিদ্ধ পুরুষ। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের অস্তিত্ব, বেদের অভ্রান্ত চরিত্র আর জাতিভেদ জৈনরা স্বীকার করেন না। জীবকে কষ্ট না দেওয়া অর্থাৎ অহিংসা এবং ইন্দ্রিয় জয়, এই দুটি জৈন ধর্মের মূলমন্ত্র। ভারতের বাইরে এই ধর্ম প্রচারিত হয় নি। জৈনরা মাছ, মাংস খান না, পশুবধ করেন না, এমন কি অনিষ্টকর প্রাণীও হত্যা করেন না।

দুই সম্প্রদায়

জৈনমত

বুদ্ধদেব ঃ হিমালয়ের কোলে নেপালের তরাই অঞ্চলে কপিলাবস্তু নামে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে ক্ষত্রিয় শাক্যবংশে বুদ্ধদেবের জন্ম হয়। তার পিতা শুদ্ধোদন এখানকার নায়ক বা দলপতি ছিলেন। প্রথম জীবনে বুদ্ধদেবের নাম ছিল সিদ্ধার্থ বা গৌতম। শৈশব অবস্থায় মা মায়া দেবী মারা গেলে শুদ্ধোদন শিশুর মাসী গৌতমীর সাহায্যে ছেলেকে মানুষ করেন ও নানা বিদ্যায় শিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর সাধ ছিল, সিদ্ধার্থ বড় হয়ে যোদ্ধা হবেন ও দেশ শাসন করবেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের মনের ভাব ছিল অন্য রকম, আমোদ-প্রমোদে মন না দিয়ে তিনি সর্বদাই গভীর চিন্তা করতেন—কি করে মানুষ দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাবে। পুত্রের উদাসী ভাব দেখে গোপা বা যশোধরা নামে এক সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়ে শুদ্ধোদন তাঁকে সংসারী করলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থের মন বদলান গেল না। জরা, রোগ, মৃত্যু প্রভৃতি মানুষের দুর্দশার চিন্তা তাঁর মনকে ব্যাকুল করত।

প্রথম জীবন ও শিক্ষা

বিবাহ

ভাবতেন, সংসার ছাড়লে দুঃখের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। মায়ার বাঁধনে সংসার তাকে দিন দিন জড়িয়ে ফেলবে, তাতে কেবল দুঃখই বাড়বে। অতঃপর ঊনত্রিশ বছর বয়সে তাঁর একটি পুত্র হল। তখন মনে জোর করে একদিন গভীর জঙ্গলে গিয়ে সন্ন্যাসীর বেশ ধরলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি রাজগৃহ ও বৈশালী নগরে এলেন। সেখানে কয়েকজন ব্রাহ্মণ ও যোগীর কাছে উপদেশ নিয়ে তিনি কঠোর তপস্যা করতে লাগলেন। উরুবিল্ব নগরে দু-বছর কঠিন সাধনার পর অতি দুর্বল অবস্থায় তাঁর মনে হল, শুধু তপস্যায় মানুষের মুক্তি হয় না; প্রকৃত জ্ঞানই মুক্তির উপায়। তারপর তিনি গয়ার কাছে বিখ্যাত বোধিবৃক্ষের নিচে বসে ধ্যান করতে লাগলেন। গভীর সাধনায় একদিন পরম সত্য তাঁর কাছে পরিস্কার ফুটে উঠল। দিব্যজ্ঞান লাভ করে তিনি 'বুদ্ধ' বা জ্ঞানী নামে জগতে পরিচিত হলেন।

সংসার ত্যাগ, সাধনা



গৌতম বুদ্ধ

বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি

কিন্তু নিজে মুক্ত হয়ে তিনি তৃপ্তি পেলেন না। সকল মানুষ যাতে উদ্ধার পায়, সেই উদ্দেশ্যে তিনি কাশীর কাছে সারনাথের মৃগদাব বনে তাঁর উপদেশ প্রচার করলেন। এই সারনাথে পরে একটি স্তূপ নির্মিত হয়। প্রথমে তাঁর পাঁচজন শিষ্য হল। তাঁদের মধ্যে সারিপুত্ত এবং মোগ্গলানই প্রধান। ক্রমশঃ অনেকেই তাঁর কাছে দীক্ষা নিতে লাগল। কোশলরাজ

প্রচারকর্ম ও শিষ্যবৃন্দ

প্রসেনজিৎ ও মগধের রাজা বিম্বিসার তাঁর ভক্ত হলেন। অনাথপিণ্ডদের মত ধনী-শ্রেষ্ঠী, আবার আনন্দ ও উপালির ন্যায় দরিদ্র সাধারণ ব্যক্তিও তাঁর কৃপা লাভ করেন। এই ভাবে শ্রাবস্তী, রাজগৃহ, বৈশালী প্রভৃতি নগরে সকল লোকের মধ্যে ধর্ম প্রচার করে আশী বছর বয়সে কুশী নগরে তাঁর দেহত্যাগ বা মহাপরিনির্বাণ ঘটে। সিংহলী গ্রন্থের মতে এই ঘটনা ঘটে খৃঃ পূঃ ৫৪৪ অব্দে। অপর ঐতিহাসিক মতে বুদ্ধের দেহান্ত হয় খৃঃ পূঃ ৪৮৬ বা ৪৮৩ অব্দে। বুদ্ধদেবের জন্মস্থান লুম্বিনীতে অশোকের তৈরি শিলাস্তম্ভ আছে। কিন্তু নির্বাণস্থান কুশী নগরে অশোক-স্তম্ভের কোনও চিহ্ন আবিষ্কৃত হয় নি।

দেহত্যাগ

সংঘ ও ধর্মগ্রন্থ ঃ বুদ্ধদেব শিষ্যদের জন্য একটি সংঘ গড়েন এবং সৎপথে থাকবার জন্য কতকগুলি নিয়ম বেঁধে দেন। প্রথমে স্ত্রীলোকেরা সংঘে প্রবেশ করতে পারত না। পরে তাদের ভিক্ষুণী হতে অনুমতি দেওয়া হয়। সাধারণের জন্যই বুদ্ধদেবের শিক্ষা। তাই কেবল পণ্ডিতদের ভাষা সংস্কৃতের সাহায্য না নিয়ে চলিত 'পালি' ভাষায় তিনি উপদেশ দিতেন। বুদ্ধদেব নিজে তাঁর ধর্মমত লিখে যান নি। তাঁর মৃত্যুর পর শিষ্যরা তাঁর মুখের উপদেশগুলি বইয়ের আকারে নিবন্ধ করেন। এই ধর্মগ্রন্থের নাম ত্রিপিটক অর্থাৎ তিন পেটিকা। প্রথমভাগ 'সূত্র'—পিটকে বুদ্ধবাণী ও প্রচার কাহিনী, দ্বিতীয় ভাগ 'বিনয়'—পিটকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীর জন্য বিধি-নিষেধ ও আচার-নির্দেশ, আর তৃতীয় ভাগ 'অভিধর্ম'—পিটকে বৌদ্ধ ধর্মমতের মূলতত্ত্ব ও নীতিগুলি সংকলিত আছে।

সংঘ রচনা

মৌখিক উপদেশ

ত্রিপিটক

কিন্তু এই ত্রিপিটক ছাড়া বৌদ্ধদের অনেক ধর্মগ্রন্থ আছে, যথা—ধম্মপদ। বৌদ্ধ যখন হীনযান ও মহাযান, প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত হ'য়ে গেল, তখন এই বিভাগের মধ্য থেকে একাধিক মতবাদ ও সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হল। ফলে বিভিন্ন মার্গের দার্শনিক ও পণ্ডিতগণ বিভিন্ন টীকা ও ভাষ্য, কোষগ্রন্থ প্রভৃতি রচনা করলেন। এইভাবে বৌদ্ধধর্মের উপর এক বিশাল তত্ত্ব দর্শন ও সাহিত্য চক্র গড়ে ওঠে।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ

ধর্মমত ঃ বুদ্ধদেবের ধর্মমত সহজ ও সুন্দর। জন্মগত জাতিভেদ তিনি মানতেন না, ঈশ্বর সম্পর্কেও তিনি কিছু বলেন নি। মানুষ কেমন করে মুক্তি পাবে, ওই তাঁর আসল বক্তব্য। যাগযজ্ঞ তপস্যায় তাঁর আস্থা ছিল না। জীবমাত্রেই কর্মফল অনুসারে জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ ভোগ করে। ভোগ বাসনা শূন্য হলে দুঃখ কষ্টের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া সম্ভব। বৌদ্ধরা একেই নির্বাণ বলেছেন। নির্বাণ শব্দের অর্থ—সমস্ত কামনা হতে মুক্তি। নির্বাণের পর আর জন্ম হয় না, দুঃখভোগও করতে হয় না। নির্বাণ লাভের

বুদ্ধবাণী

কর্মফল

নির্বাণ

উপায় কি? বুদ্ধদেবের মতে সম্যক্ দৃষ্টি, সৎকর্ম, সদ্বাক্য, সৎ সংকল্প, সাধু-চেষ্টা, সৎ জীবন, সৎ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি, এই আটটি উপায়ে মুক্তি পাওয়া যায়। এই হল অষ্টাঙ্গিক মার্গ। অহিংসা পরম ধর্ম—সেও বৌদ্ধধর্মের একটি মূল নীতি। জগতে সুখভোগ আর কঠিন তপস্যা, দুটির কোনটাই ভালো নয়। এই জন্য বুদ্ধদের মতে 'মঝ্ ঝিম পথ' বা মধ্যপন্থাই উৎকৃষ্ট। প্রত্যেক লোকই 'পঞ্চশীল' পালন করবে, অর্থাৎ মিথ্যা কথা বলবে না; চুরি করবে না, অন্যায় আচরণ করবে না, জীব-হিংসা করবে না ইত্যাদি। বেদ ও জাতি-ভেদ না মানলেও বৌদ্ধ ধর্ম আর্য ধর্মেরই এক শাখা। পরবর্তীকালে বুদ্ধদেব হিন্দুদের কাছেও মহাপুরুষ বলে পূজিত হন। তাঁর পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত ও বোধিসত্ত্বদের কথা নিয়েও অনেক গল্প রচিত হয়েছে।

অষ্টাঙ্গিক মার্গ

অহিংসা

মধ্যপথ

পঞ্চশীল

বোধিসত্ত্ব ও জাতকমালা

বৌদ্ধধর্মের ও সংস্কৃতির যথেষ্ট ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। আজকাল অনেক জায়গায় বৌদ্ধের জয়ন্তী পালন হয় 'পঞ্চশীল' প্রভৃতি শান্তিনীতির কথাও বারবার শোনা যায়। অতএব বৌদ্ধ ধর্মের ও সংস্কৃতির ঐতিহাসিক তাৎপর্য সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। প্রথমতঃ, বৌদ্ধধর্ম একেবারে নতুন তত্ত্বকথা বলেনি। পৃথক ধর্মমত হলেও এটি আর্য ধর্মের এক শাখা, জীর্ণ বৈদিক ধর্মেরই বিরাট সংস্কার, শান্তি, সাম্য ও মৈত্রীর উপর প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধমতকে নতুন ধর্ম না বলে মূলগত সংস্কার বলাই সঙ্গত। হিন্দুধর্মের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব যেমন অস্বীকার করা যায় না, তেমনি 'মহাযান' নামক পরবর্তী বৌদ্ধমতের উপর হিন্দুর দেবতা, ধর্ম-চিন্তা, মূর্তি গঠন প্রভৃতি আচার ও সংস্কারের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, বৌদ্ধধর্ম শুধু ভারতীয় নয়, অন্যান্য দেশের সমাজ, চিন্তা ও জ্ঞানচর্চাকেও যথেষ্ট প্রভাবিত করেছে, বিশেষ করে মধ্য-এসিয়া ও পশ্চিম এসিয়ার কতক অঞ্চলে। বৌদ্ধধর্ম কালক্রমে পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ ধর্মে পরিণত হয়ে একটি নতুন পথের সন্ধান দেয়। বৌদ্ধ সাধনা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য-শিল্প শুধু হিন্দু ভারতেই পুষ্ট ও সমাদৃত হয়নি; ব্রহ্মদেশ, চীন, তিব্বত, শ্যাম বা 'থাই' ও ভারতের উত্তর এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলেও প্রসার লাভ করে। কিন্তু ভারতে বৌদ্ধধর্ম বেশি দিন টেঁকেনি, ভারতের বাইরেই তার প্রসার ও উন্নতি। তবে সুঙ্গ এবং গুপ্ত আমলে বৌদ্ধধর্ম নিগৃহীত হয় নি, বরং বৌদ্ধ শিল্পে উৎকর্ষ বেড়েছিল। তাছাড়া, বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতার অঙ্গ হয়ে যায়। তাই মনে হয়, বৌদ্ধধর্ম ও সভ্যতা ভারতীয় সাধনা ও ঐতিহ্যেরই এক অভিনব প্রকাশ।

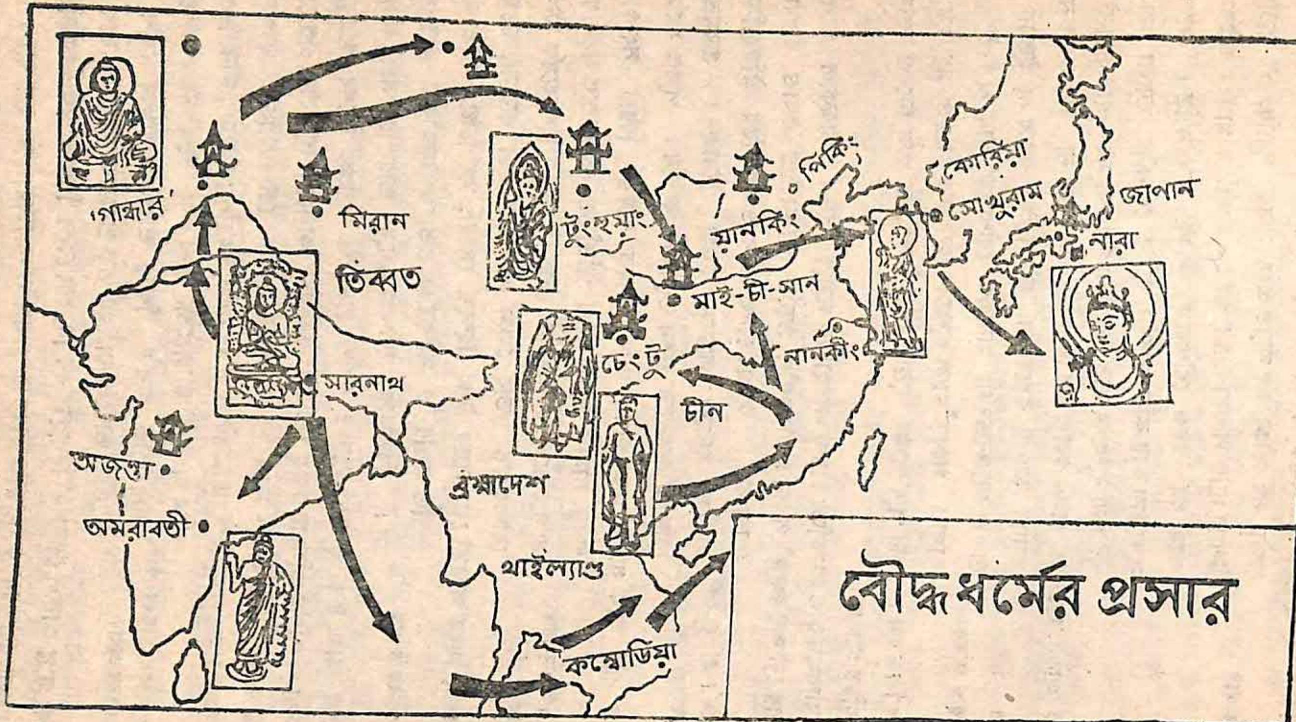
বৌদ্ধধর্মের ঐতিহাসিক তাৎপর্য

হিন্দু ধর্মের মূলগত সংস্কার

পারস্পরিক প্রভাব

বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসার

মোটামুটি ভাবে বলা যায়, বৌদ্ধধর্মের উত্থান দেশের প্রচলিত, সংস্কারে আচ্ছন্ন



বৌদ্ধধর্মের প্রসার

ধর্ম ও সমাজের বিরুদ্ধে একটি বড় প্রতিবাদ-আন্দোলন হিসাবে গণ্য। বৌদ্ধধর্ম-সম্প্রদায়ে নারীদের আসন ও মর্যাদা স্বীকৃত হয়। তাছাড়া ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্মের বিস্তার ও বৌদ্ধ শিল্প-সংস্কৃতির প্রসার হয়েছিল।

হীনযান ও মহাযান

'হীনযান' ও 'মহাযান' এই দুই পন্থার মধ্যে আদি ধর্মমত 'হীনযান' শ্রীলঙ্কা ব্রহ্ম ও শ্যাম দেশে প্রচলিত আছে। আর 'মহাযান' ধর্মমত ভারতের উত্তরাঞ্চল দিয়ে ভারতীয় প্রচারকদের মাধ্যমে তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি সুদূর প্রাচ্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আর একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি ও উৎস-স্থল হল ভারত, অথচ এখানে তার ক্রমিক অবনতি, আর দেশান্তরে তাঁর প্রসার ও সমাদর। মধ্য এসিয়া, সুদূর প্রাচ্য এবং দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় বৌদ্ধ প্রচারকদের অক্লান্ত কর্ম নিষ্ঠাই এই প্রসারের মুখ্য কারণ।

জৈন, বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম ঃ তিনটি ধর্মমতের তুলনা করলে বোঝা যায়, কয়েকটি বিষয়ে পারস্পরিক সাদৃশ্য আছে, আবার পার্থক্যও আছে। হিন্দুদের জন্মান্তরবাদ ও কর্মফল জৈন ও বৌদ্ধগণ স্বীকার করেছেন।

সাদৃশ্য ও পার্থক্য

কিন্তু জগৎস্রষ্টার অস্তিত্ব, বেদের অভ্রান্ততা সম্পর্কে জৈন ও বৌদ্ধগণ কিছু বলেন নি। উভয়েই জাতিভেদ এবং ব্রাহ্মণদের আধিপত্য মানেন না। জৈনরা বৌদ্ধদের মতই জীবনের পবিত্রতা ও সদাচার অনুষ্ঠানে বিশ্বাসী কিন্তু অহিংসার প্রয়োগে জৈনরা চরমপন্থী। কিছু বাহ্যিক সাদৃশ্য থাকলেও জৈন দর্শনের সহিত বৌদ্ধ দর্শনের অনেক পার্থক্য আছে।

হিন্দুদের উপনিষদে অহিংসা-ধর্মের সূচনা আছে কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধদের কাছে এটি মূল মন্ত্র। জিতেন্দ্রিয়তা এবং আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ তিন ধর্মেই স্বীকৃত। কিন্তু জৈনদের কাছে ঐগুলিই পরম সিদ্ধি আর বৌদ্ধ আদর্শ হল সম্বোধি ও নির্বাণ। অতএব দেখা যাচ্ছে, জৈন ও বৌদ্ধধর্মে তত্ত্ব অপেক্ষা চরিত্রগুণ ও নৈতিক আচারেরই প্রাধান্য। তবে তপস্যায় এবং কৃচ্ছ্রসাধনে জৈনরা বেশি আস্থা রাখেন, আর বৌদ্ধরা মধ্যপথে বিশ্বাসী।

বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অবনতি ঃ বৌদ্ধ রাজাদের অবলুপ্তি ঘটলে তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতাও লুপ্ত হয় এবং বৌদ্ধধর্মের অবনতি শুরু হয়। নানা মত ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে, বিশেষতঃ প্রাচ্য এবং উত্তর পূর্ব ভারতে তান্ত্রিক আচারের সঙ্গে মিশে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম তার বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক চরিত্র হারিয়ে ফেলে। মুসলমান আক্রমণের পর থেকে সংঘবদ্ধ বৌদ্ধ সমাজ ক্ষয়িষ্ণু হতে থাকে। সিন্ধু প্রদেশে প্রথম মুসলিম আক্রমণের সময় বৌদ্ধগণ নাকি আরবদের সহযোগিতা করেন। এতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ বাড়তে থাকে এবং তাঁদের নিজস্ব মর্যাদা কমে যায় বলে অনুমান করা চলে।

ভারত থেকে বৌদ্ধধর্মের ক্রমিক অবলুপ্তির অন্য কয়েকটি কারণও কাছে কিন্তু ব্রাহ্মণ্য ধর্মালম্বীদের মধ্যে যথেষ্ট বৌদ্ধ-বিদ্বেষ থাকলেও নির্যাতনের ফলে তার

পতন হয় নি। বরঞ্চ সুঙ্গ, গুপ্ত রাজাদের আমলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির হিন্দু সমাজ ও সভ্যতার যে ধ্বংসসূচক সংঘর্ষ হয় নি, তার প্রমাণ আছে। ব্রাহ্মণদের বৌদ্ধ-বিদ্বেষ এবং পরবর্তীকালে শঙ্করাচার্য, কুমারিল ভট্ট প্রভৃতি মহান্ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় হিন্দুধর্মের নব জীবনলাভ বৌদ্ধধর্মের প্রসারে যে অন্তরায় সৃষ্টি করে, এ কথা সত্য। কিন্তু হিন্দু ধর্মের ভিতরের শক্তি বৌদ্ধধর্মের অনেক বৈশিষ্ট্যকে আত্মসাৎও করেছিল। অতএব বলা যায়, রাজানুগ্রহের অবসান, সংঘ-বিভেদ, সাম্প্রদায়িক বিভাগ ও মতান্তর এবং নৈতিক আদর্শের অবনতিও বৌদ্ধধর্মের পতনে বেশি সাহায্য করেছে। কিন্তু বৌদ্ধদের সংখ্যা আজ অতি লঘু হলেও বৌদ্ধ দর্শন সংস্কৃতি ও ভাবধারার মাহাত্ম্য এখনও ভারতের নিজস্ব গৌরব। বিশ্বমানবিক ধর্মে ও চিন্তায় এর প্রভাব বর্তমান পাশ্চাত্ত্য জগতের শিক্ষিত মানুষের শ্রদ্ধার বস্তু।

পতনের কারণ

———

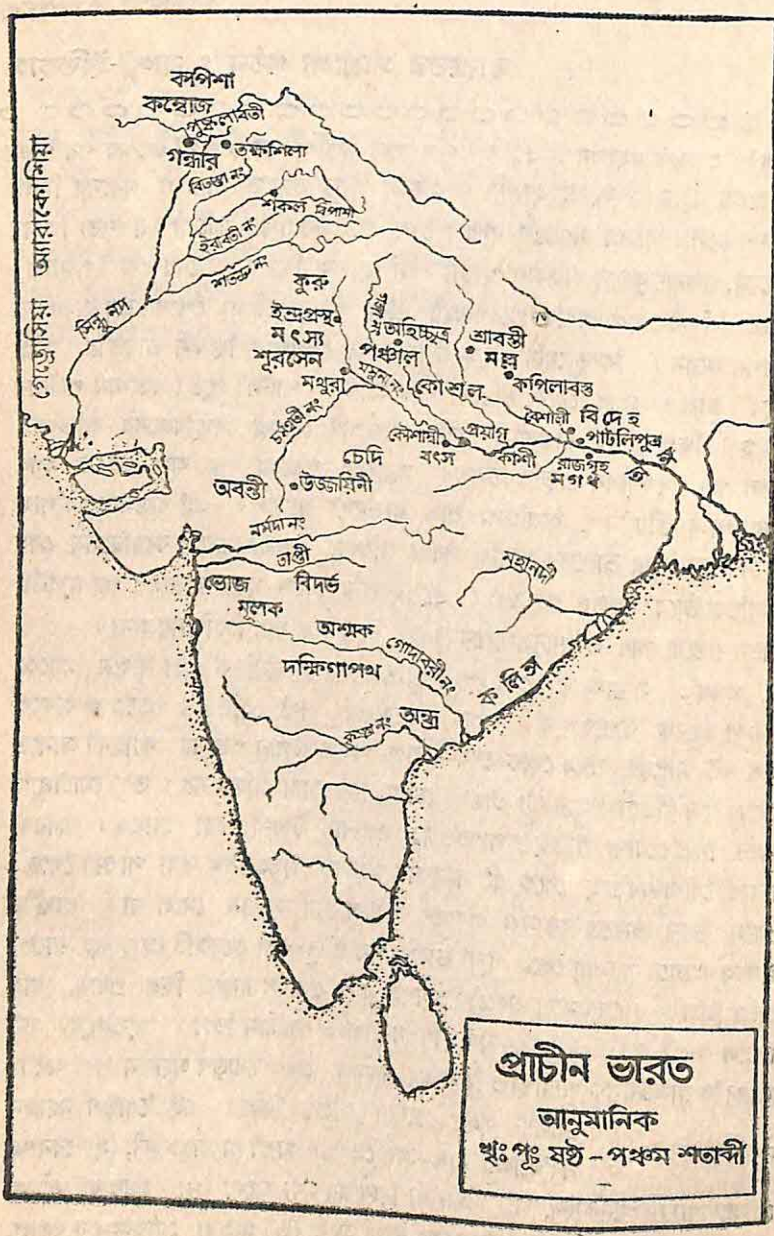
পঞ্চম অধ্যায়

ভারতের সাম্রাজ্য গঠন ঃ রাষ্ট্র-ইতিহাস

[ক] ষোড়শ মহাজনপদ ঃ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খৃস্ট জন্মের পর পঞ্চম শতকের প্রায় শেষ, এই হাজার বছর কাল উত্তর ভারতে সাম্রাজ্য গঠনের নিয়ত চেষ্টা চলে। বিভিন্ন রাজবংশ মগধকে কেন্দ্র করে উত্তরাপথে তাঁদের আধিপত্য বিস্তার করেন, একমাত্র কুশান রাজবংশ ছাড়া, তাঁরা ছিলেন বিদেশী, চীনের এক উপজাতি। উত্তর পশ্চিম থেকে ভারতে প্রবেশ করে তাঁরা পুরুষপুর বা পেশোয়ারে রাজধানী স্থাপন করেন। কিন্তু মৌর্য, সুঙ্গ ও গুপ্ত বংশের রাজারা ছিলেন ভারতীয়, তাঁরা পূর্ব ভারতে মগধ থেকে সাম্রাজ্য গঠন করেন। পাটলী পুত্র (বর্তমান পাটনার কাছে) ছিল তাঁদের রাজধানী সেই রাজপাট থেকেই দিগ্‌বিজয়ের অভিযান, রাজ্যরক্ষা, দেশশাসন প্রভৃতি চলত। গুপ্তদের পতনের পর আর একবার মগধ ভারতের রাষ্ট্রীয় কেন্দ্র হয়েছিল, পাল রাজাদের আমলে। এই বাঙলার ধর্মপাল ও দেবপাল উত্তর ভারতের কনৌজ পর্যন্ত অধিকার বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন এবং সাময়িক ভাবে সফলও হয়েছিল। তাঁদের প্রায় চারশ বছর রাজত্বের পর খৃস্টীয় দ্বাদশ শতকে মগধ ও পাটলিপুত্রের গৌরব লুপ্ত হয়ে যায় চিরদিনের জন্য।

মগধ ঃ সাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধনে মগধের ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্র—ইতিহাস পড়তে ও বুঝতে হলে এই মগধের প্রথম থেকে শেষ সাম্রাজ্য পর্যন্ত উত্থান পতনের কাহিনী জানতে হবে। সে ইতিহাস অনেকটা ভাঙা—চোরা, ঠিক ধারা বাহিক নয়। তবু মোটামুটি একটা নির্ভরযোগ্য ইতিবৃত্ত পণ্ডিতদের গবেষণায় উদ্ধার করা হয়েছে। কারণ, পুরাণ, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ থেকে এই সময়কার অনেক ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া গেছে। প্রথমে উত্তর ভারতে কোনও একচ্ছত্র আধিপত্যের সন্ধান মেলে না। রাষ্ট্রীয় ঐক্যের অভাবে গান্ধার থেকে পূর্ব ভারত পর্যন্ত ভূ-ভাগ কয়েকটি ছোট বড় রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এদের মধ্যে অবন্তী কোশল মগধ ও বৎস রাজ্যই ছিল প্রধান, আর পাঞ্চাল কাশী অঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটি হীনবল রাজ্যও বর্তমান ছিল। খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল এই রকম। তখন 'ষোড়শ মহাজন পদ' অর্থাৎ ষোলটি বৃহৎ রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ছিল। এই 'ষোড়শ মহাজন পদ'গুলির নাম যথাক্রমে (১) কাশী বা বারাণসী, (২) কোশল বা অযোধ্যার অনেকাংশ, (৩) অঙ্গ বা বিহারের মধ্য অংশ, (৪) মগধ বা দক্ষিণ বিহার (৫) বৃজি (বজ্জি) বা বিহারের উত্তর অংশ (৬) মল্ল বা গোরক্ষপুর অঞ্চল, (৭) চেদি বা বুন্দেলখণ্ড, (৮) বৎস (বংশ) বা উত্তর প্রদেশে যমুনার নিকটবর্তী অঞ্চল, (৯) কুরু বা ইন্দ্রপ্রস্থ অঞ্চল, (১০) পাঞ্চাল বা রোহিল খণ্ডের একাংশ, (১১) মৎস

ষোড়শ মহাজনপদ



প্রাচীন ভারত
আনুমানিক
খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ – পঞ্চম শতাব্দী

বা রাজস্থানের অংশবিশেষ, (১২) শূরসেন বা মথুরার নিকটবর্তী অঞ্চল, (১৩) অশ্মক বা অন্ধ্রপ্রদেশের একাংশ, (১৪) অবন্তী বা মধ্য প্রদেশের অন্তঃপাতী, (১৫) গান্ধার বা উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দেশ ও কাশ্মীরের একাংশ এবং (১৬) কম্বোজ বা কাশ্মীরের উত্তর পশ্চিমে পার্বত্য প্রদেশ ও পামীরের কিছু অংশ। তাদের মধ্যে রাজতন্ত্র আর গণতন্ত্র বা রিপাবলিক, দুই ধরনেরই শাসন-পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এই ছোট ছোট গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট রাজবংশ পুরুষানুক্রমে রাজত্ব করতেন না; রাষ্ট্রের দলপতিরাই নায়ক নির্বাচন করে শাসন-কার্য চালাতেন। কপিলাবস্তুতে শাক্যদের রাজ্য, বৈশালী নগরে বৃজ্জি ও লিচ্ছবিদের যুক্তরাষ্ট্র এই রকম গণতন্ত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। জনসাধারণের তরফে যাঁরা শাসনভার নিতেন, তাঁদের 'গণজ্যেষ্ঠ' বা 'সংঘমুখ্য' বলা হত। মনে রাখা উচিত, এইসব গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলি স্বপ্রধান হওয়ার ফলে ঐক্যবোধের অভাব হয় এবং তার সুবিধা নিয়েই বৈদেশিক আক্রমণের পথ সহজ হয়।

কোশলপতি প্রসেনজিৎ, মগধাধিপ বিম্বিসার, অবন্তীর রাজা প্রদ্যোৎ এবং বৎসরাজ উদয়ণ প্রভৃতি বিখ্যাত রাজারা গৌতম বুদ্ধের সমকালীন ছিলেন। এঁদের মধ্যে মগধ রাজ্যই সবচেয়ে বড় ও শক্তিশালী হয়ে পূর্ব ভারতে প্রথম সাম্রাজ্যের পত্তন করে। কালক্রমে এই প্রাচ্য দেশের সাম্রাজ্য-সীমা সিন্ধু নদের পূর্বকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়, একথা গ্রীক লেখকরা বলে গেছেন।

[খ] **মগধের অভ্যুদয় ঃ** পূর্ব ভারতের শ্রেষ্ঠ দুই রাজ্য ছিল কোশল ও মগধ। কোশল প্রথমে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং কাশীরাজ্য জয় করে, শাক্যদেরও বশীভূত করে। কিন্তু কোশলের ক্রমবিস্তৃত প্রভাব পরাস্ত হল মগধের কাছে। এই সময় মগধরাজ ছিলেন হর্যঙ্ক বংশের প্রসিদ্ধ বিম্বিসার। তিনি পূর্ব বিহারে অঙ্গরাজ্য জয় করেন এবং কোশলরাজ প্রসেনজিতের ভগিনীকে বিবাহ করে কাশী রাজ্যের কিছু অংশ যৌতুক পান। প্রসেনজিৎ ও বিম্বিসার উভয়েই বৌদ্ধভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধ জনশ্রুতি অনুসারে বিম্বিসার তাঁর বৌদ্ধ বিদ্বেষী পুত্র অজাতশত্রুর হাতে নিহত হন। রাজগৃহ বা রাজগীর ছিল তাঁর রাজধানী। দক্ষিণ বিহারে এই বিখ্যাত নগরী পাঁচটি পাহাড়—ঘেরা, আর উঁচু পাথরের প্রাচীর ও চারদিকে পরিখা বা খাল দিয়ে সুরক্ষিত ছিল। বুদ্ধদেব এখানে কিছুকাল বাস করেন বলে বৌদ্ধদের কাছে এটি পরম পবিত্র তীর্থ বলে বিবেচিত।

প্রসেনজিৎ ও বিম্বিসার

রাজগৃহ

বিম্বিসারের মৃত্যুর পর অজাতশত্রু সিংহাসনে বসে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন। তাঁর কাছে কোশলরাজাকেও কন্যাদান ও কাশী রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে সন্ধি প্রার্থনা করতে হল। ফলে মগধরাজ্য সমস্ত গঙ্গা-উপত্যকা নিয়ে এক বড় সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। নিরাপত্তার জন্য অজাতশত্রু নাকি শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে পাটলি নামে দুর্গ তৈরি করেন। বৌদ্ধগ্রন্থে অজাতশত্রুকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলে যে বর্ণনা করা হয়, তা সত্য নয়। অজাতশত্রুর কয়েক

অজাতশত্রু

পুরুষ পরে শিশুনাগ নামে এক রাজা অবন্তি রাজ্য জয় করে মালব অঞ্চল পর্যন্ত মগধের আধিপত্য বিস্তার করেন। এই বংশের রাজত্ব শেষ হলে এলেন মহাপদ্ম উগ্রসেন। তিনি নন্দকুল-জাত শূদ্র, তাই এই নতুন রাজকুলের নাম নন্দবংশ। মহাপদ্ম প্রকৃত পক্ষে এক পরাক্রান্ত সম্রাট ছিলেন। পুরাণে তাঁকে 'একরাট্' বলে স্বীকার করা হয়েছে। তাঁর সাম্রাজ্য নাকি খুব বড় ছিল। নন্দবংশের সর্বশেষ রাজা ধননন্দ, তার ঐশ্বর্য, প্রতাপ এবং সামরিক শক্তি প্রবল ছিল, তারই রাজত্ব কালে জগদ্বিখ্যাত গ্রীক আলেকজাণ্ডার ভারত আক্রমণ করেন। এই 'প্রাচ্য' ও 'গঙ্গা-রাঢ়' দেশের মিলিত বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করা আলেকজাণ্ডার ও তার সৈন্যদল বাঞ্ছনীয় মনে করেননি।

শিশুনাগ

মহাপদ্ম উগ্রসেন

[গ] পারসীক আক্রমণ ঃ খৃঃ পূঃ ষষ্ঠ শতকের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম ভারতে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই সময় পারস্যের বিশাল সাম্রাজ্য ভারত সীমান্ত স্পর্শ করে। বিখ্যাত সম্রাট দারায়ুস-এর রাজত্বকালে সেনাপতি স্কাইলাক্স ভারত-সীমান্ত আক্রমণ করে পাঞ্জাবের এক অংশে পারসীক প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ক্রমে গান্ধার, তক্ষশীলা এবং উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল পারসীক সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। ঐতিহাসিকরা বলেন, প্রাচীন ভারতে প্রস্তর শিল্প, স্তম্ভনির্মাণ, শিলালিপি খোদাই করার রীতি, আর খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার—এগুলির মধ্যে পারসীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া পারসীক আক্রমণের ফলে পশ্চিম এসিয়া ও পাশ্চাত্য দেশগুলির সঙ্গে সংযোগ, যাতায়াতের সুবিধা ও বাণিজ্যের প্রসার ঘটেছিল। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে পারসীক আধিপত্য পরবর্তীকালে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানেও সহায়ক হয়েছিল।

পারসীক আক্রমণ

ফলাফল

[ঘ] আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ ঃ পিতা ফিলিপের মৃত্যুতে মাত্র বিশ বছর বয়সে আলেকজাণ্ডার গ্রীস দেশে ম্যাসিডনের রাজা হন। দিগ্ বিজয়ের বাসনায় তিনি সুদূর এসিয়ায় অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন। পশ্চিম—এশিয়া জয়ের পর তিনি পারসীক সম্রাটকে হারিয়ে পারস্য দখল করেন, তারপর ভারত অভিমুখে অগ্রসর হন। কিন্তু ভারত—সীমান্ত পার হতে গিয়ে তাঁকে বিশেষ বেগ পেতে হয়। ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমায় তখন কোনও বড় রাজ্য ছিল না, জায়গাটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। উপজাতি-শাসিত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সদ্ভাব ছিল না এবং একতার অভাবে তারা বিদেশীদের রুখতে পারেনি। এদের মধ্যে কেউ কেউ আলেকজাণ্ডারের বশ্যতা স্বীকার করে, কেউবা যুদ্ধ করে গ্রীক বাহিনীর কাছে পরাস্ত হয়। অম্ভি ছিলেন তক্ষশীলার রাজা, তিনি বিনা যুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করেন। তক্ষশীলার নগরটি খুব পুরাতন, প্রাচীন হিন্দু যুগে এটি শিক্ষা ও সভ্যতার একটি বড় কেন্দ্র ছিল।

প্রথম জীবন

পারস্য জয়

ভারত সীমান্তের পরিস্থিতি

অম্ভি

এইভাবে সিন্ধুনদের পশ্চিম পারের রাজ্যগুলি বশীভূত করে, আলেকজাণ্ডার বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী পুরুরাজ্য আক্রমণ করেন। বিতস্তার দুইতীরে উভয় পক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হল; কিন্তু শেষকালে ভীষণ সংঘর্ষের পর হিন্দু সৈন্যদল ছত্রভঙ্গ হল, পুরুরাজ পরাস্ত হলেন। পুরুর অসীম সাহস ও বীরত্ব দেখে আলেকজাণ্ডার তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দেন ও নানা উপহার দিয়ে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেন।

পুরু ও আলেকজাণ্ডার

এই যুদ্ধের পর আলেকজাণ্ডারের ইচ্ছা ছিল আরও অগ্রসর হবেন, কিন্তু সৈন্যরা কাতর এবং ক্রমশঃ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠল। ওদিকে মগধের সম্রাট ধননন্দ প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য সামন্ত নিয়ে আলেকজাণ্ডারকে বাধা দেবার জন্য প্রস্তুত শুনে গ্রীক সৈন্যরা বাড়ি ফিরতে চাইল। তখন আলেকজাণ্ডার সৈন্যদের ফেরবার আদেশ দিলেন। পথে মালব নামে এক ক্ষত্রিয় উপজাতিকে পরাস্ত করে তিনি পটল নগরে পৌঁছলেন। তারপর একদল সৈন্য জাহাজে করে নিয়ার্কসের অধীনে সমুদ্রপথে ফিরে গেল, আর আলেকজাণ্ডার স্থলপথে বেলুচি মরুভূমি পার হয়ে অনেক কষ্টে পারস্যের সুসা নগরীতে পৌঁছলেন। এর কিছুকাল পরে মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে ব্যাবিলনে তাঁর মৃত্যু হয়। তখন পারস্য ও ভারতের অঞ্চলগুলি সেনাপতি সেলুকসের অধিকারে আসে। আলেকজাণ্ডারের ভারত জয়ের আশা সফল হয়নি।

প্রত্যাবর্তন

ফলাফল ঃ গ্রীকদের ক্ষিপ্র অভিযান ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ অধিকার এতই স্বল্পস্থায়ী যে, তার রাজনৈতিক প্রভাব ভারতের ইতিহাসে বেশি কিছু নয়। ভারতীয় সাহিত্যেও গ্রীক বিজয়ের কোনও উল্লেখ নেই। তবে ঐ আক্রমণের প্রত্যক্ষ ফল সামান্য হলেও, পরোক্ষ ফল অস্বীকার করা যায় না। প্রথমতঃ পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের মধ্যে যাতায়াতের পথ আরও সুগম হয় এবং বাণিজ্যিক সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারত সীমান্তে কয়েকটি বসতিস্থাপন গ্রীক বিজয়ের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। অশোকের শিলালিপিতে 'যোন' বা যবন অধিবাসীর কথা স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তৃতীয়তঃ, নিকট সংস্পর্শের ফলে গ্রীক ও ভারতীয়দের মধ্যে যে আদান-প্রদান শুরু হয়, তাতে উভয় দেশের সংস্কৃতির মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব দেখা যায়। গ্রীক আক্রমণের পরোক্ষ ফল হিসাবে গান্ধার শিল্পের উৎপত্তি ও প্রসার ঘটে। এই শিল্প গ্রীক ও ভারতীয় রীতির সংমিশ্রণের ফল। আর একটি পরোক্ষ ফল এই যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত এবং পাঞ্জাব অঞ্চলে ছোট ছোট রাজ্যগুলি শক্তিহীন হয়ে যায়। তার পূর্ণ সুযোগ নিয়ে মৌর্যচন্দ্রগুপ্ত সমগ্র উত্তর ভারতে একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হন। এই আক্রমণের গুরুত্বপূর্ণ ফল মোটামুটি দুটি—প্রথমটি গ্রীকদের বিতাড়িত করে মৌর্যসাম্রাজ্যের

পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দেশের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি

যবন বসতি

শিল্প সংস্কৃতির উপর প্রভাব

গান্ধার শিল্প

মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা

প্রতিষ্ঠা এবং ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন। দ্বিতীয়টি, সাল তারিখ দেওয়া ইতিহাসের সূত্রপাত। আলেকজাণ্ডারের শিক্ষিত কর্মচারীরা ও পরবর্তী কালের গ্রীক লেখকরা ভারতের সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে অনেক মূল্যবান তথ্য লিখে যান।

রাষ্ট্রীয় ঐক্য

[ঙ] মৌর্য যুগ ঃ চন্দ্রগুপ্ত ঃ আলেকজাণ্ডারের ভারত অভিযান সম্পর্কে ইতিহাস জানার জন্য যতটুকু দরকার, ততটুকুই বলা হল। তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পাঞ্জাব থেকে গ্রীক সৈন্য বিতাড়িত হয়, মগধেও নন্দবংশের উচ্ছেদ হয়। যিনি এইসব কাজ সম্পন্ন করেন, তাঁর নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনিই প্রথম বিদেশীদের পরাস্ত করে এক নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। বলা যেতে পারে, তার সাম্রাজ্য গঠন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। মৌর্য যুগ থেকেই প্রাচীন ভারতের সমাজ, রাজনীতি, শিল্পকলার একটা স্পষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি।

চন্দ্রগুপ্ত কে, কোথা থেকে কি ভাবে তিনি প্রথম সম্রাট হলেন, সে কথা এখন বলি। পুরাণের মতে তিনি নন্দরাজের মুরা নামে এক নীচজাতীয়া স্ত্রীর সন্তান। কেউ কেউ বলেন, তিনি নন্দ-বংশেরই একটি ছোট শাখার রাজপুত্র। বৌদ্ধ মতে. মধ্য ভারতের পিপ্পলীবন বলে এক ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের 'মোরিয়' নামে ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগুপ্তের জন্ম। 'মোরিয়' থেকেই মৌর্য নাম এসেছে, এইটাই আধুনিক অভিমত। হিন্দু বৌদ্ধ জৈন গ্রন্থে মৌর্যদের উল্লেখ আছে। গ্রীক লেখকদের রচনা থেকে জানা যায়, চন্দ্রগুপ্ত প্রথমে আলেকজাণ্ডারের শিবিরে আশ্রয় নেন, তারপর কোনও কারণে আলেকজান্ডারের অসন্তোষ হওয়ায় প্রাণভয়ে তিনি সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। পরে একটি সৈন্যদল গঠন করে, তিনি মগধের দিকে আসেন। কিংবদন্তী আছে এই সময়ে এক কূটবুদ্ধি ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা হয়। তক্ষশিলার এই পণ্ডিত চাণক্যের সাহায্যেই চন্দ্রগুপ্ত নাকি মগধরাজ নন্দকে বিনাশ করে সিংহাসন অধিকার করেন (খৃস্ট পূর্ব ৩২৪)। এরপর তিনি পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের পরিত্যক্ত সেনাশিবির থেকে গ্রীক সৈন্যদের বিতাড়িত করেন। চন্দ্রগুপ্তের গোড়ার ইতিহাস যাই হোক, তিনি যে অসাধারণ বুদ্ধিমান শক্তিশালী পুরুষ ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এখন, মগধ অধিকার আর পাঞ্জাব থেকে গ্রীক সৈন্যদের হটিয়ে দেওয়া, কোনটি আগে কোনটি পরে হয়েছিল, ঠিক বলা যায় না। তবে সম্ভবতঃ মগধে নিজের আসন পাকা করেই তিনি উত্তরে ও পশ্চিমে এগিয়ে ছিলেন।

প্রথম জীবন

মৌর্য নামের উৎপত্তি

চন্দ্রগুপ্ত অনেকগুলি রাজ্য জয় করেন। মগধের অধীনে যে সব রাজ্য নন্দদের শাসনে ছিল, সেগুলি তো পেলেনই, পশ্চিমে গুজরাট সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত অঞ্চলটিও অধিকার করলেন। সৌরাষ্ট্রে তাঁর অধীনস্থ এক রাজকর্মচারী পুষ্যগুপ্তের নাম পাওয়া যায়। উত্তরে পাঞ্জাব, তার ওপারে কাবুল, কান্দাহার হিরাট, বেলুচিস্তান, এগুলিও তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। মোটামুটি বলা যায়, চন্দ্রগুপ্তের বিশাল সাম্রাজ্য পারস্যের পূর্ব সীমান্ত

সাম্রাজ্য বিস্তার

থেকে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত অর্থাৎ সমগ্র উত্তরাপথ ও মধ্য ভারত নিয়ে বিস্তৃত ছিল। দাক্ষিণাত্যেও তিনি অভিযান করেছিলেন, এই রকম জনশ্রুতি আছে। মহীশূর পর্যন্ত দক্ষিণ ভারতের একটি বড় অংশ তাঁর অধিকারে ছিল, তার কিছু ঐতিহাসিক প্রমাণও পাওয়া যায়। যাই হোক, বিদেশীদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম প্রতিরোধক ও ভারতের প্রথম স্বাধীন সাম্রাজ্যের স্রষ্টা। বিভিন্ন জনপদে বিভক্ত ঐক্য বন্ধনহীন দেশে তিনিই সর্বপ্রথম সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় সংহতি স্থাপন করেন। চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবন সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা যায় না। জৈন কিংবদন্তী অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত জৈন মত গ্রহণ করেন এবং মহীশূরের কাছে শ্রাবণ বেলগোলায় তাঁর মৃত্যু হয় (খৃঃ পূঃ ৩০০)।

কৃতিত্ব

বিন্দুসার ঃ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের চব্বিশ বছর রাজত্বের পর তাঁর ছেলে বিন্দুসার সিংহাসন পেলেন। তাঁর উপাধি ছিল 'অমিত্রঘাত'। তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কেবল জানা যায়, তক্ষশিলায় এক বিদ্রোহ তিনি কঠোরভাবে দমন করেন। কেউ কেউ বলেন, তিনিই দাক্ষিণাত্য জয় করেন। মনে হয়, তিনি পিতার প্রতাপ প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ন রেখেছিলেন। গ্রীকদের সঙ্গে তাঁর সদ্‌ভাব ছিল। সিরিয়ার গ্রীক রাজা ডিমাকস নামে এক দূত এবং মিশরের গ্রীক রাজাও তাঁর সভায় আর একজন দূত পাঠিয়েছিলেন। মৌর্য যুগে বিদেশী রাজ্যের সঙ্গে ভারতের যে যোগাযোগ শুরু হয়, এই দৌত্যই তার প্রমাণ।

তক্ষশিলার বিদ্রোহ দমন

দৌত্য

অশোক ঃ অশোকের জননী ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশীয়া সুভদ্রাঙ্গী, আবার অন্য মতে তিনি ক্ষত্রিয়া ধর্মা দেবী। খৃস্টপূর্ব ২৭৩ বা ২৭২ সালে তিনি সম্রাট্ হন। তবে পিতার মৃত্যুর চার বছর পরে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়েছিল। বৌদ্ধ মতে তিনি সিংহাসন নিয়ে ভাইদের সঙ্গে বিরোধে লিপ্ত হন এবং তাদের হারিয়ে, কাউকে বা হত্যা করে সাম্রাজ্য অধিকার করেন। এই জন্য তিনি 'চণ্ডাশোক' বলে অভিহিত হন। কিন্তু অনেক পণ্ডিত এই বৌদ্ধ কাহিনী বিশ্বাস করেন না। তাঁরা বলেন, অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করে তিনি যে 'ধর্মাশোক' নামে পরিচিত হলেন, এটা দেখাবার জন্যই বৌদ্ধ জনশ্রুতি তৈরি হয়েছে যে তিনি গোড়ার জীবনে বড় নিষ্ঠুর ছিলেন। শোনা যায়, বৌদ্ধ সন্ন্যাসী উপগুপ্তের উপদেশে তিনি বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন এবং ধর্মপ্রচারের জন্য দৃঢ় পণ করেন। এ কাহিনী কতদূর সত্য, বলা যায় না। তবে সম্রাটের একখানি শিলালিপিতে তাঁর মনোভাব ও স্বভাব পরিবর্তনের কারণ দেওয়া আছে।

প্রথম জীবন

চণ্ডাশোক

কলিঙ্গ যুদ্ধ ও বৌদ্ধ মত গ্রহণ ঃ রাজত্বের তেরো বছরে অশোক একবার যুদ্ধ করে প্রবল কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন। বর্তমান ওড়িশায় সেই রাজ্য ছিল। এই ভীষণ যুদ্ধের ফলে অজস্র রক্তপাত ও লোকক্ষয় হয়। চারদিকে ধ্বংসের চিহ্ন ও

মানুষের আর্তনাদ শুনে তাঁর হৃদয় অনুতাপে জ্বলতে লাগল। তিনি যখন বুঝলেন যুদ্ধের পরিণাম এত সাংঘাতিক, তখন প্রতিজ্ঞা করলেন, 'ভবিষ্যতে আর যুদ্ধ নয়। কারও শোকদুঃখের কারণ হব না। লোভজয় ছেড়ে, এখন ধর্মবিজয় বরণ করব।' এই উপলব্ধি অশোককে যেন একেবারে নতুন মানুষে পরিণত করল। তিনি এখন থেকে 'ভেরী ঘোষ' (যুদ্ধের বাদ্য) বন্ধ করে 'ধর্ম ঘোষ' প্রবর্তন করলেন, মানুষদের মঙ্গলের জন্য সর্বদা চেষ্টা করতে লাগলেন। আর অকারণ প্রাণিহত্যা নিবারণের জন্য তিনি মৃগয়া ত্যাগ করলেন, আহারের জন্য পশু বধ কম করে দিলেন এবং ক্রমে তা একেবারে বন্ধ করলেন।

কলিঙ্গযুদ্ধ ও দৃষ্টি পরিবর্তন

ভেরী ঘোষের পরিবর্তে ধর্ম ঘোষ



মহামতি অশোক

অহিংসা মন্ত্রের সাধক হয়ে অশোক এখন মনপ্রাণ দিয়ে সেই ধর্ম পালন করতে লাগলেন। মনের শান্তির জন্য তিনি নানা মঠে ও ধর্মস্থানে ঘুরতে লাগলেন এবং বাকি জীবন কেবল প্রজার হিত ও জীবের কল্যাণেই উৎসর্গ করলেন। অশোক নানা সৎ কাজ করে গেছেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি বড় বড় রাজপথ, রাস্তার দুইধারে অতিথিশালা ও পথিকদের বিশ্রামগৃহ তৈরি করলেন। জল সরবরাহের জন্য পুকুর ও খাল কাটালেন এবং গরীব দুঃখীদের কষ্ট নিবারণের জন্য দানশালা প্রতিষ্ঠা করলেন। আবার পথের মাঝে মাঝে ওষুধের গাছগাছড়া রোপণ এবং অনেক জায়গায় মানুষ ও পশুদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করলেন। শুধু তাই নয়, প্রজারা যাতে সুশিক্ষা পায়

জনকল্যাণমূলক কাজ

ধর্মপ্রচারের জন্য অশোকের ব্যবস্থা


শাহবাজগঢ়ি
মানসেরা
বিতস্তা নং
ইরাবতী নং
বিতস্তা
শতদ্রু নং
সিন্ধু নং
তোপরা
কলসি
মীরাট
ইন্দ্রপ্রস্থ
শ্রাবস্তী
মথুরা
গঙ্গা
নিগলিভা
কপিলাবস্তু
ললিতপতন (কাঠমাণ্ডু)
রামপূর্বা
লৌরিয়ানন্দনগড়
বৈরাট
চম্বতী নং
কৌশাম্বী
কাশী
পাটলিপুত্র
প্রয়াগ
মগধ
চম্পা
সাসারাম
সাঁচি
রূপনাথ
নর্মদা নং
সৌরাষ্ট্র
গিরনার
তাম্রলিপ্তি
মহানদী
ধৌলি
জৌগড়
সোপারা
গোদাবরী নং
কলিঙ্গ
কৃষ্ণা নং
অন্ধ্র
গবীমঠ
সিদ্দাপুর
নেলোর
সত্যপুত্র
চোল
কেরলপুত্র
পাণ্ড্য
তাম্রপর্ণী
অশোকের সাম্রাজ্য
(২৫০ খৃঃ পূঃ)
অনুশাসনসমূহ
প্রাপ্তির স্থান
শিলা লিপি
স্তম্ভ লিপি
আনুমানিক সীমান্ত

এবং প্রকৃত ধর্ম কি তা বুঝতে শেখে, তার জন্য তিনি স্ত্রী ও পুরুষ ধর্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। এঁরা দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে ঘুরে সম্রাটের উপদেশগুলি বিশদ ভাবে বুঝিয়ে ও শিখিয়ে দিতেন। সম্রাট্ নিজেও এসব দিকে খুব নজর রাখতেন। ভাল ভাবে বোঝাবার জন্য অশোক পাথরের থামের উপর ও গুহার গায়ে 'ধর্মের' মূল নীতিগুলি খোদাই করিয়ে দিলেন। এই লিপিগুলি চলিত ভাষায় সহজ করে লেখা। সম্রাট্ বার বার বললেন, 'দেখ, পিতা-মাতা গুরুজন ব্রাহ্মণ ও শ্রমণকে শ্রদ্ধা করবে। দাসদাসীদের উপর অত্যাচার করবে না, হিংসা ও জীবহত্যা করবে না, কখনও অকারণে পশু-পক্ষীদের কষ্ট দেবে না। সৎপাত্রে দান করবে, অপর ধর্মের নিন্দা করবে না।'

অশোক চেয়েছিলেন প্রজাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল সাধন। বিভিন্ন শিলালিপিতে তিনি 'ধম্ম' কথাটি একাধিকবার প্রয়োগ করেছেন। এবং তার প্রকৃত অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন। 'ধম্মে'র দুটি দিক কতকগুলি বিশিষ্ট গুণ বা নীতির অনুশীলন, আর কয়েকটি দোষ পরিহার। অশোক বৌদ্ধ ধর্মগ্রহণ করলেও এবং তাঁর শিলালিপিতে ব্যবহৃত অনেক শব্দ বুদ্ধবাণী থেকে গৃহীত হলেও তিনি যে ধম্মপ্রচার করেন তাকে তাঁর ব্যক্তিগত ধর্মমত বলা চলে। যা রাজার ও প্রজার উভয়েরই মঙ্গল ধর্ম।

অশোকের ধর্ম

রজ্জুক,ধর্ম-মহামাত্র প্রভৃতি রাজকর্মচারীদের উপর অশোক আদেশ জারি করেছিলেন, কারও উপর কোন অবিচার না হয়, এ দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। রাজপুরুষরা যেন আলস্য ও অবহেলা ত্যাগ করে সর্বদাই প্রজার মঙ্গল-চেষ্টা করেন। চরদের উপর হুকুম ছিল যে, প্রজাদের কোন দুঃখ-অভিযোগের কথা জানতে পারলে, যে কোন সময়ে তারা, অন্তঃপুরেই হোক্ আর প্রাসাদেই হোক্, রাজাকে খবর দিয়ে আসবে। এক শিলা-লিপিতে তিনি কর্মচারীদের উদ্দেশ করে লিখে গেছেন, 'আমি প্রজাদের নিজের সন্তানদের মত দেখি। লোকে যেমন ছেলেমেয়েদের মঙ্গল দেখলে শান্তি পায়, আমিও সেরূপ প্রজাদের সুখে সুখী হব।'

প্রজার মঙ্গল চিন্তা

আদর্শ রাজনীতি

ধর্মপ্রচার ঃ শেষ জীবনে সম্রাট্ বৌদ্ধধর্ম প্রচারে জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। নিজে ত্যাগী হলেন, বৃথা আমোদ ও পশুবধ বন্ধ করলেন। তারপর নিজ রাজ্যের বাইরেও ধর্ম-প্রচারের জন্য ভাল ভাল লোক নির্বাচন করে মিশর, পশ্চিম এসিয়া ও গ্রীসে পাঠালেন। সুদূর দক্ষিণ ভারতেও ধর্মপ্রচারক গেল। তাঁর এক পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রা (মতান্তরে ভ্রাতা ও ভগিনী) সিংহলে গিয়ে ধর্মপ্রচার করেন। ব্রহ্ম ও চীনদেশেও অশোক ধর্মপ্রচারক পাঠিয়েছিলেন বলে শোনা যায়। তাছাড়া ভগবান বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রামে ও অন্যান্য বৌদ্ধ তীর্থে ভ্রমণ করে নানা জায়গায় স্তূপ, বিহার, চৈত্য ও স্তম্ভ প্রতিষ্ঠা করেন। বুদ্ধদেব সর্বপ্রথম সারনাথে তাঁর ধর্মমত

বিদেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ

স্তূপ, বিহার চৈত্য ও স্তম্ভ নির্মাণ

প্রচার করেন। তাই সারনাথে একটি বড় স্তূপ নির্মিত হয়, এটি আজও বর্তমান। অশোক-স্তম্ভের উপর যে সিংহচূড়া আছে, সেটি এখন স্বাধীন রাষ্ট্র ভারতের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অশোকের আদর্শ ও কৃতিত্ব ঃ আজ থেকে বাইশ শত বছর আগে (খৃঃ পূঃ ২৩২) অশোক দেহত্যাগ করেছেন। কিন্তু শুধু ভারত নয়, সমগ্র জগৎ এই সম্রাটের পুণ্যস্মৃতি আজও ভোলেনি। দেশ-বিদেশের মনীষীরা স্বীকার করেন, অশোকের মত সম্রাটের তুলনা মেলে না। এত বিশাল মৌর্য সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়ে তিনি এক কথায় লোভ ও যুদ্ধ বর্জন করলেন। জয়ের মুহূর্তে এত বড় ত্যাগ স্বীকার সত্যই কঠিন। কলিঙ্গ জয় করে তিনি হয়তো আরও যুদ্ধ করতে পারতেন, রাজ্যসীমা বাড়াতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা বাঞ্ছনীয় মনে করেননি, কারণ তিনি অতকাল আগে বুঝতে পেরেছিলেন যে হিংসায় সুখ নেই, শান্তি ও মৈত্রীতেই জগতের হিত। তাঁর বিরাট সাম্রাজ্য এখন লুপ্ত ও অতীত, কিন্তু পৃথিবীর আদর্শ নৃপতি মহামতি অশোক ইতিহাসে অমর হয়ে আছেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে অশোকের স্থান



অশোক স্তম্ভ

অশোক সম্বন্ধে আমরা এখন অনেক তথ্য জানতে পেরেছি তাঁর নির্দেশে যে সব শিলা-লেখ গিরি ও গুহার গায়ে, শিলা-ফলকে ও পাথরের থামে খোদাই করা হয়েছিল, সেই লিপিগুলির আবিষ্কার, পাঠ-উদ্ধার এবং অর্থ প্রকাশ সম্ভব হয়েছে প্রায় দু'শ বছর ধরে নানা দেশী বিদেশী পণ্ডিত গবেষকদের অক্লান্ত পরিশ্রমে। তাই জানতে পেরেছি যে 'দেবানামপ্রিয় প্রিয়দর্শী'ই হচ্ছেন রাজা অশোক। একমাত্র মাস্কি শিলালেখ-তে অশোকেই 'প্রিয়দর্শী' তার প্রামাণ্য উল্লেখ আছে। ঐ সব শিলা ও স্তম্ভলিপি থেকে জানা যায় সম্রাটের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও আদর্শ কি ছিল। তাঁর কলিঙ্গ জয় ও ধর্ম-প্রচারের কাহিনী, প্রজাদের মঙ্গল সম্পর্কে তাঁর দায়িত্ববোধ, তাঁর শাসনব্যবস্থা, এমন কি সাম্রাজ্যসীমাও স্পষ্ট করে বুঝতে এখন আর অসুবিধা নেই। কামরূপ ও তামিল রাজ্যগুলি ছাড়া সমগ্র দেশ তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল। অশোকের সাম্রাজ্য উত্তরে কাশ্মীর ও উত্তর পশ্চিমে আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু প্রদেশ থেকে দক্ষিণে পেনার নদী পর্যন্ত এবং পশ্চিম ভারতে আরব সাগর থেকে পূর্বভারতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

অশোকের সাম্রাজ্যের আয়তন

মৌর্যযুগে দেশের অবস্থা ঃ মৌর্য যুগের সমাজ, শাসন ও অর্থব্যবস্থা এখন জানতে হবে। এ সম্বন্ধে নানা তথ্য পাওয়া গেছে যে সব বই থেকে তাদের নাম জেনে রাখো ঃ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস-এর বিবরণ,

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র (কারুর কারুর মতে ইনিই চাণক্য), হিন্দুদের পুরাণ এবং বৌদ্ধ ও জৈনদের ধর্মপুস্তক ও সাহিত্য। এ ছাড়া ভারতের নানা জায়গায় ছড়ানো অশোকের অনুশাসনগুলিও মৌর্য ইতিহাসের অনেক তথ্য দিয়েছে। এখানে একটা কথা বলা দরকার মনে করি। মৌর্যদের ইতিহাসের ঠিক পরেই মৌর্য যুগে দেশের অবস্থা বর্ণনা করলে একটানা ইতিহাস পড়ার ও বোঝার খুব

ইণ্ডিকা

সুবিধা হয়। তাই মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের বই থেকে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি এখানেই বলছি। ভারতের রাজধানীতে সেলুকস যে দূত রেখেছিলেন, তাঁর নাম মেগাস্থিনিস। এই গ্রীক দূত মৌর্য সাম্রাজ্যের শাসন-প্রণালী, লোকের আচার-ব্যবহার, রাজধানী ও প্রাসাদের বর্ণনা লিখে গেছেন। বইখানির নাম ইণ্ডিকা। এ বই এখন পাওয়া যায় না। তবে পরবর্তী গ্রীক লেখকদের রচনায় আমরা জানতে পারি মেগাস্থিনিস কি দেখেছিলেন ও কি কি কথা বলেছিলেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণী ঃ মেগাস্থিনিস তাঁর 'ইণ্ডিকায়' বলেন ভারতে তখন ছোট বড় ১১৮টি রাজ্য ছিল। তাদের মধ্যে মগধই শ্রেষ্ঠ। মগধরাজের সৈন্যবল

রাজসৈন্য

ছিল প্রায় এক লক্ষ পদাতিক, ৩০০০০ ঘোড়সওয়ার, ৫০০০ হাতি, অনেক যুদ্ধরথ ও নৌযান। তাঁর ঐশ্বর্য প্রচুর, রাজধানী ও প্রাসাদটির শোভাও ছিল বিস্ময়কর। একদল সশস্ত্র নারীসৈন্য

দেহরক্ষী

রাজাকে সর্বদাই পাহারা দিত। রাজা নিজেই বিচার করতেন ও রাজকার্যে যথেষ্ট সময় দিতেন। ভারতের পশ্চিম সীমা থেকে রাজধানী 'প্যালিমবোথ্রস্' বা পাটলিপুত্র পর্যন্ত একটি প্রশস্ত রাজপথ ছিল। শহরটি ছিল গঙ্গা ও শোণ নদীর সঙ্গমে, লম্বায় এগারো মাইল ও চওড়ায়

রাজধানী ও রাজপ্রাসাদ

দু মাইল। চার ধারে উঁচু কাঠের প্রাচীর আর তার মধ্যে ছোট ছোট দুর্গের মধ্যে সৈন্যসামন্ত সর্বদা প্রস্তুত থাকত। প্রাচীরের বাইরে একটি বড় জলপূর্ণ পরিখা ছিল। রাজপ্রাসাদটি ছিল দেখবার মত, কাঠের তৈরি ও নানা রকম সুন্দর কারুকার্যে সাজানো। মাটি খুঁড়ে স্পুনার সাহেব পাটনার কাছে কুমরাহার নামক জায়গায় এই প্রাসাদের ধ্বংসচিহ্ন এবং একটি চওড়া কাঠের রেলিং আবিষ্কার করেন।

মেগাস্থিনিস আরও বলেছেন, এ দেশে চুরি-ডাকাতির উপদ্রব নেই, তবে বিশেষ

দণ্ডবিধির কঠোরতা

ধরনের অপরাধ করলে কঠোর দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এদিকে বহু গুপ্তচর ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াত। মোটের ওপর ভারতবাসীরা ছিল ভদ্র, শান্তিপ্রিয় ও সত্যবাদী। মামলা মোকদ্দমা বা পরের দ্রব্যে তারা লোভ করত না। চন্দ্রগুপ্তের শিবির নিবাসে প্রায় চার লক্ষ লোকের

সততা

বাস কিন্তু সেখানে দৈনিক চুরির পরিমাণ নগণ্য! বাড়ি-ঘর, টাকাকড়ি আলগা ও খোলা অবস্থায় থাকে, পরস্পরের প্রতি তাদের এতই বিশ্বাস। তারা মিতাহারী ও মিতাচারী, বিশেষ উৎসব ছাড়া

সুরাপান করে না। মেগাস্থিনিস এই ভাবে ভারতীয় চরিত্রের খুব সুখ্যাতি করেছেন ; বলেছেন, ভারতে ক্রীতদাস প্রথা নেই। এ কথাটি সম্পূর্ণ সত্য নয়। তবে ভারতবাসীরা যে স্বাধীনতাপ্রিয়, তার পরিচয় তাঁর বিবরণ থেকে বোঝা যায়।

মেগাস্থিনিস বলেন দেশ-শাসনের জন্য অনেক শ্রেণীর কর্মচারী ছিল, এক এক রকম কাজের ভার থাকত এক এক দল রাজপুরুষের হাতে। আর সমস্ত রাজ্যটি কয়েকটি দেশে বিভক্ত ছিল। এখানে রাজার প্রতিনিধিরা মন্ত্রীদের সাহায্যে দেশ শাসন করতেন। তিনি ভারতীয় সমাজে সাতটি 'জাতি'র উল্লেখ করেছেন—দার্শনিক, কৃষক, শিকারী ও পশুপালক, কারিগর ও ব্যবসায়ী, যোদ্ধা পরিদর্শক এবং অমাত্য। আসলে মেগাস্থিনিস 'জাতি' কথাটির সাহায্যে জীবিকা বা বৃত্তি অনুসারে লোকদের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর কথা বলেছেন। দার্শনিকরা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ সংখ্যায় কম হলেও সব চেয়ে সম্মানিত। যাগ-যজ্ঞ প্রভৃতি কাজে তারা উপস্থিত থাকে, দৈবগণনা করে রাজ্যের বিপদ-আপদ সম্বন্ধে লোকদের সাবধান করে দেয়। কৃষকদের সংখ্যাই সব চেয়ে বেশি, যুদ্ধ ও অন্যান্য কাজের দায়িত্ব থেকে তারা মুক্ত। তারা রাজাকে জমির উপর খাজনা দেয় এবং গ্রামেই বাস করে। যারা শিকারী ও পশুপালক, তারা যাযাবর। তারা তাঁবুতে বাস করে, অনিষ্টকর পাখি ও জন্তুদের উৎপাত বন্ধ করে এবং রাজাকে এক হিসেবে খাজনা দেয় গরু দিয়ে। আর কারুশিল্পী বা কারিগর দল যুদ্ধের অস্ত্র ও দরকারী জিনিস প্রস্তুত করে বলে সব রকম খাজনা থেকে রেহাই পায়। বরং রাজকোষ থেকেই তারা নিয়মিত অর্থ-সাহায্য পায়। এরপর, যোদ্ধার দল, সংখ্যায় কৃষকদের পরেই। শান্তির সময়ে এরা বিশেষ কিছু করে না। স্থায়ী সেনাবাহিনীর যাবতীয় খরচ সরকারের। পরিদর্শক শ্রেণীর কাজ হল নানা জায়গা থেকে খবর জোগাড় করে সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া। অমাত্য দলের লোক গণনায় সব চেয়ে কম কিন্তু বুদ্ধিতে কর্ম-ক্ষমতায় সমাজে তাদের প্রতিষ্ঠা সব চেয়ে বেশি। এই শ্রেণী থেকে সচিব, সভাসদ, রাজকোষের অধ্যক্ষ, প্রধান বিচারক, এমন কি সেনাপতিও নির্বাচিত হন। এই সব শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ-সম্বন্ধ হয় না, কেউ নিজের জীবিকা ছেড়ে অপরের বৃত্তি নেয় না। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, মেগাস্থিনিস জীবিকা অনুসারে শ্রেণী বা সম্প্রদায়কে 'জাতি' বলেছেন।

রাজকর্মচারী ও মন্ত্রী

সাতটি জাতি

দার্শনিক

কৃষক

শিকারী ও পশুপালক

কারুশিল্পী

যোদ্ধার দল

পরিদর্শক

অমাত্য

যুদ্ধ ও সৈন্যদের তদারক করার জন্য ৩০ জন মন্ত্রী ছয়টি ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ পর্যবেক্ষণ করতেন। পাটলিপুত্রেও এই রকম পৌর শাসনের সুব্যবস্থা ছিল। সেখানেও ছয়টি বোর্ড বা সমিতিতে

সমর বিভাগ

পাঁচজন করে সদস্য বিভিন্ন বিভাগের কাজ করতেন। অনুমান করা হয়, এই পঞ্চ সদস্যই হল প্রাচীন পঞ্চায়েত প্রথার নিদর্শন। প্রথম বোর্ড দেখে শ্রমশিল্প, দ্বিতীয় বোর্ড বিদেশীদের তত্ত্বাবধান, তৃতীয়টি জন্ম-মৃত্যুর হিসাব গণনা, চতুর্থটি কারুশিল্প ও ব্যবসা, পঞ্চমটি পণ্যদ্রব্য ও বাণিজ্য আর ষষ্ঠ বোর্ড বিক্রী জিনিসের উপর শুল্ক আদায় প্রভৃতি কাজে ব্যস্ত থাকে। এই থেকে তোমরা বুঝতে পারবে, মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা কতটা উন্নত ও আধুনিক ছিল।

নগর কর্মচারী

ছয় বোর্ড, পঞ্চসদস্য

অন্যান্য প্রসঙ্গের মধ্যে মেগাস্থিনিস বলেছেন, ভারতের জমি নরম ও অত্যন্ত উর্বর। বড় বড় নদী, জলসেচের ভাল বন্দোবস্ত, আর সুবৃষ্টি হয় বলে খাদ্যদ্রব্যের অভাব হয় না। এখানে বছরে দু-বার ফসল ওঠে, তাই দেশে দুর্ভিক্ষ হয় না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হলে জমি আর কৃষকদের কোনও রকম ক্ষতি করা হয় না। গঙ্গা আর সিন্ধু নদীর বিশেষ উল্লেখ করে বলেছেন, এই দুই বিশাল নদীর মোট আটাশটি শাখা ও উপনদী আছে। যে দেশের জলহাওয়া এত উপযোগী, সেখানে অন্নাভাব কখনও হয় না।

কৃষিকর্ম, জলসেচ

শস্যের প্রাচুর্য

জলবায়ুর গুণ

অর্থশাস্ত্র: মেগাস্থিনিসের বিবরণ ছাড়া কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র থেকেও ভারতের রাজ্যশাসন প্রণালীর বর্ণনা পাওয়া যায়, যার সঙ্গে মেগাস্থিনিসের বিবরণের অনেক মিল আছে। অর্থশাস্ত্রের মতে রাজ্যশাসনের ভার রাজার উপরেই ন্যস্ত, তাঁকে রাজ্যশাসনের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হত। কেন্দ্রীয় শাসনের সর্বময় কর্তা হলেও রাজা যথেচ্ছাচারী হতে পারতেন না। রাজার বিশ্রামের অবসর যেমন খুব কম ছিল, সেই রকম শত্রুর দ্বারা বিষপ্রয়োগ বা অন্য উপায়ে নিহত হবার ভয়ে তাঁকে সর্বদাই সতর্ক ও সুরক্ষিত থাকতে হত। প্রয়োজনীয় বিষয়ে তিনি অমাত্য ও অন্যান্য রাজপুরুষদের সাহায্য নিতেন।

কেন্দ্রীয় শাসন

মন্ত্রিপরিষদ নামে এক সভা রাজাকে পরামর্শ দিত, কিন্তু রাজা সর্বদা তার মতে কাজ করতেন না। মন্ত্রিগণের অধীনে প্রত্যেক বিভাগ বা বিষয়ের জন্য একজন করে অধ্যক্ষ ও তাঁর অধীনে অনেক কর্মচারী থাকতেন,। এই রকম রাজধানীর শাসক 'নগরক', সৈন্য-বিভাগের অধ্যক্ষ 'বলাধ্যক্ষ', শাসন ও রাজস্ব-বিভাগের কর্তা 'সমাহর্তা' ও হিসাব-বিভাগের কর্তা 'সন্নিধাতা' নামে পরিচিত ছিলেন। এই রকম মোট আটাশ জন অধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায়। তাঁরা জমির খাজনা আদায়, বাণিজ্যদ্রব্যের মাশুল আদায় ও রাজ্যের একচেটিয়া ব্যবসায়ের লাভ আদায় প্রভৃতি কাজ করতেন। তখনকার পুলিস বিভাগ খুব কার্যতৎপর ছিল। অনেক গুপ্তচর সন্ন্যাসী বা বণিকের বেশ ধরে চোরডাকাতের সংবাদ নিত ও দোষীকে

মন্ত্রিপরিষদ

বিভাগীয় অধ্যক্ষ

রাজদ্বারে সোপর্দ করত। তখনকার রাজসরকার প্রজাদের দিকে যথেষ্ট নজর রাখতেন। কৃষির জন্য জল সরবরাহের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অনাথ ও নিরন্ন লোকদের রাজসরকার থেকে খাওয়ান হত। দুর্ভিক্ষ বা অজন্মার বছরে রাজকর্মচারীরা প্রজাদের বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। প্রতি বছর প্রচুর ধান শস্য রাজার গোলায় সঞ্চয় করে রাখা হত।

লোক হিতকর কর্ম

সাম্রাজ্য তখন চারটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল—তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, তোসালি ও সুবর্ণগিরি। প্রত্যেক প্রদেশে একজন রাজবংশের কুমার শাসন করতেন। গ্রামগুলি ছিল তখনকার ক্ষুদ্রতম বিভাগ, সেখানে যাবতীয় কাজ গ্রামের লোকেরা নিজেরাই করত। অশোকের সময়ে শাসন-ব্যবস্থার বিশেষ বদল হয়নি। তবে শাস্তির কঠোরতা কমানো হয় এবং বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কয়েকজন নতুন রাজকর্মচারী নিযুক্ত হন।

প্রদেশ ও প্রাদেশিক কর্মচারী

মৌর্য যুগে প্রজাদের সঙ্গে রাজার সম্পর্ক পিতৃতুল্য। বলা হয়েছে, তিনি হলেন রাষ্ট্রের সেবক। কিন্তু কার্যতঃ এই উদার নীতি কতদূর পালন করা হত, তা বলা কঠিন। বাণিজ্য-ব্যবসায়ে, শিল্প ও পণ্যদ্রব্যের নিয়ন্ত্রণে, রাজস্ব আদায়ে এবং কৃষক-শ্রমিকদের তত্ত্বাবধানে সরকার সর্বদাই হস্তক্ষেপ করতেন। সরকারী দপ্তরের কঠিন নিয়মে অসাধু কারবার, নকল ভেজাল বিক্রয় করা চলত না।

রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ

মৌর্য শিল্পকলা ঃ মৌর্য যুগে শিল্পকলার যথেষ্ট বিকাশ হয়। এই সময়ে কাঠের বদলে প্রস্তর-শিল্পের প্রচলন হয়। চন্দ্রগুপ্তের বিখ্যাত রাজপ্রাসাদ, অশোকের অসংখ্য উৎকৃষ্ট স্তূপ, পাথরের মসৃণ স্তম্ভ এবং বাস গুহাগুলি মৌর্য শিল্পকলার পরিচয়। কলাবিদ্‌রা মনে করেন, প্রস্তর-শিল্প ও শিলালিপির লেখন পদ্ধতিতে পারসীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। মৌর্যযুগে কিছু মুদ্রার নমুনা পাওয়া যায় তাকে 'পাঞ্চ-মার্কড' (Punch-marked) বলা হয়।

পারসীক প্রভাব

[চ] গ্রীক, শক ও পহ্লব জাতির ভারত আক্রমণ (বা ভারতে আগমন) ঃ মৌর্যদের পতনের পর ভারতে যখন একচ্ছত্র সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটে, তখন নানা জাতের বিদেশী শত্রু এদেশে এসে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য স্থাপন করে। [অবশ্য 'বিদেশী' শব্দটি সকল ক্ষেত্রে পুরোপুরি খাটে না। কারণ, অনেক যবন (গ্রীক), শক রাজারা তত দিনে ভারতের ধর্ম সংস্কৃতি গ্রহণ করে অনেকটা ভারতবাসী হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য তাঁরা শত্রুভাবেই আক্রমণ করেছিলেন, সুতরাং শত্রু প্রতিরোধ বললে ভালো মানায়।]

এই সুযোগে যে সব বিদেশী শত্রু আক্রমণ করে, তারা ব্যাকট্রিয়ান গ্রীক, পার্থিয়ান (পারদ) ও সিথিয়ান বা শক। এই সকল বিদেশী জাতির আদি বাসস্থান ছিল ব্যাক্‌ট্রিয়া (বহ্লীক) ও পার্থিয়া (খোরাশান ও কাশ্যপ সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চল)। শকরা থাকত মধ্য এসিয়ায়। সেখান থেকে বিতাড়িত হয়ে তারা 'সিস্তান' বা

বিদেশী জাতির ভারতে আগমন

শকস্থানে বসবাস আরম্ভ করে। এরা সকলেই ভারতের উত্তর-পশ্চিম দ্বার দিয়ে প্রবেশ করে এবং বিভিন্ন জায়গায় রাজ্য স্থাপন করে।

গ্রীক ঃ গ্রীক রাজাদের অনেক সুন্দর সুন্দর মুদ্রা পাওয়া গেছে। তা থেকে আমরা জানতে পারি, প্রথমে ব্যাকট্রিয়ান গ্রীকরাই ভারতের সীমান্ত আক্রমণ করে এবং পাঞ্জাব ও সিন্ধুপ্রদেশ অধিকার করে। দুজন গ্রীক রাজা ভারতের মধ্যে অভিযান করেছিলেন। একজনের নাম ডিমিট্রিয়স। ইনি পাটলিপুত্র পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে সুঙ্গবংশীয় এক রাজাকে পরাস্ত করেন। আর একজনের নাম মিনান্দার। তাঁর রাজধানী ছিল সাকল (বর্তমান সিয়ালকোট)। বৌদ্ধগ্রন্থ থেকে জানা যায়, তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। বিখ্যাত পালি পুস্তক 'মিলিন্দ পণহো'র মিলিন্দই নাকি রাজা মিনান্দার। এই পুস্তকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাথে মিনান্দারের প্রশ্ন ও কথাবার্তা লেখা আছে।

ডিমিট্রিয়স ও মিনান্দার

ভারতীয় ধর্মগ্রহণ

গ্রীকরা ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের সংসর্গে এসে ভারতীয় ধর্ম ও আচার গ্রহণ করতে থাকে। সীমান্ত প্রদেশে গ্রীক-শিল্পীদের তৈরি অনেক বুদ্ধমূর্তি ও বুদ্ধলীলার প্রতিমা পাওয়া গেছে। অনেক গ্রীক রাজা 'ধার্মিক' উপাধি নিয়ে ছিলেন এবং হিলিওদোরস নামে এক গ্রীকদূত পরম বিষ্ণুভক্ত হয়ে এক গরুড়-স্তম্ভ নির্মাণ করেন। বিদিশা বা বেসনগরে ঐ স্তম্ভ ও তার উপর উৎকীর্ণ লিপি আজও বর্তমান আছে কিন্তু গ্রীকদের অধিকার বেশি দিন টিঁকল না। নিজেদের মধ্যে বিবাদের ফলে গ্রীক রাজ্য নষ্ট হয়ে যায়।

শক ঃ শকরা দুই দলে ভারতে প্রবেশ করে এবং একদল উত্তর ভারতে, অপর দল দক্ষিণে রাজ্য স্থাপন করে। উত্তরে শকরা মথুরা তক্ষশীলা কপিশা প্রভৃতি জায়গায় বসবাস করে এবং সেখানকার শক দলপতিরা ক্ষত্রপ ও মহাক্ষত্রপ উপাধি নিয়ে রাজত্ব করেন। তাঁদের অনেক রূপার মুদ্রা ও শাসনলিপি পাওয়া গেছে। কালক্রমে শকরা হিন্দু আচার গ্রহণ করে একেবারে এদেশী হয়ে যায়। অনেকে বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে এবং ভারতীয় নামও নিতে থাকে। শকদের একটি শাখা পশ্চিম ভারতে প্রবল হয়। আর একটি শাখা মালব, গুজরাট ও মহারাষ্ট্রে রাজত্ব স্থাপন করে। কিছুকাল পরে আবার একদল শক চস্টন নামক এক দলপতির অধীনে উজ্জয়িনীতে একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। উজ্জয়িনীর শকরা প্রায় তিনশ' বছর রাজত্ব করেন। ওঁরাও আচার ব্যবহারে ও ধর্মে একেবারে হিন্দু হয়ে পড়েছিলেন। মহাক্ষত্রপ স্বামী রুদ্রদামন ছিলেন এই এই বংশের প্রধান নরপতি। জুনাগড়ে রুদ্রদামনের বিখ্যাত শিলালিপিতে তাঁর পূর্ত কর্মের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি বিদেশী হলেও ধর্মের ও সমাজের রক্ষক ছিলেন। যুদ্ধ ছাড়া অন্য সময়ে কারও প্রাণবধ করতেন না, অন্যায় কর গ্রহণ করতেন না। এই

উত্তর শক

পশ্চিম ভারতের শক বংশ

রুদ্রদামন ঃ জুনাগড় লিপি

শক বংশ হিন্দু ধর্মাবলম্বী ও শিবভক্ত ছিলেন। শকদের সঙ্গে সঙ্গে মুরুণ্ড ও আভীর নামে আরও কয়েকটি জাতি ভারতে এসেছিল।

পহ্লব ঃ উত্তর ভারতের শকদের সঙ্গে পহ্লব বা পারদ জাতিও ভারত সীমান্তে অধিকার স্থাপন করে। এই বংশের রাজাদের মধ্যে খৃস্টীয় প্রথম শতকে **গণ্ডোফারনিস**-এর নাম বিখ্যাত। কাবুল, কান্দাহার ও তক্ষশীলা তাঁর রাজ্যভুক্ত ছিল। অনেকে বলেন, খৃস্টান মহাপুরুষ সেণ্ট টমাস ভারতে খৃস্টধর্ম প্রচার করতে এলে, গণ্ডোফারনিস তাঁর অনুরাগী, পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। কুষানদের শক্তি প্রতিষ্ঠার পর পহ্লবদের শাসন বিলুপ্ত হয়।

পহ্লব বা পার্থিয়ান রাজগণ গণ্ডোফারনিস

[ছ] **দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে অন্ধ্র বা সাতবাহন সাম্রাজ্য ঃ** শক পহ্লব প্রভৃতি যত বিদেশী শত্রু ভারতে প্রবেশ করে, তাদের অনেকেরই সঙ্গে অন্ধ্র বা সাতবাহনদের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ হয়। এই অন্ধ্ররা মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে বিশাল রাজ্য স্থাপন করে। পুরাণের মতে সিমুক নামে এক ব্যক্তি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর শেষভাগে (মতান্তরে খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে) অন্ধ্র বা সাতবাহন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত যখন বিদেশী শত্রুর হস্তগত, অন্ধ্ররাই তখন হিন্দুধর্ম ও সভ্যতার রক্ষাকর্তা হন এবং শক পহ্লব যবন বা গ্রীক প্রভৃতি জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করে তাদের বিতাড়িত করবার চেষ্টা করেন। দক্ষিণ ও মধ্য ভারতে বহুদিন ধরে অন্ধ্রদের আধিপত্য থাকে এবং এই বংশে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি, বশিষ্ঠীপুত্র পুলমায়ী, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি প্রভৃতি অনেক বড় রাজার জন্ম হয়। বিদেশীদের আক্রমণে কিছুকালের জন্য এঁদের প্রভাব ম্লান হয়। কিন্তু খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে **গেতামীপুত্র সাতকর্ণি** সমস্ত শত্রুকে পরাস্ত করেন ও নিজবংশের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করেন। এই রাজা নাসিকের এক শিলালিপিতে নিজেকে 'ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের দর্পচূর্ণকারী' বলে উল্লেখ করেছেন। শকাদি বিদেশীয়দের পরাস্ত করে গৌতমীপুত্র মালব থেকে দক্ষিণে মহীশূর অঞ্চল পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং নিজেকে 'শক-যবন-পহ্লব নিসূদন'-রূপে ঘোষণা করেন। রাজত্বের অষ্টাদশ বর্ষে তিনি দাক্ষিণাত্যের উত্তরবংশ শক ক্ষত্রপ নহপানের অধিকার থেকে দখল করেন। কিন্তু যজ্ঞশ্রীর পর রাজারা তেমন শক্তিশালী ছিলেন না। শকরা তাঁদের হারিয়ে দিয়ে অন্ধ্ররাজ্যের প্রদেশ জয় করে। ক্রমশঃ অন্ধ্র রাজ্যের অধঃপতন শুরু হয় এবং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ স্বাধীন হয়ে পড়ে।

প্রতিষ্ঠাতা সিমুক

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি সাম্রাজ্যের সীমানা

অন্ধ্রদের পতন

সাতবাহন বা অন্ধ্র রাজারা অতিশয় দানশীল ছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই হিন্দু হয়েও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁরা শিক্ষার সমাদর করতেন। সপ্তদশ রাজা হাল নাকি একখানি প্রাকৃত ব্যাকরণ ও 'গাথা সপ্তসতী' নামে কাব্য রচনা করেছিলেন। আর বিখ্যাত কাহিনীকার গুণাঢ্য তাঁর 'বৃহৎ কথা' বই লেখেন অন্ধ্রদের আমলে।

ধর্মানুরাগ, দানশীলতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শাসন

অন্ধ্রদের শাসন কঠোর ছিল না, তাঁরা কখনও অত্যাধিক কর আদায় করতেন না। অন্ধ্র রাজা ও রাণীদের মধ্যে অনেকেই বহু জনহিতকর কাজ করে গেছেন। দুজন অন্ধ্র রাণী নয়নিকা ও বালশ্রীর কীর্তিকথা খোদিত আছে। এখানে দুটি দরকারী কথা জেনে রাখো। অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশে ছিল মাতৃতন্ত্রের প্রচলন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি ও বশিষ্ঠীপুত্র শ্রীপুলমায়ীর নামকরণ থেকে বুঝতে পারবে, মায়ের নামে এঁদের পরিচয়। আর অন্ধ্ররা প্রথমে গোদাবরী থেকে কৃষ্ণা নদীর মধ্য ভাগে প্রভুত্ব করতেন। ঐ অঞ্চলটি মোটামুটি অন্ধ্রদেশ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাতবাহনদের দান বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। পুণা যাবার পথে একটি পাহাড়ের মধ্যে কার্লি গুহা আছে। সেখানে এক অপূর্ব সুন্দর বিশাল ও দীর্ঘ চৈত্যগৃহ আজও বর্তমান।

জনহিতকর কার্য

সংস্কৃতি

[জ] কুষান জাতি ও সাম্রাজ্য ঃ অনুমান হয় যে, খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ইউচি নামে এক জাতি মধ্য এসিয়া থেকে ভারতের দিকে আসতে থাকে। ইউচিরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত হয়, ক্রমে তাদের মধ্যে কুষান শাখা প্রধান হয়ে ওঠে এবং পূর্বদিকে বারাণসী থেকে মধ্য এসিয়া পর্যন্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। কুষানরা প্রথমে অনুন্নত যাযাবর ছিল, পরে ভারতে এসে তারা হিন্দুধর্ম ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে।

কুষাণদের ভারত আক্রমণ

সাম্রাজ্য স্থাপন

প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিস ঃ কুজুল কদফিস বা প্রথম ক্যাড্‌ফিসস্‌ নিজেকে সমগ্র ইউচি জাতির অধিনায়ক বলে ঘোষণা করেন। কাবুল ও পাঞ্জাব জয় করে তিনি একটি বড় সাম্রাজ্য গড়ে তোলেন। তাঁর পুত্র বিম কদফিস উত্তর পশ্চিম ভারতে অনেক অঞ্চল অধিকার করেন। চীন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সংঘর্ষে তিনি নাকি চীন সেনাপতি পঞ্চাও-এর কাছে পরাস্ত হন। কুষানরা শিব উপাসক ছিলেন, কেন না তাঁদের প্রচলিত মুদ্রায় শিব ও কৃষ্ণের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়।

কুজুল কদফিস

বিম কদফিস

কণিষ্ক ঃ কণিষ্ক যে কুষান বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ ও পরাক্রান্ত নরপতি ছিলেন, একথা নিঃশংশয় সত্য। ভিনসেণ্ট স্মিথের মতে দ্বিতীয় কদফিসিসের মৃত্যু হয় ১১০ খৃষ্টাব্দে এবং ১২০ খৃষ্টাব্দে কণিষ্ক সিংহাসনে আরোহণ করেন। মধ্যে দশ বছরের ব্যবধান। তিনি একটি নতুন অব্দের সূচনা করেন কিন্তু তা অজ্ঞাত। অপরাপর পণ্ডিতেরা বলেন কণিষ্কই ৭৮ খৃষ্টাব্দে শকাব্দ প্রচলন করেন। যাহোক, তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিম ভারত জয় করেন এবং পূর্ব-ভারতেরও বহু জায়গা তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয়। কাশ্মীরও তাঁর অধীন ছিল। মধ্য এসিয়ার খোতান, ইয়ারকন্দ এবং কাশগড় প্রদেশেও তিনি জয় করেন। তাঁর সময়ে কুষান সাম্রাজ্য মধ্য এসিয়া থেকে বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

কণিষ্কের সাম্রাজ্য সীমা



কুষাণ সাম্রাজ্য
আনুমানিক
১৫০ খৃঃ পূঃ

কণিষ্কের মুদ্রা ও শাসন লিপি থেকে জানা যায়, গান্ধার, সিন্ধুর নিম্ন উপত্যকা, মথুরা ও বারণাসী তাঁর সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। রাজতরঙ্গিণী থেকে জানা যায়. কাশ্মীর কুষান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ ছিল।

বিজয়-কীর্তি

বৌদ্ধ ও চীনা ইতিহাস গ্রন্থ থেকেও জানতে পারি যে কনিষ্ক পূর্বে মগধ, উত্তরে চীন ও পশ্চিমে পার্থিয়া আক্রমণ করেন। চীনা ঐতিহাসিকদের মত সেনাপতি পঞ্চাও সমকালীন ভারতীয় নৃপতিকে পরাস্ত করেন। তিনি হয় দ্বিতীয় কদফিসিস্, নয় কণিষ্ক। কণিষ্ক চীন সম্রাটকে করদান বন্ধ করেন এবং কাশগড় প্রভৃতি চীনা প্রদেশের শাসনকর্তারা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করেন। চীনা পর্যটক হিউয়েন-সাং বলেছেন কণিষ্ক চীন সম্রাটকে পরাস্ত করে সন্ধির শর্তানুযায়ী এক রাজকুমারকে প্রতিভূস্বরূপ নিজ রাজ্যে নিয়ে আসেন। তাঁর রাজধানী ছিল পুরুষপুর বা বর্তমান পেশোয়ার নগর।

চীনের সহিত সম্পর্ক

রাজধানী পুরুষপুর



কণিষ্কের ভগ্নমূর্তি

এই রাজধানী নানাবিধ অট্টালিকায় ও বৌদ্ধ মন্দিরে পূর্ণ ছিল। সেগুলির অপূর্ব শোভা দেখে বৌদ্ধ তীর্থপথিক ফা-হিয়েন ও মধ্য যুগের মুসলিম পর্যটকগণও বিস্মিত হয়েছিলেন। কণিষ্ক শুধুই শক্তিশালী সমর-নায়ক নন, ধর্ম শিল্প ও সংস্কৃতির পরম অনুরাগী পৃষ্ঠপোষকও বটে। কণিষ্কের খ্যাতি প্রধানতঃ বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর আন্তরিক সমর্থন ও আনুকুল্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর রাজত্বকালে যে বৌদ্ধ মহাসম্মেলন আহূত হয়, তার সভাপতি ছিলেন অনেকের মতে বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুমিত্র, সহাধ্যক্ষ ছিলেন মহাকবি 'অশ্বঘোষ'। 'কুন্দবনে' এই বৌদ্ধ সমিতির অধিবেশন হয়। এখানে নানা বিতর্ক আলোচনার শেষে 'মহাযান' মতের প্রাধান্য স্বীকৃত হলে কণিষ্কের আদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের উপর যে বিরাট টীকা কোষগ্রন্থ রচিত হয়, তা তাম্রফলকে খোদিত করে নবনির্মিত এক বিশাল স্তূপের ভিতরে সযত্নে রক্ষা করা হয়।

বৌদ্ধধর্মের প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা

বৌদ্ধ সঙ্গীতি মহাযান ধর্মের প্রসার

প্রথম জীবনে কণিষ্ক শিবের ও অন্যান্য দেবদেবীর পূজা করতেন, কিন্তু শেষ বয়সে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ জন্মে। তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের ব্যাপারে রীতিমত পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। তিনি পণ্ডিতদের বিশেষ সমাদর করতেন এবং তাঁর সভায় কবি অশ্বঘোষ, চিকিৎসক চরক, 'বুদ্ধচরিত' রচয়িতা নাগার্জুন ও বহু বৌদ্ধ দার্শনিক উপস্থিত থাকতেন বলে প্রসিদ্ধি আছে। বৌদ্ধ ইতিহাসে তার নাম সত্যই চিরস্মরণীয়। 'সাহানসাহ' সম্রাট ও 'দেবপুত্র' ছিল তাঁর উপাধি।

কণিষ্কের পর বাসিষ্ক, হুবিষ্ক, দ্বিতীয় কণিষ্ক ও বাসুদেব প্রভৃতি কুশান রাজারা রাজত্ব করেন। বাসুদেবের রাজত্ব শেষ হবার পর কুষানদের অধোগতি এবং হিন্দু রাজাদের উন্নতি শুরু হয়।

কুষান সভ্যতা ঃ কুষানরা বিদেশী হলেও ক্রমশঃ ভারতীয়দের সঙ্গে মিলে মিশে এদেশের ধর্ম ও ভাব গ্রহণ করেন। এই বিদেশী রাজাদের উৎসাহে ভারতীয় সংস্কৃতির এক বিস্ময়কর বিকাশ হয়। 'মাধ্যমিক সূত্র' লেখক নাগার্জুন ছিলেন মহাযান ধর্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। আর অশ্বঘোষ ছিলেন একাধারে প্রসিদ্ধ কবি নাট্যকার ও দার্শনিক। 'সৌন্দরানন্দ' কাব্য ও 'বুদ্ধচরিত' তাঁরই রচনা। অশ্বঘোষের ন্যায় মহাপণ্ডিত প্রাচীন ভারতে আর কেউ ছিলেন না। মহাযানপন্থী অসঙ্গও কুশান যুগে আবির্ভূত হন। আয়ুর্বেদ-পণ্ডিত চরক ও সুশ্রুত এই সময়ে ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অমূল্য সম্পদ তাঁদের সংহিতা রচনা করেন। এছাড়া জ্যোতিষশাস্ত্রের 'গর্গ-সংহিতা', ধর্মশাস্ত্র, ও স্মৃতিশাস্ত্রের অনেক মূল্যবান গ্রন্থ এই যুগেই রচিত ও সংকলিত হয়। অধিকাংশ বৌদ্ধগ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লেখা হয় বলে এই যুগ 'সংস্কৃত বৌদ্ধ যুগ' নামে পরিচিত। এ যুগের বৌদ্ধ সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের কোঠায় পড়ে।

বিদেশী রাজবংশের ভারতীয়করণ

বহু মণীষীর সমাবেশ

বৌদ্ধ সাহিত্যের বিস্তার

কুষান আমলে পশ্চিম এসিয়ার মারফত গ্রীক ও রোমান সভ্যতার কিছু কিছু প্রভাব ভারতে প্রবেশ করে। গ্রীক দেবতাদের মূর্তির অনুকরণে বৌদ্ধমূর্তি, আর রোমান মুদ্রার অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রার প্রচলন হয়। কণিষ্ক প্রথমে নানা দেবদেবীর উপাসক ছিলেন, পরে বৌদ্ধ ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে ঐ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হন। বুদ্ধের মূর্তি তিনি মুদ্রায় ব্যবহার করতেন। তাঁর নির্দেশে কাশ্মীরে অথবা গান্ধারে শেষ বৌদ্ধ মহাসভার অধিবেশন হয় এবং বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের উপর বিরাট টীকাগ্রন্থ 'অভিধর্ম কোষ' রচিত হয়। পেশোয়ারে তিনি একটি বিরাট চৈত্য ও কাঠের স্তূপ নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে বুদ্ধদেবের অস্থি সযত্নে রক্ষা করেছিলেন।

ধর্মানুগত্য

অভিধর্ম কোষ

মহাযান বৌদ্ধধর্ম ঃ এই সময়ে বৌদ্ধধর্মের ভিতর বেশ পরিবর্তন দেখা দেয়। বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করেন এবং সম্রাট অশোক যে ধর্মের প্রসার করেছিলেন, সেই বৌদ্ধধর্ম এখন ক্রমশঃ বদলে গেল। আগে বৌদ্ধরা বুদ্ধদেবের সরল শিক্ষা, ধর্মনীতি ও নিয়মগুলি পালন করতেন কিন্তু এখন থেকে বুদ্ধ দেবতার আসন পেলেন। বুদ্ধপূজা বা বৌদ্ধমূর্তির পূজা আরম্ভ হল। অন্যান্য দেশের বৌদ্ধরা, বিশেষ করে গ্রীকরা বুদ্ধমূর্তি প্রচলন করেন। কালক্রমে এক জনপ্রিয় বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হল, যার নাম 'মহাযান'। পুরানো বৌদ্ধ মত 'হীনযান' নামে পরিচিত হল। কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ মহাসভায় মহাযান মতই প্রাধান্য লাভ করে। তারপর, বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে ভারতের বাইরে চীন জাপান কোরিয়া প্রভৃতি দেশেও ছড়িয়ে

বহির্ভারতে মহাযানের প্রসার

পড়ল। শোনা যায়, কাশ্যপ মাতঙ্গ নামে এক ভারতীয় সাধু চীনে প্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন।

শিল্প সংস্কৃতির সমন্বয়ঃ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারের ফলে কুষান যুগে শিল্পকলার এক নতুন রূপ দেখা যায়। এই যুগের শ্রেষ্ঠ দান, গান্ধার শিল্পের সৃষ্টি। এই শিল্প ভারতীয় আর গ্রীক-রোমান রীতির এক আশ্চর্য সমন্বয়। ভারত-সীমান্তের অপর পারে যে সব গ্রীক শিল্পী ছিল, তাদের সঙ্গে ভারতীয় শিল্পীদের যে আদান-প্রদান হয়, তার অনেক উৎকৃষ্ট নমুনা আফগানিস্তানে মধ্য এসিয়ায় এবং পৃথিবীর বিখ্যাত যাদুঘরগুলিতে রাখা আছে। তাছাড়া, মথুরা, অমরাবতী, নাগার্জুনী কোন্ডা প্রভৃতি জায়গায় যে সব মূর্তি, গুহা ও চৈত্যঘর আছে, তাদের পাথরের কাজ ও সৌন্দর্য দেখবার মত।

গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পীর ভাব বিনিময়: গান্ধার শিল্প

বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের বাণিজ্য

রোম-ভারত বাণিজ্যঃ এই যুগে রোমের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল, দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে জলপথে আর উত্তর ভারতের সঙ্গে স্থলপথে। ফলে, ভারতে তৈরি অনেক জিনিস রোমান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত পশ্চিম এসিয়ায় ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে চালান যেত। ভারতের পণ্য-বোঝাই জাহাজগুলি তখন লোহিতসাগরের মুখ পর্যন্ত এসে মালপত্র নামিয়ে দিত। **পেরিপ্লাস** নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এই সময়ে এক গ্রীক নাবিক লোহিত সাগরের পূর্ব উপকূল ধরে জলপথে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের অনেক বড় বড় গঞ্জ ও বন্দরের নাম করেছেন। বলেছেন, ভারত থেকে সূক্ষ্ম মসলিন, সাধারণ সুতির কাপড়, হাতির দাঁতের জিনিস, মশলাপাতি, রেশম ও অন্যান্য অনেক মালপত্র বিদেশে রপ্তানি হত। ভারতে যে সব দ্রব্য আমদানি হত তার মধ্যে তামা, টিন, প্রবাল, কাঁচের জিনিস ও রূপার জিনিসই প্রধান। ভারতে প্রস্তুত বিলাসদ্রব্যের চাহিদা রোমে যথেষ্টই ছিল। সেই সূত্রে ভারতে যে প্রচুর রোমান স্বর্ণ চলে যায়, তার জন্য বিখ্যাত লেখক প্লিনি আক্ষেপ করে বলেছেন যে সুগন্ধি ও মূল্যবান বস্তু বা খাদ্যদ্রব্যের জন্য অর্থব্যয় বোঝা যায়, কিন্তু লঙ্কা-মরিচের মতন এমন ঝাঁঝাল এবং অদরকারী জিনিস কেন যে ভারত থেকে এত আমদানি করা হয়, তা বোধগম্য নয়!

রোমের সঙ্গে বাণিজ্য-সম্পর্ক

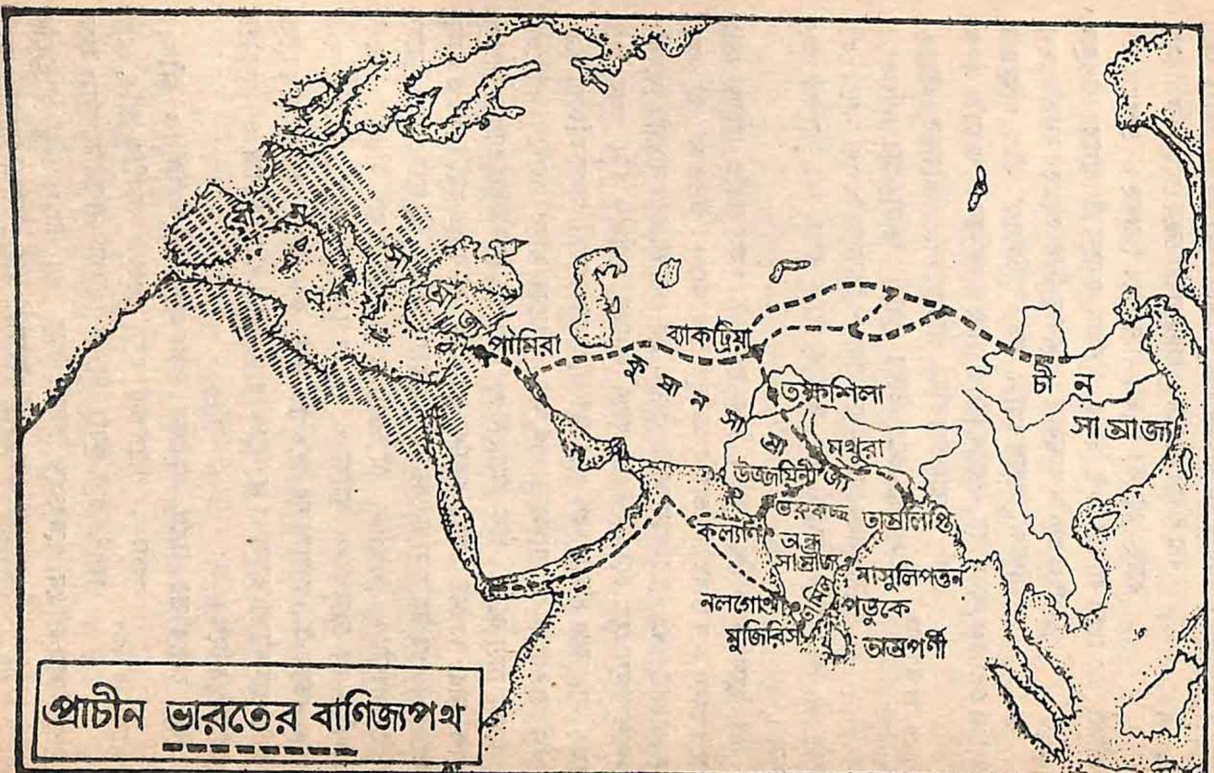
পেরিপ্লাস্

দাক্ষিণাত্যের বন্দর

রপ্তানি ও আমদানি দ্রব্য

চীন থেকে বাণিজ্যের স্থলপথ ভারতের উত্তরে ব্যাকট্রিয়া দেশে এসেছে, এবং সেখান থেকে রোমান সাম্রাজ্যের পূর্বসীমান্তে পালমিরা পর্যন্ত পৌঁছেছে। এটাই বিখ্যাত 'সিল্করুট' বা রেশমের বাণিজ্য পথ। ভারত থেকে একটি উত্তর-পশ্চিমবাহী বাণিজ্যপথ তক্ষশিলা হয়ে বহ্লীক

সিল্ক-রুট



প্রাচীন ভারতের বাণিজ্যপথ

দেশে এসে মিশেছে। পূর্ব-ভারতের তাম্রলিপ্ত থেকে আবার একটি পথ সমগ্র উত্তর-ভারত অতিক্রম করে বর্তমান দিল্লী মথুরা পর্যন্ত এসে আবার দক্ষিণ-পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত নেমে গেছে। উজ্জয়িনীর কাছে এই সব বিভিন্ন বাণিজ্যপথ মিলেছে। সেকালে এই উজ্জয়িনী এক শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল। বর্তমান ক্যাম্বে উপসাগরের উপকূলে ছিল প্রাচীন ভৃগুকচ্ছ। এখান দিয়ে ভারতের যাবতীয় স্থল-বাণিজ্য জলপথে রপ্তানি হত। 'পেরিপ্লস' বইয়ে দাক্ষিণাপথ ও তামিল দেশেরও অনেক বড় বন্দরের উল্লেখ আছে। বর্তমান পণ্ডিচেরীর নিকট একটি রোম-ভারতীয় বাণিজ্যকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। অতএব এই সময়ে উত্তরে কুষান সাম্রাজ্য আর দাক্ষিণাত্যে সাতবাহন রাজ্য থেকে বিদেশে যে ভারতীয় পণ্য চালান যেত, আবার ঐ সব বন্দরে বিদেশী দ্রব্য ভারতে প্রবেশ করত, তার সুস্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে।

ভারতের বিভিন্ন বাণিজ্য পথ

উজ্জয়িনী

পশ্চিম ও পূর্ব উপকূলস্থ বাণিজ্যকেন্দ্র

এই যুগে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল দিয়ে শক যবন পহ্লব প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে প্রবেশ করে ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়ে যায়। ভারতবর্ষ এই সময়ে মধ্য এসিয়ার সঙ্গে প্রথম যোগসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং ভারতের সংস্কৃতি বিদেশীর সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। উত্তরে কুষান সাম্রাজ্য একদিকে চীন অপর দিকে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্পর্শ করে স্থল বাণিজ্যের মধ্যবর্তী আসন অধিকার করে। দক্ষিণে সাতবাহন ও তামিল রাজ্যগুলিও পশ্চিমের সহিত জলপথে বাণিজ্যের যোগাযোগ রক্ষা করে। ধর্মে 'মহাযান'-পন্থার প্রসার, শিল্পকলায় গান্ধার শিল্পের বিকাশ আর সংস্কৃতে লেখা একাধিক বৌদ্ধ ধর্ম এই যুগের ধর্ম, শিল্প ও ভাষা-সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি সূচনা করে। ভারতের ঐতিহ্যে এই যুগের দান বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, ইউরোপের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে রেনেশাঁসের আবির্ভাব হয়, তার আগে মধ্যযুগে যেমন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ঐ নব-জাগরণের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়, তেমনই গুপ্তযুগের ভারতীয় রেনেশাঁসের সূচনা বা পূর্বপ্রস্তুতি এই কুষান যুগের সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যেই নিহিত ছিল।

[ক] মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন :

সমাজ : মৌর্যোত্তর যুগে ভারতে ব্যাকট্রিক গ্রীক, শক, পারদ, হূণ, কুষান প্রভৃতি বিদেশী জাতির আগমনের ফলে ভারতের সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই জাতিগুলি ভারতের অভ্যন্তরে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস, ভারতীয় নারী-বিবাহ ও ভারতীয় ধর্ম গ্রহণ করার ফলে ধীরে ধীরে ভারতীয় জন-সমাজে মিশে যায়। ফলে ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতি জন্ম নেয়। এবং ভারতীয় জাতি পুষ্ট হয়।

বিদেশী জাতির মিশ্রণ

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমন্বয়

বর্ণভেদ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস

দ্বিতীয়তঃ, বর্ণ জাতিভেদ প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় সমাজে বর্ণ বা জাতিভেদ ব্যবস্থার পুনর্বিন্যাস ঘটে। বহিরাগত জাতিগুলির সংস্পর্শে সমাজে যে বিশৃঙ্খলা জন্ম নিয়েছিল তা দূর করার জন্য প্রাচীন শাস্ত্রাদির নতুন ভাষ্য প্রচারিত হয়। বিদেশী রাজারা ক্ষত্রিয় হিসাবে হিন্দুধর্মে স্থান পায়।

নারীর মর্যাদা ও অধিকার হ্রাস

তৃতীয়তঃ, স্মৃতিশাস্ত্রগুলির নতুন ব্যাখ্যা ও বিধানে নারীর অধিকার ও মর্যাদা ক্ষুন্ন হয় এবং বাল্য-বিবাহের প্রচলন হয়। পুরুষের একাধিক বিবাহ স্বীকৃতি লাভ করে। নারীর শিক্ষা অর্জনের ক্ষেত্রেও বহু বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়।

সমাজে বণিকশ্রেণীর প্রতিপত্তি

চতুর্থতঃ, মৌর্যোত্তর যুগে ভারতের সঙ্গে পশ্চিম এসিয়া ও আফ্রিকার সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। এই বাণিজ্যে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। বাণিজ্যের কল্যাণে বণিক-সমাজ বিত্তশালী হয়ে ওঠে এবং সমাজে তাদের প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন নগর গড়ে ওঠে এবং সমাজে নগর-জীবনের প্রভাব পড়ে।

কৃষি

অর্থনীতি ঃ মৌর্যোত্তর যুগে ভারতীর অর্থনীতির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। শক ও কুষান যুগে রাজারা কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচ ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের শিলালিপি থেকে জানা গেছে যে তিনি মৌর্য যুগে নির্মিত সুদর্শন হ্রদের বাঁধ সংস্কার করেছিলেন। কুশান যুগে জলসেচের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল। এ যুগের ভূমি-রাজস্ব সম্ভবতঃ মৌর্য-রীতি অনুসরণ করেছিল।

চীন, রোম

সামুদ্রিক বাণিজ্য

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য ঃ মৌর্যোত্তর যুগে, বিশেষভাবে কুষান যুগে ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। (বিস্তারিত বিবরণ কুষানযুগে 'বহির্বিশ্বের সাথে ভারতের বাণিজ্য' শীর্ষক আলোচনায় দেওয়া আছে)। উত্তরে কুষান সাম্রাজ্য একদিকে চীন অপরদিকে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্পর্শ করে এসিয়ার স্থলবাণিজ্যের মধ্যবর্তী আসন অধিকার করে। দক্ষিণে সাতবাহন ও তামিল রাজ্যগুলিও পশ্চিমের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যের যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

ভৃগুকচ্ছ

পশ্চিম ভারতে শক ক্ষত্রপগণ সিন্ধু বন্দর দখল করে নেবার পর কচ্ছের ভৃগুকচ্ছ বন্দরের শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকে। এই বন্দরে পশ্চিম এসিয়া ও আলেকজান্দ্রিয়া থেকে জাহাজ আসত। ঐ সময় চীনের রেশম ভৃগুকচ্ছ বন্দর থেকে রপ্তানি হতে শুরু করে। 'পেরিপ্লস্ অব্ দি ইরিথ্রিয়ান সী' নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে এই বন্দরের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল ক্ষহরত শক ক্ষত্রপদের হাতে।

ভারতের আভ্যন্তরীন বাণিজ্যও শক কুষান যুগে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। সেযুগের বিখ্যাত বাণিজ্য কেন্দ্র গুলির মধ্যে তক্ষশীলা, পেশোয়ার, বারাণসী ও পাটালি পুত্র, বিশেষ ভাবে উল্লেখ যোগ্য।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

সাতবাহনযুগে দাক্ষিণাত্যে যে বাণিজ্যিক বিকাশ শুরু হয়েছিল, কুষান যুগে তা অক্ষুন্ন থাকে। পণ্ডিচেরীর নিকটে রোমান বাণিজ্যকেন্দ্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এযুগে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলি বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

দাক্ষিণাত্য

শক, কুষান যুগে বাণিজ্যের উন্নতির ফলে সমাজে ধণী বণিক শ্রেণীর উদ্ভব হয় এবং সমাজে ধনবন্টনে সমতা নষ্ট হয়। স্থানীয় পরিষদ গুলিতে বণিক শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

বণিক শ্রেণী

শিল্প ঃ এযুগে বাণিজ্য-বিস্তারের সঙ্গে বিভিন্ন শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে। কাঁচা মাল, দক্ষ ও বিভিন্ন কারিগর যে অঞ্চলগুলিতে পর্যাপ্ত ছিল সাধারণতঃ সেইসব অঞ্চলেই শিল্প সংগঠনগুলি গড়ে উঠেছিল। সুতাকারখানায় মহিলা শ্রমিকও নিযুক্ত হত। এযুগে নানা রকমের কার্পাসের চাষ হত। দেশের বিভিন্ন কলকারখানায় ব্যবহারের জন্য মগধ থেকে পর্যাপ্ত পরিমানে লৌহ আমদানি করা হ'ত। এযুগে যে শিল্পগুলির বিশেষ প্রসার ঘটেছিল সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল মৃৎ-শিল্প, ধাতু-শিল্প, ও কাষ্ঠ শিল্প।

শিল্প

শিল্পের উন্নতির ফলে এ যুগে বহু বাণিজ্যিক সংস্থা বা নিগম (guilds) গড়ে উঠেছিল। এই সব স্থানগুলির উদ্দেশ্য ছিল শিল্পী ও ক্রেতাদের স্বার্থ রক্ষা করা। যে সকল শিল্পী ও কারিগর এই নিগম গুলির সদস্য হত তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেত।

নিগম

শিল্পীদের নিগম ছাড়াও এ যুগে বহু শ্রমিক সমবায় গড়ে ওঠে। স্থাপত্য-সংক্রান্ত সমবায় গুলি শহরের ঘর বাড়ী বা মঠ-মন্দির নির্মানের দায়িত্ব লাভ করত।

সমবায়

বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি বণিক বা অর্থসরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবেও ভূমিকা পালন করত। মৌর্যত্তর যুগে মুদ্রার প্রচলন বেড়ে যায়। সেই সঙ্গে মহাজনী বা সুদের কারবারও প্রসার লাভ করে। খৃষ্টীয় প্রথম পাঁচ শতকের অর্থনৈতিক জীবনের চিত্র বহু শিলালিপিতে প্রতিফলিত হয়েছে। জানা গেছে, ঐযুগে পূর্বে তমলুক থেকে পশ্চিমে উজ্জয়িনী এবং উত্তর দিকে তক্ষশীলা পর্যন্ত, বাণিজ্য পথ আবার উজ্জয়িনী থেকে পশ্চিমদিকে গুজরাট বন্দরগুলি এবং সৌরাষ্ট্র প্রদেশের বন্দর ও নগরগুলি বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। ঐ অঞ্চলের মন্দিরগুলির প্রতিপত্তিশালী পুরোহিত-শ্রেণী, বণিক শ্রেণীর ভূমিকা পালন করত। মন্দিরগুলি হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক মূলধনের কোষাগার। পুরোহিতশ্রেণী ছোট ছোট কারিগর ও শিল্পীদের ঋণ

ব্যাঙ্কিং ও মুদ্রাব্যবস্থা

সরবরাহ করত এবং লাভের সিংহভাগ তাদের কাছে চলে যেত। গ্রামীণ কৃষকও পুরোহিতশ্রেণীর কাছে ঋণী হয়ে পড়ত। সেযুগে রোমান মুদ্রার অনুকরণে ভারতে মুদ্রা তৈরি করা হ'ত। দক্ষিণ ভারতে রোমের স্বর্ণ মুদ্রা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। পণ্ডিচেরীর কাছে রোমান স্বর্ণ মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।

ভারতীয় জনসমাজে বিদেশী উপাদান ও বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ও মৌর্য শিল্প অন্যত্র আলোচিত হয়েছে।

খৃষ্টীয় প্রথম দুই বা তিন শতকের যুগ বৈশিষ্ট্য ঃ খৃষ্টীয় প্রথম দুই বা তিন শতকের ঐতিহাসিক গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে প্রথমত মনে রাখতে হবে, গুপ্ত আমলে ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতি, বহির্বাণিজ্য ও উপনিবেশ-বিস্তারের সুনিশ্চিত পূর্বাভাস এই যুগে ছিল। দ্বিতীয়তঃ এই যুগে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ধরে আগত শক যবন পহলব প্রভৃতি বিদেশী জাতি ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতীয় সভ্যতার অঙ্গীভূত হয়। এই বৈদেশিক সমাগমে কুষানদের বিদগ্ধ স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত। তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষ এই সময়ে মধ্য এসিয়ার সঙ্গে প্রথম যোগসূত্রে আবদ্ধ হয় এবং ভারতীয় সংস্কৃতি বিদেশীর সংস্পর্শে বিচিত্র ও সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। বিশাল কুষান সাম্রাজ্যের অধিকাংশ ছিল ভারতের বাইরে অর্থাৎ অক্ষু নদী থেকে মধ্য এসিয়ার পশ্চিম ভাগে। চতুর্থতঃ, উত্তরে কুষান সাম্রাজ্য একদিকে চীন অপরদিকে রোমান সাম্রাজ্যের সীমান্ত স্পর্শ করে এসিয়ার স্থল-বাণিজ্যের মধ্যবর্তী আসন অধিকার করে। দক্ষিণে সাতবাহন ও তামিল রাজ্যগুলিও পশ্চিমের সঙ্গে জলপথে বাণিজ্যের যোগাযোগ রক্ষা করে চলে।

এছাড়া ধর্মে 'মহাযান'-পন্থার প্রসার, শিল্পকলায় গান্ধার শিল্পের বিকাশ আর সংস্কৃতে রচিত একাধিক বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ এই যুগের ধর্ম শিল্প ও ভাষা-সাহিত্যের উন্নতি সূচনা করে। ভারতের ঐতিহ্যে এই যুগের দান বিশেষ ভাবেই স্মরণীয়। আধুনিক পণ্ডিতরা বলেন, য়ুরোপের ইতিহাসে পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে রেনেশাঁস-এর আবির্ভাব হয়, তার আগে মধ্যযুগে যেমন দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে ঐ নব জাগরণের সূত্রপাত লক্ষ্য করা যায়, তেমনই গুপ্তযুগের ভারতীয় রেনেসাঁসের সূচনা বা পূর্বপ্রস্তুতি এই কুষান যুগের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যেই নিহিত আছে।

[ঞ] গুপ্ত সাম্রাজ্য

কুষানদের পতনের পর উত্তর ভারতে ছোট বড় অনেকগুলি রাজবংশের সৃষ্টি হয়। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতকের শুরুতে নাগবংশীয় শৈব রাজারা মথুরায় আর গুপ্ত বংশীয় রাজারা উত্তর পূর্ব ভারতে ক্ষমতাশালী হন। মধ্যভারতেও বাকাটক নামে এক রাজবংশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। পশ্চিম ভারতে উজ্জয়িনীর শকবংশ অনেক দিন রাজত্ব করে, আর পাঞ্জাব ও রাজস্থান অঞ্চলে মদ্রক, যৌধেয় এবং মালবরা শক্তিশালী হয়। কালক্রমে গুপ্ত সম্রাটরা এদের দমন করে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হন। কিন্তু মৌর্যযুগের, মত সমগ্র ভারতে তাঁদের আধিপত্য স্থাপিত হয় নি।


কাশ্মীর
পুরুষপুর
কর্তৃপুর
যৌধেয়
তিব্বত
ইন্দ্রপ্রস্থ
অর্জুনায়ন
কনৌজ
কামরূপ
বৈশালী
পুণ্ড্রবর্ধন
পাটলিপুত্র
মালব
আভীর
প্রয়াগ
কাশী
চম্পা
উজ্জয়িনী
বুদ্ধগয়া
কর্ণ-সুবর্ণ
সাঁচি
সমতট
সুরাষ্ট্র
ভরুকচ্ছ
নর্মদা নং
তাম্রলিপ্তি
মহাকোশল
মহানদী
তাপ্তী নং
সুর্পারক
বাকাটক
কোট্টুর
গোদাবরী নং
পল্লব
কাঞ্চী
চোল
পাণ্ড্য
সিংহল
গুপ্ত সাম্রাজ্য
(চতুর্থ শতাব্দী)
দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়
আনুমানিক সীমান্ত
সমুদ্রগুপ্তের দক্ষিণ
অভিযান

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩২০-৩৩০ খৃঃ অঃ) গুপ্ত বংশের আদিপুরুষ মহারাজগুপ্ত এবং তাঁর পরে ঘটোৎকচ মগধের মধ্যে সামান্য একটি রাজ্যের ভূস্বামী ছিলেন। তৃতীয় রাজা প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকেই গুপ্তরাজ্য বিস্তৃত হয়। বৈশালীর শক্তিশালী লিচ্ছবি বংশের মেয়ে কুমারদেবীকে বিবাহ করলে তাঁর প্রতিপত্তি বেড়ে যায়। প্রয়াগ, সাকেত (অযোধ্যা) এবং মগধ, এই জনপদগুলি তাঁর রাজ্যভূক্ত ছিল। পন্ডিতরা বলেন, ৩২০ খৃষ্টাব্দে তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি নিয়ে সিংহাসনে বসলে গুপ্তাব্দের প্রচলন হয় ও পাটলিপুত্রে আবার রাজধানী স্থাপিত হয়।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩০-৩৭৫ খৃঃ অঃ) প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সব চেয়ে যোগ্য পুত্র সমুদ্রগুপ্তকে পরবর্তী রাজা বলে মনোনীত করেন। লিচ্ছবি-দৌহিত্র সমুদ্রগুপ্ত শুধুই বড় বীর বা যোদ্ধা ছিলেন না, রাজনীতিজ্ঞ সম্রাটও ছিলেন। তাঁর মত সর্ববিষয়ে পারদর্শী ও প্রতিভাশালী রাজা খুব কমই দেখতে পাওয়া যায়। সমুদ্রগুপ্তকে 'ভারতের 'নেপোলিয়ন' বলা হয়।

ভারতীয় নেপোলিয়ন

দিগ্‌বিজয় ঃ এই রাজার রাজত্বকালের ইতিহাস এলাহাবাদ স্তম্ভের উপর কবি হরিষেণ রচিত 'প্রশস্তি', অশ্বমেধ যজ্ঞের পদক এবং বিভিন্ন ধরনের মুদ্রা থেকে পাওয়া গেছে। সমুদ্রগুপ্তের বিজয়বৃত্তান্ত ঐতিহাসিক ঘটনা। এই স্তম্ভলিপিতে আমরা তাঁর রাজ্যজয়ের একটি ধারাবাহিক বর্ণনা পাই। আর্যাবর্তে রাষ্ট্রীয় ঐক্য স্থাপনের চেষ্টায় তিনি উত্তর ভারতের রাজবংশগুলির উচ্ছেদ 'সর্বরাজোচ্ছেত্তা' সাধন করে সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায়ও প্রভূত্ব স্থাপন করেন। মধ্য ভারতের অটবী রাজ্য এবং দভল দেশও তিনি জয় করেছিলেন। এইভাবে হিমালয় থেকে নর্মদা এবং ব্রহ্মপুত্র থেকে যমুনা ও চম্বল নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তাঁর প্রত্যক্ষ অধিকারভূক্ত ছিল। সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা দেশ), কামরূপ ও নেপাল, পাঞ্জাব-মালবের অর্জুনায়ন, আয়ুধেয়, মদ্রক আভীর প্রভৃতি গণতন্ত্র রাষ্ট্রগুলি আর মধ্য ও পশ্চিম ভারতের অনেক রাজ্য তাঁর আধিপত্য মেনে নেয়। উত্তর ভারতের রুদ্রদেব, নাগদত্ত গণপতিনাগ, নাগসেন, অচ্যুত নন্দী এবং পশ্চিমবঙ্গের পরাক্রান্ত রাজা চন্দ্রবর্মাও প্রচন্ডশাসন সমুদ্রগুপ্তের কাছে হার স্বীকার করেন।

উত্তরাপথ বিজয়
প্রত্যক্ষ অধিকার

বিজিত রাজাগণ

দাক্ষিণাত্য অভিযান ঃ যদিও এলাহাবাদ 'প্রশস্তি'তে দক্ষিণ ভারতের বিজিত অনেক রাজ্য ও রাজাদের নাম পাওয়া যায়, তবুও এ কথা বলা যায় না যে দাক্ষিণাত্যে সমুদ্রগুপ্তের সম্পূর্ণ আধিপত্য ছিল। দাক্ষিণাত্যের কিছু অংশ তিনি জয় করেন, কিন্তু সম্রাট রাজ্যগুলি স্থানীয় রাজাদের ফিরিয়ে দেন এবং তাঁদের আনুগত্য ও উপহারেই সন্তুষ্ট থাকেন। তার কারণ, যে সব দূর রাজ্য শাসন ও রক্ষা করা কঠিন, সেগুলি মর্যাদার সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়াই সঙ্গত। দাক্ষিণাত্য অভিযানে যে সব রাজা সমুদ্রগুপ্তের সম্মুখীন হন তাঁদের নাম কোশলরাজ মহেন্দ্র, মহাকান্তারের রাজা ব্যাঘ্ররাজ, পিষ্টপুরের রাজা

দাক্ষিণাত্যে বিজয়নীতি

দাক্ষিণাত্যের পরাস্ত
নৃপতি দল

মহেন্দ্রগিরি, বেঙ্গির রাজা হস্তিবর্মা এবং কাঞ্চীর রাজা বিষ্ণুগোপ। এই দাক্ষিণাত্য অভিযান সমুদ্রগুপ্তের উচ্চ আশা এবং সাহসেরই পরিচয়। তবে এর কোনও স্থায়ী ফল হয় নি। পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ তাঁর কাছে হেরে যান কি না, তা নিশ্চিত বলা যায় না।

অশ্বমেধ যজ্ঞ

গান্ধার ও কাবুল

মালব ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলের শক রাজগণ

'দিগ্‌বিজয়ের' পর সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন এবং সেই উপলক্ষে নতুন সুবর্ণ মুদ্রা প্রচলন করেন। আর্যাবর্তের বিভিন্ন রাজ্য ছাড়া প্রত্যন্ত দেশের রাজারাও সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করেন। আবার **গান্ধার ও কাবুলের** কুষান নরপতি, 'দৈবপুত্র-সাহী-সাহানুসাহী' আর **মালব ও সৌরাষ্ট্র** অঞ্চলের শক রাজারাও বশ্যতা স্বীকার করে সম্রাটকে নানা উপহার দিয়ে সন্তুষ্ট করেন। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ তীর্থপথিকদের জন্য একটি বিহার নির্মাণের অনুমতি চাইলে, সম্রাট সে প্রার্থনা পূর্ণ করেন। হিউয়েন সাঙও সিংহলরাজের মূল্যবান উপহার পাঠানোর কথা উল্লেখ করেছেন। ভারত মহাসাগরের আরও কয়েকটি দ্বীপ থেকে নাকি সমুদ্রগুপ্তের কাছে ভেট এসেছিল। এই সব ঘটনা থেকে মনে হয়, দূরদেশের রাজারা তাঁকে প্রণাম জানিয়ে, কর বা উপহার পাঠিয়ে তাঁকে সন্তুষ্ট রেখেছিলেন।

সিংহলরাজ মেঘবর্ণ

বিভিন্ন দেশের উপঢৌকন

মুদ্রাঙ্কিত মূর্তি

সঙ্গীত ও কাব্যানুরাগ, বিদ্যোৎসাহিতা

সমুদ্রগুপ্ত পরম হিন্দু ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হলেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি অবহেলা দেখাননি। ধনুর্ধর, পরশুধারী ও ব্যাঘ্র-হন্তা, এই তিন ধরনের মূর্তি তাঁর বিভিন্ন মুদ্রায় ছাপা দেখে মনে হয় তাঁর বীরবিক্রম ও রণনৈপুণ্য অসামান্য ছিল। এক রকমের মুদ্রায় তাঁর বীণা-বাদনরত মূর্তি থেকে তাঁর সঙ্গীতজ্ঞানের পরিচয় প্রমাণিত হয়। তিনি স্বয়ং বিদ্বান ও পণ্ডিতদের গুণ-গ্রাহী ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সভাকবি হরিষেণ সম্রাটের অশেষ গুণাবলীর বহু প্রশংসা করেছেন তা একেবারে অমূলক নয়। কেউ কেউ বলেছেন, সমুদ্রগুপ্তের কীর্তিকথা বাড়িয়ে বলা হয়। কিন্তু মগধে আবার এক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ধর্ম সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসার আর নিজের শৌর্যবীর্য— এ সব কৃতিত্ব নিশ্চয়ই তাঁর বিচিত্র প্রতিভার স্বাক্ষর। উত্তর ভারতের রাষ্ট্র সংহতি নির্মাণ সমুদ্রগুপ্তের বহুমুখী পরাক্রমের একটি প্রকাশ্য রূপ মাত্র। সমুদ্রগুপ্ত নামের সঙ্গে 'পরাক্রমাঙ্ক' উপাধির সংযোগ তাই অর্থপূর্ণ এবং খুবই সঙ্গত মনে হয়।

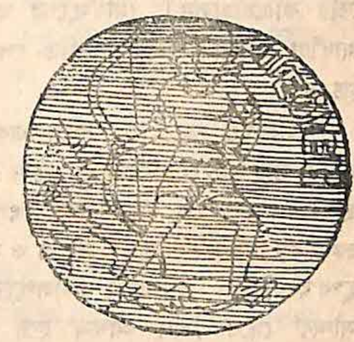


মুদ্রায় বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্ত

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (৩৭৬-৪১৪ খৃষ্টাব্দ) ঃ সমুদ্রগুপ্তের পর রামগুপ্ত নাকি রাজা হন। কিন্তু এর কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। অনেকের মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই পিতার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন। এবং তাঁর মতই বীর ও বিদ্বান ছিলেন। উত্তর ভারতে চন্দ্রগুপ্তের অনেক সোনা রূপা ও তামার মুদ্রা পাওয়া গেছে, যার ওপর সম্রাটের তীরন্দাজ, অশ্বারোহী, সিংহ-নিধনকারী প্রভৃতি মূর্তি দেখা যায়। যাই হোক, সিংহাসনে বসে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতার খ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখেন। যে

শকদের উচ্ছেদ ও ইহার ঐতিহাসিক গুরুত্ব

শক রাজারা পশ্চিম ভারতে প্রায় তিন শ'বছর রাজত্ব করেন, তিনি তাদের উচ্ছেদ করেন। এই জন্য তাঁকে মালব দেশে বেশ কিছুকাল থাকতে হয়েছিল। শকদের পরাস্ত করে তিনি **'শকারি'** ও **'বিক্রমাদিত্য'** উপাধি নেন। এর ফলে মালব সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চল তাঁর রাজ্যভুক্ত হল। পশ্চিম উপকূলের বড় বন্দরগুলি গুপ্তদের অধিকারে নিয়ে আসা বিশেষ প্রয়োজন ছিল। পাশ্চাত্ত্য দেশের সঙ্গে বাণিজের পথে দেশের সমৃদ্ধি আরও বাড়ল। শকদের বিরুদ্ধে এই দীর্ঘ যুদ্ধের মূল কারণ ছিল তাই, এটা মনে রেখো।



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় 'বিক্রমাদিত্য' ও 'সিংহবিক্রম' এই দুটি উপাধিরও উল্লেখ আছে। তাই পণ্ডিতরা মনে করেন, তিনিই হলেন সেই প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্য যাঁর দুটি রাজধানী ছিল, পাটলিপুত্র ও উজ্জয়িনী। ভারতবর্ষে বিক্রমাদিত্যকে নিয়ে অনেক অলৌকিক গল্প আছে। তিনি গুণী ও বিদ্বান ব্যক্তিদের খুব সমাদর করতেন। তাঁর সভায় নাকি নয়জন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন, তাঁদের বলা হত 'নবরত্ন'। শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন মহাকবি কালিদাস যাঁর কবি-প্রতিভা সারা পৃথিবীতে পরিচিত। বাকি আটজনের নাম হল বরাহমিহির, বররুচি, ঘটকর্পর, বেতালভট্ট, অমরসিংহ, ক্ষপণক, শঙ্কু ও ধন্বন্তরি। সম্রাটের দুই মহিষী ছিলেন, ধ্রুবদেবী আর কুবেরনাগা। দ্বিতীয় পত্নীর কন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে বিদর্ভের বাকাটক রাজা রুদ্রসেনের বিবাহ দিয়ে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত তাঁর সাম্রাজ্যকে আরও দৃঢ় ও নিরাপদ করেন। তাঁরই আমলে গুপ্ত সাম্রাজ্য গৌরবের চরম শিখরে পৌঁছেছিল। তাঁরই রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামে এক বৌদ্ধ তীর্থপথিক চীন থেকে ভারতে আসেন।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য

নবরত্ন

ফা-হিয়েন (৩৯৯-৪১৪ খৃঃ অঃ) ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ফা-হিয়েন নামে এক চীনা পর্যটক ভারতে এসে এদেশে কয়েক বছর বাস করেন এবং নানা জায়গায় ঘুরে অনেক জিনিস লক্ষ্য করে একটি সুন্দর বিবরণ লিখে গেছেন।

তা থেকে আমরা অনেক কথা জানতে পারি। যদিও ফা-হিয়েন রাজার নামোল্লেখ করেননি, তবু উভয়ের সাল-তারিখ একই সময়ের মধ্যে পড়ে। ফা-হিয়েন চীন দেশ থেকে স্থলপথে ভারতে আসেন আর সমুদ্রপথে দেশে ফিরে যান। ফা-হিয়েন বলেন, এই সময়ে রাজ্যের অবস্থা খুবই ভাল ছিল। খাসমহল জমি থেকে রাজার প্রচুর আয় হত। তবে সেকালে খাজনার চাপ ছিল কম, জিনিসপত্রও ছিল সস্তা। তাই প্রজারা সুখে ও শান্তিতে বাস করত। সুশাসনের ফলে রাজপথে চোর-ডাকাতের উপদ্রব ছিল না। প্রজাদের উপকারের জন্য রাজা দানশালা ও ধর্মশালা তৈরি করিয়েছিলেন। মৌর্যযুগের মত আইন ও শাস্তি অত কঠোর ছিল না। দোষীরা জরিমানা দিয়ে নিষ্কৃতি পেত, প্রাণদণ্ড কিংবা হাত পা কেটে দেওয়া হত না।

পাটলিপুত্র শহরে সে সময়ে একটি প্রকাণ্ড হাসপাতাল ছিল, শহরের ধনী ব্যক্তিরা তার খরচ যোগাতেন। দেশের নানা স্থানে অনেক দেবমন্দির ও বৌদ্ধ মঠ ছিল। রাজধানীতে এক বিরাট উৎসব হত, সে সময়ে রথে বসানো দেবতাদের একটি বড় মিছিল বেরুত। মথুরা ও মগধ, এই দুটি জায়গার ঐশ্বর্য ফা-হিয়েনকে মুগ্ধ করেছিল। রাজধানী পাটলিপুত্রে মৌর্যদের পুরানো প্রাসাদের শোভা ও সৌন্দর্য দেখে তিনি আশ্চর্য হয়ে যান। মগধ ও বাঙলা-দেশেও ফা-হিয়েন অনেকদিন ছিলেন তাই এখানকার সমাজ ধর্ম আচার-ব্যবহার তিনি ভালভাবেই নজর করেছিলেন। তিনি বলেছেন, পশুবধ কেবল চণ্ডাল বা নীচ জাতিরাই করে, তবে তারা নগরের ভিতরে আসে না, বাইরেই থাকে। শহরে ঢুকবার সময়ে তারা কাঠি বাজিয়ে শব্দ করে যাতে লোক সরে যায়। ভারতের লোক তখন জাহাজে করে সমুদ্রপারে দূরদেশে যেত। বাঙলায় তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক, সমুদ্র এখন অনেক দূরে সরে গেছে), সেকালের একটি বিখ্যাত বন্দর ও শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। এখান থেকে বণিকেরা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে সিংহল ব্রহ্মদেশ মালয় কম্বোজ প্রভৃতি দেশে বাণিজ্য করতে যেতেন। ফা-হিয়েন এই বন্দর থেকেই হিন্দু নাবিকদের জাহাজে চড়ে জলপথে সিংহল ও যবদ্বীপ ঘুরে চীনে ফিরে যান। যবদ্বীপে পৌঁছতে তাঁর তিন মাস সময় লেগেছিল।

ধর্ম সাহিত্য ও শিল্পকলা সম্বন্ধে ফা-হিয়েন যে সব কথা লিখেছেন, সেগুলি অতি মূল্যবান। তখন ভারতে হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রসার। হিন্দুরা ভক্তিভাবে অনেক দেবতার আরাধনা করত। বৈশালী গয়া প্রভৃতি বৌদ্ধ শহরগুলি তখন জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল, তবে বৌদ্ধধর্ম একেবারে নষ্ট হয়নি। ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে এবং সীমান্তের বাইরে বৌদ্ধধর্মের প্রসার কমেনি। রাজারা হিন্দু, কিন্তু অসহিষ্ণু নন। হিন্দু ও বৌদ্ধ পাশাপাশি বাস করে, কিন্তু পরস্পরের ধর্মকে নিন্দা করে না। ফা-হিয়েন বলেছেন, এদেশের মানুষেরা ধার্মিক ও ভদ্র এবং অহিংস-ধর্ম পালন করে। তারা সকল জায়গায় ইচ্ছামত ঘোরাফেরা করতে পারে ; ছাড়পত্রের দরকার হয় না, আইনেরও কড়াকড়ি নেই।

গোবি মরুভূমি পার হয়ে মহাযান ধর্মমতের কেন্দ্র খোটান থেকে শুরু করে উদয়ন গান্ধার তক্ষশিলা পুরুষপুর মথুরা কান্যকুব্জ কোশল শ্রাবস্তী কপিলাবস্তু বৈশালী পাটলিপুত্র রাজগৃহ এবং তাম্রলিপ্তের দীর্ঘ যাত্রাপথে ফা-হিয়েন প্রায় পনের বছর ভারতে ভ্রমণ করেন। তার মধ্যে তিনি রাজধানী পাটলিপুত্রে তিন বছর আর তাম্রলিপ্ত শহরে দু বছর ছিলেন। তাঁর বিবরণীতে ধর্মভাবের চেয়ে কৌতূহলী দৃষ্টি ও সজাগ মনের পরিচয়ই বেশি।

প্রথম কুমারগুপ্ত (৪১৪-৪৫৫ খৃঃ অঃ) ঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁর পুত্র প্রথম কুমারগুপ্ত 'মহেন্দ্রাদিত্য' সিংহাসনে বসেন। তাঁর সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্যের গৌরব ও সমৃদ্ধি নষ্ট হয়নি, কেবল তাঁর দীর্ঘ রাজত্বের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের শান্তি ক্ষুণ্ণ হয়। মধ্য ভারত থেকে দুর্ধর্ষ পুষ্যমিত্রদল আক্রমণ করলে বীর যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত তাদের হারিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ দূর করেন। কুমারগুপ্তের পট্টমহিষীর নাম অনন্তদেবী। তাঁর আর এক মহিষী ছিলেন দৈবকী, তিনি স্কন্দগুপ্তের জননী। কুমারগুপ্তের শাসনকাল মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ছিল। শুধু একটি যুদ্ধ অভিযান হয়েছিল। তিনিও সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন, তাঁর অনেক সোনা ও রুপার মুদ্রা পাওয়া গেছে। কোনটিতে ময়ূরবাহন কার্তিক, কোনটিতে গরুড়, কয়েকটিতে রাজার আকৃতি আর একটি বিশেষ ধরনের মুদ্রায় দুই রাণীর মূর্তি দেখা যায়। কুমারগুপ্তের সময় সাহিত্য ও শিল্পকলার যথেষ্ট চর্চা ও প্রসার ছিল। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে এটাই গুপ্ত গৌরবের শীর্ষস্থান।

পুষ্যমিত্রদের আক্রমণ

শান্তি ও সমৃদ্ধি

অশ্বমেধ যজ্ঞ, মুদ্রা

গুপ্তযুগের তুঙ্গ স্থান

স্কন্দগুপ্ত (৪৫৫-৪৬৭ খৃঃ অঃ) ঃ কুমারগুপ্তের পর স্কন্দগুপ্ত প্রথামত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন। পণ্ডিতরা অনুমান করেন, তাঁর সিংহাসন প্রাপ্তি নির্বিঘ্নে হয়নি। হূণদের বিরুদ্ধে তিনি যখন ঘোর সংগ্রামে ব্যস্ত, তখন তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই পুরগুপ্ত পিতার মৃত্যুর পরেই সিংহাসনে বসেন। বিজয়-অভিযান থেকে ফিরে স্কন্দগুপ্ত ভাইকে রাজ্যচ্যুত করেন। তাঁর রাজত্বকাল শান্তিপূর্ণ ছিল না। যুবরাজ অবস্থায় তিনি একবার দুর্ধর্ষ পুষ্যমিত্রদের তাড়িয়েছিলেন, রাজা হয়ে আবার তাঁকে ঘোরতর বিপদের সম্মুখীন হতে হল। কিন্তু এবারেও তিনি বীরবিক্রমে হূণ শত্রুদের পরাস্ত করেন। সুখের বিষয় হূণরা তাঁর জীবিতকালে আর গুপ্ত সাম্রাজ্যে হানা দিতে পারেনি। স্কন্দগুপ্ত এই কারণেই ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। তাঁর রাজত্বকালের আর একটি বিশিষ্ট ঘটনার কথা এখানে বলছি যা তোমাদের জানা উচিত। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য গিরনার পাহাড়ের উপরে যে সুদর্শন হ্রদ তৈরি করান, পৌত্র অশোক তার সংস্কার করিয়েছিলেন। অনেক কাল পরে ঐ হ্রদের বাঁধ ভেঙে গেলে শক রাজা রুদ্রদামন সেটি মেরামত করিয়ে দেন। এখন স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের প্রথম বছরে অতিবৃষ্টির ফলে ঐ বাঁধ

গৃহবিবাদ ও অশান্তি

হূণ আক্রমণ

পূর্তকর্ম

ভেঙে যায়। তখন সম্রাটের নির্দেশে তাঁর রাজ্যপাল পর্ণদত্ত ও তাঁর ছেলে চক্রপালিত সেটি ভালভাবে সংস্কার করেন। এখন বুঝতে পারছ, প্রাচীন কালে পূর্তকাজ অর্থাৎ নদী খাল ও হ্রদের জল তদারক করা ও বাঁধ রক্ষা করার দিকে কতটা নজর রাখা হত। জুনাগড়ে পাওয়া একটি শিলালিপিতেই চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য থেকে স্কন্দগুপ্তের আমল পর্যন্ত ৭৫০ বছরের পুরানো ইতিহাসের ছাড়া-ছাড়া কয়েকটি খবর একত্র হয়ে একটা স্পষ্ট ছবি ফুটিয়ে তুলেছে।

জুনাগড় লিপির ঐতিহাসিক মূল্য

হূণ আক্রমণ ঃ হূণরা দলে দলে এসে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ক্রমে দুর্বল করে দেয়। তাদের এক দলপতি তোরমান পাঞ্জাব এবং পরে মালব ও রাজস্থানের কিছু অংশ দখল করে নেয়। তোরমানের ছেলে মিহিরকুল নিষ্ঠুর রক্তপিপাসু বলে ইতিহাসে কুখ্যাত। শোনা যায়, মিহিরকুলের সৈন্যরা যেদিকে যেত, মাংসাশী পশু ও শকুনরা সঙ্গে সঙ্গে চলত। হূণদের আক্রমণে ইউরোপে রোমান সাম্রাজ্য যেমন ধ্বংস হয়ে যায়, ভারতেও সেই সময়ে গুপ্ত সাম্রাজ্য তাদের বার বার আক্রমণে ছিন্নভিন্ন ও কয়েকটি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। স্কন্দগুপ্তের পর গুপ্ত রাজাদের মধ্যে নরসিংহ বালাদিত্য, দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত ও বুধগুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। শেষ দিকে কয়েক জন নামেই রাজা ছিলেন। ক্রমশঃ বিখ্যাত গুপ্ত সাম্রাজ্যের কোন চিহ্নই রইল না। বঙ্গ কনৌজ মালব সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে রাজ্য স্থাপিত হল।

তোরমান

মিহিরকুল

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

গুপ্ত যুগের সমাজ ও সভ্যতা ঃ মৌর্য যুগের শাসনপ্রথার বিশেষ কোনও বদল হয়নি গুপ্ত আমলে। রাজা ছিলেন দেশের সর্বময় প্রভু এবং সমাজ ও ধর্মের রক্ষক। তাকে দেবতার মত শ্রদ্ধা করা হত। তাঁর অনেক বড় বড় মন্ত্রী, অমাত্য ও সচিব ছিল। যুবরাজকে 'আর্যপুত্র' বলা হত। তিনি সাধারণতঃ একটি প্রদেশ শাসন করতেন। গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি ভুক্তি ও দেশে বিভক্ত ছিল। এ ছাড়া, রাজার অধীনে শক্তিশালী মহাসামন্ত ও অন্যান্য সামন্ত ছিল। সমাজেও এমনি শ্রেণীবিভাগ ছিল। গুপ্ত যুগে জাতিভেদ প্রথা আরও কঠিন হয়, ব্রাহ্মণদের মর্যাদা বাড়ে, স্ত্রীলোকের অধিকার কিছু কমতে থাকে। শক প্রভৃতি বিদেশীরা বহুদিন এদেশে বাস করে উচ্চবর্ণের হিন্দু হিসেবে গণ্য হয়। স্মৃতিশাস্ত্রে দাসশ্রেণীর উল্লেখ পাওয়া যায়, তবে স্বাধীন শ্রমিক কারিগর শিল্পীদের স্বতন্ত্র সংঘ ছিল। গুপ্ত আমলে যখন শিল্প বাণিজ্যের এত প্রসার হয়েছিল, তখন শ্রেষ্ঠী ও বণিকরা খুব ধনী ছিল, সন্দেহ নেই, এবং তাদের কিছু অর্থ শিল্পকলার উন্নতির জন্য ব্যয় হত।

রাজতন্ত্র ও রাজচরিত্র

মন্ত্রি দল

যুবরাজ

দেশ ও ভুক্তি

সামন্ত চক্র

সমাজ

দাসপ্রথা

শ্রমশিল্প ও শ্রমিকসংঘ

অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি

গুপ্ত যুগে সাহিত্য শিল্প বিজ্ঞান ধর্ম ও সংস্কৃত সাহিত্যের অভাবনীয় উন্নতি, অপর দিকে পাই ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব শ্রী ও সৌন্দর্য। বহু বিদেশী পণ্ডিত গুপ্ত যুগের শিল্প-সংস্কৃতির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। বলেছেন গ্রীসে যেমন পেরিক্লিস-এর যুগ, রোমে যেমন অগস্টাস-যুগ, প্রাচীন ভারতে গুপ্ত আমলও তেমনি গৌরবময় সুবর্ণ যুগ। এই সময়ে পৌরাণিক ধর্মের প্রাধান্য দেখা যায়। রাজারা ছিলেন বিষ্ণু-উপাসক ও গোঁড়া হিন্দু। শিব, কার্তিক, পার্বতী, লক্ষ্মী প্রভৃতি অন্যান্য দেবদেবীরও পূজা প্রচলিত ছিল। এই যুগে নতুন ভক্তিভাবের উপাসনা শুরু হয়, যাকে বলা হয় ভক্তিধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মও পাশাপাশি ছিল, যদিও আগের মত ভাল অবস্থা ছিল না। তবে গুপ্ত রাজারা বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন না।

সর্বাঙ্গীন উন্নতি ও নবজীবনের আভাস

পেরিক্লিস ও অগস্টাস-যুগের সঙ্গে তুলনীয়

ধর্ম ভক্তিবাদ বৌদ্ধ-ধর্মের অবস্থা সহিষ্ণুতা

সাহিত্য ঃ সাহিত্যের দিক থেকেও গুপ্তযুগ ভারত ইতিহাসের স্বর্ণযুগ, যে সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যে নাটক কাব্যের অসাধারণ উন্নতি হয়েছিল। প্রথমেই কালিদাসের নাম করতে হয়। তিনি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন ছিলেন। কালিদাসের কবিকৃতি যুগ যুগ ধরে পাঠকের শ্রদ্ধা সঞ্চয় করেছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্', মহাকাব্য 'রঘুবংশ' আর কুমারসম্ভব', তাঁর খণ্ডকাব্য 'মেঘদূত' ও 'ঋতুসংহার' উচ্চাঙ্গের সাহিত্যসৃষ্টি। অন্যান্য কবিদের মধ্যে হরিষেণ ও বীরসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে 'মুদ্রারাক্ষস'-রচয়িতা বিশাখদত্ত ও 'মৃচ্ছকটিক' লেখক শূদ্রক গুপ্তযুগের নাট্যকার। নারদ, বিষ্ণু যাজ্ঞবল্ক্য ও মনুসংহিতা প্রভৃতি ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্রগুলি এই যুগে সংকলিত হয়। হিন্দুদের অষ্টাদশ পুরাণের সর্বশেষ সংস্কার এই যুগেই হয়েছিল। রামায়ণ ও মহাভারত, দুই মহাকাব্য অনেক অদল-বদলের পর এখন তাদের শেষ রূপ পেল। অনেকের ধারণা, গুপ্ত যুগে বুঝি সংস্কৃত সাহিত্যের পুনর্জন্ম হয়। কিন্তু একথা ঠিক নয়। গুপ্তদের আগেও সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ছিল, তার প্রমাণ সুঙ্গ ও কুষান যুগেই আছে।

সংস্কৃত সাহিত্য

কালিদাস

হরিষেণ ও বীরসেন

বিশাখ দত্ত, শূদ্রক

ধর্ম ও স্মৃতিশাস্ত্র

পুরাণ ও মহাকাব্যের সম্পাদনা

শিল্প ও বিজ্ঞান ঃ গুপ্ত যুগের শ্রেষ্ঠ গৌরব বোধহয় তার স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প। অজন্তার উনত্রিশটি গুহা বৌদ্ধমঠ হিসাবে ব্যবহৃত হত। কোনও কোনও গুহাতে বিরাট বুদ্ধমূর্তি আছে। আর আছে বহু রঙীন 'ফ্রেস্কো', গুহার দেয়ালে আঁকা। এর মধ্যে তিনটি গুহা গুপ্ত আমলের। এই চিত্রগুলি বেশির ভাগ বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে, জাতক ও বোধিসত্ত্বের কাহিনী। কোনও ছবিতে বিজয়সিংহের সিংহল যাত্রা, কোনটিতে বুদ্ধদেবের উপদেশ দান, আবার কোথাও বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে ফিরে এলে তাঁর স্ত্রী গোপা ও পুত্র

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য

রাহুলের ভিক্ষা প্রার্থনার দৃশ্য আছে। অজন্তা ও বাঘ গুহার আশ্চর্য সজীব রঙীন ছবিগুলি আজও দর্শকের মনে শ্রদ্ধা ও বিস্ময় জাগায়। নারীমূর্তির এমন কমনীয় প্রতিকৃতি, জীবজন্তুর এমন সজীব বাস্তব চিত্র সত্যই দুর্লভ। অজন্তা ছাড়া সারনাথ ও দেওগড়ের বুদ্ধমূর্তি অপূর্ব শিল্প নৈপুণ্যের পরিচয়। আবার ভিতরগাঁও, খাজুরাহো, দেওগড় প্রভৃতি মন্দিরগুলির অপূর্ব শিল্পকাজ সে যুগের এক শ্রেষ্ঠ কীর্তি।

চিত্রকলা

মন্দির শিল্পের নিদর্শন

বিজ্ঞান-চর্চায় গর্গ বরাহমিহির আর্যভট্ট ও ব্রহ্মগুপ্তের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভূগোলে ও জ্যোতিষশাস্ত্রে ভারতীয় ও গ্রীক পণ্ডিতদের ভাবের আদান-প্রাদান হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও মোমের তৈরি দেহে অস্ত্রোপচার করার পরিচয় পাওয়া যায়। ধন্বন্তরি চিকিৎসক হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ভারতীয় পণ্ডিতদের কাছে গ্রীক আরবরা এইসব বিদ্যা শেখেন। তা ছাড়া, ধাতু শিল্পের উন্নতির প্রমাণ, দিল্লীতে চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ। দেড় হাজার বছর হয়ে গেছে, তবু তাতে মরচে ধরে নি। ওদিকে সংখ্যা-গণিত, পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যাতেও গুপ্তযুগের কৃতিত্ব কম নয়। সব দিক দিয়ে আলোচনা করলে নিসঃন্দেহে বলা যায়, গুপ্তযুগই ভারতীয় সভ্যতার চরম উন্নতির কাল। হিন্দুধর্মের নতুন রূপ, সংস্কৃত সাহিত্যের বিস্ময়কর উন্নতি, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে অদ্ভুত কৃতিত্ব, বিজ্ঞানের সাধনা এই যুগের মূল বৈশিষ্ট্য। এই সব কারণে ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগকে স্বর্ণযুগ বলে অভিহিত করা হয়।

ভূগোল, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিজ্ঞান

ধাতুশিল্প

সংখ্যা গণিত, পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা

স্বর্ণযুগ

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

দেশী ও বিদেশী ঐতিহাসিকগণ যে 'classical Age'-এর শাসন, শৃঙ্খলা, সমাজ ও সভ্যতার অভূতপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করে একে ভারত ইতিহাসের তুঙ্গস্থান হিসাবে প্রশংসা করেছেন, সেই সুবর্ণযুগেরও একদিন অবনতি ও পতন ঘটল। এই বিশাল সাম্রাজ্যের বহিরাগত কারণের মধ্যে হূণ আক্রমণই প্রধান। প্রথম কুমারগুপ্ত দীর্ঘ রাজত্বের শেষ ভাগ থেকেই শান্তি ব্যাহত হতে থাকে। যুবরাজ স্কন্দগুপ্তের হস্তে তারা পরাজিত হলেও, কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এটিই ছিল আসন্ন বিপদের পূর্বাভাস।

হূণ আক্রমণ

শান্তিভঙ্গ

এর পর স্কন্দগুপ্তের রাজ্যত্বকালেও আভ্যন্তরীন শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হয়। তাঁর আমলেও হূণ-আক্রমণ গুপ্ত সাম্রাজ্যকে বড় রকমের ধাক্কা দিয়েছিল। উপরন্তু অন্তঃশত্রুর অপচেষ্টাতেও সাম্রাজ্যের দৃঢ়তা ক্ষুণ্ন হয়। কুমার-গুপ্তের মৃতুর ঠিক পরেই স্কন্দগুপ্তের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা পুরগুপ্ত বৃহৎ সাম্রাজ্যকে

আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা

খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করেন। ফলে হূণদের বিরুদ্ধে বিজয় অভিযান সমাপ্ত হলে স্কন্দগুপ্তকে পুনরায় সাম্রাজ্য রক্ষার সময় ও শক্তি ব্যয় করতে হয়।

সীমান্ত প্রদেশের পতন

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর গান্ধার, পাঞ্জাব ও রাজপুতানা অর্থাৎ উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তের প্রদেশগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরাই ছিল এতদিন সাম্রাজ্যরক্ষী স্বরূপ, হূণ আক্রমণের বিরুদ্ধে এই অঞ্চলগুলিই ছিল বহিঃশত্রু প্রতিরোধের মুখ্য প্রাচীর। ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন অনেকটা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

বুধগুপ্ত
মালবের পতন

বুধগুপ্তই ছিলেন শেষ উল্লেখযোগ্য ও পরাক্রান্ত সম্রাট কারণ, তাঁর উত্তরাধিকারীর রাজত্বকালে হূণ দলপতি তোরমাণ মালব অধিকার করেন। মালবের পতন সাম্রাজ্য-ধ্বংসের সুনিশ্চিত ইঙ্গিত।

কেন্দ্রশক্তির ক্রমিক দুর্বলতা

পরবর্তী সময়ে আভ্যন্তরীন বিশৃঙ্খলা, দুর্বল গুপ্ত নৃপতিদের অন্তর্বিবাদ, সামন্তচক্রের ক্রমবর্ধমান শক্তি, স্থানীয় শাসকবর্গের স্বাধীন রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি ঘটনাবলী গুপ্ত সাম্রাজ্যের দুর্দিন ঘনিয়ে তোলে। উত্তরাধিকারে প্রতিষ্ঠিত প্রাদেশিক রাজপুরুষগণের ক্ষমতা বৃদ্ধি আর কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র প্রধানের ক্রমিক দুর্বলতা, এই দুটি পরস্পর-সংশ্লিষ্ট ঘটনা এবং আসন্ন পতনের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

কয়েকজন রাজার বৌদ্ধধর্ম-প্রীতি

কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে শেষ দিকের কয়েকজন গুপ্ত রাজা বৌদ্ধ ধর্ম ও মতের প্রতি পক্ষপাতী ছিলেন এবং খুব সম্ভবতঃ তা রাষ্ট্রশক্তি ও সামরিক ব্যবস্থার ক্ষতি সাধন করেছিল। কিন্তু এই গৌণ ও পরোক্ষ অনুমানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া যায় না। মুখ্য ও প্রত্যক্ষ কারণ গুলিই ঐতিহাসিক দিক থেকে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ভারতে প্রভুত্বের জন্য সংগ্রাম

উত্তর ভারত

হূণ আক্রমণ ও তার ফলাফল : রোমান সাম্রাজ্যে ও ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যে প্রায় একই সময়ে দুর্ধর্ষ হূণ জাতির আক্রমণ ঘটেছিল। ইরাণ, কাবুল প্রভৃতি অঞ্চল দখল করে হূণরা ভারতে প্রবেশ করে এবং ৪৫৮ খ্রীস্টাব্দ থেকে দলে দলে এসে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে হীনবল করে ফেলে। সম্রাট স্কন্দগুপ্তের আমলে দু'বার আক্রমণ হয়েছিল, কিন্তু হূণরা রাজ্য ধ্বংস করতে পারে নি। বারবার পরাস্ত হলেও হূণরা আবার দলে দলে এসে গুপ্ত সাম্রাজ্যকে ক্রমশঃ দুর্বল করে তোলে। সেই দুর্বলতার সুযোগে **তোরমান** নামে এক দলপতির অধীনে একদল হূণ পাঞ্জাব এবং পরে মালব ও রাজপুতানার কিছু অংশ দখল করে। তোরমানের পুত্র **মিহিরকুল** নিষ্ঠুর ও রক্তপিপাসু হিসেবে ইতিহাসে কুখ্যাত। শোনা যায় মিহিরকুলের সৈন্যদল কোনও দিকে অগ্রসর হলে নর-মাংসপ্রিয় পশু-পক্ষীরা তার সঙ্গে সঙ্গে যেত। যাই হোক হূণ আক্রমণের ফলে ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের মতই ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। উত্তর ভারতের কনৌজ, মালব, সৌরাষ্ট্র, বঙ্গ প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয়। ভারত ইতিহাসে হূণ আক্রমণের এটি প্রত্যক্ষ ফল। আর একটি পরোক্ষ ফল হয়েছিল, তা সামাজিক। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজপুতরা শক-হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতি থেকে উৎপন্ন। ভারতের উত্তরে ও পশ্চিমে এই সব আক্রমণকারী এসে বসবাস করেছিল। ক্রমশঃ তারা হিন্দু-সমাজে প্রবেশ অধিকার পেয়ে ভারতীয় হয়ে যায়। এবং তাদের মধ্যে শক্তিমান গোষ্ঠীগুলি নিজেদের প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র-বংশের হিন্দু সন্তান বলে পরিচয় দিতে থাকে। এইভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ উপকরণ অনুপ্রবেশ করে। এদের অনেকেই সাহসী ও যুদ্ধ-নিপুণ ছিল। কালক্রমে এই উপজাতির দল শৌর্য-বীর্যের জন্য ভারতীয় সমাজে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়। এদের মধ্যে সব চেয়ে প্রবল শাখা ছিল গুর্জর। তারাই প্রতিহার বংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য তারা গুর্জর প্রতিহার নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই বংশের অনেক বিখ্যাত রাজা মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন।

তোরমান

মিহিরকুল

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

উত্তর ভারতে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব

সামাজিক ফল

রাজপুত-গোষ্ঠীর সৃষ্টি

গুর্জরশাখা ও প্রতিহার বংশ

কোন কোন পণ্ডিত বলেন যে বিদেশীদের সঙ্গে মিশ্রণের বিপক্ষে হিন্দু সমাজের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব জাগ্রত হয়েছিল এবং সমাজে বর্ণ ও জাতিভেদ প্রথা কিছু কঠোর হয়েছিল। রাষ্ট্র ও সমাজে যে পরিবর্তন দেখা দিল, তা থেকে ভারতের ইতিহাসে হূণ আক্রমণের গুরুত্ব বিচার করা যায়।

হিন্দু-সমাজে জাতিভেদ প্রথার কঠোরতা

যশোধর্মন ঃ যশোধর্মন ছিলেন মালবের এক স্বাধীন রাজা। হূণ রাজা মিহিরকুলের অত্যাচার যখন চরমে পৌঁছেছিল তখন যশোধর্মন (আনুমানিক ৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে) প্রবল পরাক্রমে হূণদের একেবারে বিধ্বস্ত করে দেন। তাঁর সাহস ও যুদ্ধ-কৌশল ছিল অসাধারণ। এই ঘটনার পর তিনি সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা বলে গণ্য হয়েছিলেন। এই হূণ-বিজেতা যশোধর্মনের কথা মান্দাসোরে প্রাপ্ত মাত্র একখানি লিপি থেকে জানা গেছে। তাতে বলা হয়েছে, তাঁর সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। হূণ-বিজয়ী হিসাবে ইতিহাসে তিনি বিখ্যাত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সুযোগ্য বীর ও তাঁর বংশধরদের সম্বন্ধে আমরা কিছুই জানি না। উত্তর ভারতের ইতিহাসে তাঁর অভ্যুদয় ও কৃতিত্ব অনেকটা প্রক্ষিপ্ত বলে মনে হয়। কেউ কেউ তাঁকেই 'বিক্রমাদিত্য' ভাবেন, যদিও সে ধারণার কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই। যাই হোক, যশোধর্মনের পর আর্যাবর্তে কোনও একচ্ছত্র রাজা ছিলেন না। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে স্থানীয় রাজবংশ স্বাধীনভাবে রাজ্য পরিচালনা করে ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

যশোধর্মনের কীর্তি

মান্দাসোর লিপি

প্রক্ষিপ্ত চরিত্র : তথ্যের অভাব

হর্ষবর্ধনের আমল ঃ (৬০৬-৬৪৭ খ্রীঃ) ঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলে যে সব নতুন রাজবংশের উৎপত্তি হয়, তাদের মধ্যে একটি মৌখরি আর একটি পুষ্যভূতি। পুষ্যভূতিরা থানেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই থানেশ্বরের এক রাজা প্রভাকরবর্ধন হূণদের তাড়িয়ে বিশেষ ক্ষমতাশালী হন। তাঁরই কনিষ্ঠ পুত্র হর্ষবর্ধন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশ' বছর পরে হর্ষবর্ধনের চেষ্টায় ও বিক্রমে উত্তর ভারতে আবার একটি বৃহৎ রাজ্য স্থাপিত হয়। কনৌজ (কান্যকুব্জ) ছিল তারই রাজধানী। হর্ষের রাজত্বকালে এই প্রাচীন নগরীর সৌন্দর্য ও সমৃদ্ধি খুব বেড়ে যায়। হর্ষবর্ধনের মত গুণী জ্ঞানী ও প্রতাপশালী রাজার যোগ্য রাজধানী ছিল ঐ সুশোভিত কনৌজ নগরী। পরবর্তীকালে, গুর্জর-প্রতিহার ও পাল সম্রাটদের আমলে কনৌজ আরও ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি লাভ করে।

পুষ্যভূতি বংশ ও থানেশ্বর

কনৌজ

হর্ষের রাজ্যলাভ ঃ থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্ধনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন, আর একটি মাত্র কন্যা, নাম রাজ্যশ্রী। এই কন্যার বিবাহ হয় মৌখরি বংশীয় রাজা গ্রহবর্মার সঙ্গে। থানেশ্বর রাজবংশের পরম শত্রু ছিলেন মালবের রাজা

দেবগুপ্ত, আর দেবগুপ্তের বন্ধু ও সহায় হলেন বাঙলার কর্ণ-সুবর্ণের রাজা শশাঙ্ক, যিনি বাঙলার প্রথম স্বাধীন ও প্রতাপশালী রাজা।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যু ও হর্ষের রাজ্য লাভ

প্রভাকর-বর্ধনের মৃত্যুর পর রাজ্যবর্ধন থানেশ্বরের রাজা হলেন। অল্পকাল পরে মালবরাজ দেবগুপ্তের হাতে ভগিনীপতি গ্রহবর্মার পরাজয় ও হত্যার সংবাদ পেয়ে তিনি শত্রুর হাতে বন্দিনী ভগ্নী রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করার জন্য ছুটলেন। মালবসৈন্য তাঁর কাছে হেরে গেল বটে, কিন্তু তিনি নিজে শশাঙ্কের কাছে পরাস্ত ও নিহত হলেন। রাজ্যশ্রী কারাগার থেকে পালিয়ে বনে চলে গেলেন। এই ঘোর বিপদের সময় হর্ষকে রাজপদ নিতে হল। সিংহাসন পেয়ে শশাঙ্ককে দমন আর বোনকে উদ্ধার করাই তাঁর সংকল্প হল। বিধবা রাজ্যশ্রী জীবনের সুখশান্তি হারিয়ে বনের মধ্যে আগুনে



হর্ষবর্ধন

থানেশ্বরের সঙ্গে মৌখরি রাজ্যের সংযুক্তি

ঝাঁপ দেবার আয়োজন করছিলেন, হর্ষ তাঁকে খুঁজে পেয়ে সঙ্গে করে আনলেন। মৌখরি রাজ্যটি হর্ষ তখন আপনার অধিকারভুক্ত করে থানেশ্বর থেকে কান্যকুব্জে রাজধানী সরিয়ে আনেন। রাজা হয়ে তিনি 'শীলাদিত্য' উপাধি গ্রহণ করেন।

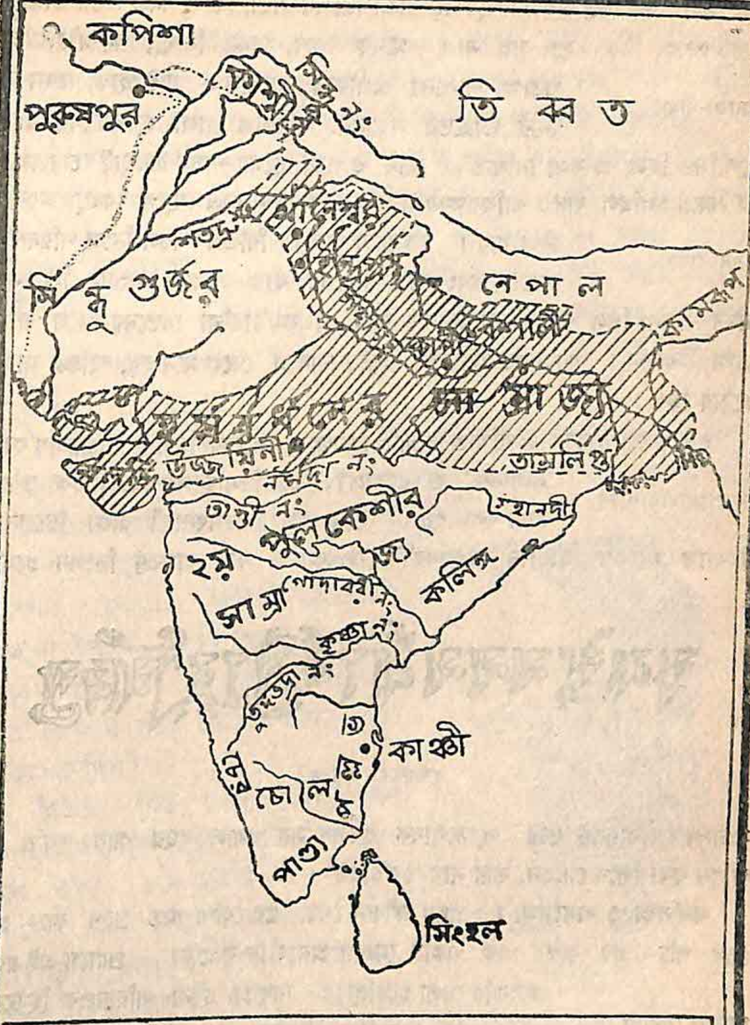
সাম্রাজ্য ও শাসন ঃ তারপর হর্ষ গৌড়ধ্বংসের প্রতিজ্ঞা নিয়ে শশাঙ্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। অনেকে শশাঙ্ককে বৌদ্ধবিদ্বেষী কঠোর প্রকৃতির লোক বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা বোধ হয় সত্য নয়।

হর্ষ ও শশাঙ্ক

যুদ্ধে কার পরাজয় হল, তাও বলা কঠিন। সম্ভবতঃ শশাঙ্কের জীবিতকালে হর্ষ তাঁকে হারাতে পারেন নি। যাই হোক, শশাঙ্ক ছাড়া অনেক রাজাই হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেন, যেমন, মগধের গুপ্ত রাজারা ও শশাঙ্কর পরাক্রমে ভীত কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মা।

দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাজয়

বিন্ধ্য ও নর্মদা অতিক্রম করে হর্ষ দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হলে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর কাছে পরাস্ত হন। 'উত্তরাপথনাথ' হর্ষবর্ধনের এই পরাজয়ের কথা চালুক্যরাজের আইহোল 'প্রশস্তি'তে লেখা আছে, তবে কেউ কেউ একথা স্বীকার করেন না। পশ্চিম দিকে সৌরাষ্ট্রের বলভি রাজা হর্ষের বশ্যতা স্বীকার করেন আর পূর্বদিকে মগধ কঙ্গোদ রাজ্য তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। এই ভাবে হর্ষ উত্তর ভারতে আপনার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর সাম্রাজ্যের আয়তন হল মোটামুটি উত্তরে হিমালয়ের কোল থেকে দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত আর পূর্বে কামরূপ থেকে পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন,



হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য

আনুমানিক সীমান্ত -------

স্কেল মাইল ০ ১০০ ২০০ ৩০০ ৪০০

হর্ষ মধ্য ভারতের একজন খুব বড় রাজা ছিলেন সত্য, কিন্তু সমস্ত উত্তর ভারতের সম্রাট তাঁকে ঠিক বলা যায় না। অনেক অংশ, যেমন সিন্ধু, কাশ্মীর, তাঁর প্রত্যক্ষ শাসনের এলাকায় আসেনি। যাই হোক, তখনকার উত্তর ভারতের সবচেয়ে পরাক্রান্ত রাজা হর্ষবর্ধনের রাজ্য সুশাসিত ছিল, এ কথা নিশ্চিত। মৌর্য ও গুপ্ত যুগের শাসন-ব্যবস্থাই মোটামুটি এই সময়ে চলছিল, যদিও শান্তিরক্ষায় গুপ্ত যুগের তুলনায় এ যুগে কিছু অবনতি দেখা যায়। হর্ষবর্ধন রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল নিজে পরিদর্শন করতেন এবং সর্বত্র শাসনের কাজ সম্বন্ধে সংবাদ নিতেন। জমির খাজনা ছিল শস্যের এক ষষ্ঠাংশ আর রাজকর্মচারীরা বেতনের বদলে জমি ভোগ করতেন। কারাদণ্ড অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি ব্যবস্থা থেকে মনে হয়, শাস্তির আইন কঠোর ছিল।

সাম্রাজ্য-সীমা

শাসন ব্যবস্থা

হর্ষ নিজে সুকবি ও পণ্ডিত ছিলেন, হস্তাক্ষরও সুন্দর ছিল। 'প্রিয়দর্শিকা', 'নাগানন্দ' ও রত্নাবলী', এই তিনটি সংস্কৃত নাটক তাঁরই রচনা বলা হয়। তিনি খুব বিদ্যোৎসাহী রাজা ছিলেন। বিখ্যাত সংস্কৃত আখ্যান 'কাদম্বরী'র লেখক ও কবি বাণভট্ট ছিলেন হর্ষের

বিদ্যোৎসাহীরূপে হর্ষ



হর্ষবর্ধনের হস্তাক্ষর

সভাসদ। বাণভট্ট তাঁর পৃষ্ঠপোষক হর্ষবর্ধনের ষোল বছর বয়স পর্যন্ত যে জীবন কথা লিখে গেছেন, তার নাম 'হর্ষচরিত'।

ধর্মসভা ও দানমেলা ঃ প্রথম জীবনে শৈব, পরে বৌদ্ধ মত গ্রহণ করে হর্ষ প্রায় পাঁচ বছর অন্তর এক একটি মেলার অনুষ্ঠান করতেন। প্রয়াগে এই রকম কয়েকটি মেলা হয়েছিল। বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ যখন কনৌজে উপস্থিত হন, তখন হর্ষ সেখানে এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন। কুড়ি জন করদ রাজার সঙ্গে হর্ষ প্রতিদিন একটি সোনার বুদ্ধমূর্তির মাথায় রাজছত্র ধরে শোভাযাত্রায় বেরুতেন পথে যেতে যেতে অনেক ধনরত্ন বিতরণ করতেন। এর পর হর্ষ প্রয়াগে গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে গিয়ে একটি প্রকাণ্ড দানমেলার অনুষ্ঠান করতেন। তিনদিন ধরে খুব ধুমধাম চলত। প্রথম দিন হর্ষ বুদ্ধের পূজা করতেন, দ্বিতীয় দিনে সূর্যের, আর তৃতীয় দিনে শিবের অর্চনা করতেন। এই থেকে মনে হয়, হর্ষ বৌদ্ধ হয়েও হিন্দু দেবতার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রত্যেক দিন বৌদ্ধ, জৈন, ব্রাহ্মণ,

প্রয়াগের মেলা ও কনৌজের ধর্মসভা

দানশীলতা

সন্ন্যাসী ও দীন-দরিদ্রদের প্রচুর অর্থদান করা হত। শেষ দিনে রাজভাণ্ডার উজাড় করে দানমেলা সাঙ্গ হত আর হর্ষ নিজের পোষাক অলংকার পর্যন্ত বিলিয়ে দিতেন। তারপর তিনি ও ভগ্নী রাজ্যশ্রী ভিক্ষুর বেশ পরে ঘরে ফিরতেন।

হর্ষবর্ধন সম্বন্ধে আমরা যে সব তথ্য জানতে পারি, তার কিছুটা 'হর্ষচরিত' আর বেশির ভাগ হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণী থেকে। এ ছাড়া হর্ষের কয়েকটি তাম্রশাসন থেকে তাঁর শাসনব্যবস্থা ও সামন্ত রাজাদের কথাও কিছু কিছু জানা গেছে। তাঁর কীর্তি সম্বন্ধে দ্বিমত নেই। তিনি সুপণ্ডিত, দানশীল ও বৌদ্ধধর্মের শেষ পৃষ্ঠপোষক বলে ইতিহাসে খ্যাত। ৬৪৬ বা ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়।

বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা ও মৃত্যু

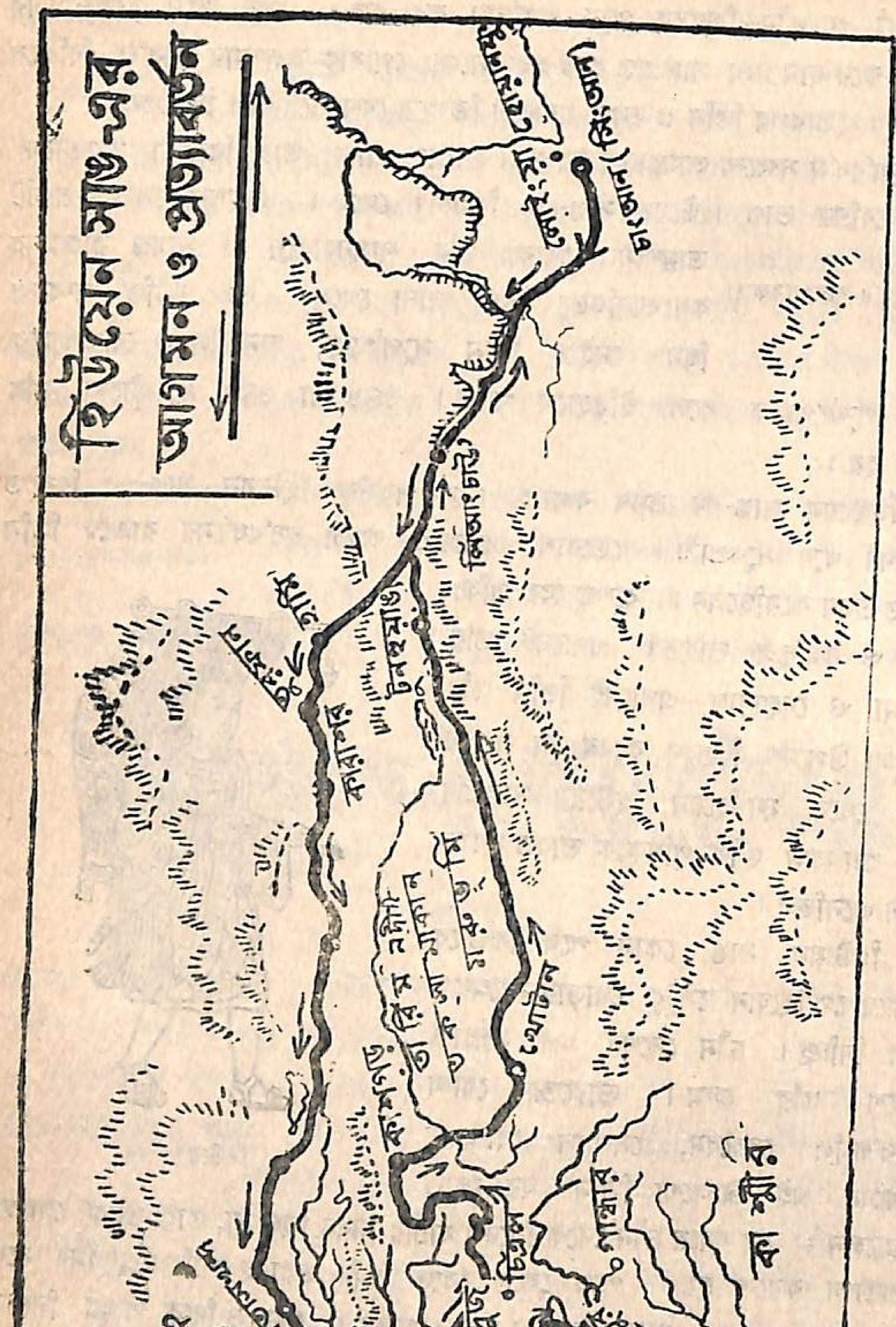
হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণ কথাঃ চীন পর্যটক হিউয়েন সাঙ-এর বিস্তৃত বিবরণী খুব সুখপাঠ্য। তেরোশ' বছরেরও আগে হর্ষবর্ধনের রাজত্বে তিনি ভারত ভ্রমণ করেছিলেন। বুদ্ধদেবের পবিত্র জন্ম ও কর্মস্থল ভারত। এখানেই তাঁর সাধনা ও দেহত্যাগ, এখানেই তিনি তাঁর অমূল্য উপদেশ বিতরণ করেন যা সুদূর চীন থেকে ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ-এর মত জ্ঞানবান তীর্থ পথিককে ভারত দর্শনে টেনে এনেছিল।


হিউয়েন সাঙ

হিউয়েন সাঙ কোন পথে কিভাবে ভারতে পৌঁছলেন সেটুকু গোড়ায় সংক্ষেপে বলে নিচ্ছি। চীন দেশের এক সম্ভ্রান্ত বংশে তাঁর জন্ম। ভারতের বৌদ্ধ তীর্থগুলি দেখবেন, সেখানে বৌদ্ধধর্ম শিখবেন, এই উদ্দেশ্যে তিনি ঘর ছেড়ে বেরুলেন। সে সময়ে চীন থেকে বিদেশ যাত্রার নিয়ম ছিল না, তাই তাঁকে গোপনে দেশত্যাগ করতে হয়। পথে যেতে যেতে তিনি ভয়াবহ গোবি মরুভূমির মধ্যে এসে দিশাহারা হয়ে পড়লেন। কোনও দিকে পথের নিশানা নেই, তাই মানুষ ও পশুদের কংকাল দেখে তিনি এগুতে লাগলেন। তৃষ্ণার জল না পেয়ে তাঁর অশেষ দুর্গতি হয়েছিল। অবশেষে বহু কষ্টের পর হিউয়েন সাঙ তিয়েন সান বা চীনা তুর্কিস্তান প্রদেশে প্রবেশ করলেন। সেখানকার রাজা বা খান তাঁকে খুব সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা করেন। তিনি পণ্ডিত অতিথিকে অভিবাদন জানিয়ে তাঁবুর ভিতরে নিয়ে গেলেন এবং চালের তৈরি পিঠা, দুধের সর, মধু প্রভৃতি খাদ্য দিয়ে তাঁকে তৃপ্ত করলেন।

ভ্রমণ পথ

হিউয়েন সাঙ রাজাকে বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথাগুলি বুঝিয়ে দেন ও তাঁকে


হিউয়েন সাঙ-এর
আগমন ও প্রত্যাবর্তন
বোখারা
তাসখন্দ
সমরখন্দ
বল্খীক
বামিআন
কুন্দুজ
চিত্রল
কাপিশী
পুরুষপুর
গান্ধার
গজনী
হিন্দুকুশ পর্বত
সিন্ধু নং
কাশ্মীর
কাশগড়
তারিম নদী
তকলামাকান
মরুভূমি
খোটান
কারাশর
তুরফান
হামি
টুনহুয়াং
লিআংচাউ
লোইয়াং
হোয়াংহো
চাংআন (সিংআন)

দীক্ষিত করেন। সেখান থেকে একটি দোভাষী নিয়ে তিনি তারপর সমরকন্দ পৌঁছলেন। এই শহর তখন মধ্য এসিয়ার বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। এখানে সুন্দর তেজী ঘোড়া ও চমৎকার হাতের কাজের জিনিসপত্র বিক্রী হত। এই ভাবে ভ্রমণ করতে করতে তিনি গান্ধার প্রদেশে হাজির হলেন। তারপর ভারতে এসে সম্রাট হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর গভীর প্রীতি ও বন্ধুত্ব হল। হর্ষের রাজত্বে আট বছর কাটিয়ে তিনি ষোল বছর বিদেশ বাসের পর আবার স্থলপথ দিয়েই স্বদেশে ফিরে যান। ভারত ছেড়ে যাবার সময় হিউয়েন সাঙ অনেক দামী পুঁথিপত্র, ছবি এবং সোনা, রূপা ও চন্দন কাঠের বুদ্ধমূর্তি নিয়ে যান। দেশে ফিরবার পরে চীন সম্রাট বিশেষ সমাদর জানিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। হিউয়েন সাঙ যে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখে যান, তার নাম সি-ইউ-কি। এই কাহিনী থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে ভারতের ধর্ম ও সমাজ এবং উত্তর দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি বিশেষ রাজ্যের পরিচয় পাই। হিউয়েন সাঙ ছিলেন সুপণ্ডিত ও ধার্মিক। তাই বৌদ্ধধর্ম ও আচারনীতির সম্বন্ধেই বেশি লিখেছেন।

ঐতিহাসিক গুরুত্ব

ধর্ম ও বিদ্যাচর্চা : হর্ষের সময়ে হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় ধর্মই প্রচলিত ছিল। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, বিদেশীদের কাছে ভারতবর্ষ ব্রাহ্মণের দেশ বলে পরিচিত। শিক্ষিত সমাজে দেবভাষা সংস্কৃতের প্রচলন বেশি, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিতরাও এই ভাষা ব্যবহার করেন। ভারতে নানা সম্প্রদায় আছে, কিন্তু কেউ কাউকে উৎপীড়ন করে না। 'মধ্যদেশের' লোকরা সুসভ্য ও মার্জিত, তারা শিক্ষা ও সংযমের মূল্য বোঝে। আগেকার মত বৌদ্ধ ধর্মের সুদিন নেই। পাটলিপুত্র শ্রাবস্তী প্রভৃতি বৌদ্ধ যুগের কয়েকটি বিখ্যাত নগর এখন জনহীন ও ধ্বংসস্তূপে পূর্ণ। বিদেশীদের আক্রমণে, বিশৃঙ্খলা এবং অনাদরে এই সব জায়গা পূর্বগৌরব হারালেও তাদের জৌলুস একেবারে লুপ্ত হয়নি। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তখনও প্রায় ৫,000 বৌদ্ধ মঠ ছিল। কাশ্মীর জলন্ধর কান্যকুব্জ বৈশালী বুদ্ধগয়া প্রভৃতি জায়গায় অনেক ভিক্ষু ও পণ্ডিত মঠে থেকে লেখাপড়ার চর্চা ও ধর্ম আলোচনা করতেন। হিউয়েন সাঙ-এর হিসেবে এঁদের সংখ্যা দু লক্ষের উপর।



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীলমোহর

মধ্যদেশের বর্ণনা

বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধমঠ

নালন্দা : শিক্ষা ব্যবস্থা : বিহারের অন্তর্গত নালন্দা নগরে এই রকম একটি মঠে তখন এক প্রকাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। মঠে বড় বড় বৌদ্ধ আচার্য ও পণ্ডিতেরা ছাত্রদের পড়াতেন। তাঁদের অধ্যাপনার খ্যাতি বহু দেশে ছড়িয়ে পড়ে।

শিক্ষালাভের জন্য চীন, তাতার, পূর্ব উপদ্বীপ, নানা দূরদেশ থেকে ছাত্র আসত। হিউয়েন সাঙ-এর সময় নালন্দার ছাত্রসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। পড়াশুনা ও থাকা-খাওয়ার খরচ লাগত না, দেশের ছয়জন রাজা ও অন্যান্য ধনী ব্যক্তির উপর ছাত্রদের ভরণপোষণের ভার ছিল। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ থেকে এই মঠ ও বিদ্যাপীঠের পুরানো ঘর-বাড়ি কিছু খুঁড়ে পাওয়া গেছে। সেখান থেকে অনেক মূর্তি ও স্তূপ উদ্ধার করা হয়েছে। শোনা যায়, মঠটি আগে ছয়তলা বাড়ি ছিল, তিনতলা পর্যন্ত সিঁড়িগুলি এখনও ভাল অবস্থায় আছে।

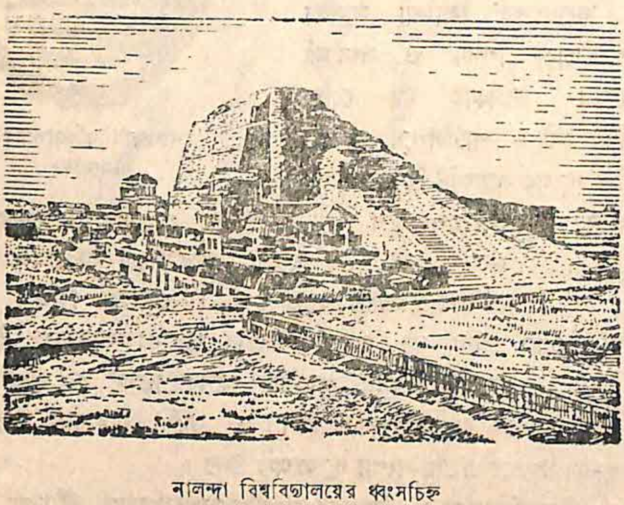
অধ্যাপক ও ছাত্রবর্গ

নালন্দার ধ্বংসস্তূপ

নালন্দায় ছাত্রদের জীবন ছিল কঠিন সংযমে বাঁধা। শাস্ত্র আলোচনা, 'স্থবির' অধ্যাপকের প্রতি ভক্তি, ধর্মনিষ্ঠা ও পবিত্রতাই ছিল মহা-বিদ্যালয়ের আদর্শ। মঠের ভিতরে অধ্যাপনা শোনবার জন্য লম্বা ঘর, পাঠাগারের জন্য আলাদা কক্ষ আর ছাত্র-নিবাসের উপযোগী টানা দালান-ঘরের বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। নালন্দায় পুঁথির সংকলন ছিল বিরাট। সে যুগের পণ্ডিত অধ্যাপকের অনেক নামও পাওয়া গেছে। এঁদের মধ্যে ধর্মপাল ও চন্দ্রপাল, স্থিরমতি ও গুণমতি চরিত্রে ও বিদ্যাবত্তায় সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেন। মঠের প্রধান আচার্য ছিলেন মহাজ্ঞানী শীলভদ্র। অনেকের মতে এই বিশ্ব-বিশ্রুত অধ্যাপক ছিলেন বঙ্গের বা পূর্ব ভারতের লোক। মহাবিদ্যালয়ে তর্ক, জিজ্ঞাসা ও পরস্পর আলোচনা করাই ছিল পাঠরীতি। ছাত্রদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে অনেকগুলি ছিল কঠিন শাস্ত্র। প্রথম

মহাবিদ্যালয়ের জীবন যাপন

বৌদ্ধ আচার্য ও শীলভদ্র



নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসচিহ্ন

পাঠের নাম 'সিদ্ধবস্তু'। অক্ষর-পরিচয় ও সহজ ব্যাকরণ শেষ হলে শুরু হত গদ্য ও পদ্য রচনা। ভাষাজ্ঞানের ভিত্তি পাকা করে তবে 'বিদ্যা' অর্থাৎ

বিশেষ জ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হত। হিউয়েন সাঙ শব্দবিদ্যা (ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্ব), হেতুবিদ্যা (ন্যায়শাস্ত্র), অধ্যাত্মবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা ও শিল্পস্থানবিদ্যা, এই পাঁচটি শিক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। বোঝা যায় নালন্দায় গভীর ও উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। এই মহাবিদ্যালয়ে প্রবেশ করার অনুমতি পাওয়া ছিল খুব শক্ত ব্যাপার। সেখানে 'দ্বারপন্ডিত' থাকতেন। শিক্ষার্থী এলে তাঁরা তাকে রীতিমত প্রশ্ন করে পরীক্ষা করতেন। ঠিক মত জবাব দিতে পারলে তবেই সে ভর্তি হতে পারত।

পাঠ্যসূচী

প্রবেশাধিকার

দেশের অবস্থা ঃ হিউয়েন সাঙ দেশের ভিতরকার অবস্থার কথাও বলেছেন। তখনকার দিনে পণ্ডিত ও জ্ঞানী লোকদের জমি দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষির অবস্থা ভাল আর গ্রামগুলিতেও ঘন বসতি ছিল। গুপ্ত রাজত্বকালে ফা-হিয়েন ভারত ভ্রমণ করেন, কোথাও তাকে বিপদে পড়তে হয়নি। কিন্তু হিউয়েন সাঙ দু'দু' বার ডাকাতের হাতে পড়েছিলেন। তবে হিউয়েন সাঙ এ কথা লিখেছেন যে, অপরাধীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়। সাধারণ লোক শান্তিপ্রিয় এবং তাদের নীতিজ্ঞান আছে। একটু হঠকারী ও অস্থিরচিত্ত হলেও তাদের ধর্মভয় আছে, তারা প্রতারণা করে না এবং কথা দিয়ে কথা রাখে। তা ছাড়া, দেশের ব্যবসা বাণিজ্য খুব ভালভাবেই চলত। পশ্চিম ভারতে মালব গুজরাট প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে বিদেশের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। এ দিকে বাংলায় তখন তাম্রলিপ্ত একটি প্রধান বন্দর ছিল। সেখান থেকে চীন ও পূর্ব-সমুদ্র-গামী জাহাজ ছাড়ত।

দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা

চালুক্য ও পল্লবরাজ্য ঃ হিউয়েন সাঙ ওড়িশা এবং দাক্ষিণাত্যেও গিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বাদামির চালুক্য এবং আরও দক্ষিণে পল্লব রাজাদের কীর্তির কথা উল্লেখ করেছেন। চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী ভারতের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। হর্ষবর্ধনের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধের কথা আগেই পড়েছ। এইসময়ে বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে পুলকেশীর সাম্রাজ্য খুব বিস্তৃত ছিল। পশ্চিমে গুজরাট ও মালব আর দক্ষিণে চোল পাণ্ড্য এবং পল্লব রাজ্যগুলি তাঁর বশ্যতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়। হিউয়েন সাঙ ৬৪১ খ্রীস্টাব্দে যখন এখানে আসেন, তখন দ্বিতীয় পুলকেশীর চরিত্র ও বিক্রম দেখে তিনি বলেছেন যে, তাঁর হৃদয় গভীর ও বুদ্ধি তীক্ষ্ম ছিল। চালুক্যরাজের সৈন্যসামন্তরা দুর্ধর্ষ যোদ্ধা। হাতির দলকে খেপিয়ে দিয়ে তুরী ভেরী বাজাতে বাজাতে তারা যুদ্ধে অগ্রসর হয়। হাতি ও সৈন্যবলের জন্য রাজা কোনও শত্রুকেই ভয় করে না। রাজ্যের ব্যাস প্রায় ৮৬৩ মাইল এবং রাজধানীও এক মস্ত শহর। এখানকার লোকরা সহজে রেগে যায়, আবার শীঘ্রই ক্ষমা করতে জানে। কোনও সেনাপতি যুদ্ধে হেরে গেলে তাকে শাস্তি দেওয়া হয় না, শুধু লজ্জা দেবার জন্য স্ত্রীলোকের কাপড় পরতে দেওয়া হয়।

চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী

চরিত্র ও বিক্রম

দেশবাসীর বৈশিষ্ট্য

এই চালুক্যদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন দক্ষিণের পল্লবরা। হিউয়েন সাঙ-এর ভ্রমণকালে পল্লব রাজা ছিলেন নরসিংহবর্মা। এই সময়ে দক্ষিণ ভারতে হিন্দুধর্ম ও শিল্প-সভ্যতার কেন্দ্র ছিল পল্লব রাজধানী কাঞ্চী। চালুক্য রাজাদের সঙ্গে নিয়তযুদ্ধ বিগ্রহ চললেও পল্লব রাজত্বে শিল্পকলার আশ্চর্য উন্নতি হয়। হিউয়েন সাঙ কাঞ্চীর পল্লব রাজার বিশেষ প্রশংসা করে গেছেন।

পল্লব রাজ্যের বর্ণনা

মধ্য যুগে বাঙলা ঃ বর্তমান 'পশ্চিমবঙ্গ' আর 'বাংলাদেশ' মিলে যতটা আয়তন, প্রাচীন বাঙলা তার চেয়েও কিছু বড় ছিল। উত্তরবঙ্গে পুন্ড্র ও বরেন্দ্রী, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও তাম্রলিপ্ত, দক্ষিণে ও পূর্বে সমতট হরিকেল প্রভৃতি অনেক-গুলি জনপদ ছিল। তা ছাড়া, উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গের কিছুটা অংশ গৌড় নামে পরিচিত ছিল। গুপ্তদের পতনের বেশ কিছুকাল পরে বাঙলায় স্থানীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। শশাঙ্ক হলেন বাঙলার প্রথম স্বাধীন ও প্রতাপশালী রাজা।

শশাঙ্ক ঃ শশাঙ্কের প্রথম জীবন সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। কেবল তিনি যে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের অধীনে একজন বড় সামন্ত ছিলেন, এ কথা অনুমান করা যায়। তাঁর রাজ্যকাল আরম্ভ হয় আন্দাজ ৬০৬ খ্রীস্টাব্দে, অর্থাৎ তিনি হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক। শশাঙ্কের রাজধানী ছিল কর্ণসুবর্ণ, মুর্শিদাবাদ জেলায় রাঙামাটি নামক জায়গায়। সমস্ত গৌড়ের উপর তাঁর আধিপত্য ছিলই, তার উপর দক্ষিণে মেদিনীপুর অঞ্চল (দন্ডভুক্তি), ওড়িশা (উৎকল) এবং গঞ্জাম জেলায় কঙ্গোদ রাজ্যও তিনি জয় করেন। পশ্চিম দিকে মগধ রাজ্যও তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। এ কথা সত্য, শশাঙ্কের আগে বাঙলার কোনও রাজার এতটা শক্তি ও প্রতিপত্তি হয়নি।

কর্ণসুবর্ণ

রাজ্যের আয়তন

একটি বড় রাজ্য স্থাপন করে শশাঙ্ক কনৌজে মৌখরিদের দমন করতে অগ্রসর হলেন। মৌখরি রাজা গ্রহবর্মার পরাজয়, থানেশ্বরের রাজা রাজ্যবর্ধনের সঙ্গে দেবগুপ্তের যুদ্ধ, শশাঙ্কের হাতে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যু—এ সব কথা আগেই পড়েছ। হিউয়েন সাঙ শশাঙ্ককে রাজ্যবর্ধনের হত্যার জন্য দায়ী করেছেন, তাঁকে বৌদ্ধ ধর্মের ঘোর শত্রু বলেছেন। এ বিষয়ে সঠিক কিছু বলা শক্ত, পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। কোনও কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ দেখিয়েছেন, হর্ষের সঙ্গে যুদ্ধের পরও শশাঙ্কের স্বাধীন প্রতাপ ক্ষুন্ন হয়নি এবং রাজত্বও নষ্ট হয়নি। মোট কথা শশাঙ্কই হলেন বাঙলার প্রথম বড় স্বাধীন রাজা, যিনি বুদ্ধিতে ও বাহুবলে বাঙলা বিহার ওড়িশায় প্রভুত্ব বিস্তার করে অনেক বছর রাজত্ব করে যান।

বাঙলার প্রথম বড় স্বাধীন রাজা

গুর্জর প্রতিহার রাজ্য

খৃস্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে রাজপুতদের প্রথম অভ্যুদয়। এই রাজপুতেরা কারা, কোথা থেকে এদের উৎপত্তি, তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন, রাজপুতরা শক হূণ প্রভৃতি বিদেশী জাতির বংশধর পাঞ্জাবে ও রাজস্থানে যে সব শক ও হূণ প্রভৃতি এসে বাস করছিল, কালক্রমে তারা হিন্দু সমাজে প্রবেশ-অধিকার পেয়ে ভারতীয় হয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে শক্তিমান দলগুলি আপনাদের সূর্য ও চন্দ্র বংশের সন্তান বলে পরিচয় দিতে থাকে। যুদ্ধনিপুণ শাসনপটু দলগুলি রাজপুত নামে প্রসিদ্ধ হয়। এদের মধ্যে চারটি বংশ দাবী করে, তারা এক পবিত্র যজ্ঞের অগ্নিকুণ্ড থেকে উদ্ভূত। এটি অবশ্য কিংবদন্তী ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং রাজপুত একটি আলাদা জাত নয়, বিভিন্ন উপজাতির দল বা গোষ্ঠী। শৌর্য বীর্যের জন্য তারা হিন্দু সমাজে ক্ষত্রিয় বলে গণ্য হয়। হূণদের মধ্যে সবচেয়ে প্রবল শাখা হল গুর্জর। তারাই প্রতিহার বা পরিহার বংশ প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্য গুর্জর-প্রতিহার নামে পরিচিত। এই বংশের অনেক বিখ্যাত বীর রাজা মুসলমান আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করেন।

হূণদের একটি শাখা গুর্জর

প্রতিহার বংশ প্রথমে ভিনমান নামক স্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করে। পরবর্তী কালে কনৌজ অধিকারের পর সেটি বিশাল প্রতিহার সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। খৃস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি প্রথম নাগভট্ট এই বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। চতুর্থ রাজা বৎসরাজ বীর যোদ্ধা ছিলেন কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুবের কাছে পরাস্ত হন। পঞ্চম নৃপতি দ্বিতীয় নাগভট্ট বাঙলার রাজা ধর্মপালকে হারিয়ে ধর্মপালের আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেন এবং কনৌজে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। এই তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধে তিনি শেষ পর্যন্ত হেরে যান। উত্তরে সিন্ধু দক্ষিণে অন্ধ্র, পশ্চিমে সৌরাষ্ট্র, আর পূর্বে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তিনি অধিকার করেন বলে শোনা যায়। এই সময়ে গুর্জর-প্রতিহার, রাষ্ট্রকূট ও পাল রাজবংশের মধ্যে কনৌজকে কেন্দ্র করে উত্তর ভারতের আধিপত্য লাভের জন্য ত্রিভুজের মত এক বিশাল সংঘর্ষের সূচনা হয়। এই ত্রিকোণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা খুব সম্ভবতঃ প্রচুর অর্থ ব্যয় ও লোকক্ষয় করে এবং এর ফলও স্থায়ী বা সার্থক হয় নি। কোনও পক্ষই সমগ্র ভারতের আধিপত্য লাভ করতে পারে নি, সকলেই ভেবেছিলেন যে কনৌজ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সীমা বৃদ্ধি করলে এবং উত্তরাপথের রাজধানী স্বরূপ ঐ নগরী অধিকার করলে সার্বভৌম শক্তি অর্জন করতে পারবে। গুর্জর প্রতিহার, পাল ও রাষ্ট্রকূট বংশে বিভিন্ন সময়ে একাধিক পরাক্রান্ত রাজার আবির্ভাব হয়েছে এবং তাঁরা একটি বৃহৎ আঞ্চলিক রাজ্যকে বৃহত্তম সাম্রাজ্যে

প্রথম নাগভট্ট

বৎরাজ

দ্বিতীয় নাগভট্ট

ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ

ত্রিকোণ সংঘর্ষ, মন্তব্য

পরিণত করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন কেউই কেন্দ্রীয় প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি এবং সাময়িক সাফল্য তাঁদের উচ্চাশায় উদ্‌ভ্রান্ত করে শুধু পরস্পরের মধ্যে নানারকম জোট সৃষ্টি করে। অথচ এই ত্রিশক্তির সমাবেশ যদি উত্তরে ও পশ্চিমে সংবন্ধ হত তা হলে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতে বিদেশী অভ্যুদয় ও প্রতিষ্ঠা আদৌ সম্ভব হত কি না সন্দেহ।

রামভদ্র, শ্রেষ্ঠ নরপতি মিহিরভোজ

দ্বিতীয় নাগভট্টের ছেলে রামভদ্র এবং পৌত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ মিহিরভোজ। ৮৩৬ খৃস্টাব্দ থেকে তিনি প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্ব করেন। প্রতিহার বংশের তিনিই শ্রেষ্ঠ নরপতি। তাঁর দীর্ঘ রাজত্বকালে সাম্রাজ্যের গৌরব ও প্রতিপত্তি অসম্ভব বৃদ্ধি পায়। হিমালয় থেকে নর্মদা এবং শতদ্রু নদী থেকে উত্তরবঙ্গে পাহাড়পুর পর্যন্ত তাঁর রাজ্য বিস্তৃত ছিল বলে প্রসিদ্ধি আছে। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা জেজকভুক্তির উদীয়মান

সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

চান্দেল্ল রাজ আর বঙ্গের পালরাজ ছিলেন তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বঙ্গ ও জেজকভুক্তি তাঁর কাছে পরাস্ত হয়, কিন্তু রাষ্ট্রকূট রাজার সঙ্গে যুদ্ধে তিনি কৃতকার্য হতে পারেননি। মিহির-

হিন্দু-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

ভোজের রাজত্বকালেই আরব বণিক সুলেমান তাঁর রাজ্যে বেড়াতে আসেন এবং তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদলের ও সাম্রাজ্যে শান্তিরক্ষার বিশেষ প্রশংসা করে যান। মিহিরভোজ 'আদিবরাহ' ও 'প্রভাস' নাম ধারণ করেন এবং হিন্দু সংস্কৃতির পরম পৃষ্ঠপোষক হন। তাঁর বহু-উপাধি-যুক্ত বিস্তর মুদ্রা দেখে তাঁর বিস্তৃত সাম্রাজ্য ও দীর্ঘ রাজত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

প্রথম মহেন্দ্র পাল, মহীপাল

মিহিরভোজের পুত্র প্রথম মহেন্দ্র পাল কৃতী রাজা ছিলেন। তাঁর সভাতেই 'কর্পূরমঞ্জরী'র বিখ্যাত কবি রাজশেখর থাকতেন। পরবর্তী রাজা মহীপালের রাজত্বকালেই মাসুদি নামে এক পর্যটক এই রাজ্যে বেড়াতে এসে রাজার উষ্ট্রদল ও সৈন্যশক্তির কথা উল্লেখ করে যান। কিন্তু রাষ্ট্রকূট নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দ তাকে পরাস্ত করে কনৌজ অধিকার করেন। চান্দেল্লরাজের সাহায্যে মহীপাল আবার স্ব-রাজ্য উদ্ধার করেন।

প্রতিহার শক্তির দুর্বলতা, রাজপুত রাজ্যের উৎপত্তি

কবি রাজশেখর ও 'চণ্ডকৌশিকে'র লেখক ক্ষেমীশ্বর অবশ্য কর্ণাটদেশের (রাষ্ট্রকূট) রাজার পরাজয়ের কথাই লিখেছেন। কিন্তু এই সময় থেকেই প্রতিহার বংশের অবনতি শুরু হয়। দেবপাল রাজ্যপাল প্রভৃতি কয়েকজন রাজা কোনও ক্রমে রাজ্য রাখেন বটে, কিন্তু প্রতিহার-শক্তির দুর্বলতার সুযোগে করদ ও মিত্র রাজারা স্বাধীন হয়ে দাঁড়ান। ফলে বিভিন্ন জায়গায় কয়েকটি রাজপুত রাজ্য গড়ে ওঠে। তাদের মধ্যে ধারা বা মালবের পরমার, বুন্দেলখণ্ডের (জেজকভুক্তির) চান্দেল্ল, মধ্য ভারতের চেদি, কনৌজের গহড়বাল বা রাঠোর, চহমান বা চৌহান, আর সোলাঙ্কি রাজ্যই প্রধান। প্রতিহার রাজারা উত্তর ভারতে প্রায় দু শ' বছর ধরে আধিপত্য ভোগ করেন।

তাঁরা যেমন বীর ও বিদ্যোৎসাহী, তেমনি শাসনপটু ছিলেন। অগণিত অশ্বারোহী সৈন্যবলেই তাঁরা মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করে স্বাধীনতা বজায় রাখেন। এই কারণেই ইতিহাসে তাঁদের খ্যাতি।

রাজপুত বংশগুলির মধ্যে কয়েকজন রাজা ইতিহাসে স্থায়ী আসন পেয়েছেন, যেমন লক্ষ্মীকর্ণ, দ্বিতীয় মূলরাজ, গোবিন্দচন্দ্র, মুঞ্জ ভোজরাজ ও বীর পৃথ্বীরাজ। এঁদের অনেকেই দুর্ধর্ষ তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিলেন। তাঁদের উৎসাহে সাহিত্য ও শিল্পকলারও যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। চান্দেল্ল রাজাদের সময় খাজুরাহোতে একাধিক প্রসিদ্ধ মন্দির তৈরি হয়। তাদের আশ্চর্য শিল্পরূপ ভারতীয় স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। আবু পর্বতের বিখ্যাত দিলওয়ারা মন্দিরের ভেতরের ছাদে অলিন্দে সর্বত্র রাজপুত যুগের জৈন শিল্পকলার অপরূপ সূক্ষ্ম কাজ দর্শককে মুগ্ধ বিস্মিত করে। রাজপুত (কাংড়া) চিত্রকলাও ভারতীয় চিত্রশিল্পের এক নতুন রীতি দেখায়। তা ছাড়া, রাজপুত পুরুষ ও রমণীদের বীরত্ব ও আত্মসম্মান চারণ কবিদের কণ্ঠে গাথা-সঙ্গীতে অমর হয়ে আছে। বিশাল গড় বা দুর্গ নির্মাণ, সর্দারদের উপর প্রভুত্ব, আশ্রিতদের প্রতিপালন আর্তজনের রক্ষা রমণীদের সম্মান, মুসলমানদের প্রতিরোধ—এগুলি হল রাজপুত চরিত্রের বিশেষত্ব। তেমনি আবার সামন্ত সমাজের কুফল, কলহে আর গৃহযুদ্ধে রাজপুত রাজ্যগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে মুসলিম শক্তির কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

সাহিত্য ও শিল্পকলা

কাংড়া চিত্রকলা

পাল-সেন যুগের বাংলা

গোপাল ঃ শশাঙ্কের পর বাঙলাদেশ আবার অনেক ছোট রাজ্যে ভাগ হয়ে যায় এবং এই সময়ের ইতিহাস জানা যায়নি। বাঙলার ইতিহাসে এটি এক শ' বছর ব্যাপী অন্ধকার যুগ। রাজাদের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ আর শত্রুদের আক্রমণের ফলে বাংলাদেশ দুর্দশাগ্রস্ত হয়। খৃস্টীয় অষ্টম শতকে যশোবর্ধন নামে কনৌজের রাজা নাকি গৌড় আক্রমণ করে পূর্ব ও মধ্য বাঙলা জয় করে নেন। ওদিকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্য ও তাঁর পৌত্র বিনয়াদিত্যের সঙ্গে গৌড়ের যুদ্ধ বেধেছিল। এই অরাজক অবস্থাকে সংস্কৃতে 'মাৎস্য-ন্যায়' বলা হয়। তার মানে, পুকুরে বড় বড় মাছ যেমন ছোট মাছগুলোকে খেয়ে ফেলে, নৈরাজ্যের সময় প্রবলরা তেমনি দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালায়। এই সংকটকালে দেশের প্রধান ব্যক্তিরা ও জনসাধারণ একত্র হয়ে গোপাল নামে এক যোগ্য দলপতিকে রাজা নির্বাচিত করেন, যাতে এই অরাজকতার অবসান হয়। অনুমান করা হয় ৭৩৫ খৃস্টাব্দে

শশাঙ্কের পর গৌড়ের অবনতি

বঙ্গে বিদেশী আক্রমণ

বাংলায় মাৎস্য-ন্যায়

গোপাল কর্তৃক বাংলায় রাজপদ লাভ

দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র ও বপ্যটের পুত্র গোপাল রাজপদে অভিষিক্ত হন। গোপালদেব সাধারণ বংশে জন্মেছিলেন, কিন্তু নিজগুণে বাঙলায় শান্তি শৃঙ্খলা এনে তিনি একটি দৃঢ় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। এই নিপুণ যোদ্ধা ও নেতা বাঙলায় যে প্রসিদ্ধ পালবংশ স্থাপন করে যান, সেই তাঁর প্রধান কীর্তি।

বাংলায় শান্তি ও শৃঙ্খলা

ধর্মপাল (৭৭৯-৮১৫): গোপালের পর তাঁরই ছেলে ধর্মপাল সিংহাসনে বসেন। ধর্মপাল বাঙলার সীমা ছাড়িয়ে পাঞ্জাবের জলন্ধর পর্যন্ত উত্তর ভারতের অনেক অঞ্চল জয় করেন। তাঁর রাজত্বকাল থেকেই পশ্চিমে গুর্জর-প্রতিহার ও দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট বংশের সঙ্গে বাঙলার পাল রাজাদের বহুদিন ধরে ত্রি-শক্তির লড়াই চলে। সকলেই চেয়েছিলেন, কনৌজ জয় করে উত্তর ভারতে একাধিপত্য বিস্তার করবেন। ধর্মপাল কনৌজের রাজা (গুর্জরদের মিত্র) ইন্দ্রায়ুধকে হারিয়ে দিয়ে নিজের বশ্য মিত্র চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। এই কীর্তি স্মরণীয় করবার জন্য তিনি এক বিরাট দরবার করেন যেখানে মৎস্য ভোজ মদ্র অবন্তী গান্ধার প্রভৃতি রাজ্যের রাজারা উপস্থিত হয়ে তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁর এই প্রতিপত্তি স্থায়ী হয়নি। দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট রাজা ধ্রুব (নিরুপম) এবং তৃতীয় গোবিন্দ ধর্মপালকে নাকি আর এক যুদ্ধে পরাস্ত করেছিলেন। তারপর প্রতিহার বংশের রাজা দ্বিতীয় নাগভট্ট ধর্মপালের মিত্র রাজা চক্রায়ুধকে তাড়িয়ে দিয়ে কনৌজে আবার নিজের প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

ত্রি-শক্তি সংঘর্ষ

কনৌজ দরবার

পরাজয়

দেবপাল (৮১৫-৮৫৪ খৃস্টাব্দ): ধর্মপালের ছেলে দেবপাল হলেন এই বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত তাঁর অধিকার বিস্তৃত হয়। গরুড়স্তম্ভ লিপিতে বলা হয়েছে, দেবপাল উৎকল (ওড়িশা), দ্রাবিড় হূণ, গুর্জর প্রভৃতি জাতির গর্ব খর্ব করেন (উৎকলিত উৎকল-কুলং খর্বীকৃত দ্রাবিড়-গুর্জর-দর্পং হৃতহূণগর্বং)। বাংলার সীমান্ত অঞ্চল কামরূপও তিনি জয় করেছিলেন। ওদিকে পালদের চিরশত্রু প্রতিহাররাজ রামভদ্র তাঁর কাছে পরাস্ত হন। দেবপালের খ্যাতি সাগরপারেও পৌঁছেছিল। সুমাত্রা-যবদ্বীপের শৈলেন্দ্র-বংশীয় মহারাজা বালপুত্রদেব দেবপালের কাছে দূত পাঠিয়েছিলেন। নালন্দা মহাবিদ্যাপীঠে বালপুত্রদেব একটি মঠ তৈরি করিয়ে দেন, তারই খরচের জন্য দেবপালের নিকট তিনি পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা করাতে দেবপাল সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন। মুদ্গিরিতে (মুঙ্গেরে) দেবপালের একটি বড় শিবির-গৃহ ছিল। বৌদ্ধ হলেও তিনি হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির অনাদর করতেন না। বাদল লিপি থেকে জানা যায়, গর্গদেব ও দর্ভপাণি নামে তাঁর দু-জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। দর্ভপাণি ও তাঁর পৌত্র কেদারমিশ্র সম্রাটকে বিজয় অভিযানে যথেষ্ট সাহায্য

দেবপালের সাম্রাজ্য

শৈলেন্দ্ররাজের দৌত্য

করেন। দেবপালের রাজত্বের বাঙলার যথেষ্ট গৌরব বৃদ্ধি হয়। প্রায় চল্লিশ বছর রাজত্বের পর তাঁর মৃত্যু হলে বাঙলার প্রতিপত্তি ক্রমশঃ কমতে থাকে। নবম শতাব্দীর শেষ দিকে প্রতিহার রাজা মহেন্দ্রপাল উত্তরবঙ্গ অধিকার করে নেন।

পালবংশের গৌরব

প্রথম মহীপাল : (৯২২-১০৪০) শূরপাল নারায়ণপাল প্রভৃতি কয়েকজন রাজার শাসনের পর প্রথম মহীপাল বাঙলা ও মগধের রাজা হন। ইতিমধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গে শূরবংশীয় এবং চন্দ্রবংশীয় রাজারা প্রবল হয়ে ওঠেন। শূরবংশের কয়েকজন রাজার নাম সাহিত্যে ও লেখমালায় উল্লিখিত আছে। এদের মধ্যে আদিশূরের খ্যাতি নানা কিংবদন্তীর সঙ্গে জড়িত। মহীপালের রাজ্যলাভের পূর্বে অর্থাৎ খৃস্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ দিকে কম্বোজ নামে এক জাতিও বাঙলা দেশ আক্রমণ করেছিল। এরা কোন জাতি, তা বলা কঠিন। কেউ বলেন তারা উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত থেকে আসেন। অনেকে বলেন, তারা তিব্বতের দিক থেকে এসেছিলেন, আবার অনেকে মনে করেন, তারা কাম্বোডিয়ার লোক। এ সময়ে দক্ষিণ ভারতের চোল বংশীয় রাজা প্রথম রাজেন্দ্র চোল পশ্চিমবঙ্গ আক্রমণ করেন। চোল রাজা 'গঙ্গাবিজয়ী' হয়েছিলেন বলে লিখে গেছেন, কিন্তু এ কাহিনী কতদূর সত্য বলা যায় না। মহীপাল দুর্বল রাজা ছিলেন না, তিনি পাল রাজ্যকে আসন্ন ধ্বংস থেকে রক্ষা করেছিলেন। মহীপালের নামের সঙ্গে জড়িত অনেক দীঘি ও নগর এখনও আছে। লোকে মহীপালের গান ও মহীপালের নাম এখনও উল্লেখ করে। মহীপালের পুত্র জয়পালের সময় চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বঙ্গ আক্রমণ করেন কিন্তু জয়পালের পুত্রের সঙ্গে চেদি রাজকন্যার বিবাহ হলে সন্ধি স্থাপিত হয়।

কম্বোজগণ কর্তৃক গৌড় আক্রমণ

চোল অভিযান, মন্তব্য

মহীপালের কীর্তি

মহীপালের পর থেকেই পাল রাজশক্তি ক্রমশঃ দুর্বল হয়ে পড়ে। নানাদিক থেকে বাঙলার উপর আক্রমণ হতে থাকে এবং দেশের ভেতরেও বিদ্রোহ হয়। এই সময় কৈবর্ত জাতি বিদ্রোহী হয়ে রাজা দ্বিতীয় মহীপালকে হত্যা করে এবং দিব্বোক বা দিব্য নামে এক কৈবর্ত দলপতিকে সিংহাসনে বসায়। দিব্বোকের ভাই ভীমও কিছুকাল বাঙলার একাংশে রাজত্ব করেন। কিন্তু সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত' থেকে জানা যায় যে, মহীপালের ভাই রামপাল আবার সিংহাসন দখল করেন। এই সাময়িক উত্থানের পর রামপালের মৃত্যু হলে মদনপালের সময় পালবংশের আধিপত্য লুপ্ত হয়।

ক্রমিক দৌর্বল্য, দিব্বোক, ভীম, রামপাল ও মদনপাল

সেন বংশ

পালবংশ প্রায় চার শত বছর রাজত্ব করেন। তারপর সেন বংশ নামে এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। সেন রাজাদের পূর্ব-পুরুষ ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট

দেশের লোক। এই বংশের সামন্তসেন ও হেমন্তসেন রাঢ় দেশে প্রবল হয়ে ওঠেন। তারপর সেনবংশের প্রথম রাজা বিজয়সেন পালবংশের শেষ রাজাকে পরাস্ত করে সমস্ত বঙ্গ, কামরূপ ও মিথিলা জয় করেন। এই সময় থেকেই বাঙলায় সেন-রাজত্বের আরম্ভ। পাল রাজারা ছিলেন বৌদ্ধ, সেন রাজারা হিন্দু।

সেনদের উৎপত্তি, বিজয়সেন, হিন্দু-রাজ

বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন পিতার রাজ্য আরও বৃদ্ধি করেছিলেন। তাঁর রাজ্য রাঢ় বা পশ্চিমবঙ্গ, বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গ, মিথিলা বা উত্তর বিহার, বঙ্গ ও বাগাড়ি এই কয়ভাগে বিভক্ত ছিল। বল্লালসেন রাজা হিসেবে তো বটেই, পণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী-রূপেও বাঙলার ইতিহাসে সুপরিচিত। নানা শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল। সংস্কৃত ভাষায় 'অদ্ভুতসাগর' নামে একটি জ্যোতিষশাস্ত্রের বই ও 'দানসাগর' নামে একটি স্মৃতিশাস্ত্রের বই তিনি লিখেছিলেন। সমাজ-সংস্কার করেছিলেন বলেও তাঁর প্রসিদ্ধি আছে। তিনি বাঙলার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যদের মধ্যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করেন। আচার-ব্যবহার ও পাণ্ডিত্য দেখে তিনি কতকগুলি বংশকে 'কুলীন' পদবী দেন।

বল্লালসেন, কীর্তি-কথা

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন প্রায় ষাট বছর বয়সে রাজা হন ও আশী বছর বয়স পর্যন্ত রাজত্ব করেন। যৌবনে তিনি বীরত্বের পরিচয় দেন এবং উড়িষ্যা কাশী কামরূপ ও মগধ জয় করেন। কাশী প্রয়াগ ও পুরীতে তিনি জয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। ধর্মপাল ও দেবপালের পর আর কোনও রাজাই লক্ষ্মণসেনের মতন কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। লক্ষ্মণসেন পিতার মতই পণ্ডিত ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন। লক্ষ্মণসেনের প্রধান রাজধানী ছিল গৌড়ে বা মালদহ জেলায়, নাম লক্ষ্মণাবতী। আর এক রাজধানী ছিল গঙ্গাতীরে নদীয়ায়। লক্ষ্মণসেনের বৃদ্ধবয়সে মুসলমানরা উত্তর ভারত জয় করে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয় এবং লক্ষ্মণাবতী অধিকার করে নেয়।

লক্ষ্মণসেন, রাজ্যজয়, দুই রাজধানী

মুসলমানদের বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে কাহিনী প্রচলিত আছে যে, মহম্মদ ঘুরীর এক তুর্কী সেনাপতি বখ্তিয়ার মাত্র আঠার জন অশ্বারোহী নিয়ে নদীয়া নগর কৌশলে দখল করে নেয়। ভয়ত্রস্ত বৃদ্ধ রাজা তখন নগর ত্যাগ করে পালিয়ে যান। কিন্তু এ কাহিনী সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। মিন্হাজউদ্দীন তাঁর ইতিহাসে মগধ ও গৌড় জয়ের এই বিবরণ দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাঁর বিবরণ লোকমুখ থেকে শুনে লেখা, তাও এই ঘটনার চল্লিশ বছর পরে শোনা। বখ্তিয়ারের এই দিনের অভিযানে কেবল 'নদীয়া' নগরটিই দখল করা হয়। লক্ষ্মণসেনের বংশধরেরা পূর্ববঙ্গে অনেক দিন রাজত্ব করেছিলেন, তার পর মুসলমানরা সমগ্র বঙ্গ অধিকার করে। তবে বখ্তিয়ার বাঙলা দেশে এসে সর্বপ্রথম মুসলিম শাসনের ভিত্তি স্থাপন করেন, এটুকু বলা যায়। মিন্হাজ কিন্তু 'রায়-লখমনিয়া' বা লক্ষ্মণসেনকে 'হিন্দুস্থানের

মুসলিমগণের বঙ্গবিজয়-কাহিনী, সমালোচনা, লক্ষ্মণসেনের প্রকৃত পরিচয়

খলিফা স্থানীয়' বলে বর্ণনা করেছেন এবং তাঁর দানশীলতা ও শাসননীতির যথেষ্ট সুখ্যাতি করেছেন। সুতরাং লক্ষ্মণসেন যে ঐ সময় উত্তর ভারতের হিন্দুরাজাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

দাক্ষিণাত্য

বাদামি বা বাতাপির চালুক্যগণ ঃ গুপ্তরাজারা কিংবা তাঁদের বংশধরগণ কেউই দাক্ষিণাত্য কিংবা তামিল প্রদেশ জয় করতে পারেন নি, সাতবাহনের পতনের পর ষষ্ঠ শতাব্দীতে চালুক্যবংশীয় রাজারা মধ্য ভারতে প্রবল হয়ে বাদামি বা বাতাপি নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। এই চালুক্য বংশের উৎপত্তি কিছু রহস্যাবৃত। চালুক্যরাজারা নিজেদের সূর্যবংশীয় বলে পরিচয় দিতেন। কিংবদন্তী অনুযায়ী এঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয় এবং উত্তরাপথ থেকে আগত। হিউয়েন সাঙ দ্বিতীয় পুলকেশীকে ক্ষত্রিয় বংশজাত বলেছেন। ভিনসেণ্ট স্মিথ মনে করেন চালুক্য বা সোলাঙ্কিরা গুর্জর জাতির এক শাখা 'চাপ'দের সঙ্গে সম্পর্কিত। রাজপুতানা থেকে এরা দাক্ষিণে এসে বসবাস করেন। এই অনুমানের কিন্তু কোনও ভিত্তি নেই। সম্ভবতঃ চালুক্যরা স্থানীয় গোষ্ঠী এবং দাক্ষিণাত্যে রাষ্ট্রকূটদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ করে ঐ অঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করে। চালুক্যবংশের প্রথম রাজা জয়সিংহ রাষ্ট্রকূট-রাজ ইন্দ্রকে পরাস্ত করেন। তাঁর পুত্র প্রথম পুলকেশী বাতাপি নগরে রাজধানী স্থাপন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁর পুত্র প্রথম কীর্তিবর্মা নাকি অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেন, তবে তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র ও ভ্রাতার মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। প্রথম কীর্তিবর্মার পুত্র ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চালুক্যকুলতিলক দ্বিতীয় পুলকেশী।

বাদামি বা বাতাপির চালুক্যগণ

উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মত

তবে কীর্তিবর্মার মৃত্যু হলে তাঁর ভ্রাতা মঙ্গলেশ ভ্রাতুষ্পুত্রকে সরিয়ে সিংহাসন দখল করেন কিন্তু শেষকালে তাঁর হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্ব আরম্ভ হয় যুদ্ধবিগ্রহ করে এবং শেষ হয় পল্লবরাজের সঙ্গে সংঘর্ষে। প্রথমেই তিনি ভীমা নদীর ওপারে কদম্বদের রাজধানী বৈজয়ন্তী বা বনবাসী অধিকার করেন এবং কোঙ্কন প্রদেশও জয় করেন। পিতৃব্যের সঙ্গে দ্বন্দ্ব, হর্ষের সঙ্গে সংঘর্ষ, দাক্ষিণাত্যে সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রচেষ্টায় পশ্চিম দিকে লাট গুর্জর মালব এবং পূর্বদিকে কোশল কলিঙ্গ আর দাক্ষিণে পল্লব চোল ও কেরল প্রভৃতি রাজ্যের সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধেই তাঁর জীবনের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়।

চালুক্যবংশের প্রধান নরপতি দ্বিতীয় পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে হর্ষবর্ধনকে প্রতিরোধ করে দক্ষিণ মালব ও গুজরাট প্রদেশ জয় করেন এবং দাক্ষিণে পান্ড্য কেরল ও চোলরাজ্যে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা করেন। ঐ সকল রাজ্য জয় করতে গিয়ে তাঁকে সুদূর দাক্ষিণের পল্লবদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। দ্বিতীয় পুলকেশী পল্লবরাজ মহেন্দ্রবর্মাকে পরাজিত করে নিজের আধিপত্য স্থাপন করেন।

কথিত আছে, পারস্যরাজ খসরুর সঙ্গে তাঁর দৌত্য-বিনিময় হয়। শেষ জীবনে কিন্তু পুলকেশী সুখী হতে পারেন নি এবং তাঁর প্রাধান্যও

দ্বিতীয় পুলকেশী

স্থায়ী হয় নি। পল্লবরাজ প্রথম নরসিংহবর্মা সততই প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য উদ্যত ছিলেন। সুযোগ পেয়ে তিনি পুলকেশীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন ও তাঁকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করে (৬৪২ খৃস্টাব্দে) বাতাপি নগর আগুন লাগিয়ে দেন। এই যুদ্ধেই সম্ভবত পুলকেশী নিহত হন।

বেঙ্গির চালুক্যগণ

এ দিকে তাঁর অনুজ বিষ্ণুবর্ধন বেঙ্গিতে চালুক্যবংশেরই এক শাখা 'পূর্ব চালুক্য' নামে স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশীর উত্তরাধিকারী হলেন প্রথম বিক্রমাদিত্য। কাঞ্চী নগর দখল করে তিনি পিতৃপরাজয়ের প্রতিশোধ তোলেন। পল্লবদের সঙ্গে সংঘর্ষ বহু দিন ধরে চলতে থাকে। অনেক বছর পরে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের সময় চালুক্যদের গৌরব কিছুটা ফিরে আসে। ইনিই শেষ পরাক্রান্ত চালুক্য নৃপতি। পল্লবরাজ নন্দিবর্মাকে এক ঘোরতর যুদ্ধে পরাস্ত করে ইনি কাঞ্চী অধিকার করতে সমর্থ হন। তাঁর পুত্র বিনয়াদিত্য, বিনয়াদিত্যের পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মা। দ্বিতীয় কীর্তিবর্মার রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূটরাজ দন্তিদুর্গ ৭৫৩ খৃষ্টাব্দে চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করলে চালুক্যদের গৌরব অস্তমিত হয়। চালুক্যদের যুদ্ধবিগ্রহে শৌর্য-বীর্যেই খ্যাতি, সাংস্কৃতিক দান তেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নয়। তবে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক ধর্মাবলম্বী ছিলেন, বৌদ্ধ জৈন পণ্ডিতদের সমাদর করতেন এবং কয়েকটি জায়গায় প্রস্তর মন্দির নির্মাণ করান।

রাষ্ট্রকূট বংশ

উৎপত্তি ঃ রাষ্ট্রকূটদের উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ আছে। রাষ্ট্রকূট অনুশাসন-লিপিতে তাঁরা যদুবংশীয় সাত্যকির বংশধর বলে বর্ণিত হয়েছেন। কেউ বলেন তাঁরা ছিলেন দ্রাবিড় কৃষক। সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্যদের সামন্ত ছিলেন এবং তাঁদের ভাষা ছিল কানাড়া।

চালুক্যগণ বাতাপি নগরে প্রায় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তারপর ৭৫২ খ্রীস্টাব্দে দন্তিদুর্গ নামক এক দলপতির অধীনে রাষ্ট্রকূটগণ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্তিবর্মাকে পরাস্ত করে সমগ্র মহারাষ্ট্র

দন্তিদুর্গ

অধিকার করেন। দন্তিদুর্গ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এই রাষ্ট্রকূট বংশ ৯৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। দন্তিদুর্গ 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

দন্তিদুর্গের পর প্রথম কৃষ্ণ সিংহাসনে আরোহন করেন। ৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চালুক্যরাজ্য আক্রমণ করে চালুক্য রাজ্যের অবসান

প্রথম কৃষ্ণ

ঘটান। তাঁর আমলে ইলোরার কৈলাসনাথের মন্দির নির্মিত হয়। প্রথম কৃষ্ণ ৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

প্রথম কৃষ্ণের পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে বসেন। তিনি ৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৭৮০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ৭৮০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর ভ্রাতা ধ্রুব তাঁকে পরাস্ত করে সিংহাসন অধিকার করেন।

দ্বিতীয় গোবিন্দ

ধ্রুব (৭৮০—৭৯৩ খ্রীঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেই রাজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। তাঁর আমলে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের বিস্তার ঘটে এবং রাষ্ট্রকূট শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে।

ধ্রুব

তৃতীয় গোবিন্দ (৭৯৩—৮১৪ খ্রীঃ): ধ্রুবের পর তাঁর ভ্রাতা তৃতীয় গোবিন্দ সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমনে লিপ্ত হন। বিদ্রোহ দমনের পর তিনি রাজ্যজয়ে উদ্যোগী হন। এবং পল্লবরাজ ও বেঙ্গীরাজকে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেন। অতঃপর তৃতীয় গোবিন্দ উত্তর ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে অগ্রসর হন। প্রতিহার-রাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট তাঁর হাতে পরাস্ত হ'য়ে রাজপুতানায় আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ধর্মপাল ও তাঁর সামন্ত কনৌজের চক্রায়ুধকে বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য করেন। উত্তর ভারতের আরও অনেক রাজা তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। তিনি যখন উত্তর ভারত অভিযানে ব্যস্ত ছিলেন, তখন দক্ষিণ ভারতের চোল পাণ্ড্য কেরল, পল্লব প্রভৃতি শক্তিগুলি তাঁর বিরুদ্ধে এক শক্তিসংঘ গঠন করেছিল। তৃতীয় গোবিন্দ তাদের পরাস্ত করেন। সিংহলরাজও তাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। ফলে সমগ্র দক্ষিণ ভারতে রাষ্ট্রকূট প্রভুত্ব স্থাপিত হয়। তৃতীয় গোবিন্দ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা।

তৃতীয় গোবিন্দ

প্রথম অমোঘবর্ষ (৮১৪—৮৭৭ খ্রীঃ): তৃতীয় গোবিন্দের পর তাঁর পুত্র প্রথম অমোঘবর্ষ নাবালক অবস্থায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ দেখা দেয়। তিনি বিদ্রোহ দমন করে সাম্রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনেন। বিদ্যোৎসাহিতা, পরধর্ম-সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণে তিনি গুণান্বিত ছিলেন। আরব পর্যটক সুলেমান অমোঘবর্ষের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

প্রথম অমোঘ বর্ষ

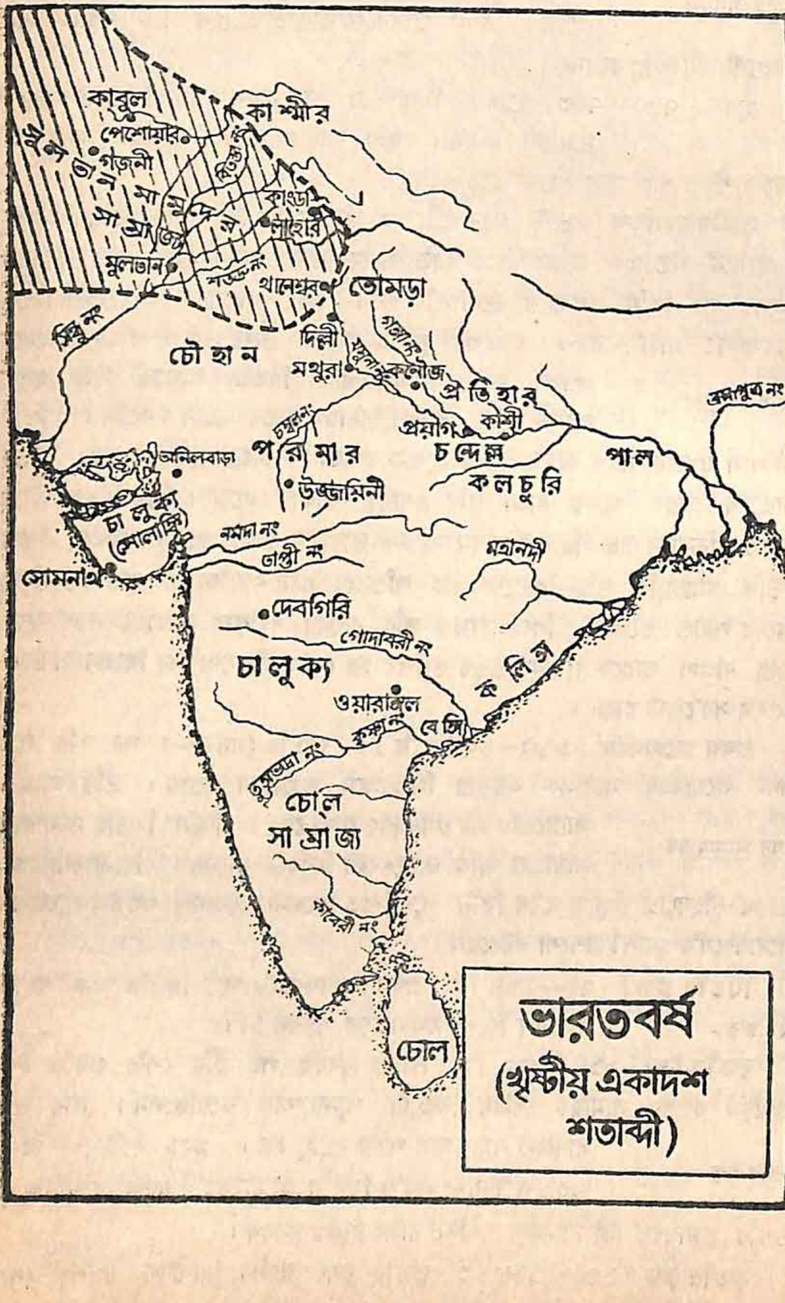
দ্বিতীয় কৃষ্ণ (৮৭৮—৯১৪): প্রথম অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয় কৃষ্ণ শাসক হিসাবে বিশেষ সফল হতে পারেন নি।

দ্বিতীয় কৃষ্ণ

তৃতীয় ইন্দ্র (৯১৪—৯২২): দ্বিতীয় কৃষ্ণের পর তাঁর পৌত্র তৃতীয় ইন্দ্র রাষ্ট্রকুট বংশের সামরিক গৌরব কিছুটা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। তাঁর পর রাষ্ট্রকূট সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। ৯২২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ ও তৃতীয় অমোঘবর্ষ এই তিনজন রাষ্ট্রকূট রাজা রাজত্ব করেন।

তৃতীয় ইন্দ্র

তৃতীয় কৃষ্ণ (৯৪০—৯৬৮): তৃতীয় কৃষ্ণ ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক। ডাঃ আলতেকার বলেন, 'আর কোন রাষ্ট্রকূট রাজা



ভারতবর্ষ (খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দী)

তাঁর মত সম্পূর্ণভাবে দাক্ষিণাত্য জয় করেন নি।' তৃতীয় গোবিন্দ মহীশূর বা গঙ্গাবাদি এবং উত্তরে কালাঞ্জর ও চিত্রকূট অধিকার করেন। তিনি চোল, পাণ্ড্য ও কেরলদেরও পরাস্ত করেন এবং রামেশ্বরে একটি মন্দির স্থাপন করেন। তাঁর দ্বিতীয় বারের উত্তর ভারত অভিযানে মালব উজ্জয়িনী ও বুন্দেলখণ্ড রাষ্ট্রকূট অধিকারে আসে। তাঁর মৃত্যুর পর রাষ্ট্রকূট বংশ পতনের দিকে দ্রুত ধাবিত হয় এবং ৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে কল্যাণীর চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় তৈল শেষ রাষ্ট্রকুট রাজ কর্ককে পরাস্ত ও নিহত করে রাষ্ট্রকুট শাসনের অবসান ঘটান।

তৃতীয় কৃষ্ণ

কল্যাণের চালুক্য বংশ ঃ রাষ্ট্রকূটদের অবসানের পর কল্যাণের চালুক্য বংশ দাক্ষিণে মধ্যভারতে ও কর্নাটে রাজত্ব করেন। কল্যাণ ছিল চালুক্যদের রাজধানী এবং তৈল ৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এই বংশের প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশে অনেক যোদ্ধা ও বিজয়ী রাজার জন্ম হয়। সোমেশ্বরের পুত্র ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য এই বংশের প্রধান নরপতি (১০৭৬—১১২৭) এবং তিনি চোলদেরকে পরাস্ত করেন। তিনি চোলরাজ কুলোতুঙ্গকে পরাস্ত করে চোল রাজধানী দখল করেন। হয়সল রাজবিষ্ণুবর্ধনও তাঁর কাছে পরাজিত হন এবং তিনি মহীশূরের একাংশ দখল করেন। বিজয়কাহিনীর বর্ণনা সভাকবি বিহ্লনের 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' নামক গ্রন্থে পাওয়া যায়। তিনি সুপণ্ডিত ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'মিত্রাক্ষরা' গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁর রাজসভা অলংকৃত করেছিলেন। ১১৯০ খ্রীস্টাব্দে এই বংশের রাজত্বের অবসান হয়। কল্যাণের চালুক্যদের সঙ্গে চোলরাজাদের বহুদিন সংঘর্ষ চলে। দীর্ঘ বিরোধের ফলে চালুক্য শক্তির পতন হলে বরঙ্গলে কাকতীয়, মহারাষ্ট্রে যাদব ও মহীশূরে হয়সল বংশ প্রাধান্য লাভ করে।

ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য

দক্ষিণ ভারত

কাঞ্চীর পল্লব বংশ ঃ পল্লবদের আদিভূমি ও উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে প্রচুর মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন বিদেশী পহ্লবগণ থেকে পল্লবদের উৎপত্তি। কিন্তু শুধু নামের সাদৃশ্য দেখে এরূপ অনুমান যুক্তি সঙ্গত নয়। ডাঃ জয়স্বল বলেন, পল্লবরা দ্রাবিড় নয়, বিদেশীও নয়। তাঁরা উত্তর ভারত থেকে আগত সদবংশীয় ব্রাহ্মণ এবং নাগবংশের সঙ্গে এঁদের কিছু রক্ত মিশ্রণ আছে। ডাঃ আয়েঙ্গার কিন্তু মনে করেন পল্লবগণ সাতবাহনদের অধীনস্থ এক সামন্তকূল। আধুনিক গবেষণার সিদ্ধান্ত অনুসারে পল্লবদের আদিভূমি তোণ্ডমণ্ডলম। মৌর্যদের পতনের পর তাঁরা সাতবাহনদের করদ রাজ্যে পরিণত হন। মৌর্য ও সাতবাহনদের সঙ্গে সংস্পর্শের ফলে পল্লবদের সভ্যতা উত্তরভারতীয় সংস্কৃতি অর্জন করে। সম্ভবত এই বৈশিষ্ট্যের জন্য, তাঁদের দ্রাবিড়-বহির্ভূত বলে মনে করা হয়।

উৎপত্তি সম্পর্কে মতভেদ

পল্লবদের প্রথম উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন শিবস্কন্দ বর্মা। অমরাবতী থেকে বেলারি পর্যন্ত তাঁর রাজ্যসীমা ছিল। তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন বলে জনশ্রুতি আছে। তারপর সমুদ্রগুপ্তের দাক্ষিণ অভিযানের সময় বিষ্ণু গোপ ছিলেন পল্লবদের রাজা। বিষ্ণুগোপ সমুদ্রগুপ্তের কাছে পরাস্ত হন। বিষ্ণুগোপ ৩৫০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৩৭৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। পরবর্তী দীর্ঘ সময়ের কোন সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন সনদগুলি থেকে অনেক রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু আর কিছুই জানা যায় না। সিংহবর্মণ নামে এক পল্লব রাজা ৪৩৬ খ্রীস্টাব্দে পল্লব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন এবং সম্ভবতঃ তিনি ছিলেন বৌদ্ধ মতের অনুসারী।

শিবস্কন্দ বর্মা

বিষ্ণুগোপ

সিংহবর্মণ

খ্রীস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে সিংহবিষ্ণু পল্লবদের গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। এই সময় থেকে পরবর্তীকালের পল্লব ইতিহাস মোটামুটি ধারাবাহিক ও নির্ভরযোগ্য। সিংহবিষ্ণু ৫৭৫ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি কাবেরী নদী পর্যন্ত পল্লবরাজ্য বিস্তৃত করেন। শোনা যায় তিনি সুদূর দাক্ষিণের ও সিংহলের রাজাদের পরাস্ত করেছিলেন। 'কিরাতার্জুনীয়' গ্রন্থের স্রষ্টা কবি ভারবি সিংহবিষ্ণুর সভাকবি ছিলেন।

সিংহবিষ্ণু

সিংহবিষ্ণুর পুত্র প্রথম মহেন্দ্র বর্মণ ৬০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। তাঁর আমলে চালুক্য পল্লব সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনি পল্লব রাজ্যের আয়তন ও গৌরব বৃদ্ধি করেন।

প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ

প্রথম নরসিংহ বর্মণ (৬৩০—৬৬৮ খ্রীস্টাব্দ)—মহেন্দ্রবর্মণের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র পল্লব সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং 'মহামল্ল' উপাধি গ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন পল্লব বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত করে দাক্ষিণ ভারতে পল্লব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। 'মহাবংশ' নামক বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে জানা যায় তিনি নৌ-অভিযান পাঠিয়ে তাঁর বন্ধু মানবর্মণকে সিংহলের সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। হিউয়েন সাঙ-এর বিবরণীতে পল্লব রাজ্যের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধির উল্লেখ আছে।

প্রথম নরসিংহবর্মণ

দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ (৬৬৮—৬৭০)—প্রথম নরসিংহবর্মণের পর কিছু দিনের জন্য পল্লব কীর্তি ম্লান হয়ে যায়। তাঁর পুত্র দ্বিতীয় মহেন্দ্র বর্মণ মাত্র দু'বছর রাজত্ব করেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রথম পরমেশ্বরবর্মণ (৬৭০—৬৯৫) রাজা হন। এই সময় চালুক্য রাজ প্রথম বিক্রমাদিত্য পল্লবগণকে পরাস্ত করে কাঞ্চী অধিকার করেন।

দ্বিতীয় মহেন্দ্রবর্মণ ও প্রথম পরমেশ্বর বর্মণ

দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণ (৬৯৫—৭২২ খ্রীঃ)—প্রথম পরমেশ্বরবর্মণের পর তাঁর

দ্বিতীয় নরসিংহ বর্মণ, দ্বিতীয় পরমেশ্বর বর্মণ

পুত্র দ্বিতীয় নরসিংহবর্মন পল্লব সিংহাসনে বসেন এবং 'রাজসিংহ' উপাধি গ্রহণ করেন। বিখ্যাত কৈলাসনাথ মন্দিরটি তাঁর আমলে নির্মিত হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মণ ৭৩০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ (৭৩০—৭৯৬ খ্রীস্টাব্দ): পরবর্তী পল্লবরাজ দ্বিতীয়

দ্বিতীয় নন্দীবর্মণ

নন্দীবর্মণের আমলে পুনরায় পল্লব-চালুক্য সংঘর্ষ শুরু হয়। চালুক্যদের কাছে বারবার পরাস্ত হলেও তিনি রাজ্য অক্ষুন্ন রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আমলে রাষ্ট্রকূট-পল্লব সংঘর্ষ শুরু হয়।

পরবর্তী পল্লবরাজ দন্তিবর্মণ (৭৯৬—৮৪০ খ্রীস্টাব্দ) পাণ্ড্য ও রাষ্ট্রকূটদের কাছে পরাস্ত হন। তাঁর পর তৃতীয় নন্দীবর্মন পান্ড্যদের কাছে পরাস্ত হন। পল্লব বংশের শেষ রাজা অপরাজিতও সার্থকনামা ছিলেন না। ৮৯১ খ্রীস্টাব্দে পল্লব সামন্ত আদিত্য চোল অপরাজিতকে পরাজিত করেন এবং পল্লব-রাজ্য অধিকার করেন। ফলে পল্লব শাসনের অবসান ঘটে।

তাঞ্জোরের চোল বংশ: ভারতের সর্বদক্ষিণে চোলরা রাজত্ব করতেন। পল্লবদের পতনের পর চোলদের উত্থান হয়। চোলরা জলে ও স্থলে বিশেষ পরাক্রান্ত ছিলেন। রাজরাজ চোল সিংহলের কিয়দংশ, মালদ্বীপ ও লাক্ষাদ্বীপ জয় করেন।

সুদূর দক্ষিণে চোলবংশ

রাজেন্দ্র চোলদেব মহীপালের সময় বাঙলা দেশ আক্রমণ করেন ও নৌসৈন্যের সাহায্যে ব্রহ্মদেশের কিয়দংশ জয় করে সুমাত্রার শ্রীবিজয় রাজ্য আক্রমণ করেন। ক্রমে চোলরাজ্য বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং মাদুরায় পান্ড্যেরা স্বাধীন হয়। চতুর্দশ শতাব্দীর তুর্কীরা সুদূর দক্ষিণ ভারত অধিকার করে।

নবম শতাব্দীতে বিজয়ালয় চোল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি পান্ড্যদের

বিজয়ালয় প্রথম আদিত্য

কাছ থেকে তাঞ্জোর দখল করেন এবং সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন। বিজয়ালয়ের পুত্র প্রথম আদিত্য (৮৮০—৯০৭ খ্রীস্টাব্দ) চোলবংশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তাঁর আমলে চোলরাজ্য উত্তরে মাদ্রাজ থেকে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রথম আদিত্যের পুত্র প্রথম পরান্তক (৯০৭—৯৫৪ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন দক্ষিণ

প্রথম পরান্তক

ভারতে চোল শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। তিনি পাণ্ড্যরাজ্য দখল করেন। তবে তিনি রাষ্ট্রকূটরাজ্য তৃতীয় কৃষ্ণের হাতে পরাজিত হন। চোল রাজ্য সাময়িকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে।

কিন্তু চোলরাজ প্রথম রাজরাজের (৯৮৫—১০১৪ খ্রীঃ) আমলে চোলগণ পুনরায় শক্তিশালী হয়ে উঠে। 'তাঞ্জোর লিপি'তে তাঁর অসামান্য সামরিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর আমলে চোল নৌ-বাহিনী চের নৌবাহিনীকে ধ্বংস

করে। তিনি চের ও পাণ্ড্য রাজগণকে পরাজিত করেন এবং মাদুরা অধিকার করেন। এক বিরাট নৌবাহিনী প্রেরণ করে তিনি সিংহলের উত্তরাংশ অধিকার করেন। তিনি বেঙ্গীর চালুক্য-রাজ বিনয়াদিত্যকে আনুগত্য স্বীকারে বাধ্য করেন। সমগ্র মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী, কুর্গ, মহীশুরের কিয়দংশ, সিংহলের একাংশ এবং মালদ্বীপ তাঁর অধীনে আসে। লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপের উপর প্রভুত্ব স্থাপনে রাজরাজের শক্তিশালী নৌবাহিনী যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল। আরব সমুদ্রের পথে আরব অনুপ্রবেশের পথ বন্ধ করে রাজরাজ ভারত ইতিহাসের গতি পরিবর্তন করে দেন। বঙ্গোপসাগর চোল-হ্রদে পরিণত হয়। নৌশক্তি ও নৌ-সাম্রাজ্যের জন্য রাজরাজ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে এক অনন্য স্থান লাভ করেছেন।

প্রথম রাজরাজ

প্রথম রাজেন্দ্র ঃ (১০১৪—১০৪৪ খৃীঃ)—রাজরাজের পুত্র প্রথম রাজেন্দ্র বা রাজেন্দ্র চোলদেব গঙ্গই কোণ্ড ছিলেন চোলবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি চোল সাম্রাজ্যের আয়তন ও প্রতিপত্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি করেন। তিনি সমগ্র সিংহল অধিকার করেন এবং পাণ্ড্য ও কেরল রাজ্য নিজ শাসনাধীনে আনেন। অতঃপর তিনি উত্তর ভারতে বিস্তার নীতি অনুসরণ করেন এবং পাল-রাজ প্রথম মহীপালকে পরাস্ত করে 'গঙ্গই কোণ্ড' উপাধি গ্রহণ করেন। রাজেন্দ্র তাঁর শক্তিশালী নৌবাহিনীর সাহায্যে নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, পেগু ও মালয় উপদ্বীপ অধিকার করেছিলেন। তিনি পিতার ন্যায় সিংহল কেরল ও পাণ্ডরাজ্য থেকে আরব-বণিকদের বিতাড়নের নীতি গ্রহণ করেছিলেন। ফলে চোল নৌবহর বঙ্গোপসাগরে গুরুত্ব লাভ করে। রাজেন্দ্রের সব চেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল দক্ষিণ এসিয়ায় চোল সাম্রাজ্য স্থাপন।

প্রথম রাজেন্দ্র

রাজেন্দ্রের পর রাজাধিরাজ ও অধিরাজেন্দ্র কিছুকাল রাজত্ব করেন। রাজেন্দ্র চোলের দৌহিত্র তৃতীয় রাজেন্দ্র চোল কুলোতুঙ্গ চোল বংশের শেষ কীর্তিমান নরপতি। কল্যাণের চালুক্যরাজ এবং উড়িষ্যার গঙ্গরাজ্যের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ হয়। তারপর বিশাল চোল সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাণ্ড্যরাজগণ প্রবল হয়ে ওঠেন।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম শতাব্দী থেকে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

পাল ও সেন যুগ ঃ পাল যুগের খলিমপুর, জাজিলপুর, বাদল, গরুড়স্তম্ভ ও মুঙ্গের লিপি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। দেবপাল উৎকল, দ্রাবিড়, গুর্জর ও হূণদের দর্প চূর্ণ করেছিলেন বলে গরুড়স্তম্ভ লিপিতে উল্লেখ আছে। কিন্তু শিলালিপি ছাড়াও পাল ও সেন যুগের সমৃদ্ধ সাহিত্য ঐ যুগের সমাজ ও সংস্কৃতির প্রকৃত চিত্র তুলে ধরে।

সংস্কৃত সাহিত্যচর্চা

চিকিৎসা-শাস্ত্র

সাহিত্য ঃ পালদের আমলে লুইপাদ কাহ্নপাদ প্রভৃতি বৌদ্ধ গুরুদের লেখা চর্যাপদগুলি সবচেয়ে পুরানো বাংলা ভাষার নমুনা। পণ্ডিতরা বলেন এই সব বৌদ্ধ দোঁহা ও গান থেকেই আমাদের বৈষ্ণব ও বাউল গানের উৎপত্তি। পাল যুগে বাঙলায় অনেক বড় পণ্ডিত ও লেখক জন্মেছিলেন। প্রথমে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চার কথা বলি। পাল রাজাদের তাম্র-শাসনগুলিতে সংস্কৃত শ্লোক থেকেই তা প্রমাণ হয়। দেবপালের মন্ত্রী দর্ভপাণি, কেদার মিশ্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণরা নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। আর এক দর্শনশাস্ত্রের পণ্ডিত হলেন, শ্রীধরভট্ট, এঁর নিবাস ছিল ভরসুট গ্রামে। চিকিৎসা-শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার চক্রপাণি দত্ত, বঙ্গসেন ও

কাব্য ও ইতিহাস

সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত

ধর্মশাস্ত্রেও কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিত লেখকের পরিচয় পাওয়া গেছে। আর কাব্য-রচনায় একমাত্র বড় কবি হলেন সন্ধ্যাকর নন্দী, যাঁর লেখা 'রামচরিত' একাধারে কাব্য ও ইতিহাস।

ধোয়ী, জয়দেব

হলায়ুধ

সেন যুগেও সংস্কৃত সাহিত্যের যথেষ্ট চর্চা ও প্রসার হয়েছিল। বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের রচনার কথা আগেই বলা হয়েছে। শরণ, গোবর্ধন, উমাপতি ধর, 'পবন-দূত' কাব্যের কবি ধোয়ী আর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যের অমর কবি জয়দেব, এঁরা ছিলেন লক্ষ্মণসেনের রাজসভার পঞ্চরত্ন। পরমবৈষ্ণব জয়দেবের কৃষ্ণভক্তি সম্বন্ধে নানা কাহিনী শোনা যায়। একবার নাকি একটি শ্লোকের চরণ লিখতে না পেরে স্নান করতে যান। ফিরে এসে দেখেন শ্রীকৃষ্ণ নিজে বাকি পদগুলি পূরণ করে রেখেছেন। এই জয়দেব শুধু সংস্কৃত কবি নন, সারা ভারতেও শেষ বড় সংস্কৃত কবি। লক্ষ্মণ-সেনের প্রধান মন্ত্রী হলায়ুধ ছিলেন সে যুগের সব চেয়ে বিখ্যাত পণ্ডিত। তাঁর দুই দাদা ঈশান ও পশুপতি হিন্দুদের আচার পদ্ধতির ওপর বই লেখেন। আর এক নামকরা পণ্ডিত ছিলেন সর্বানন্দ।

বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম ঃ পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্ম ও শিক্ষার প্রসারের জন্য অনেক কাজ করেছেন। বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দা বিহারে তাঁরা নানাভাবে

সাহায্য দেন। সোমপুর, ওদন্তপুরী ও বিক্রমশিলার মহাবিহারগুলি তাঁরাই প্রতিষ্ঠা করেন। রাজশাহীর কাছে পাহাড়পুরে সোমপুরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। মহারাজ ধর্মপালের আর এক নাম 'বিক্রমশিলদেব' অর্থাৎ তিনিই বিক্রমশিলা বিহারটি প্রতিষ্ঠা করেন। বিক্রমশিলায় কয়েকজন বড় আচার্য ছিলেন, তাঁদের মধ্যে বাঙলা দেশের পণ্ডিত শান্তিপদ ও তাঁর ছাত্র দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশের নাম চির প্রসিদ্ধ।

নালন্দা, সোমপুর, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীলা

অতীশের জন্ম গৌড়ের এক রাজ-পরিবারে; বাবার নাম কল্যাণশ্রী, মার নাম প্রভাবতী। বৌদ্ধপণ্ডিত শীলরক্ষিতের কাছে তাঁর দীক্ষা। সিংহল প্রভৃতি নানা জায়গায় শিক্ষালাভ করে তিনি রাজা মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশিলার আচার্যপদে বসেন। তারপর তিব্বতের রাজার একান্ত অনুরোধে তিনি তিব্বতে গিয়ে তেরো বছর কাল বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও প্রচার করে সেখানেই মারা যান। এই সব যোগাযোগের ফলে নেপাল তিব্বতে বৌদ্ধ ধর্ম ও শিল্পের ওপর বাঙলার বিশেষ প্রভাব পড়ে।

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

তবে ধর্মবিশ্বাসে বৌদ্ধ হয়েও পাল রাজারা যে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতেন, তার প্রমাণ তাঁদের শাসনলিপি। সেগুলিতে শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতি পৌরাণিক ধর্ম আর পাশুপত মন্দির প্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। পালযুগে যত দেবতার মূর্তি পাওয়া যায়, তার মধ্যে হিন্দু দেব-দেবীর সংখ্যাই বেশি। সেন আমলে অবশ্য ব্রাহ্মণসমাজ ও সংস্কৃতির বহুল প্রসার হয়। বিশেষ করে বল্লালসেন ও লক্ষ্মণসেনের হিন্দু আচারের প্রতি অনুরাগ এবং তাঁদের রাজত্বে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের লেখা নানা শাস্ত্র-গ্রন্থ থেকে সে কথা স্পষ্টই বোঝা যায়।

হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা

বাণিজ্য ও শিল্প ঃ এই যুগে বাঙলা দেশের সব চেয়ে বড় বন্দর ও বাণিজ্য-কেন্দ্র ছিল তাম্রলিপ্ত। হিউয়েন সাঙ বলেছেন, এখানে জলপথ ও স্থলপথ মিলেছে আর অনেক দুষ্প্রাপ্য দামী মাল এখানে জমা হয়। তাম্রলিপ্ত থেকে অনেক ভারতীয় জাহাজ সাগর পাড়ি দিয়ে সুদূর চীন ও জাপানে যাতায়াত করত। বাঙালী নাবিক ও বণিকদলের সাহসে ও চেষ্টাতেই দেশের সম্পদ বাড়ে। এ সময়ে বাঙলার কৃষিবাণিজ্য ও শিল্পের অবস্থা ভালোই ছিল। পাথর ও পোড়া মাটির ওপর কাজে বাঙালী শিল্পীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। স্তূপ ও বিহারের মধ্যের যে সব সুন্দর পাথরের কাজ ও মূর্তি পাওয়া গেছে, সেই ছবিগুলি দেখলে শিল্পকাজে

তাম্রলিপ্ত



প্রজ্ঞাপারমিতা—সন্ধ্যাকর নন্দীর পুঁথির পাতা থেকে

শিল্পকর্ম

নমুনা বুঝতে পারবে। অনেক নিপুণ শিল্পীর নাম আমরা জানতে পেরেছি, যেমন ধীমান ও তাঁর ছেলে বীতপাল তাঁরা পাথর ও ধাতু দিয়ে মূর্তি গড়তেন। শঙ্খদাস, বিমলদাস, বিষ্ণুদাস প্রভৃতি আরও বাঙালি শিল্পী ছিলেন। রাজা রামপালের সময়ের পুঁথিতে অনেক সুন্দর ছবি আঁকা আছে।

ধীমান, বীতপাল

সমাজ জীবন ঃ পাল ও সেন আমলে ভূস্বামী ও বড় গৃহস্থদের অবস্থা ভালই ছিল, কিন্তু সাধারণ চাষী ও শ্রমিকদের অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না মনে হয়। এ যুগের 'চর্যাগীত' গুলিতে গরীব সমাজের অভাব-দৈন্যের ছবি পরিষ্কার ফুটেছে। সেখানে অধিকাংশ লোক গ্রামবাসী কৃষিজীবি। বাঙলায় তখন আখ, তুলো, সর্ষে, পান ও অনেক রকম ফলের চাষ হত। বহু দূরদেশেও বাঙলার তৈরি সুতির কাপড়ের খুব আদর ছিল। কামার, কুমোর, তাঁতি, স্যাকরা, শাঁখারী প্রভৃতি কারিগরদের নিজস্ব সংঘগুলি পরে 'জাতি' হিসেবে পরিচিত হয়। বাঙালীদের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত, মাছ, মাংস, শাক, ফল, দুধ ও দুধের তৈরি জিনিস। ব্রাহ্মণরা আমিষ খেতেন এবং রুই ও ইলিশ মাছের খুব প্রচলন ছিল। পুরুষের বেশ মালকোচা দিয়ে খাটো ধুতি, মেয়েদের পরনে গোড়ালী-ঢাকা শাড়ী। অলঙ্কারের মধ্যে নারী ও পুরুষ কানে কুণ্ডল গলায় হার পরতেন। পুরুষদের কাঁধ পর্যন্ত বাবরি চুল, মেয়েদের হাতে শাঁখা, মাথায় নানা ছাঁদের খোঁপা। মেয়েরা সিঁদুর, আলতা, কুঙ্কুম ব্যবহার করতেন।

বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা

কৃষিদ্রব্য

কারিগরদের সংঘ

খাদ্য, পোষাক, অলংকার

নানা রকম খেলাধূলা আমোদ-প্রমোদের প্রচলন ছিল। পাহাড়পুরের মূর্তিতে ঢাক-ঢোল বাঁশী ও বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র দেখা যায়। পুরুষরা কুস্তি, শিকার ও বাজিকরের খেলা পছন্দ করত। যানবাহন বলতে সাধারণ লোক চড়ত নৌকা ও গরুর গাড়ি, বড়লোকরা ব্যবহার করত হাতী, ঘোড়া ও রথ। বিয়ের পর নতুন বৌ গরুর গাড়ী করে শ্বশুরবাড়ী যেত। মোটামুটি বলা যায়, সেকালের বাঙালী জীবন-যাত্রার সঙ্গে একালের বেশি গরমিল নেই। হিউয়েন সাঙ বাঙলার নানা অঞ্চল ঘুরে ও দেখে বাঙালীদের স্বভাব-চরিত্রের সুখ্যাতিই করেছেন। বলেছেন, বাঙালী ছাত্ররা বুদ্ধিমান ও বিদ্যায় অনুরাগী, দোষের মধ্যে একটু চঞ্চল ও ব্যস্তবাগীশ। কিন্তু কাশ্মীরের কবি ক্ষেমেন্দ্র বলেছেন, গৌড়ের ছাত্ররা দেখতে ক্ষীণ হলেও উদ্ধত, দোকানদার দাম চাইলে দাম না দিয়ে ঝগড়া মারামারি করে। যাই হোক, সহজে উত্তেজিত, তর্কপ্রিয় বলে সেকালের বাঙালীর একটু অখ্যাতি ছিল মনে হয়। আর সমাজে কিছু কিছু যে খারাপও ছিল, পুরনো সাহিত্যে তার উল্লেখ আছে।

খেলাধুলা ও আমোদ-প্রমোদ

বাঙালীর স্বভাব

দক্ষিণ ভারতের বৈশিষ্ট্য ঃ সুদূর দক্ষিণ ভারতের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস থেকে

প্রমাণ হয়, সংকীর্ণ জায়গার ভিতর বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সর্বদা যুদ্ধ বিগ্রহ অনিবার্য ছিল। প্রত্যেক রাজ্যই প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টা করতেন এবং রাজ্যের সীমান্ত নির্দিষ্ট থাকত না। তবে দাক্ষিণাত্যের সমাজ ও ধর্ম শিল্প ও সভ্যতার বিশেষত্ব আছে। উত্তর ভারত থেকে পৌরাণিক ধর্ম ও সংস্কৃতি নিলেও দক্ষিণ ভারত মন্দিরশিল্পে ও মূর্তিগঠনে তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছিল। দক্ষিণ ভারতীয় সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি হ'চ্ছে গ্রামসমাজের স্বাধীনতা, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন নৌ-বাণিজ্য আর একান্ত নিজস্ব ভঙ্গীতে তৈরি মন্দিরগুলির আশ্চর্য শিল্পকাজ। এ সব ক্ষেত্রেই চোলরা ছিলেন অগ্রণী। দোর্দণ্ড প্রতাপ চোল রাজারা একদা বঙ্গোপসাগরকে 'চোল হ্রদে' অর্থাৎ নিজস্ব এলাকায় পরিণত করেন। চোল রাজারা শক্তিশালী হলেও পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মন্ত্রিদল, আর সাধারণ প্রজাদের নিয়ে 'পঞ্চ মহাসভা'র মতামত মেনে চলতেন। এখানে দাসপ্রথা ছিল না, স্থায়ী সৈন্যদল বেতন পেত। দক্ষিণ ভারতে সমাজের ভিত্তি হল গ্রাম। গ্রাম সমাজের স্বাধীনতা চোলদের আমলে বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। রাজা ছিলেন সকলের উপর। রাজকর্মচারীরা সব বিষয়ে তদারক করতেন বটে কিন্তু গ্রামের কর্তা ব্যক্তিদের পরিচালিত গ্রামসভার হাতে অনেক ক্ষমতা ছিল। এক সভার মধ্যে বিভিন্ন সমিতিগুলি এক একটি বিভাগের কাজ করে যেত। গ্রামবাসীরাই নির্বাচিত হয়ে সভ্য হতে পারতেন। জনসাধারণের এই রকম স্বাধীন অধিকার ভারতে আর কোথাও দেখা যায় নাই। গ্রাম শাসনের সুন্দর ব্যবস্থায় ও সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্পষ্টই গণতন্ত্রের চেহারা ফুটে ওঠে। কৃষি, পণ্য ও বাণিজ্য দক্ষিণ ভারতের অর্থনীতিকে যথেষ্ঠ সমৃদ্ধ করেছিল এবং শিল্পকলায় প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল। কিন্তু সাধারণ মানুষ তাতে কতটুকু উপকৃত হয়েছিল, তার কোন হদিস পাওয়া যায় না। যাই হোক, এই যুগে চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, চান্দেল্ল প্রভৃতি রাজ্যগুলির রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মোটামুটি পাওয়া গেলেও তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক বিধি-ব্যবস্থার তেমন কোন উল্লেখযোগ্য তথ্য বা উপকরণ পাওয়া যায় নি। তবে অনুমান করা চলে যে ঐ সময়ে মধ্য ভারতে প্রভাবশালী বাকাটক রাজ্যের এবং দক্ষিণ-পশ্চিমের সাতবাহনদের অধোগতি ও পতনের পর ঐ সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক তথা বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধাগুলি এই দক্ষিণী রাজ্য-গুলির অধিকারে আসে। যাই হোক, এই রাজ্যগুলির শিল্প সংস্কৃতির চর্চার অনেক নিদর্শন আজও বর্তমান। এই সব রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি দৃঢ় হয়ে উঠেছিল এবং নানা দিক থেকে প্রাপ্ত ঐশ্বর্য তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পুষ্ট করেছিল।

মন্দির শিল্প ও মূর্তি-গঠনে স্বাতন্ত্র্য

গ্রাম-সমাজ ও স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন

নৌবাণিজ্য

সমাজের বৈশিষ্ট্য

অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধি

সংস্কৃতি চর্চার নিদর্শন

শিল্প ও সংস্কৃতি ঃ গোটা ভারতবর্ষের ইতিহাস শুধু উত্তর ভারতের ইতিহাস

সয়। দক্ষিণ ভারতে ধর্ম সমাজ ও সভ্যতার এক বিশিষ্ট রূপ বহু শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। যেখানে দিগ্‌জয়ী শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্বাচার্য, সায়ন ও মাধবাচার্যের মত মহাজ্ঞানী পণ্ডিত দার্শনিকদে জন্ম সেখানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপটি আজও বেঁচে আছে। এখানকার মন্দির, শিল্প, নৃত্য, নাট্য ও সঙ্গীত ভারতের ইতিহাসে এক বড় নতুন অধ্যায় রচনা করেছে।

ধর্ম ও সংস্কৃতির বিশুদ্ধ রূপ

ইতিহাসে রাজা-রাজড়াদের কথাই শুনে থাকি। কিন্তু যারা পাথর কুঁদে ঐ সব অপূর্ব মূর্তি সৃষ্টি করল গুহার গায়ে বিচিত্র রূপে বিভিন্ন ভঙ্গীতে যক্ষ-অপ্সরাদের মনোহর মূর্তি খোদাই করল, মন্দিরে কত কারুকাজ-করা স্তম্ভ, অলিন্দ বেষ্টনী রচনা করল : সমুদ্রতীরে, দুর্গম গিরিগহ্বরে, নানা দেবদেবীর কল্পনাকে রূপ দিয়ে গেল, তারা কারা ? সাধারণ মানুষ, কিন্তু শিল্পীর জাত। এদের হাতেই ভারতীয় সভ্যতার সেরা পরিচয় যা দেখে দেশী-বিদেশী পণ্ডিতরা বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেছেন। হাজার বছর ধরে বংশপরম্পরায় এই নিপুণ শিল্পীরা কাজ করে বেড়িয়েছে এক রাজত্ব থেকে আর এক রাজত্বে। সেই অমরাবতী, নাগার্জুনকোণ্ডা থেকে আইহোল, বাদামি, কার্লি, কাহেরি ঘরপুরী দ্বীপের গুহাচৈত্য, ইলোরার পাহাড়কাটা মন্দিরে এবং মহাবলিপুরম, কাঞ্চী, চিদাম্বরম মাদুরা, তাঞ্জোর প্রভৃতি নগরের দেবালয়গুলিতে তারা প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেছে।

স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পে প্রতিভার সাক্ষ্য

পল্লব শিল্প : সম্রাট অশোকই প্রথমে উত্তর ভারতে পাথরের ব্যবহার প্রচলন করেন। তার পরে সুঙ্গ ও কুষান যুগে এবং আরও পরে, গুপ্ত রাজাদের সময়ে প্রস্তরশিল্পের আশ্চর্য উন্নতি দেখা গেল। এর প্রায় পাঁচশ বছর পরে সুদূর দক্ষিণে প্রস্তরশিল্পের এক নতুন রূপ ও রীতি নিয়ে এলেন পল্লবরা। পল্লব শিল্পের উৎকৃষ্ট পরিচয় পাই মহাবলিপুরমে। সেখানকার 'সপ্তরথের' কথা আগে বলতে হয়। দ্রৌপদী অর্জুন ভীম ধর্মরাজ ইত্যাদির নামে সাতটি রথের আকারে মন্দির আছে। এক একটি বিরাট শিলা থেকে এক একটি রথ তৈরি হয়েছে। আকারে বড় নয়, কিন্তু অল্প আয়তনের মধ্যে এমন সৌন্দর্য ও সামঞ্জস্য বিরল। এর পরে কৃষ্ণমন্ডপ, সেখানে পাথরের উপর বিচিত্র দৃশ্য। এই বিশাল প্রস্তরচিত্রে গঙ্গাবতরণের দৃশ্য দেখানো হয়েছে। এখানে নর-নারী ও জীবজন্তুর মূর্তিগুলি এত জীবন্ত যে বিস্ময় জাগে। তারপর পঞ্চপাণ্ডব, ত্রিমূর্তি ও আদি বরাহ গুহাগুলির মধ্যে কত বিচিত্র কাজ। আর আছে বিখ্যাত মহিষমণ্ডপ। এর মধ্যে পাহাড়ের গায়ে খোদিত মহিষাসুরমর্দিনীর অপরূপ মূর্তি। আর একটি মহিষমর্দিনী মূর্তিও পাওয়া যায়, যেখানে দেবীর মুখে কুমারী-ভাব দাঁড়ানোর ললিত ভঙ্গী দেখলে মনে বিস্ময় ও শ্রদ্ধা জাগে। আইহোল চালুক্যদের দুর্গামন্দিরেও সিংহবাহন যুদ্ধরত দেবীমূর্তি আছে। কিন্তু তাঁর মুখে বিজয়িনীর উল্লাস ফুটে আছে।

মহাবলি পুরমের 'সপ্তরথ'

মহাবলিপুরমের সব চেয়ে বড় আকর্ষণ হচ্ছে 'জল-শয়ন' মন্দির। সমুদ্রতীরে পাথরের ভিত্তির উপর মন্দির দাঁড়িয়ে আছে আর সাগরের ঢেউ উচ্ছ্বসিত ফেনায় মন্দিরের পাদপীঠ ছুঁয়ে যাচ্ছে। সামনে অনন্ত সমুদ্র, উপরে অসীম আকাশ। এর অদ্ভুত শোভা ও গাম্ভীর্য কিছুক্ষণ দেখলে মন উদাস হয়ে যায়। রাস্তা থেকে মন্দিরে যাওয়ার পথে রয়েছে সিংহমূর্তি, যা পল্লব শিল্পে খুব বেশি দেখা যায়।

চালুক্য শিল্প ঃ চালুক্য আর রাষ্ট্রকূটদের ইতিহাস কেবল যুদ্ধ বিগ্রহের কাহিনী নয়। তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রসারে যথেষ্ট উৎসাহ এবং সাহায্য করেছিলেন। অজন্তায় যদিও পুরোপুরি বৌদ্ধ শিল্প, ইলোরায় বৌদ্ধ গুহাচৈত্যের পাশাপাশি হিন্দু শিল্পেরও বহু নমুনা রয়েছে। যাই হোক, চালুক্য আমলের প্রথম দ্রষ্টব্য হল আইহোল। সেখানে গোলাকার দুর্গামন্দির আছে। চালুক্যদের রাজধানী বাদামিতে অনেক গুহা এবং পাহাড়কাটা মন্দির আছে। এই সব গুহাতে, মহাদেবের অর্ধ-নারীশ্বর মূর্তি, দেয়ালে নৃত্যরত শিবের প্রস্তরচিত্র, দালানের শেষে উপবিষ্ট বিষ্ণুমূর্তি, আর ব্র্যাকেটে শিবদুর্গা ও অপ্সরা মূর্তির মুখের ভাব ও দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে শিল্পের মহিমা বিকশিত হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া গুহার দেয়ালে, ছাদে, বারান্দায় থামের মাথায় অজস্র সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ আছে।

আইহোল

বাদামির গুহা
পাহাড়কাটা মন্দির

বাদামির পরে এলিফাণ্ট গুহায় যে অপরূপ শিল্পকাজ আছে, তার কথা এখানে বলে রাখি। বোম্বাই-এর কিছু দূরে একটি পাহাড়ী দ্বীপে এই গুহামন্দির। সেখানে নানা মূর্তির মধ্যে মন্দিরের দ্বারপাল এবং রাজবেশে শিবের উল্লেখ করতেই হবে। মহাদেবের তিনটি মুখে যে প্রশান্ত গম্ভীর ভাব, তা দেখে এক বিখ্যাত বিদেশী পণ্ডিত বলেছেন, যেন পাথরই গলে গিয়ে মহাদেবের ভাবরূপ হয়ে উঠেছে।

এলিফাণ্টা

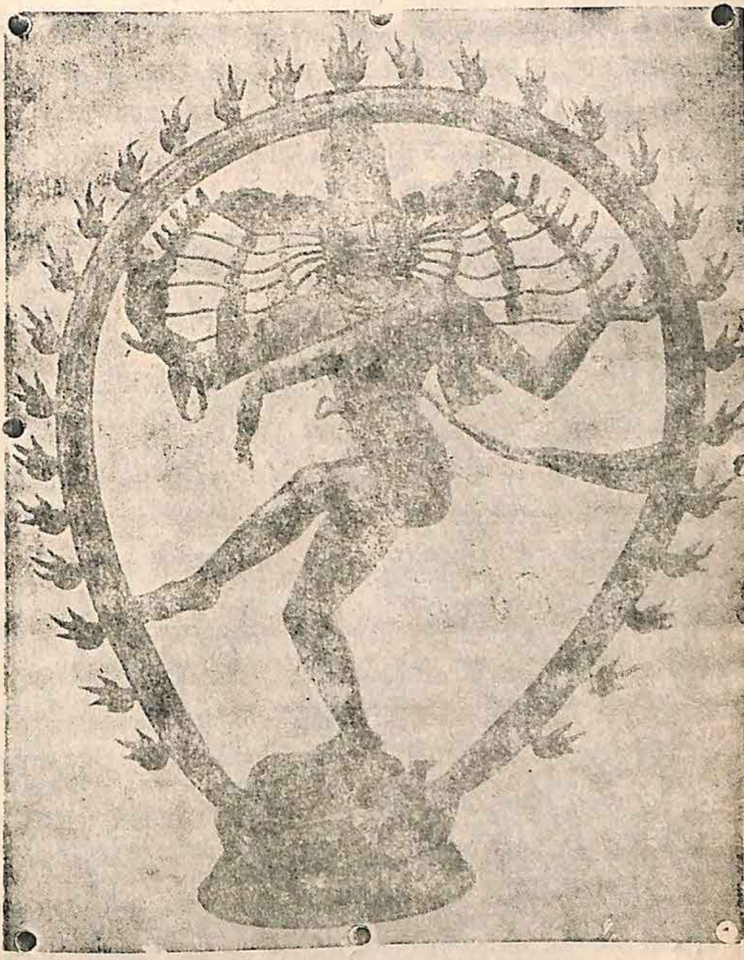
রাষ্ট্রকূট শিল্প ঃ রাষ্ট্রকূটদের সামরিক খ্যাতি ছিল, কিন্তু শিল্পের ক্ষেত্রেও তাদের দান প্রচুর। ইলোরায় হিন্দু বৌদ্ধ গুহামন্দির ও মঠ পাশাপাশি বিরাজ করছে। তার মধ্যে কৈলাস মন্দিরই রাষ্ট্রকূটদের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। গুহার মধ্যে অর্থাৎ ছাদে বারান্দায় দেয়ালের গায়ে শিব-পার্বতীর বিবাহ-দৃশ্য, নটরাজ প্রভৃতি পাথরের চিত্রমূর্তিতে যে অজস্র শিল্প-কাজের নমুনা আছে, তা অবশ্য অনবদ্য সুন্দর। কিন্তু পাহাড় থেকে কাটা মন্দিরটির বিভিন্ন অংশে বিচিত্র সৌন্দর্য কেমন করে সম্ভব হল, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। একটি মূর্তি, রাবণ কৈলাস পর্বতকে নাড়া দিচ্ছেন, তার মধ্যে কি বলিষ্ঠ ভাব ফুটে উঠেছে। গুহার ভিতর পাথর কেটে এই ধরনের মন্দির বা চৈত্য নির্মাণ কম কৃতিত্ব নয়। সেই জন্য বলা হয়, দক্ষিণ-ভারতে যেমন একাধারে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিপুণ প্রকাশ দেখা যায় তেমন আর কোথাও নেই। তবে চীনের তুনহুয়াং প্রদেশে ঠিক এই সময়েই ঐ রকম পাহাড় কেটে মঠ তৈরি করার

ইলোরার কৈলাসমন্দির

রীতি ছিল। সেখানকার সহস্র বুদ্ধের সঙ্গে অজন্তা গুহায় সহস্র বুদ্ধের আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

চোল-শিল্প: চোলদের আমল থেকে মন্দিরশিল্প পুরোপুরি হিন্দু। তাঁদের মত মহৎ শিল্পচর্চা দাক্ষিণ ভারতে আর কোনও রাজবংশ এমন বিরাট ভাবে করেনি। পল্লব শিল্প সীমার মধ্যে, সরল সুষমাময় চোল শিল্প বিশাল, অলংকারে মণ্ডিত। বৃহৎ প্রাঙ্গণ, জলাশয়ের মাঝখানে দীপমাণিকা, দোকান-ঘেরা চত্বর, আকাশ-ছোঁয়া বিরাট মন্দির-তোরণ

গো-পুরম গুচ্ছ



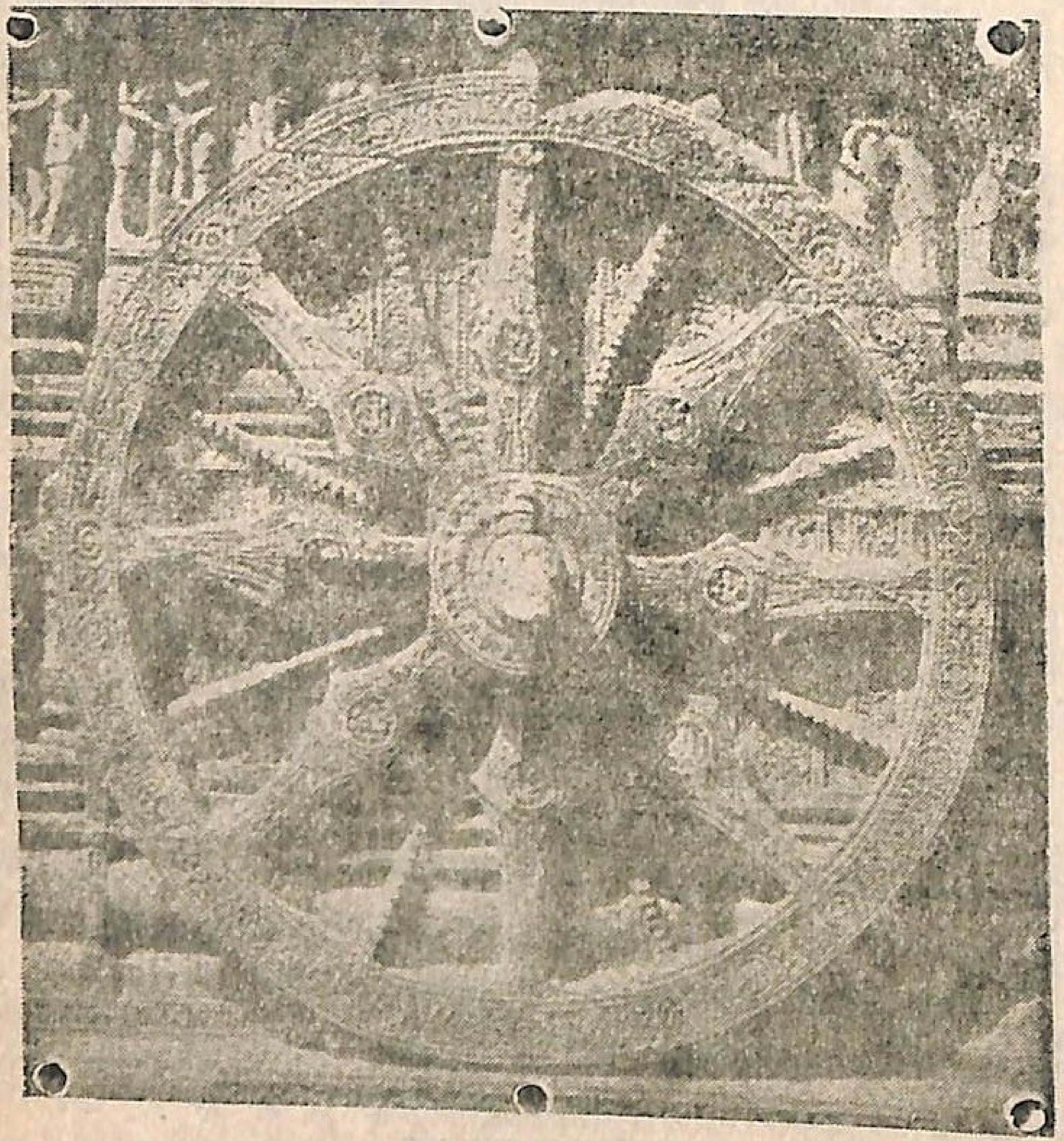
নটরাজের ব্রোঞ্জ মূর্তি

বা 'গোপুরম'গুলির পিরামিড-আকার শোভা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। আসল মন্দির অপেক্ষাকৃত ছোট কিন্তু অতি উচ্চ ঐ দৃপ্ত গোপুরমগুলিতেই চোলদের

বিশেষত্ব ও শিল্পক্ষমতা ধরা পড়ে। তাঞ্জোর, চোলপুরম ও চিদাম্বরমের মন্দিরগুলির কারুকাজ এবং অজস্র মূর্তি স্বচক্ষে না দেখলে চোল শিল্পের স্বরূপ বোঝা যায় না। বিখ্যাত শিল্পরসিক ফার্গুসন সাহেব বলেছেন, চোলরা শিল্পের পরিকল্পনায় যেন অতি মানুষ আর সূক্ষ্ম রূপদানে নিখুঁত মণিকার। তা ছাড়া, চোল শিল্পের সব চেয়ে বিশিষ্ট নমুনা হল ঢালাই-করা ব্রোঞ্জের মূর্তি। নানা ভঙ্গীতে নটরাজের ধাতু-বিগ্রহ ও অন্যান্য মূর্তিগুলি সভ্য জগতে পরম সমাদর পেয়ে থাকে। অনেকেই বলেন, চোলদের নটরাজে ভারতের কল্পনা ও সৃষ্টি এক হয়ে মিশে গেছে।

নটরাজ মূর্তি

চান্দেল্ল শিল্প ঃ জেজকভুক্তির (আধুনিক বুন্দেলখণ্ড) চান্দেল্ল বংশও শিল্প এবং স্থাপত্যের জন্য স্মরণীয়। বিখ্যাত কিরাত সাগর হ্রদ এই বংশের কীর্তিমান রাজা কীর্তিবর্মনের স্মৃতি বহন করছে। কালিঞ্জরের দুর্ভেদ্য দুর্গ, নানা হ্রদ ও বাঁধ এবং খাজুরাহোতে কাণ্ডারিয় মহাদেব, চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি অপূর্ব মন্দিরগুলি চান্দেল্লদের প্রধান ও স্মরণীয় কীর্তি।



কোণার্কের মন্দিরের নিম্নাংশ

ওড়িশার শিল্প (গঙ্গবংশ) ঃ এগারো শতকে ভুবনেশ্বর ও পুরীর মন্দিরগুলি

নিজস্ব রীতিতে তৈরি হয়। পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, রাজা-রানী ও লিঙ্গরাজ প্রভৃতি ভুবনেশ্বরের বিখ্যাত মন্দিরগুচ্ছ ওড়িশার গৌরব। মুক্তেশ্বর যেন একটি নিটোল ছোট মুক্তা, এত সুন্দর তার গড়ন। আর রাজা-রানী মন্দিরটি বোধ হয় সব চেয়ে সুন্দর গম্ভীর। একাদশ শতাব্দীতে পূর্ব গঙ্গবংশ এক শক্তিশালী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। পূর্ব-গঙ্গবংশের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন অনন্তবর্ম চোড়গঙ্গ (১০৬৮—১১৪৮ খৃঃ)। তিনি ছিলেন শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক। তাঁর রাজত্বকালে পুরীর বিখ্যাত জগন্নাথ মন্দিরটি নির্মিত হয়। তাঁর আমলে ওড়িশার মন্দির শিল্প বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করে। সিমহাচলমে একটি উঁচু পাহড়ের উপর নৃসিংহ-দেবের বিশাল মন্দিরটি তিনি তৈরি করে যান। অনন্তবর্মণের পুত্র নরসিংহবর্মণের আমলে কোনার্কের সূর্যমন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরটির গঠন ও ভাস্কর্য সত্যই অপরূপ। বারোটি চাকায় সাতটি ঘোড়ায় টানা এই রথাকৃতি মন্দির ওড়িশার মন্দিরশিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কালো পাথরের ঘোড়া ও হাতীর তেজস্বী ভঙ্গী দর্শকের বিস্ময় সৃষ্টি করে। শূন্য বালিয়াড়ির মধ্যে পরিত্যক্ত এই ভগ্নপ্রায় মন্দিরের লুপ্ত অতীত মনে চমক ও বিষাদ জাগায়।

পুরীর জগন্নাথ মন্দির ও কোনার্কের সূর্যমন্দির

ভারত ও বহির্জগৎ

ভারতের বাইরে ভারতীয় সভ্যতা ঃ ভারতের সঙ্গে বাইরের জগতের যোগাযোগ বহু যুগ ধরে চলে আসছে। সম্রাট অশোকের আমল থেকেই বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শুরু হয়। এই সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল বেশির ভাগ বাণিজ্য আর খানিকটা ধর্মপ্রচারের সূত্রে। সেইসূত্রে ভারতীয় ধর্ম শিল্প ও সভ্যতা বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। তার প্রত্যক্ষ চিহ্ন এখনও দেখা যায়, ঐতিহাসিক প্রমাণ তো আছেই। এবার প্রাচীন ভারতের প্রতিবেশী অঞ্চল বা রাজ্যগুলিতে কেমন করে ভারতের সংস্কৃতি পৌঁছল, তার ইতিহাস সংক্ষেপে বলি।

ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা আর নতুন দেশ দেখার আগ্রহ, এই দুটি কারণে অনেক ভারতীয় সাগরপারে গিয়ে এক একটি জায়গায় বসবাস শুরু করেন। তারপর সেই সব বসতি থেকে অঞ্চল বিশেষে কয়েকটি রাজ্য গড়ে উঠল। ফলে স্থানীয় বাসিন্দারা ভারতের ধর্ম ও সভ্যতাকে কাছে পেল, এবং নিজ নিজ আচার-সংস্কারের সঙ্গে সেগুলি মিশিয়ে এক একটি সমৃদ্ধ সভ্যতা সৃষ্টি করল। উত্তরে কুষান গুপ্ত ও পাল বংশ আর দক্ষিণে পল্লব চোল প্রভৃতি রাজাদের আমলে, দুদিক দিয়ে ভারতের ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তার ঘটেছিল। একটি হল স্থলপথে মধ্য এসিয়া, তিব্বত, চীনের দিকে। এই অঞ্চলটিকে বলা হত 'ইণ্ডিয়া মাইনর' বা ক্ষুদ্র ভারত। আর দ্বিতীয়টি জলপথে, দক্ষিণ এসিয়ার দিকে অর্থাৎ ব্রহ্ম, সিংহল, শ্যাম (থাইল্যাণ্ড) মালয় ও ইন্দোচীন অঞ্চলে (সুমাত্রা, যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, কম্বোজ প্রভৃতি দেশে)।

স্থলপথে ও জলপথে ধর্ম ও সভ্যতার বিস্তার

সাগরপারে ঐ সব হিন্দু ও বৌদ্ধ রাজ্যগুলিকে এক সময়ে একত্র ভাবে বলা হত 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া, বা বৃহত্তর ভারত'। তার কারণ, ভারতবাসীরা মনে করতেন যে ঐসব দূরদেশের রাজা প্রজা সকলে মিলে যেন একটি বৃহত্তর ভারতেরই অঙ্গ। এই ধারণার বশে আঞ্চলিক রাজ্যগুলিতে হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম এবং ভারতীয় শিল্পকলার অভিনব বিকাশ হয়, যার অনেক চিহ্ন সেখানকার বিশাল মন্দির ও স্তূপগুলিতে আজও বর্তমান রয়েছে।

বৃহত্তর ভারত

মধ্য এসিয়া ও ভারত ঃ মধ্য এসিয়ায় ভারতীয় সংস্কৃতির অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। প্রত্নতত্ত্বের বিখ্যাত পণ্ডিত অরেল স্টাইন মধ্য এসিয়ার মরু-অঞ্চল খুঁড়তে খুঁড়তে ভারতীয় নগরের ধ্বংসচিহ্ন আবিষ্কার করেন। তিনি এখানে অনেক বৌদ্ধবিহার ও মূর্তি, ছবি, পুঁথিপত্র এবং ভারতীয় ভাষাক্ষরে লেখা মূল্যবান বৌদ্ধগ্রন্থ উদ্ধার করেছেন। চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাঙ এ অঞ্চলে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার যে সব চিহ্ন চোখে দেখেছিলেন, এখন তা সম্পূর্ণ সত্য বলে প্রমাণিত হল। মধ্য এসিয়ার দক্ষিণে খোটান আর উত্তরে কুচি, এই দুটি জায়গা ভারতীয় সভ্যতার বড় কেন্দ্র ছিল। দু'জনেই খোটানে বৌদ্ধধর্মের খুব প্রভাব দেখেছিলেন। ফা-হিয়েনের সময়ে এখানে সবচেয়ে বড় মঠ ছিল গোমতী বিহার। হিউয়েন সাঙও চীনে ফেরার পথে খোটানের ভারতীয় রাজা বিজিতসিংহের অতিথি হন।

প্রাপ্ত নিদর্শন

খোটান ও কুচি

চীন ঃ ভারতের সঙ্গে চীনের সম্পর্ক অতি প্রাচীন। খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী থেকে উভয় দেশের মধ্যে সভ্যতার বিনিময় শুরু হয়। অনেক ধার্মিক পণ্ডিত ও রাজদূত ভারত থেকে চীনে এবং চীন থেকে ভারতে যাতায়াত করতেন। ভারতীয় বণিকরাও চীন ও পূর্ব দ্বীপপুঞ্জে যেতেন। এ সব এখন অতীত স্মৃতি। যখন কুচির পণ্ডিত কুমারজীব, কাশ্মীরের রাজপুত্র গুণবর্মণ, সর্বশাস্ত্র পারদর্শী উজ্জয়িনীর পরমার্থ ও কাঞ্চীর রাজকুমার বোধিধর্ম চীনে গিয়ে বুদ্ধের বাণী প্রচার করেন, তখন ছিল ভারতের এক স্মরণীয় যুগ ভারতীয় পাণ্ডিত্যের তখন এতই খ্যাতি ছিল যে, চীনের সম্রাটরা এই সব অধ্যাপক ও প্রচারকদের সসম্মানে নিমন্ত্রণ করতেন বৌদ্ধ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা ও ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ করবার জন্য। বাংলাদেশ থেকে জ্ঞানভদ্র ও যশোগুপ্ত চীনে গিয়েছিলেন। শুধু বৌদ্ধধর্ম নয়, ভারতের সঙ্গীত চিকিৎসা ও গণিতশাস্ত্র চীনে সমাদর লাভ করে। চিত্রশিল্প, বুদ্ধ মূর্তিগঠন ও গুহামন্দির তৈরি করার কৌশল চীন ও ভারত পরস্পরের কাছে শিক্ষা করে। তাং যুগে ভারতের সঙ্গে চীনের মৈত্রী ও সভ্যতার বন্ধন আরও দৃঢ় হয়। হিউয়েন সাঙ দেশে ফিরে ভারতীয় সংস্কৃতির চর্চায় মনোনিবেশ করেন এবং সবসুদ্ধ ৪৭ খানি ভারতীয় পুঁথির চীনা অনুবাদ করেন। ই সিং সমুদ্রপথে তাম্রলিপ্ত বন্দরে নেমে নালন্দায় দশ বছর পড়াশুনা করেন। তিনিও চীনে ফিরবার

চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার ও চীন সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা

সময় অনেক সংস্কৃত পুঁথি নিয়ে যান। এই ভাবে ভারত ও চীনের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে ভাবের আদান-প্রদান চলছিল।

তিব্বত, কোরিয়া ও জাপান : তিব্বত-ভারত সম্পর্কও পুরাতন। ভারতের এক রাজকুমার নাকি সেখানে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন, একথা তিব্বতী বইয়ে লেখা আছে। হর্ষবর্ধনের সময় স্রং-সান-গাম্পো ছিলেন তিব্বতের রাজা। তাঁর রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয় এবং তাঁরই উৎসাহে সেখানে সংস্কৃত ভাষা ও ভারতীয় অক্ষর মালার প্রচার হয়। এই সময়ে তিব্বতে অনেক মঠ ও মন্দির স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিব্বতী পণ্ডিতরা নালন্দা প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনার জন্য ভারতে আসতেন। বিক্রমশিলা বিহার থেকেও বাঙলার অতীশ দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের সংস্কার করতে গিয়েছিলেন। তিব্বতে ধর্মগুরু লামার প্রাধান্য। এইভাবে মধ্য এসিয়া, তিব্বত ও চীন থেকে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতা ক্রমশঃ মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া জাপান অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। দক্ষিণ ভারত থেকে মহাপণ্ডিত বোধিসেন জাপানে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা ও বৌদ্ধ সংঘের ধর্ম প্রচার করেন। জাপানের সম্রাট তাঁকে অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করেন।

অতীশ দীপঙ্কর

বোধিসেন

সুবর্ণভূমি : ভারতের সঙ্গে সুবর্ণভূমির যোগাযোগ ঘটেছিল দু হাজার বছরেরও আগে। মালয় উপদ্বীপ এবং সুমাত্রা জাভা বালি বোর্নিও প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জ এবং কম্বোডিয়া আনাম প্রভৃতি দেশগুলির একত্রে নাম দেওয়া হয়েছিল 'সুবর্ণভূমি'। বাণিজ্য অথবা বসতির জন্য এই সব দেশে ভারতবাসীরা যেতেন। ক্রমে তাঁদের চেষ্টায় রাজ্য গড়ে উঠল। বিদেহ দ্বারাবতী চম্পা কম্বুজ অমরাবতী প্রভৃতি রাজ্যগুলির নাম দেখলে হিন্দু প্রভাব সহজেই ধরা পড়ে। হরিবর্মণ সূর্যবর্মণ প্রভৃতি রাজাদের নামও ভারতীয়। পণ্ডিতদের মতে ইন্দোচীনের সব চেয়ে বড় নদীর নাম মেকং 'মা গঙ্গা' থেকেই হয়েছে। এইসব অঞ্চলের আদি অধিবাসীরা অনুন্নত ছিল ; কাজেই ভারতের সভ্যতা সহজেই তারা গ্রহণ করল। অনেক রাজা সংস্কৃত ভাষায় শিলালিপি খোদাই করলেন, কেউ বা শিবের মন্দির স্থাপন করলেন। এই ভাবে সুদূর প্রাচ্যে ভারতীয় ধর্ম ও সভ্যতার নতুন বিকাশ দেখা দিল।

ভারতীয় প্রভাব

শিলালিপি ও শিবমন্দির

যশোধরপুর : ইন্দোচীনের মধ্যে কম্বোজ (বর্তমান কাম্পুচিয়া) নামে এক রাজ্য ছিল। চীনা ইতিহাসে এই রাজ্যের অনেক পুরানো কথা লেখা আছে। কম্বোজের প্রাচীন কীর্তির মধ্যে সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আঙ্কোরের ধ্বংসাবশেষ। রাজা যশোবর্মনের সময় বর্তমান আঙ্কোর ঠোমে রাজধানী স্থাপিত হয়। রাজধানীর প্রাচীন নাম ছিল যশোধরপুর। নগর প্রাকারের চার পাশ দিয়ে একটি প্রশস্ত খাতের চিহ্ন আছে, সেতু দিয়ে খাত পার হওয়া যেত। সেতুর দুধারে রেলিঙয়ে সাগর-মন্থনের চিত্র আছে। পাঁচটি তোরণপথ

আঙ্কোর ঠোম

দিয়ে নগরে প্রবেশ করা যেত। নগরের মাঝখানে প্রসিদ্ধবায়ন মন্দির। এটি সম্ভবতঃ শিবের মন্দির ছিল। পিরামিডের মত তিনটি স্তরে নির্মিত এই মন্দিরের পাথরে হিন্দু পুরাণ-কথার অনেক চিত্র খোদিত আছে। যশোধরপুরের প্রাচীন বর্ণনা চীনা রাজদূতের লেখায় পাওয়া যায়। এককালে এই পুরীর শোভা ছিল অতুলনীয়। বিশাল তোরণ, প্রশস্ত অলিন্দ, চত্বর ও প্রাঙ্গনে সুশোভিত এই রাজধানীতে বহুলোকের বসতি ছিল। চওড়া রাস্তা দিয়ে হাতী ও রথ চলত, হ্রদগুলিতে প্রমোদনৌকা ভাসত, মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা বাজত। এখনও বনের পথে ঐ শূন্যপুরী পড়ে আছে।

যশোধরপুর

আঙ্কোর ভাট আর একটি দ্রষ্টব্য কীর্তি। এটি বিষ্ণুমন্দির, এক প্রকাণ্ড সমতল বেদীর উপর অবস্থিত। এই মন্দির আজও ধ্বংস হয়নি। খ্রীস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব রাজা সূর্যবর্মন এটি প্রতিষ্ঠা করেন। আঙ্কোর ভাটের বিশাল মন্দির হিন্দু কম্বোজের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। নিচে দাঁড়িয়ে প্রকাণ্ড মন্দিরের গায়ে শিল্পকাজগুলি দেখলে অবাক হতে হয়।

আঙ্কোর ভাট

কম্বোজের পূর্বদিকে আর একটি হিন্দু রাজ্য ছিল, তার নাম চম্পা। এখানে পাণ্ডুরঙ্গ ও ভৃগু নামে দুটি প্রাচীন রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। চম্পাতেও অগণিত হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দিরের চিহ্ন রয়েছে। এ রাজ্যে অনেক সমৃদ্ধ নগর ছিল। পো-নগরের মুখলিঙ্গ ও কৌঠার দেবীর মন্দির সুবিখ্যাত। চম্পার দেবমন্দিরগুলি অধিকাংশ ইটের তৈরি, কিন্তু শিল্পরীতির সঙ্গে পল্লব ও চালুক্য মন্দিরশিল্পের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। চম্পায় অনেক কীর্তিমান রাজা ছিলেন, কিন্তু কম্বোজ ও চীনের সঙ্গে চম্পারাজ্যের বহুদিন ধরে যুদ্ধের ফলে চম্পার গৌরব অস্তমিত হয়।

হিন্দু ও বৌদ্ধ মন্দির

এক সময়ে মালয় উপদ্বীপ ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অনেক বসতি ছিল। এইখানে শৈলেন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে আরব বণিকরা এই অঞ্চলে ব্যবসা করতেন। তাঁরা এই রাজ্যটিকে সব চেয়ে ধনশালী ও শক্তিশালী বলে বর্ণনা করেছেন। শৈলেন্দ্র বংশে অনেক বিখ্যাত রাজা ছিলেন। এই রাজারা মহাযানপন্থী বৌদ্ধ ছিলেন। সেকালের বাঙলা মহাযান বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্র ছিল। খুব সম্ভব শৈলেন্দ্রবংশীয় রাজারা বাঙলা দেশ থেকে এই বিষয়ে প্রেরণা পেয়েছিলেন। বৌদ্ধ সাধু কুমার ঘোষ এখানে এসে শৈলেন্দ্র রাজাদের গুরু হন। কুমার ঘোষের আজ্ঞায় শৈলেন্দ্ররাজ তারাদেবীর সুন্দর এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের রাজারা শিল্পকলার চর্চায় খুব উৎসাহ দিতেন। তাঁদের শিল্পপ্রীতি ও জাঁকজমকের পরিচয় পাই অতি যত্নে তৈরি বরবুদুরের সুপ্রসিদ্ধ স্তূপে। জাভার (যবদ্বীপ) এই প্রকাণ্ড মন্দির একটি পাহাড়ের উপর আজও দাঁড়িয়ে আছে। এতে ছাদওয়ালা নয়টি থাম, নিম্নতম স্তরটি লম্বায় প্রায় ১৩১ গজ।

মহাযান পন্থী শৈলেন্দ্র বংশ

বরবুদুরের স্তূপ

সর্বোচ্চ ধামের মাঝখানে আছে একটি ঘণ্টাকৃতি বৃহৎ স্তূপ। স্তূপগুলির মধ্যে অগণিত বুদ্ধমূর্তি আছে। অলিন্দগুলিতেও চমৎকার কারুকার্য। মালয় ও ইন্দোনেশিয়ায় এককালে রামায়ণ ও মহাভারতের যে বহুল প্রচলন ছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে স্থানীয় নৃত্য অনুষ্ঠানে।

সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশেও হীনযান বৌদ্ধ প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সম্রাট অশোকের সময় থেকেই এইসব জায়গায় বৌদ্ধ-ধর্মের বিস্তার শুরু হয়। সুবর্ণভূমিতে তিনি প্রচারক পাঠান। মগধ থেকে শ্যামদেশে (বর্তমান থাইল্যান্ড) বৌদ্ধধর্মের প্রসার হয়, জনশ্রুতি আছে। সিংহল, ব্রহ্ম, ও শ্যামদেশের মন্দিরগুলিতে হিন্দু রীতির প্রভাব সুস্পষ্ট, তা ছাড়া ব্রহ্ম ও শ্যামদেশের অনেক নদী ও রাজ্যের নাম ভারতীয়, যেমন ইরাবতী, শ্রীক্ষেত্র, অযোধ্যা ও সুখোদয়। এই সব অঞ্চলের শাস্ত্র গ্রন্থ পালি ভাষায় লেখা ও পড়া হয়; তাও ভারতের কাছে পাওয়া।

সিংহল, ব্রহ্ম এবং শ্যামদেশ

এতক্ষণ যে সব রাজ্যের কথা বলা হল, তাদের জীবনে ভারতীয় প্রভাব এত বেশি পড়েছিল যে আজও তা মুছে যায়নি। কিন্তু এগুলিকে কোনমতেই ভারতীয় উপনিবেশ বলা চলে না। ভারতের সঙ্গে ঐ দেশগুলির বাণিজ্য ও সংস্কৃতির যোগাযোগই আসল কথা। কাজেই বলা চলে, ভারতীয় সভ্যতা এককালে অন্য দেশের মানুষকে উৎসাহ ও শিক্ষা দিতে পেরেছে। মালয় অঞ্চল থেকে কালক্রমে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম উঠে গেল, মুসলিম ধর্মের উদয় ও প্রসার হল, কিন্তু এখনও সেখানে ভারতীয় প্রভাব নিশ্চিহ্ন হয়নি। একদিকে ভারত, অপরদিকে চীন। উভয়েরই সভ্যতা প্রাচীন, উভয় দেশেই সংস্কৃতির যোগাযোগ ঘটেছে। তাই এই বিরাট ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চলগুলি ভারত ও চীনের কাছে অনেক ঋণী। মধ্য এসিয়ার একটি অংশকে আগে 'সের-ইণ্ডিয়া' বা চীন-ভারত বলা হত। মালয়, ইন্দোচীন ও থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশগুলিতেও কত পরিবর্তন হয়েছে, কিন্তু তাদের সামাজিক জীবনে, আচারে, ও অনুষ্ঠানে এখনও ভারতের সঙ্গে প্রাচীন সম্পর্কের কয়েকটি চিহ্ন ধরা যায়। বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্কৃত ভাষায় লেখা শতাধিক লিপি পাওয়া গেছে। বোঝা যায়, বৌদ্ধধর্ম সাময়িক ভাবে প্রসার লাভ করলেও এখানে পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম বিশেষ করে শৈব বৈষ্ণব ধর্মমতই প্রাধান্য লাভ করে। চম্পায়, কম্বোজে হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শন, সংস্কৃত কাব্য-সাহিত্য, মনু, স্মৃতি, ব্যাকরণ ও জ্যোতিষ বিদ্যার যথেষ্ট চর্চা হয়। শিল্পকলার ক্ষেত্রে অবশ্য চম্পার চেয়ে কম্বোজ ও যবদ্বীপের কৃতিত্বই বেশি।

ভারতীয় সভ্যতার চিহ্ন বর্তমানেও অটুট

অষ্টম অধ্যায়

মধ্যযুগে ভারত ঃ দিল্লী সুলতানী

[এক] তুর্কী-আফগান ও মুঘল যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 'মুসলিম ভারত' না বলে কেন 'মধ্যযুগের ভারত' বলা উচিত? ইতিহাস অখণ্ড ও অবিভাজ্য। তবু প্রবহমান ইতিহাসের ধারাকে কয়েকটি কালপর্বে বিভক্ত করা যায়। কিন্তু কোন বিশেষ যুগকে 'হিন্দু', 'মুসলিম' প্রভৃতি নামে চিহ্নিত করা উচিত নয়। কারণ কোন ধর্ম বা সম্প্রদায়ের নামে ইতিহাসকে নামাঙ্কিত করা সঙ্গত নয়। মুসলমান শাসিত ভারতবর্ষের ইতিহাসকে 'মুসলিম ভারত' না বলে 'মধ্যযুগের ভারত' বলাই সঙ্গত। কারণ, এ যুগের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে মূলতঃ মুসলমান প্রাধান্য দেখা গেলেও, অন্যান্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের ভূমিকা নগণ্য ছিল না। সুতরাং 'মুসলিম ভারত' নামকরণে ইতিহাসের ব্যাপক ধারণাকে খণ্ডিত ও সংকীর্ণ করা হ'বে। দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস বলতে শুধু রাষ্ট্রীয় উত্থান-পতনের কাহিনী বোঝায় না। মানুষের যাবতীয় কর্ম, চিন্তা এবং উন্নতির প্রয়াস, এমনকি মানব-মনের বিশ্বাস ও সংস্কার পর্যন্ত ইতিহাসের বিষয়বস্তু। তৃতীয়তঃ দীর্ঘকাল পাশাপাশি থাকার ফলে হিন্দু-মুসলমান, এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রাথমিক বিরোধের তীব্রতা কমে আসে। এমনকি চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্মপ্রচারক হিন্দু ও ইস্‌লাম ধর্মের ভাল ভাল উপদেশগুলি একত্র মিশিয়ে মিলনের সেতু রচনা করতে থাকেন। ধীরে ধীরে ভারতে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যা কোন বিচারেই সম্পূর্ণ মুসলিম সংস্কৃতি নয়। সুতরাং আলোচ্য যুগের ভারতকে 'মুসলিম ভারত' না বলে 'মধ্যযুগের ভারত' বলাই যুক্তিযুক্ত।

[দুই] **মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদান ঃ সুলতানি যুগ ঃ** সুলতানি যুগের ভারত ইতিহাস রচনার উপাদান প্রচুর। এ যুগের ইতিহাস রচনার জন্য কেবলমাত্র শিলালিপি, মুদ্রা বা অন্যান্য পরোক্ষ উপাদানের উপর নির্ভর করতে হয় না। সুলতানি যুগের বিভিন্ন সময়ে রচিত সমসাময়িক, ইতিহাস, সুলতানদের আত্মচরিত, ঐতিহাসিক সাহিত্য এবং বিদেশী পর্যটকদের বিবরণ সুলতানি যুগের ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক অবস্থার চিত্র পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে।

উপাদানের প্রাচুর্য

আরবী ভাবায় রচিত 'চাচ্‌নামা' আরবদের সিন্ধু-বিজয়ের এক প্রামান্য পুস্তক। 'তারিখ্-ই-সিন্ধ্' গ্রন্থে মীর মহম্মদ মাসুম আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় থেকে

আকবরের যুগ পর্যন্ত ঘটনাবলী লিখে গেছেন। অল্‌বিরুণী-রচিত **'তারিখ-উল্‌-হিন্দ'** গ্রন্থে একাদশ শতকের শুরুতে ভারতের ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি পাওয়া যায়। মিনহাজ্‌-উস্‌-সিরাজ-রচিত **'তবকৎ-ই-নাসিরি'** গ্রন্থে ১২৬০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানি সাম্রাজ্যের এক ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। আমীর খসরু রচিত **'খাজাইন-উল্‌-ফুতুহ্‌'** খলজী ও তুঘলক যুগের ইতিহাসের এক অতি মূল্যবান গ্রন্থ। জিয়াউদ্দিন বারণী-রচিত **'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'** গ্রন্থে বলবনের সিংহাসন লাভ থেকে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছর পর্যন্ত সময়ের ঘটনাবলী বর্ণিত আছে। খাজা আবদুল্লা মালিক ইসামি-রচিত **'ফুতুহ্‌-উস-সালাতিন'** নামক গ্রন্থে মামুদের সময় থেকে মহম্মদ-বিন-তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক বিবরণ আছে।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনা

আফগান আমলের কোন সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ না থাকায় ঐ যুগের ইতিহাসের জন্য আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলের রচনার উপর নির্ভর করতে হয়।

আফগান যুগের সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থের অভাব

সুলতানি যুগের ইতিহাস রচনার জন্য বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মহম্মদ-বিন্‌-তুঘলকের রাজত্বকালে মরক্কোনিবাসী ইবন্‌ বতুতা ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। **'সফর নামা'** নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর ভ্রমণ কাহিনী লিপিবন্ধ করেছেন। এই বিবরণই মহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালের একটি মৌলিক ও নির্ভরযোগ্য উপাদান। চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ান পঞ্চদশ শতকের বাঙলার সমাজ ও অর্থনীতি তাঁর রচনায় সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন। এ ছাড়া সুলতানি যুগের অন্যান্য পর্যটকদের মধ্যে নিকোলো-কন্টি- আবদুর রজাক ও মার্কোপোলোর বিবরণী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী

[তিন] ভারতে ইসলামের প্রবেশ ; আরবগণের সিন্ধু বিজয় ঃ উত্তর ভারতে যখন হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য ধ্বংসের পথে, ঠিক সেই সময় আরবদেশে একটি নতুন ধর্ম মতের উদয় হয়। তার নাম ইসলাম। এই মহান ধর্ম প্রচলন করেন আরবের এক মহাপুরুষ হজরত মহম্মদ। অল্প সময়ের মধ্যে এই ধর্ম পশ্চিমমুখী পারস্য, মিশর, সিরিয়া, উত্তর আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ছড়িয়ে পড়ে। ইসলামের অগ্রগতির সঙ্গে ভারতের ভাগ্য জড়িত ছিল। ৬৭০ খ্রীস্টাব্দে পারস্য সাম্রাজ্য অধিকারের পর থেকেই আরবদের দৃষ্টি পড়ে ভারতবর্ষের উপর এবং ৭১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রমান্বয়ে বহুবার ভারত আক্রমণের চেষ্টা করা হয় এই জাতীয় চেষ্টার শেষ পরিণতি হ'ল ৭১১-১২ খ্রীস্টাব্দে ইরাকের শাসনকর্তা হাজাজের নির্দেশে সিন্ধুদেশ আক্রমণ। এই সময় সিন্ধুদেশে দাহির নামে একজন ব্রাহ্মণ রাজা রাজত্ব করতেন। আরবী ভাষায় রচিত 'চচ্‌নামা' থেকে জানা যায়, দাহিরের পিতা প্রাক্তন

ইসলামের বিস্তার

সিন্ধু আক্রমণ

রাজবংশ উচ্ছেদ করে সিন্ধু দেশের রাজ্যভার গ্রহণ করেছিলেন। যাই হোক, সিন্ধু দেশের উপকুলে জলদস্যুরা হাজাজের একখানি জাহাজ লুঠ করলে হাজাজ দাহিরের কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন। জলদস্যুদের ওপর তার কোন হাত নেই এই যুক্তিতে সিন্ধুরাজ দাহির ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেন। তখন এই অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হাজাজ তাঁর জামাতা মহম্মদ-বিন্-কাশিমের নেতৃত্বে দাহিরের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অভিযান প্রেরণ করেন। ছয় হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে মহম্মদ বিন্-কাশিম সিন্ধু দেশের দেবল বন্দরে উপস্থিত হয়। কিন্তু দাহির প্রতিরোধের আপ্রাণ চেষ্টা করেও ব্যর্থ হন এবং দেবল বন্দরের পতন হয়। এর পর কাশিম কয়েকটি হিন্দু দুর্গ দখল করেন। সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে দাহির যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। এরপর ব্রাহ্মণাবাদ, মুলতান প্রভৃতি স্থানও কাশিমের অধিকারে আসে। এইভাবে সিন্ধুদেশে আরব অধিকার ও শাসন প্রবর্তিত হয়। বিদেশী মুসলিম শক্তির বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরোধ বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে পরিচালনা করার জন্য দাহির ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সেইজন্য দাহিরের নাম ও কৃতিত্ব চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, পুষ্যমিত্র সুঙ্গ এবং স্কন্দগুপ্তের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে।

আক্রমণ অজুহাত ও দাবি

মহম্মদ বিন্ কাশিমের অভিযান, ব্যর্থ প্রতিরোধ

দেবলের পতন ও দাহিরের মৃত্যু

মুসলিম অধিকারের প্রসার, দাহিরের কৃতিত্ব

সিন্ধুদেশে কিন্তু আরব শাসন বেশি দিন স্থায়ী হতে পারে নি। ভারতের অভ্যন্তরেও আরব শাসন প্রবেশ লাভ করতে পারল না। এর পিছনে অনেকগুলি কারণ ছিল। প্রথমতঃ প্রতিহার, চালুক্য প্রভৃতি রাজপুত রাজ্যগুলি তখন বেশ শক্তিশালী ছিল। মিহিরভোজের গোয়ালিয়র অনুশাসন থেকে জানা যায় যে, গুর্জর প্রতিহার রাজ যুদ্ধে ম্লেচ্ছদের বার বার পরাস্ত করেছিলেন। তাঁদের প্রতিরোধ শক্তি ও সামরিক সাফল্য মুসলিমদের হঠে যাবার একটি প্রধান কারণ। দ্বিতীয়তঃ, মুসলিম জগতের প্রভু খলিফাগণ এই রাজ্যটির রক্ষা অথবা সম্প্রসারণের প্রতি উদাসীন ছিলেন। আরব-পারস্য অঞ্চলের সঙ্গে সমুদ্রপথে সিন্ধুদেশের যোগাযোগ নিয়মিত ভাবে রক্ষা করার গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করেন নি। ফলে, অল্পকালের মধ্যেই সিন্ধুদেশ কতকগুলি ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়। তৃতীয়তঃ, হিন্দুভারতে যুদ্ধনীতি ও দেশরক্ষার প্রচেষ্টা তখনও নিতান্ত দুর্বল হয়ে পড়েনি। হিন্দুরাজগণের মধ্যে সম্পূর্ণ ঐক্য না থাকলেও তাঁদের সামরিক নৈপুণ্য, শক্তি এবং দেশরক্ষা সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব ছিল না। চতুর্থতঃ, প্রাকৃতিক বাধা থর মরুভূমির অবস্থিতির জন্য আরবদের পক্ষে গাঙ্গেয় অঞ্চলে অনুপ্রবেশ করা সহজ কাজ ছিল না।

আরব জয়ের ব্যর্থতা ও ব্যর্থতার কারণ

রাজপুত রাজ্যগুলির প্রতিরোধ শক্তি ও সামরিক সাফল্য

সিন্ধু রক্ষায় খলিফাগণের উদাসীনতা

হিন্দু ভারতের দেশ রক্ষার সচেতনতা ও সামরিক নৈপুণ্য, প্রাকৃতিক বাধা

রাজনীতিক্ষেত্রে আরবদের সিন্ধুবিজয় ভারতের ইতিহাসে তাৎপর্যহীন ও একটি বিক্ষিপ্ত অধ্যায়। আরব শাসন কেবল মাত্র সিন্ধু অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। ঐতিহাসিক স্টেন্‌লি লেনপুলের মতে আরবদের সিন্ধুদেশ-জয় ছিল 'ভারত ও ইসলামের ইতিহাসের এক ফলাফলবিহীন ঘটনা'।

ভারত-ইতিহাসে সিন্ধু বিজয়ের তাৎপর্য

কিন্তু সংস্কৃতি ও সভ্যতা-বিস্তারের দিক থেকে সিন্ধু-বিজয়ের মূল্য কম ছিল না। আরবগণ ভারতবাসীর সংস্পর্শে এসে ক্রমশঃ ভারতীয় সভ্যতার নিকট ও প্রকৃত পরিচয় পেতে থাকে এবং তার ফলে ভারত ও বোগদাদের মধ্যে যোগসূত্র রচিত হয়। আরবগণ হিন্দুদের নিকট জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাশাস্ত্র, হিন্দুদর্শন, গণিত, সঙ্গীত, চিত্রকলা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানলাভ করে। এই আরবগণের মাধ্যমেই ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের মহিমা পরবর্তীকালে পাশ্চাত্ত্য দেশে প্রসার লাভ করে। অপর পক্ষে হিন্দু নাবিকরা ভারতের উপকূল ধরে বহুদিন থেকে যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার ভোগ করে আসছিল, এখন ক্রমশঃ তা আরব সওদাগরদের অধীনে চলে গেল। ভারতের উপকূল-বাহী সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রাচীন অধিকার এইভাবে পরহস্তগত হয়। আরবরা এই জল বাণিজ্যের পথ পশ্চিম থেকে ক্রমে পূর্ব দিকে সরিয়ে আনে এবং ভারত মহাসাগরের সমগ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে (ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশে) তাদের একচেটিয়া বাণিজ্য কায়েম করে।

পরোক্ষ ফলাফল, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের কাছে আরবের ঋণ

সামুদ্রিক বাণিজ্যে হিন্দু নাবিকদের একচেটিয়া অধিকার হস্তচ্যুত

[চার] ভারতে মুসলমান শাসনের সূচনা ঃ মুসলমান আক্রমণের প্রাক্কালে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের অবস্থা ঃ ভারতে মুসলিম রাজ্যের সূত্রপাত হয় যখন আরবরা ৭১১ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধুর রাজা দাহিরকে পরাস্ত করে ঐ প্রদেশে অধিকার করে। কিন্তু আরবরা ভারতের ভিতরে আর অগ্রসর হতে পারে নি। তার প্রধান কারণ, প্রতিহার রাজ্য আরব মুসলিমদের বাধা দিয়ে পশ্চিমে ভারতে প্রবল হতে দেয়নি। সিন্ধুদেশ অল্পকালের মধ্যে ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়, আর খলিফারাও সিন্ধু রাজ্যটিকে রক্ষা করার বা শক্তিশালী করার জন্য চেষ্টা করেননি। এইভাবে প্রায় দু'শ বছর কেটে যায়। আরবরা সিন্ধুর সীমা অতিক্রম করে ভারতীয় জীবনের কোন ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করতে পারে নি। এই কারণে দশম শতাব্দীর শেষ পর্বে গজনীর তুর্কী মুসলমানদের আক্রমণের সময় থেকেই ভারতবর্ষে প্রকৃত মুসলিম আক্রমণ ও প্রভুত্ব বিস্তারের সূচনা হয় বলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক মনে করেন।

সিন্ধুর দুর্বলতা ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভাজন

গজনীর তুর্কী মুসলমানদের ভারত আক্রমণ

দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে মধ্য এসিয়া বা তুরাণ অঞ্চলে তুর্কী মুসলমানরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে। আলপ্তগীন নামে এক তুর্কী নেতা গজনীতে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মৃত্যুর পর জামাতা সবুক্তগীন গজনীর সিংহাসন পেলেন। এই সময়ে উত্তর ভারত কয়েকটি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল এবং মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করার মত কোন সার্বভৌম রাজশক্তি ছিল না। ঐ সময়ে কাশ্মীরে কার্কট বংশ, আজমীর ও দিল্লীতে চৌহান বংশ, কনৌজে গাহড়বান বংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যগুলি পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তখন ভারতের উত্তর পশ্চিমে ও পাঞ্জাবে হিন্দু শাহী বংশ রাজত্ব করত। ঐ রাজ্যের রাজা ছিলেন জয়পাল। তাঁর রাজধানী ছিল উন্দ। গজনী ও শাহীরাজ্য পাশাপাশি থাকায় শীঘ্রই সবুক্তগীনের সঙ্গে শাহীরাজ জয়পালের সংঘর্ষ বাধল। ৯৮৬ খ্রীস্টাব্দে জয়পাল সবুক্তগীনের কাছে পরাস্ত হয়ে রাজ্যের কিছু অংশ ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। কিন্তু নিজ রাজ্যে ফিরে এসে তিনি সন্ধির শর্ত অমান্য করেন। তখন সবুক্তগীন আবার জয়পালকে আক্রমণ করেন। এই সময়ে কয়েকটি হিন্দু রাজ্য তাঁকে যুদ্ধে সাহায্য করে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়পালের শোচনীয় পরাজয় হয়। তার ফলে শাহীরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল সবুক্তগীনের অধিকারে চলে যায়।

আলপ্তগীন, সবুক্তগীন, উত্তরভারতের অবস্থা

উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পাঞ্জাবের অবস্থা

গজনী ও শাহীরাজ্যের সংঘর্ষ, জয়পালের পরাজয়

শাহীরাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে সবুক্তগীনের অধিকার প্রতিষ্ঠা

সুলতান মামুদ ঃ (৯৯৮-১০৩০ খৃস্টাব্দ) মামুদ ছিলেন গজনীর শ্রেষ্ঠ সুলতান। পিতা সবুক্তগীনের মৃত্যু হলে তিনি সিংহাসনে বসেন। তাঁর পরাক্রমে বোগদাদের খলিফা পর্যন্ত তাঁর স্বাধীনতা স্বীকার করেন। হিন্দুদের অতুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন, সেখানকার পৌত্তলিক ধর্ম উচ্ছেদ—এই দুইটি সংকল্প নিয়ে তিনি ভারত অভিযান শুরু করেন। তাই ভারতবর্ষ তাঁর আক্রমণে ও অত্যাচারে বিশেষ ভাবে উৎপীড়িত হয়েছিল। মামুদ মোট সতেরো বার উত্তর ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। তাঁর প্রথম অভিযান ১০০১ খৃস্টাব্দে। সে সময় তিনি পেশোয়ারের কাছে পিতৃশত্রু জয়পালকে যুদ্ধে হারিয়ে বন্দী করেন। তারপর অপমানজনক সন্ধি থেকে মুক্তির জন্য জয়পাল জ্বলন্ত চিতায় প্রাণ বিসর্জন দেন। জয়পালের ছেলে আনন্দপাল ১০০৬ সালে এক যুদ্ধে মামুদের কাছে পরাজিত হন। তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য আনন্দপাল হিন্দু রাজাদের সাহায্য পেয়েছিলেন, একথা সত্য নয়। যাই হোক আনন্দপাল দু-বছর পরে সুলতান মামুদের কাছে চূড়ান্ত ভাবে হেরে যান। আনন্দপালের ছেলে ত্রিলোচনপাল ও পৌত্র ভীমপালের প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও তুর্কী আক্রমণের চাপে শাহী বংশ ধ্বংস হয়ে যায় (১০২৬ খৃঃ)।

মামুদের ভারত অভিযানের উদ্দেশ্য

জয়পাল, আনন্দপাল

শাহী বংশ ধ্বংস

ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল ও পাঞ্জাব রক্ষার জন্য শাহী রাজাদের এই বীরত্বের কথা ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে আছে। 'রাজতরঙ্গিনীর' লেখক কল্‌হন ও সুপণ্ডিত অল্‌বিরুনি এ কথার উল্লেখ করেছেন। মামুদের অভিযানের ফলে উত্তর ভারতের অনেক সমৃদ্ধ শহর ও রাজ্য লুঠ হয়েছিল। থানেশ্বর মথুরা প্রভৃতি বড় বড় নগরের বহু মন্দির ধ্বংস হয়, অনেক মানুষের প্রাণহানি হয়। ১০১৮ সালে মামুদ যখন প্রতিহারদের রাজধানী কনৌজ আক্রমণ করেন তখন রাজা রাজাপাল ভয় পেয়ে আত্মসমর্পণ করেন। গুর্জর-প্রতিহার বংশের গৌরবময় ইতিহাসের এখানেই সমাপ্তি। ১০২৬ খৃস্টাব্দে মামুদ সৌরাষ্ট্রের প্রসিদ্ধ সোমনাথ মন্দির লুঠ করেন। চালুক্যরাজ ভীম যুদ্ধ করে মামুদের গতিরোধ করতে পারেন নি। সোমনাথের মন্দির অপবিত্র করে, বিগ্রহ চূর্ণ করে মামুদ প্রচুর ধনরত্ন নিয়ে দেশে ফিরে যান। চার বছর পরে গজনীতে সুলতান মামুদের মৃত্যু হয়।

কনৌজের পতন

সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন

চালুক্যরাজ ভীমের প্রতিরোধ ও ব্যর্থতা

মামুদের ভারত আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল, ভারতের অতুল ঐশ্বর্য লুণ্ঠন করা। কোনও উচ্চ আদর্শ তাঁর ছিল না মনে হয়। ভারতবাসীদের চোখে তিনি নিষ্ঠুর ধর্মদ্বেষী লুণ্ঠনকারী হিসাবে কুখ্যাত। কিন্তু স্বদেশে তিনি ছিলেন ন্যায়বান গুণগ্রাহী সুশাসক। ভারতের ধনরত্ন দিয়ে তিনি গজনীতে একটি বড় বিদ্যাপীঠ ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন, রাজধানীরও যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি করেন। তাঁর রাজসভায় প্রসিদ্ধ 'শাহনামা'র লেখক ফিরদৌসী, ঐতিহাসিক উৎবি, দার্শনিক ফরাবি প্রভৃতি মনীষীদের যথেষ্ট সমাদর ছিল। মামুদের বার বার আক্রমণে পাঞ্জাব গজনী রাজ্যভুক্ত হয়েছিল কিন্তু পাঞ্জাবে তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করেন নি। তবে তাঁর দেখানো পথেই মহম্মদ ঘুরী হিন্দুস্থানে মুসলিম আধিপত্য কায়েম করেছিলেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের ফলাফল : মূলতঃ লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হ'লেও সুলতান মামুদের ভারত অভিযানগুলির কয়েকটি স্থায়ী ফল ছিল। প্রথমতঃ সামরিক প্রয়োজনে পাঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানের উপর তাঁর আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, মুসলমান আক্রমণকারীদের সম্পর্কে ভারতীয় হিন্দু জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার হয়েছিল এবং তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তৃতীয়তঃ, মামুদের ক্রমাগত আক্রমণের চাপে উত্তর ভারতের রাজ্যগুলি সামরিক শক্তি কিছুটা বিধ্বস্ত হয়েছিল। এর ফলে পরবর্তীকালে মুসলমান আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি তাদের ছিল না। চতুর্থতঃ মামুদের ধর্মীয় অত্যাচারের ফলে ভারতীয় হিন্দুদের মনে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা সৃষ্টি হয়েছিল। এর ফলে ভারতে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তনে যথেষ্ট বাধার সৃষ্টি হয়েছিল।

পাঞ্জাবের অধিকাংশের উপর মুসলমান আধিপত্য

হিন্দুদের ভীতি, অর্থনৈতিক ভিত্তি দুর্বল

সামরিক শক্তি হ্রাস

হিন্দুদের মনে ইসলাম সম্পর্কে ঘৃণা

অলবিরুনি (৯৭৩—১০৪৮ খ্রীঃ) ঃ সুলতান মামুদের শাসনকালে অল্‌বিরূণি ছিলেন একজন বিশেষ প্রতিভাবান ব্যক্তি। মামুদের রাজসভায় তিনি ছিলেন অলঙ্কার স্বরূপ। ৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে খিভা রাজ্যে তাঁর জন্ম হয়। খুব সম্ভব তিনি যুদ্ধবন্দী হিসেবে গজনীতে আনীত হন এবং তাঁর বিদ্যাবুদ্ধির কথা জানার পর গুণজ্ঞ সুলতান তাঁকে সসম্মানে রাজসভায় প্রতিষ্ঠিত করেন। মামুদ পাঞ্জাব অধিকার করার পর অল্‌বিরূনি তাঁর সঙ্গে পাঞ্জাবে কিছুকাল বসবাস করেন। এই সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষা, হিন্দু দর্শন ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করেন। অল্‌বিরূনির 'তারিখ-উল-হিন্দ' নামক গ্রন্থে ভারতীয় ইতিহাস, ভারতবাসীদের চরিত্র, আচার-ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান মন্তব্য আছে। গ্রন্থটিকে বিশ্ব-সাহিত্যের একটি অমূল্য সম্পদ বললে অত্যুক্তি হয় না। ভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির উপর এমন নিখুঁত তথ্যপূর্ণ বই কোন বিদেশীই লিখতে পারেন নি। হিন্দুদের সমাজ ধর্ম ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর গভীর দৃষ্টি ও জ্ঞান ছিল। জনৈক পণ্ডিতের মতে, —"উন্মুক্ত তরবারি, অগ্নিদগ্ধ নগর আর লুণ্ঠিত দেবালয়ের উন্মত্ত পরিবেশে 'অল্‌বিরূনির ভারত কথা' যেন উদার, নিরপেক্ষ জ্ঞান সাধনার এক স্বপ্নময় দ্বীপ। উইল ডুরান্টের মতে গ্রন্থখানি প্লিনির 'Natural History' নামক পুস্তকের সঙ্গে তুলনীয়। যাই হোক, এই গ্রন্থে একাদশ শতকের শুরুতে ভারতের ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য ও বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায়।

পরিচিতি

শাস্ত্রচর্চা ও পাণ্ডিত্য

ভারত-গ্রন্থ ও তাহার মূল্য

[পাঁচ] দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা ঃ ঘুর বংশের সুলতান গিয়াসুদ্দিন গজনী রাজ্যকে উচ্ছেদ করলে সমগ্র আফগানিস্থান ও পাঞ্জাব তাঁর রাজ্যভুক্ত হল। গিয়াসুদ্দিনের ভাই মহম্মদ ঘুরী সুলতান মামুদের প্রদর্শিত পথেই উত্তর ভারতে মুসলিম আধিপত্য অনেকটা কায়েম করেছিলেন।

ঘুরবংশ, গিয়াসুদ্দিন, মহম্মদ ঘুরী

দিল্লী সুলতানীর প্রতিষ্ঠা ও প্রসার ঃ 'দাস' বংশ (আলবারি তুর্কী) ঃ কুতবউদ্দিন আইবক ঃ মহম্মদ ঘুরীর মৃত্যুর পরে তাঁর সেনাপতি কুতবউদ্দিন পাঞ্জাব ও অন্যান্য রাজ্য পেলেন (১২০৬ খৃঃ)। প্রকৃতপক্ষে কুতবউদ্দিন আইবকই হিন্দুস্থানে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হিন্দুস্থানে তিনি যে মুসলিম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন তা ৩২০ বছর টিঁকে ছিল। সাধারণতঃ পাঠান নামে পরিচিত হলেও, সুলতানরা আসলে 'আলবারি তুর্কী' ছিলেন। এই সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল দিল্লী। কুতবউদ্দিন যে সুলতানী প্রতিষ্ঠা করেন, তা 'দাস বংশ' নামে পরিচিত, কারণ তিনি ও তাঁর দুজন উত্তরাধিকারী প্রথম জীবনে দাস ছিলেন। শত্রুর হাতে পড়ে সে যুগে অনেক সম্ভ্রান্ত বংশের লোকও গোলাম হতেন। তবে অনেক সুলতান তাঁদের দাসদের

কুতবউদ্দিন আইবক কর্তৃক 'দাস' বংশের প্রতিষ্ঠা

ভালোভাবে পালন করতেন এবং গুণ দেখে তাদের উচ্চপদে নিযুক্ত করতেন। কুতবউদ্দিন প্রথমে মহম্মদ ঘুরীর ঐ রকম একজন দাস ছিলেন। কুতব খুব কঠোর শাসক ছিলেন, কিন্তু সাহসী ন্যায়বান ও দানশীল বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। মুসলিম ঐতিহাসিকরা বলেছেন, তিনি উদার প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। কুতুব লক্ষ টাকা দান করতে কিংবা লক্ষ লোকের জীবন নিতে দ্বিধা করতেন না। দিল্লী ও আজমীরের কাছে দুটি মসজিদ তাঁর ধর্ম ও শিল্পের উপর অনুরাগ প্রমাণ করে। লাহোরে কুতবউদ্দিন হঠাৎ মারা গেলে কিছুদিনের জন্য তাঁর অকর্মণ্য পুত্র আরাম শাহ সিংহাসনে বসেন। কিন্তু রাজ্যের ওমরাহরা তাঁকে হারিয়ে দিয়ে ইলতুৎমিসকে আমন্ত্রণ করে আনেন।

চরিত্র ও কৃতিত্ব

আরাম শাহ, ইলতুৎমিস

ইলতুৎমিস (১২১১—১২৩৫ খৃঃ) প্রথম জীবনে ইলতুৎমিস্ ছিলেন কুতবউদ্দিনের ক্রীতদাস, পরে জামাতা। তাঁর রাজত্বের গোড়ায় চারিদিকে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সিন্ধুর শাসনকর্তা নাসিরউদ্দিন কুবাচা ও বাঙলা দেশের খলজী মালিক নামে শাসনকর্তারা দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করেন। গজনীর তাজউদ্দিন ইলদিজও পাঞ্জাব অধিকারে সচেষ্ট হন। হিন্দুশাসকদের মধ্যেও বিদ্রোহের অভাব ছিল না। হিন্দুগণ গোয়ালিয়র ও রণথম্বোর অধিকার করে নেন। নবপ্রতিষ্ঠিত তুর্কী রাজ্যের এই সংকটমুহূর্তে ইলতুৎমিস্ এই সকল বিদ্রোহ দমন করেন ও রাজ্যরক্ষা করেন। তাজউদ্দিনকে পরাস্ত করে পাঞ্জাব পুনরধিকার এবং দিল্লীর আমীর ও বাঙলার শাসক দলপতিদের দমন করে রাজ্যের নিরাপত্তা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করা তাঁর সুনিশ্চিত কৃতিত্ব। বোগদাদের খলিফা তাঁকে সুলতানী গদী প্রাপ্তির সনদ পাঠালে মুসলিম ভারতে ইলতুৎমিসের প্রতিষ্ঠা বেড়ে যায়। তাঁর মুদ্রায় তিনি নিজেকে খলিফার বিশ্বস্ত অনুচর রূপে বর্ণনা করেছেন। সুলতান হিসাবে রণথম্বোর ও গোয়ালিয়র পুনরধিকার, মালব অভিযান, ভিলসা দুর্গ এবং উজ্জয়িনী অধিকার করে বিন্ধ্য পর্বতের উত্তরে সুলতানী আধিপত্য বিস্তার বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

হিন্দু প্রতিরোধ

ইলতুৎমিসের রাজত্বকালের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, দুর্ধর্ষ চিঙ্গিস খাঁর অধীনে মোঙ্গল (মুঘল অথবা মোগল) আক্রমণ। ১২২০ খৃস্টাব্দে খাওয়ারিজম্ ও পারস্য দেশ অধিকার করে চিঙ্গিস একটি মোঙ্গল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। অনেকের মতে মোঙ্গলগণ বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিল। চিঙ্গিস একজন পলাতক রাজার সন্ধানে ভারতের সীমান্তে এসে পড়েন, কিন্তু ইলতুৎমিস্ এই পলাতক রাজাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত হওয়ায়, চিঙ্গিস স্বেচ্ছায় পাঞ্জাব ত্যাগ করেন। ভারতে মোঙ্গলদের এই প্রথম হানা। চিঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণ আকস্মিক ঘটনা বিশেষ এর পেছনে কোনও সুপরিকল্পিত অভিযানী উদ্দেশ্য ছিল না। বরঞ্চ এর ফলে, সন্দেহভাজন প্রতিদ্বন্দ্বীদের হঠিয়ে আপনার শক্তি বৃদ্ধি করার সুযোগ ইলতুৎমিসের করায়ত্ত হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ

বিদ্রোহদমন, রাজ্যশাসন ও দেশরক্ষা ছাড়াও বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছিল। কুতবউদ্দিনের আরব্ধ কুতবমিনার স্তম্ভটির গঠন তাঁরই শেষ কীর্তি। কোনও কোনও ঐতিহাসিক ইলতুৎমিস্‌কে 'দাসবংশের' শ্রেষ্ঠ সুলতান বলেছেন। এই মন্তব্যের স্বপক্ষে কয়েকটি যুক্তির অবতারণা করা যায়। প্রথমতঃ রাজ্যকে দৃঢ়বদ্ধ করার মত সময় কুতবউদ্দিন পান নি। ইলতুৎমিসের উপর সেই নবজাতকের লালন ও পোষণভার পড়েছিল এবং তিনি যোগ্যতার সঙ্গে সে দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে সব কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হন, সেগুলির সমাধানে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন বলা যায়, মোঙ্গল আক্রমণের আশংকায় তিনি লাহোর থেকে দিল্লীতে রাজধানী সরিয়ে আনেন। প্রতিরোধকারী হিন্দু রাজগণকে তিনি বশ্যতা স্বীকার করান। কুবাচা প্রভৃতি শক্তিমান প্রতিদ্বন্দ্বীদের ক্ষমতা হ্রাস করেন। বাঙলার গিয়াসউদ্দিন খলজীকে তিনি পরাস্ত ও নিহত করেন এবং পরবর্তী বঙ্গ বিদ্রোহকে পুনরায় দৃঢ়হস্তে দমন করেন। তৃতীয়তঃ খলিফার স্বীকৃতি ও অভিনন্দন প্রাপ্তিতে দিল্লীর সুলতানীর ধর্মমর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ফলে উলেমাদের প্রতিষ্ঠাও বাড়তে থাকে এবং রাজতন্ত্র অনেকটা ইসলামী ধর্মের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠ হয়। চতুর্থতঃ তিনিই সর্বপ্রথম আরবী ভাষায় ও হরফে মুদ্রাঙ্কন শুরু করেন। পঞ্চমতঃ সামসি ক্রীতদাসদের নিয়ে তিনি যে 'চল্লিশের চক্র' গঠন করেন তা কালক্রমে এত প্রবল হয়ে ওঠে যে তুর্কী সাম্রাজ্যের ভাঙন ধরিয়ে দেয়। ষষ্ঠতঃ শিক্ষিত রাজদরবারের ঐতিহ্য তাঁরই হাতে গড়ে ওঠে। 'ইন্দো-তুর্কী' নামে পরিচিত এক বিশিষ্ট স্থাপত্য শিল্পধারা ইলতুৎমিসের রাজত্বকালেই প্রবর্তিত হয়। গিয়াসউদ্দিন বলবন আলবেরি তুর্কীদের মধ্যে আর এক শ্রেষ্ঠ সুলতান। শাসক হিসেবে ইলতুৎমিসের সঙ্গে বলবনের প্রায়ই তুলনা করা হয়। ১২৩৬ খৃস্টাব্দে ইলতুৎমিসের মৃত্যু হয়।

আলোচনা

রাজিয়া (১২৩৬—১২৪০ খৃঃ) ঃ ইলতুৎমিসের ছেলেরা অপদার্থ বলে তিনি তাঁর উপযুক্ত কন্যা রাজিয়াকে উত্তরাধিকার দিয়ে যান। তাঁর মৃত্যুর পর অপদার্থ ভাই রুকনউদ্দিনকে সরিয়ে দিয়ে রাজিয়া সিংহাসন অধিকার করেন (১২৩৬ খৃঃ)। মাত্র এই একবারই দিল্লীর সিংহাসনে স্ত্রীলোক বসতে পেরেছিলেন। রাজিয়া পুরুষের বেশে রাজসভায় আসতেন, নিপুণভাবে রাজ্য চালাতেন এবং দরকার মত নিজে অস্ত্র ধারণ করতেন কিন্তু সুলতানীতে নারীর আসন আমীর ওমরাহদের চক্ষুঃশূল হয়ে ওঠে। একজন কর্মচারীর প্রতি রাজিয়ার পক্ষপাতিত্ব দেখে তাঁরা চক্রান্ত শুরু করেন। ফলে, আলতুনিয়ার হাতে তিনি বন্দী হলেন। তখন আলতুনিয়াকে বিবাহ করে রাজিয়া সিংহাসন উদ্ধারের চেষ্টা করেন কিন্তু সফল হননি। শেষে দুজনেই শত্রুর হাতে নিহত হলেন (১২৪০ খৃঃ)।

সিংহাসনে আরোহণ

আমীর ওমরাহ্‌দের চক্রান্ত, মৃত্যু

নাসিরুদ্দিন ও বলবন ঃ রাজিয়ার পর উল্লেখযোগ্য সুলতান হলেন নাসিরুদ্দিন। তিনি ধর্মভীরু শান্তিপ্রিয় মানুষ, রাজকার্যে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ছিলনা। শ্বশুর উলুঘ খাঁ দেশ শাসন করতেন আর তিনি সাধু ফকিরের মত জীবন-যাপন করতেন। রাজকোষ থেকে নিজের খরচ নিতেন না, বই নকল করে তাই বিক্রী করে সংসার চালাতেন। এই বংশে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে আদর্শ চরিত্রের লোক। তাঁর একটি মাত্র বেগম ছিলেন। নাসিরুদ্দিনের মৃত্যুর পর ঐ উলুঘ খাঁ গিয়াসুদ্দিন বলবন নামে দিল্লীর সুলতান হলেন (১২৬৬ খৃঃ)। এক দিকে বিদ্রোহ দমন, অপর দিকে মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ, এই দুটি ব্যবস্থার জন্য তাঁর রাজত্ব বিখ্যাত। নির্মমভাবে বিদ্রোহীদের সায়েস্তা করে তিনি দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিয়ে আসেন। দিল্লীর কাছে আলোয়ার অঞ্চলে মেওয়াটি রাজপুতদের বিদ্রোহ তিনি কঠোর হাতে দমন করেন। এদিকে বাঙলার শাসনকর্তা তুঘ্রল খাঁ বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিল্লী সৈন্যদের দু-দুবার পরাস্ত করেন। তখন সুলতান নিজেই বাঙলায় এসে বিদ্রোহী তুঘ্রল খাঁকে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করেন। পুত্র বুঘরা খাঁকে বাঙলার শাসনকর্তা নিযুক্ত করে তিনি দিল্লী ফিরে গেলেন।

নাসিরউদ্দিন

গিয়াসুদ্দিন বলবনের সিংহাসন প্রাপ্তি

মোঙ্গল আক্রমণ,

আভ্যন্তরীন বিদ্রোহ দমন

ওদিকে মোঙ্গলরা উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আবার আক্রমণ শুরু করাতে বলবন মোঙ্গলদের প্রতিরোধের জন্য ব্যাপক ব্যবস্থা করলেন। তিনিই প্রথম রাজ্যের সীমান্ত রক্ষার প্রয়োজন বুঝেছিলেন এবং ভেবেছিলেন রাজ্য বিস্তারের চেয়ে এটি আরও দরকারী। বলবন নির্দয় শাসক হলেও গুণীদের খুব সমাদর করতেন। প্রসিদ্ধ কবি আমীর খসরু ও ঐতিহাসিক মিনহাজ তাঁর সভায় থাকতেন। সুলতান হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব ইতিহাসে স্থান পেয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর (১২৮৬) 'দাস' বংশের অধঃপতন আরম্ভ হয়। শেষ সুলতান বুঘরা খাঁর ছেলে কায়কোবাদ অপদার্থ ও দুশ্চরিত্র ছিলেন। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে জালালুদ্দিন কায়কোবাদকে হত্যা করে ১২৯০ খৃস্টাব্দে খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

মোঙ্গল ভীতি, সীমান্তের নিরাপত্তা

চরিত্র ও কৃতিত্ব,

কায়কোবাদ 'দাস' বংশের পতন

[ছয়] খলজী সাম্রাজ্যবাদ ঃ আলাউদ্দীন খলজী (১২৯৬-১৩১৬ খৃঃ) জালাল-উদ্দিন খলজী ছয় বছর রাজত্ব করেন। সে সময়ে মোঙ্গলরা ভারত আক্রমণ করলে সুলতান তাদের বিতাড়িত করেন। প্রায় তিন হাজার মোঙ্গল এদেশে থেকে যায়। জালালুদ্দিন এদের ইসলামে দীক্ষিত করে দিল্লীর কাছে বসবাস করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। এরা নব মুসলমান নামে পরিচিত। জালাল-উদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র আলাউদ্দিন নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। তিনি পিতৃব্যকে হত্যা করে প্রচুর টাকা দিয়ে দিল্লীর আমীর ও ওমরাহদের বশীভূত

জালালউদ্দিন, নব মুসলমান

আলাউদ্দিন কর্তৃক সিংহাসন অধিকার

করেন। তারপর ১২৯৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিংহাসন অধিকার করে দৃঢ় শাসন এবং রাজ্যবিস্তারের দিকে মন দিলেন। তিনি দিগ্‌বিজয়ী সুলতান হতে চেয়েছিলেন।



সাম্রাজ্য বিস্তার: আলাউদ্দিন প্রথমে রাজপুত রাজ্য গুজরাট আক্রমণ করলেন। তাঁর সেনাপতিরা রাজা কর্ণদেবকে হারিয়ে সমৃদ্ধ বন্দরগুলি লুঠ করেন। অসংখ্য বন্দীর মধ্যে ছিলেন মালিক কাফুর ও রানী কমলা দেবী। পরে একজন তাঁর শ্রেষ্ঠ সেনাপতি, অপরজন তাঁর প্রিয় মহিষী হন। তারপর তিনি রাজস্থানের দিকে এগিয়ে রানা হামীরের অধীন রণথম্বোর দুর্গ আক্রমণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতক

উত্তর ভারত, গুজরাট
রণথম্ভোর, চিতোর

সেনাপতির সাহায্যে দুর্গ জয় করেন (১৩০১ খৃঃ)। ১৩০৩ খৃস্টাব্দে তিনি চিতোর আক্রমণ করলেন। প্রাচীন রাজপুত কাহিনীতে শোনা যায়, তিনি রানা ভীমসিংহের পত্নী পদ্মিনীর রূপলাবণ্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন। চিতোরের পতন আসন্ন হওয়াতে পদ্মিনী জহরব্রতে আত্মবিসর্জন দেন ও রাজপুতেরা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেয়। আধুনিক ঐতিহাসিকরা পদ্মিনীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করেন। তা ছাড়া, এ সময়ে চিতোরের রানা ছিলেন রত্নসিংহ, সুতরাং কাহিনীটি ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। এরপর মালবের উজ্জয়িনী, ধারা, মাণ্ডু, চান্দেরী রাজ্যগুলি আলাউদ্দিন দখল করেন। উত্তর ভারতে প্রায় সর্বত্র অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে আলাউদ্দিন দাক্ষিণ ভারত বিজয়ে মন দিলেন। প্রথমবার পরাজয়ের পর দেবগিরির রাজা রামচন্দ্র নিয়মিত কর দিতে অবহেলা করছিলেন। তার উপর তিনি গুজরাটের পলাতক রাজা কর্ণদেবকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এখন কাফুরের কাছে হেরে গিয়ে রামচন্দ্র বশ্যতা স্বীকার করলেন। এরপর কাফুর তেলিঙ্গানার বরঙ্গল আক্রমণ করে কাকতীয়রাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্রদেবকে হারিয়ে দেন ও সন্ধি করতে বাধ্য করেন। ১৩১০ খৃস্টাব্দে মালিক কাফুর দোরসমুদ্রে হয়সলরাজ তৃতীয় বীর বল্লালকে পরাজিত ও বন্দী করে দিল্লীতে পাঠালেন। তারপর কাফুর মাদুরার পাণ্ড্যরাজ ও তাঞ্জোরের চোল রাজাকে পরাস্ত করে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে একটি মসজিদ স্থাপন করলেন। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের পুত্র একবার দেবগিরির স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করলে তিনি কাফুরের হাতে পরাজিত ও নিহত হন। দক্ষিণ ভারতে এই ব্যাপক তুর্কী অভিযানের ফলে বহু নগর লুঠ ও অগণিত মন্দির বিধ্বস্ত হয়েছিল। মৌর্যদের পরে এই দ্বিতীয়বার সারা ভারত জুড়ে সাম্রাজ্য স্থাপিত হল। এটি সম্ভব হয়েছিল আলাউদ্দিন ও তাঁর সুযোগ্য সেনাপতি মালিক কাফুরের অদম্য চেষ্টায় ও যুদ্ধ-কৌশলে। খলজী সাম্রাজ্য অবশ্য বেশি দিন স্থায়ী হয়নি।

মালব

দক্ষিণ ভারত, দেবগিরি

বরঙ্গল, দোরসমুদ্র, মাদুরা, চোল রাজ্য

মালিক কাফুর

আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে মোঙ্গলরা অনেকবার আক্রমণ করেছিল। প্রথম বারে তাঁর এক সেনাপতি বাধা দিতে গিয়ে প্রাণ হারান। আবার যখন মোঙ্গলরা আসে, আলাউদ্দিন তখন পশ্চিম সীমান্তে কয়েকটি দুর্গ তৈরি করেন। এদিকে দিল্লীর উপকণ্ঠে 'নব মুসলমানরা' বিদ্রোহ করলে সুলতান একদিনে ত্রিশ হাজার লোক হত্যা করেন। মোঙ্গলরা আরও তিনবার হানা দিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দিন তাদের রুখতে পেরেছিলেন ও সীমান্ত রক্ষা করেছিলেন।

মোঙ্গল আক্রমণ, ও প্রতিরোধ পশ্চিম সীমান্তে দুর্গ নির্মাণ

শাসন ব্যবস্থা ঃ মোঙ্গল আক্রমণ ছাড়া আরও নানা বিদ্রোহ আলাউদ্দিনকে চিন্তান্বিত করে তুলেছিল। তিনি বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান করে চারটি কারণ

খুঁজে পান : (১) রাজকার্যে সুলতানের আলস্য অবহেলা, (২) আমীর ওমরাহদের সামাজিক সম্বন্ধ, (৩) মদ্যপান, এবং (৪) প্রজাদের আর্থিক অসচ্ছলতা। সুলতান এগুলি সম্বন্ধে যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সাম্রাজ্যের সংবাদ সংগ্রহের জন্য তিনি একদল গুপ্তচর নিযুক্ত করলেন। মদ্যপান নিষিদ্ধ হল, সামাজিক উৎসবাদি বন্ধ হল। সুলতানের সম্মতি ছাড়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হল। আলাউদ্দিন অনেকের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করলেন, এবং প্রজাদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করলেন। হিন্দুগণকে আয়ের অর্ধেক রাজকর দিতে হত। এর ফলে তাদের দুর্দশার অন্ত ছিল না।

বিদ্রোহের কারণ

প্রতিকার ব্যবস্থা, কর স্থাপন

আলাউদ্দিনের শাসনের ভিত্তি ছিল সামরিক। যুদ্ধবিগ্রহ ও সীমান্তরক্ষার জন্য বহু সৈন্যের প্রয়োজন হত। জিনিসের দাম কম না হলে বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করা কঠিন। এই উদ্দেশ্যে আলাউদ্দিন জিনিসের দর বেঁধে দিয়ে মূল্য-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা চালু করেন। বিভিন্ন রকমের খাদ্য শস্য, সুতা ও রেশম বস্ত্র ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ক্রয়-বিক্রয়ের মূল্য সূচী নির্দিষ্ট রাখার ব্যাপারে প্রত্যেক বিক্রেতাকে সতর্ক করে দেওয়া হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণে কয়েকটি খামার ও বাজার গড়ে তোলা হয়। এ ছাড়া কয়েকটি শস্য ভাণ্ডার স্থাপন করা হয় এবং ন্যায্য মূল্যের দোকান মারফৎ শস্য ভাণ্ডারগুলি থেকে জনসাধারণের মধ্যে খাদ্য শস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়। বস্তুতঃ দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 'রেশনিং ব্যবস্থার' প্রবর্তন আলাউদ্দিনের প্রশংসনীয় কীর্তি।

শাসনের সামরিক ভিত্তি

বিভিন্ন অর্থ নৈতিক ব্যবস্থা

ঐতিহাসিকগণ আলাউদ্দিনের দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও 'রেশনিং ব্যবস্থার ফলাফল সম্পর্কে একমত নন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, এই ব্যবস্থাগুলির ফলে জনসাধারণের কোন উপকার হয়নি। সুলতান প্রধানতঃ সেনাবাহিনীর সুবিধার জন্যই ঐ ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক লেনপুল মনে করেন, এতে সাধারণ মানুষও উপকৃত হয়েছিল। কে. এস. লালের মতে মূল্য-নিয়ন্ত্রণের ফলে বণিকদের ক্ষতি হয়েছিল এবং ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাহত হয়েছিল। তবে ফিরিস্তা আলাউদ্দিনের মূল্য নিয়ন্ত্রণ নীতির অকুণ্ঠ প্রশংসা করে গেছেন।

অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ফলাফল

আলাউদ্দিনের আমলে রাজশক্তি ছিল সুকঠিন-সেনাদলের অত্যধিক প্রাধান্য এবং ব্যক্তি স্বাধীনতার অবলোপ এর প্রধান অঙ্গ। তাঁর কঠোর শাসন প্রজারা সহ্য করেছে ; কিন্তু কোন শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের শুভেচ্ছা তিনি অর্জন করতে পারেন নি। রাষ্ট্র-শাসনের ব্যাপারে অপরের হস্তক্ষেপ তিনি পছন্দ করতেন না। সুতরাং তাঁর আমলে উলেমাগণের ক্ষমতাও ছিল সীমাবদ্ধ। তিনি রাজনীতি থেকে ধর্মকে বিচ্ছিন্ন রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। ফলে উলেমা-প্রভাবিত

নরপতিত্বের পূর্বেকার আদর্শ লোপ পায়। আলাউদ্দিনের মন্ত্রিগণ ছিলেন তাঁর সচিব ; সুলতানের আদেশ পালন করাই ছিল তাঁদের কাজ। শক্তিশালী সেনাবাহিনী এবং দক্ষ গুপ্তচরগণের সাহায্যে আলাউদ্দিন এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয়শাসন গড়ে তুলেছিলেন। রাজ্যের সর্বত্র বিশৃংখলা ও অরাজকতার অবসান হয়েছিল, প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত হয়েছিল এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব দেশের সর্বত্র সুদৃঢ় হয়েছিল।

কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব স্থাপন

চরিত্র ও কৃতিত্ব ঃ আলাউদ্দিনের সময়েই ভারতের মুসলিম সাম্রাজ্য সবচেয়ে বিস্তৃত হয়। তিনি শুধু খলজী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান নন, দিল্লীতে সাম্রাজ্যবাদেরও পথিকৃৎ। দ্বিতীয় 'সেকেন্দার শাহ' উপাধি গ্রহণ এবং নব ধর্ম প্রচারের বাসনা থেকে তাঁর দম্ভ ও উচ্চাশা প্রমাণিত হয়। তাঁর চরিত্রে নৃশংসতা ও উচ্ছৃংখলতা ছিল চরম। ঐতিহাসিক বরানীর কথায় সুলতান মিশরের ফ্যারো অপেক্ষা অধিক লোকের প্রাণদন্ড দিয়েছিলেন। ইব্‌ন্ বতুতা তাঁকে একজন 'শ্রেষ্ঠ সম্রাট' আখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু ভিনসেণ্ট স্মিথ সুলতানের ক্ষমতালাভ ও সাম্রাজ্যরক্ষার পথকে কোন শ্রেষ্ঠ শাসক বা রাজনীতিজ্ঞ পুরুষের উপযুক্ত বলে মনে করেন না। তবে সুদূর দক্ষিণ পর্যন্ত ভারতে এত বড় মুসলমান সাম্রাজ্য তাঁরই সৃষ্টি। শিল্পকলাতেও তাঁর আগ্রহ ও অনুরাগ কম ছিল না। তিনি দিল্লীর নিকট সিরি নগরের নির্মাতা। কুতবমিনারের 'আলাই দরবাজা' এবং অসংখ্য মসজিদ তাঁর শিল্পরুচির পরিচয়। বিখ্যাত কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ আমীর খসরু তাঁর সভাসদ ছিলেন।

শ্রেষ্ঠ সুলতান

নৃশংসতা

বরানী ও বতুতার উক্তি, স্মিথের মন্তব্য

শিল্প-কলার প্রসার

সুলতানের শেষ জীবন ছিল অশান্তিময়। তাঁর সাম্রাজ্যের মধ্যে ভাঙন ধরল এবং নানাস্থানে বিদ্রোহ দেখা দিল। সম্ভবতঃ কাফুরের বিষপ্রয়োগে ১৩১৬ খৃীস্টাব্দে আলাউদ্দিনের প্রাণ বিয়োগ হয়। তখন মালিক কাফুর আলাউদ্দিনের শিশু পুত্র শিহাবুদ্দিনকে সুলতান করে নিজেই সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন।

শেষ জীবন

আলাউদ্দিন তুর্ক-আফগান আমলের শ্রেষ্ঠ সুলতান। তাঁর কীর্তি সম্পর্কে মতভেদ থাকলেও এ কথা সত্য যে তিনি শক্তিশালী সম্রাট। শৃংখলা ও দৃঢ় শাসন প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রচুর সামর্থ্য দেখিয়েছেন। তবে আত্মশক্তি বজায় রাখতে তিনি যে সব উপায় অবলম্বন করেন, তাতে মনে হয় কূট কৌশল, চন্ডনীতি আর সামরিক বলের উপর প্রতিষ্ঠিত মধ্যযুগীয় রাজধর্মের ঊর্ধ্বে তিনি উঠতে পারেন নি। সেই হিসেবে তাঁকে গিয়াস্‌উদ্দিন বলবনেরই এক গৌরবময় সংস্করণ বলা চলে।

সমালোচনা

[সাত] মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বকাল (১৩২৫—১৩৫১ খৃীঃ) ঃ খলজী বংশের পতনের পর এলেন তুঘলকরা। দিপালপুরের শাসনকর্তা গাজী

মালিক খল্‌জী বংশের শেষ সুলতানকে হত্যা করেন ও গিয়াসুদ্দিন তুঘলক শাহ্‌ নাম গ্রহণ করে দিল্লীতে তুঘলক বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইবন্‌-বতুতার বিবরণে জানা যায় রাজপুত্র জুনা খাঁর চক্রান্তে গিয়াসউদ্দিন এক দুর্ঘটনায় নিহত হন। পিতা গিয়াসুদ্দিনের মৃত্যুর পর জুনা খাঁ মহম্মদ বিন্‌-তুঘলক নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন (১৩২৫ খ্রীঃ)।

তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা

মহম্মদ তুঘলক মধ্যযুগের একটি অদ্ভুত চরিত্র। তাঁর সময়ে বিখ্যাত পর্যটক মরক্কোবাসী ইবন-বতুতা ভারতে এসেছিলেন। 'সফর-নামা' বইখানিতে তাঁর ভ্রমণ-কাহিনী লিপিবন্ধ আছে। তিনি সম্রাটের চরিত্রকে 'বিপরীতের মিশ্রণ' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি সুলতানের পাণ্ডিত্যের সঙ্গে তাঁর খামখেয়াল ও নিষ্ঠুরতার কথাও উল্লেখ করে গেছেন। মহম্মদ সত্যই গুণী ও পন্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। আরবী-ফার্সী ছাড়া গণিত, তর্ক ও দর্শনশাস্ত্র জ্যোতিষ-বিজ্ঞানেও তাঁর দখল ছিল। তিনি খাঁটি মুসলমান, শাসক হিসেবেও তাঁর অনেক গুণ ছিল। তাঁর স্বভাবে মদ্যপান প্রভৃতি কোনও দোষ ছিল না। সুলতান হয়ে তিনি রাজ্যবিস্তার করেছিলেন, বিজিত প্রদেশগুলিতে শাসনের সুব্যবস্থাও করেছিলেন। কিন্তু নানা গুণ সত্ত্বেও আপন বুদ্ধির দোষে ও খেয়ালের বশে তিনি সমস্তই নষ্ট করলেন। প্রথমে সুলতানি পেয়ে তিনি দান খয়রাতে অনেক অর্থ ব্যয় করলেন। তারপর হানাদার মোঙ্গলদের তিনি টাকা দিয়ে বশ করতে গেলেন। ফলে টাকার লোভেই তারা বার বার এদেশে আসতে লাগল। সঞ্চিত ধন এইভাবে খরচ হয়ে গেলে তিনি রাজ্যজয়ের উৎসাহে মেতে উঠলেন। প্রথমে পারস্যদেশ, তারপর খোরাসান ও পার্বত্য কারাজল অঞ্চল জয়ের আয়োজন করতে গিয়ে তিনি মোট চার লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেন কিন্তু শেষে অনিশ্চিত অবস্থার জন্য সংকল্প ত্যাগ করেন। এই সবে অনেক খরচ হয়ে গেল, তখন রাজকোষ পূর্ণ করবার জন্য তিনি এক নতুন উপায় বার করলেন। সুলতানের হুকুমে তামার নোট চলতে লাগল। এক এক টুকরো তামার পাতে পাঁচ মোহর দশ মোহর লিখে ছেড়ে দেওয়া হলো।

চরিত্র, দোষ-গুণ

মোঙ্গল-নীতি

খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা, মুদ্রা-সংস্কার নীতি

এর ফলে বিপর্যয় ঘটল। বিদেশী বণিকরা ঐ সব নোট নিতে চাইল না। চতুর লোকরা এই সুযোগে নোট জাল করে প্রচুর লাভ করতে লাগলেন, এদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য নষ্ট হতে বসল। সুলতান যখন বুঝলেন মস্ত ভুল হয়েছে, তখন রাজকোষ থেকেই টাকা দিয়ে সেই সব তামার নোট আবার কিনে নেওয়া হল। এতে অর্থভাণ্ডার নিঃশেষ হয়ে এলে, মহম্মদ ভেবে চিন্তে খাজনা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করলেন। এত খাজনা চাপানো হল যে প্রজারা জমি ছেড়ে বনজঙ্গলে পালিয়ে গেল। সুলতানও ছাড়বার পাত্র নন, তাঁর আদেশে সৈন্যরা গঙ্গা-যমুনার মধ্য অঞ্চল ঘিরে ফেলে পশুর মত মানুষ শিকার করতে লাগল। জমির চাষ গেল, চাষীও মরল, রাজ্যময় দুর্ভিক্ষ

কুফল, খাজনা বৃদ্ধি

দেখা দিল। তারপর সুলতানের মনে হল, দিল্লী থেকে দেবগিরিতে রাজধানী তুলে নিয়ে গেলে উত্তর পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম, সাম্রাজ্যের সব অঞ্চলই দেখাশুনা করার খুব সুবিধা হবে। জায়গাটিও তাঁর পছন্দ হয়েছিল। সুলতানের হুকুমে প্রজারা দিল্লী ছেড়ে দেবগিরিতে (দৌলতাবাদে) চলল। পথকষ্টে অনেকেই মারা পড়ল, কিন্তু প্রজারা নিরুপায়। কিছুদিন পরে তাঁর মত পরিবর্তন হল, তখন প্রজাদের আবার দিল্লীতে ফিরতে হল। এই সব পাগলামির ফলে প্রজাদের কষ্ট ও অসন্তোষ বাড়তে লাগল। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে, গুজরাট, মালব, মধ্যভারত, দক্ষিণভারত, জৌনপুর ও বাঙলায় বিদ্রোহ দেখা দিল। সম্রাট ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন, শেষে সিন্ধু প্রদেশে যুদ্ধরত অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হল (১৩৫১ খৃঃ)। তখন রাজা ও প্রজা পরস্পরের হাত থেকে রেহাই পেল।

দুর্ভিক্ষ, রাজধানী স্থানান্তর ও পুনরায় বদল

প্রজা-বিদ্রোহ, মৃত্যু

ইবন বতুতার মন্তব্য অনেকটা সত্য। কঠোরতা ও দানশীলতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও নির্বুদ্ধিতা মিলে মহম্মদকে এমন অদ্ভুত খেয়ালী রাজায় পরিণত করেছিল। কিন্তু এ কথাও ঠিক, প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য খারাপ ছিল না, আধুনিক ঐতিহাসিকরা বলেন তাঁর সব পরিকল্পনাই বাতুলতা ছিল না। আসল কথা, তাঁর বাস্তব জ্ঞানের অভাব ছিল। কতটা কাজ করা যায়, কিভাবে তা করা উচিত, এই মাত্রাজ্ঞান না থাকার জন্য তিনি রাজনীতিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। বরানী প্রভৃতি মুসলিম লেখকরা সুলতানের কাজকর্ম বর্ণনা করতে গিয়ে কিছু বাড়াবাড়ি করেছেন। সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মহম্মদ তুঘলককে একা দায়ী করা যায় না।

আধুনিক মত

কিছুদিন হল এক শ্রেণীর ঐতিহাসিক মহম্মদ বিন তুঘলকের প্রকৃতি ও শাসন প্রণালী সম্বন্ধে প্রচলিত অভিমত অগ্রাহ্য করেছেন। তাঁদের মতে ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ে সুলতানের উদার মনোভাব সে যুগের মুসলিম সমাজকে বিরূপ করে তুলেছিল। বরানী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ এই অনুদার মুসলিম সমাজেরই মুখপাত্র। তাই তাঁদের চারিত্রচিত্রনে বিদ্বেষ ও অতিশয়োক্তি আছে। অতএব সুলতানের বিফলতার যে কাহিনী তারা লিখে গেছেন, তা ঠিক গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি তুর্কী সমাজের পতনের ব্যাপারেও তাঁর দায়িত্ব পুণর্বিবেচনা করা প্রয়োজন।

সমালোচনা

ফিরুজ শাহ তুঘলক ঃ (১৩৫১—১৩৮৮ খ্রীঃ) মহম্মদ তুঘলকের মৃত্যুর পর তাঁর পিতৃব্য-পুত্র ফিরুজশাহ সিংহাসনে বসেন (১৩৫১ খৃঃ)। তিনি অনেকটা ঠাণ্ডা মেজাজের লোক ছিলেন। বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্য অনবরত যুদ্ধ করা তাঁর কাছে অসম্ভব বোধ হল। তিনি সিন্ধুপ্রদেশের বিদ্রোহ থামালেন বটে কিন্তু তাকে পুনরুদ্ধার করতে পারেননি। গুজরাট মধ্যভারত প্রভৃতি অঞ্চলের বিদ্রোহীদের স্বাধীন বলে

রাজনৈতিক ইতিহাস

স্বীকার করলেন, তার বাঙলাকে দিল্লীর অধীনে আনবার চেষ্টা করে যখন দেখলেন তাও শক্ত ব্যাপার তখন বাঙলার স্বাধীনতা মেনে নিলেন। নগরকোট অধিকার আর ওড়িশার রাজাকে পরাস্ত করা ছাড়া তাঁর অন্য অভিযানগুলি ব্যর্থ হয়েছিল। কাজেই দিল্লী সাম্রাজ্য ছোট হয়ে গেল। এখন যা বাকি রইল তাতে তিনি সুশাসনের ব্যবস্থা করলেন। চোর ডাকাত দমন করলেন, অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি কঠোর শাস্তি উঠিয়ে দিলেন। মহম্মদ তুঘলকের সময় দুর্ভিক্ষের জন্য ফিরুজ কৃষি-ঋণ মকুব করলেন এবং অনেক অন্যায় শুল্ক ও কর বন্ধ করে দিলেন। তিনি পতিত জমিতে প্রজা বসিয়ে, চাষের উন্নতির জন্য খাল কাটালেন, নতুন গ্রাম নগর স্থাপন করলেন। ফিরুজের রাজত্বে অনেক মসজিদ, পান্থশালা, হাসপাতাল ও বিদ্যালয় তৈরি হয়েছিল। তিনি বহু মসজিদ, সরাইখানা উদ্যান এবং হিসার, ফিরোজপুর, জৌনপুর প্রভৃতি শহর স্থাপন করেন। যমুনার বিশাল খাল তাঁরই কীর্তি। তা ছাড়া, ফিরুজ পুরনো রাজধানীর আয়তন বাড়িয়ে তার মধ্যে অনেক বাগান তৈরি করেন, তার নাম ফিরোজাবাদ। সুতরাং ফিরুজ তুঘলক অনেকগুলি জনহিতকর কাজ করে যান।

সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস, কৃষি ও বাণিজ্য

জনহিতকর কাজ,

উদ্যান রচনা

কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরধর্মের প্রতি তাঁর উদারতা ছিল না। তিনি ছিলেন খাঁটি সুন্নি কাজেই ইসলামী শিক্ষাবিস্তারে তাঁর যথেষ্ট মনোযোগ ছিল। তাঁর আমলে অনেক মাদ্রাসা স্থাপিত হয়, আফিফ ও বরানীর লেখা দু-খানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ের মুসলমান ও হিন্দুদের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যায়। তিনি হিন্দুদের উপর 'জিজিয়া' কর বসান এবং তাঁর আত্মজীবনীতেও বহু হিন্দু মন্দির ধ্বংস ও মসজিদ নির্মাণের কথা লেখা আছে। অনুদার ধর্মনীতির জন্য হিন্দুদের প্রতিরোধ আন্দোলন, অতিরিক্ত জায়গীর বিতরণ, শাসন বিভাগে দুর্নীতি এবং মন্ত্রীদের অতিরিক্ত ক্ষমতা লাভ প্রভৃতি কারণে ফিরুজের শাসনব্যবস্থা শিথিল হয়ে পড়ে। তবে ফিরুজের সপক্ষে বলতে হবে যে তাঁর রাজত্বে কৃষি ও বাণিজ্য-শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয় আর তাঁরই নির্দেশে কতকগুলি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। দীর্ঘ রাজত্বের পর ১৩৮৮ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে তুঘলক বংশের পতন শুরু হয়। যে কয়জন রাজা সিংহাসনে বসেন, তাঁরা দুর্বল ও অকর্মণ্য ছিলেন। রাজ্যশাসন ছিল মন্ত্রী-অমাত্যদের হাতে কতকগুলি স্বার্থপর লোকের জন্য দেশে কলহ ও ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হয়। এই দুরবস্থার জন্য ফিরুজ-শাহের দায়িত্ব মহম্মদ তুঘলকের চেয়ে কম নয়। ডক্টর ত্রিপাঠীর মতে শাসকের ভাবমূর্তি নির্ভর করে প্রজাদের বৈষয়িক সমৃদ্ধির উপর। একথা সত্য, ফিরোজ দেশে সমৃদ্ধি এনেছিলেন, কিন্তু সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। তাই তাঁকে সমগ্র বিচারে সফল ও দক্ষ শাসক বলা যায় না। তাঁর মৃত্যুর পর দেশের দুর্দশা

অনুদার ধর্মনীতি

আরও বৃদ্ধি পায়। তার উপর এই দুর্দিনে হিন্দুস্থান তৈমুরলঙের আক্রমণে বিধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

[আট] তৈমুর লঙের ভারত অভিযান ও ফলাফল ঃ চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড় শ' বছর পরে তৈমুর নামে এক মোঙ্গল অধিপতি সমরকন্দের সিংহাসনে বসেন। ধর্মে তিনি মুসলমান ছিলেন কিন্তু ইতিহাসে তিনি এক নিষ্ঠুর হানাদার বলে খ্যাত। এক তুর্কী সুলতানকে তিনি খাঁচায় পুরেছিলেন। তৈমুরই ভারতের মুঘল সম্রাটদের পূর্বপুরুষ। মায়ের দিক দিয়ে চিঙ্গিস খাঁর সঙ্গে তাঁর রক্তসম্পর্ক ছিল। তিনি মোঙ্গলদের বিশাল সাম্রাজ্য আবার উদ্ধার করার চেষ্টায় দিগ্‌বিজয়ে বেরিয়ে ছিলেন। সমগ্র এসিয়ার এক বিস্তৃত অংশ তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে। ১৩৯৮ সালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। দিল্লীর মসনদে তখন তুঘলক বংশের শেষ রাজা মামুদ। তৈমুর হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে স্পষ্টই ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করেন। পাঞ্জাবের অনেক শহর লুঠ করে তিনি দিল্লীর কাছে পৌঁছন। হিন্দু-মুসলমান একত্র হয়েও তাঁর আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারেনি। মামুদ তুঘলককে পরাস্ত করে তৈমুর দিল্লী অধিকার করে প্রচুর খেসারত দাবি করেন এবং অর্থ না পেয়ে নগর লুঠ ও হাজার হাজার বন্দীর হত্যার আদেশ দেন। তৈমুর পনের দিন দিল্লীতে ছিলেন কিন্তু ঐ সময়ের মধ্যেই এই নিষ্ঠুর বিজেতা তাণ্ডব লীলা সৃষ্টি করেন। হত্যা ও সেই সঙ্গে মহামারীর ফলে দিল্লীর অবস্থা ভয়াবহ হয়ে ওঠে। এক মুসলিম ঐতিহাসিক লিখে গেছেন, 'পূর্ণ দুই মাসকাল দিল্লীর আকাশে একটি পাখি পর্যন্ত উড়িতে দেখা যায়নি।' তৈমুর দিল্লী আক্রমণ করলে মামুদ তুঘলক গুজরাটে পালিয়ে যান। তারপর দিল্লীতে ফিরে আর পনের বছর নামমাত্র রাজত্ব করেন। তুর্কী সাম্রাজ্য ক্রমেই ছোট হয়ে আসে, অনেক প্রদেশ স্বাধীন হয়ে যায়। অবশেষে ১৪১৩ খৃস্টাব্দে মামুদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই তুঘলক বংশের অবসান হল।

নিষ্ঠুর হানাদার

বংশ পরিচয় ভারত আক্রমণ

হিন্দু-মুসলমানের প্রতিরোধ প্রচেষ্টা ব্যর্থ,

দিল্লীতে নিষ্ঠুর তাণ্ডব-লীলা

তুর্কী সাম্রাজ্যের বিভাজন তুঘলক বংশের পতন

সৈয়দ বংশ ঃ মামুদের মৃত্যুর পরে খিজির খাঁ নামে মুলতানের এক শাসনকর্তা দিল্লী অধিকার করেন। 'সৈয়দ' বংশ (গুরুর বংশ) ইঁনিই প্রতিষ্ঠা করেন। এঁরা হজরত মহম্মদের বংশধর বলে দাবি করতেন। যাই হোক, এই বংশের চারজন রাজা দিল্লী সাম্রাজ্যের অতি অল্প অংশেই আধিপত্য করেন। প্রকৃত পক্ষে খিজির খাঁ কখনও সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন নি। এই বংশের শেষ রাজা আলাউদ্দিন বহলুল লোদী নামে এক পাঠান সর্দারের কাছে আত্মসমর্পণ করেন।

খিজির খাঁ

সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠা, পতন

লোদী বংশ ঃ সৈয়দ বংশের পর লোদীরা সুলতানী ভোগ করেন পঁচাত্তর বছর। বহলুল লোদীই দিল্লীর প্রথম পাঠান বা আফগান সুলতান। নিজ

ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের জোরে তিনি সামান্য অবস্থা থেকে দিল্লীর মসনদ লাভ করেন। বহলুল যোদ্ধা ছিলেন, দীর্ঘ দিন যুদ্ধ করে তিনি জৌনপুর রাজ্য অধিকার করেন। তাঁর আমলে দিল্লী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা আবার কিছুটা ফিরে আসে। দেশ শাসনের ব্যাপারে তিনি আফগান আত্মীয়দের উপরেই নির্ভর করতেন। তাঁর মৃত্যুর পর লোদী বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান সিকন্দর লোদী সিংহাসনে বসেন। শাসক হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল, তাঁর আমলে রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বহলুল লোদী জৌনপুর বিজয়

সিকন্দর লোদী, রাজ্য বিস্তার, হিন্দুনীতি

মধ্য ভারতে গোয়ালিয়র, ঢোলপুর, চান্দেরির রাজারা তাঁর হাতে পরাস্ত হন। এ দিকে জৌনপুর থেকে বাঙলায় তাঁর শাসন স্বীকৃত হয়। তবে হিন্দুরা তাঁর হাতে উৎপীড়িত হয়েছিল। তাঁর আদেশে মথুরার দেবমন্দিরগুলি ধ্বংস করা হয়। তবে তাঁর রাজত্বকালে দেশের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়নি, জিনিসপত্র যথেষ্ট সুলভ ছিল।

ইব্রাহিম লোদী, দুর্বলতা ও ত্রুটি, চক্রান্ত, পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের হাতে পরাজয়

সিকন্দর শাহের পর আসেন ইব্রাহিম লোদী। যুদ্ধ ও দেশ শাসনে তিনি অপটু ছিলেন না কিন্তু আত্মীয় আফগানরা তাঁর উদ্ধত স্বভাবে বিরক্ত হয়ে বিদ্রোহের চক্রান্ত শুরু করেন। বিহারের দরিয়া খাঁ লোহানী আর লাহোরের দৌলত খাঁ লোদী কাবুলের রাজা তৈমুর বংশীয় বাবরকে ভারত আক্রমণে আমন্ত্রণ করেন। ১৫২৬ খৃস্টাব্দে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবর ইব্রাহিম লোদীকে হারিয়ে দিল্লী অধিকার করেন। দিল্লীতে তুর্ক-আফগান বা পাঠানদের আধিপত্য শেষ হল। বাবর দিল্লীতে যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলেন, ইতিহাসে সেটাই বিখ্যাত মুঘল সাম্রাজ্য।

[নয়] কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যের উত্থান : ক) ইলিয়াস শাহী বংশের আমলে বাঙলা : তুঘলক সাম্রাজ্যে ভাঙন শুরু হলে বঙ্গের তুর্কী শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন হয়ে রাজত্ব করতে থাকেন। মহম্মদ তুঘলকের সময় ফকরুদ্দিন নামে এক ব্যক্তি সোনারগাঁয়ে রাজধানী স্থাপন করে নিজেকে পূর্ববঙ্গের স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করলেন। এদিকে পশ্চিম বঙ্গেও আলাউদ্দিন আলি শাহ স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন দুটি স্বাধীন বঙ্গের সূচনা হল। এর কিছুদিন পরে ইলিয়াস শাহ নামে এক ব্যক্তি বাঙলা ও বিহারের অনেক অংশ রাজ্যভুক্ত করে পাণ্ডুয়া নগরে নিজের রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি সামসুদ্দিন উপাধি নিয়ে সমগ্র বঙ্গের স্বাধীন নৃপতি হন (১৩৪৫ খৃঃ)। মহম্মদ তুঘলক ইলিয়াস শাহকে দমন করতে পারেন নি। তাঁর পরবর্তী সম্রাট ফিরুজ শাহ অনেক সৈন্য সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করতে এলে প্রবল শত্রুর সম্মুখে সামসুদ্দিন দাঁড়াতে পারেন নি। তাঁর রাজধানী শত্রুহস্তে পড়ে ও তিনি আত্মরক্ষার জন্য বিখ্যাত একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁর অধীনে হিন্দু ও মুসলমান সৈন্যগণ প্রাণপণে যুদ্ধ করে। অবশেষে সম্রাট দিল্লী ফিরে যান ও বাংলায় ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হন।

বঙ্গে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন

একডালার যুদ্ধ

সুলতান ইলিয়াস শাহের মৃত্যু হলে পুত্র সিকন্দর শাহ বাঙলার সিংহাসনে বসেন। তাঁর রাজত্বকাল মোটামুটি শান্তি ও সমৃদ্ধি-পূর্ণ ছিল। সিকন্দরই পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ নির্মাণ করান। দিল্লীর সুলতান আর একবার বঙ্গ জয়ের চেষ্টা করলে সিকন্দর তা ব্যর্থ করে দেন। কিন্তু তাঁর পুত্র গিয়াসউদ্দিন বিদ্রোহী হয়ে সোনারগাঁয়ে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন এবং পিতাকে হত্যা করে রাজ্যলাভ করেন। কিন্তু এভাবে রাজ্য শুরু করলেও গিয়াসউদ্দিন ন্যায়পরায়ণ সুকবি ও বীর ছিলেন। তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত পারস্য কবি হাফিজের চিঠিপত্র বিনিময় হত। সুদূর চীন সাম্রাজ্যেও তিনি দূত পাঠান। 'মিং'-সম্রাট ও বাঙলার সুলতানগণ অনেক দিন এই সম্পর্ক রক্ষা করেছিলেন। 'মিং' রাজবংশের ইতিহাস থেকে চীনা পর্যটক মা-হুয়ানের বঙ্গদর্শনের বর্ণনা সম্প্রতি পাওয়া গেছে তাতে বাঙালীর পোশাক, নারীদের বেশভূষা, বাঙলার নিজস্ব মসলিন এবং বিভিন্ন কারুশিল্পের প্রচুর প্রশংসা আছে। 'মিং' বংশের চীনা ইতিহাসে গিয়াসউদ্দিনের পৌত্র সামসুদ্দিনের প্রেরিত দূত ও শিল্প-সম্ভারের উল্লেখও আছে। বাঙলার আতিথেয়তা ও সমৃদ্ধির খ্যাতি তখনকার দিনের (১৪৩৮ খৃঃ) চীনা ইতিহাসে লিপিবন্ধ হয়।

সিকন্দর শাহ, গিয়াউদ্দিন

চীন দূতের বিবরণ

এই বংশের কয়েকজন সুলতানের পর উত্তর বঙ্গে ভাতুড়িয়ার ব্রাহ্মণ জমিদার কংসনারায়ণ বা রাজা গণেশ বাঙলার সিংহাসন অধিকার করেন (১৪১৫)। কিন্তু রাজা গণেশের কোনও স্বনামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া যায় নি। তাই পণ্ডিতরা মনে করেন, গণেশ প্রকৃত পক্ষে রাজ্য শাসন করলেও রাজোপাধি গ্রহণ করেন নি। পরে পুত্র যদুকে তিনি রাজ্যভার ছেড়ে দেন। যাই হোক, এই সময় দনুজমর্দন নামে এক হিন্দু রাজাও বিশেষ ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেন এবং পাণ্ডুয়া থেকে আরাকান পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগের অধিপতি হন। তাঁর নামাঙ্কিত মুদ্রা বাঙলার নানাস্থানে পাওয়া গেছে। তাই অনেকে মনে করেন, গণেশ ও দনুজমর্দন একই ও অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু অনুমানের কোনও প্রমাণ নেই। রাজা গণেশের পুত্র যদু মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে জালালউদ্দিন নামে রাজত্ব করেন। কিন্তু কিছুকাল পরে ইলিয়াস শাহের বংশই বাঙলাদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৪৪২ থেকে ১৪৮৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাঁদের রাজত্ব চলে। যদুর পুত্র সামসুদ্দিনকে হটিয়ে ইলিয়াস শাহের এক বংশধর নাসিরউদ্দিনকে সিংহাসনে বসান হয়। ১৪৪২ থেকে ১৪৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তার পর পুত্র বরবক শাহ সিংহাসন প্রাপ্ত হন এবং চৌদ্দ বছর কাল রাজ্য শাসন করেন। এই রুকনউদ্দিন বরবকের রাজত্বকাল দুটি কারণে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত তার সময়ে দেশের শান্তি সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পায়। হুশেন শাহের সময় বাঙলা দেশের যে সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তার কিছু কৃতিত্ব বরবকের প্রাপ্য। দ্বিতীয়তঃ বরবক অনেকগুলি অ্যাবিসিনীয়

রাজা গণেশ ও দনুজমর্দন

যদু ও জালালউদ্দিন. ইলিয়াস শাহী বংশের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

বরবক শাহ ১৪৬০-৭৪

ক্রীতদাস পোষণ করতেন এবং মধ্যে মধ্যে কিছু লোককে উচ্চ পদে নিযুক্ত করেন। এর একটি বড় রকমের কুফল দাঁড়ায় যে, ঐ হাবসী (অ্যাবিসিনীয়) ক্রীতদাসেরা এ দেশে প্রবল হয়ে ওঠে ও প্রজাদের উপর কয়েক বৎসর ধরে ভীষণ অত্যাচার করতে থাকে। কয়েকজন হাবসী এদেশে রাজত্বও করে।

হুসেন শাহ ও নসরৎ শাহ ঃ এই অরাজকতা থেকে নিষ্কৃতির আশায় বাঙলায় হিন্দু ও মুসলমান প্রধানগণ আলাউদ্দিন হুসেন শাহকে বাঙলার সুলতান হিসেবে মনোনীত করেন (১৪৯৩)। তাঁরই রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হয়। হুসেন শাহ উদার ও ন্যায়পরায়ণ শাসক ছিলেন। তাঁর রাজকর্মচারিগণের মধ্যে অনেক হিন্দু ছিলেন। তাঁদের মধ্যে পরমবৈষ্ণব রূপ ও সনাতন নামে দুজন ব্রাহ্মণ এবং গোপীনাথ বসু ও পুরন্দর খাঁ নামে দুই কায়স্থের নাম উল্লেখযোগ্য। হুসেন শাহ বিহারের কিছু অংশ জৌনপুরের সুলতানের থেকে অধিকার করেন এবং ওড়িশা আসাম ও ত্রিপুরার রাজগণকে পরাজিত করে ঐ সব অঞ্চল রাজ্যভুক্ত করেন। কামতাপুর (বর্তমান রঙ্গপুর ও দিনাজপুর) অঞ্চলও তিনি জয় করেন। তাঁর পুত্র নসরৎ শাহও সুদক্ষ নরপতি ছিলেন এবং বাঙলা ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর সময়েই পূর্ববঙ্গে পোর্তুগীজ উপদ্রব শুরু হয়। তাঁর রাজত্বের পর মোগল সম্রাট হুমায়ুন বঙ্গ জয় করেন কিন্তু পর বৎসরই শের শাহ বাঙলা অধিকার করেন।

হুসেন শাহ, হিন্দুরাজ-কর্মচারী

রাজ্যজয়, নসরৎ শাহ

এই বংশের শেষ সুলতান গিয়াসউদ্দিন মামুদ শের শাহ কর্তৃক বিতাড়িত হলে করনারী নামে এক পাঠান বংশ বাঙলা দেশে অধিকার স্থাপন করে এবং ওড়িশা জয় করে নেয়। সুলেমান করনারী এই বংশের স্থাপয়িতা। মোগল আধিপত্য মুখে স্বীকার করে কার্যতঃ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করেন। তাঁরই সেনাপতি 'কালাপাহাড়', যিনি হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান হন ও এই সময়ে ওড়িশা জয় করেন। কররানীবংশীয় দাউদের পরাজয় ও অধঃপতনের পর সম্রাট আকবর কর্তৃক বাঙলা দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হয় (১৫৭৬)।

গিয়াসউদ্দিন মামুদ, সুলেমান কররানী, দাউদ ও আকবরের বঙ্গ-অধিকার

সমাজ ও শিল্প ঃ মুসলমানেরা বাংলা দেশ জয় করলে হিন্দু ও মুসলমান একত্র বাস করতে শিখল। বহুদিনের সংঘর্ষের পর উভয় সম্প্রদায় পাশাপাশি থাকার জন্য একের প্রভাব অপরের ওপর পড়ল। ফলে বাঙালী সমাজ ও জীবন একটি নতুন রূপ নিল। হিন্দুরা প্রজা, মুসলমানরা শাসক। কিন্তু অনেক মুসলমান এই সময়ে হিন্দুদের কয়েকটি আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। তাদের চাল-চলন এবং খাওয়া-দাওয়ার মধ্যেও কিছু কিছু পরিবর্তন দেখা দিল। এদিকে হিন্দুরাও বেশভূষায় মুসলমান প্রভাব স্বীকার করে নিল। অনেকে দাড়ি রাখল, আরবী ও পারসী ভাষা শিখে কর্মচারী হইল।

হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলন

সংস্কৃতি ঃ এ যুগে বাঙলা সাহিত্যের খুব উন্নতি হয় ; কারণ, বাঙালীর সাহিত্য-রচনায় হুসেন শাহ বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছিলেন। কৃত্তিবাসী রামায়ণ, ভাগবত এবং মহাভারতের বঙ্গানুবাদ এ যুগেই রচিত হয়। এই সময়ে বাঙলা দেশে সংস্কৃত ভাষা ও ধর্মশাস্ত্রের যথেষ্ট চর্চা ও সমাদর ছিল। হুসেন শাহের মন্ত্রী রূপ গোস্বামী পঁচিশটি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। মালাধর বসু ভাগবতের বাঙলা অনুবাদ করেছিলেন। নবদ্বীপ ও অন্যান্য ব্রাহ্মণপ্রধান স্থানে অনেক টোল-চতুষ্পাঠী ছিল, সেখানে বিদ্বান অধ্যাপক ও ছাত্র সাহিত্য ও দর্শন চর্চা করতেন। ন্যায়শাস্ত্রের চর্চায় বাঙলা দেশ সে যুগে শ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত ছিল। স্থাপত্যশিল্পেও বাঙলার কৃতিত্ব কম ছিল না। পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ, গৌড়ের ছোট ও বড় সোনা মসজিদ কদম রসুল, খুলনার নিকট বাগেরহাটে ষাটগম্বুজ প্রভৃতি বিখ্যাত ইমারতগুলি এই সময়কার শ্রেষ্ঠ শিল্প-নিদর্শন।

সাহিত্যের উন্নতি

শিক্ষার চর্চা, স্থাপত্য

মন্তব্য ঃ বাঙলা দেশে হিন্দু মুসলিমের সামাজিক মিলন এবং সংস্কৃতি চর্চা সম্পর্কে কিন্তু সম্প্রতি মতদ্বৈত দেখা দিয়েছে। এযাবৎ হুসেন শাহ আমলের যে গুণকীর্তন শুনতে আমরা অভ্যস্ত, কোনও কোনও ঐতিহাসিক তা স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। আধুনিক গবেষণা হুসেন শাহের কৃতিত্ব কিছুটা ম্লান করতে উদ্যত। তাঁর হিন্দু-প্রীতি, পরধর্মসহিষ্ণুতা, হিন্দু সাহিত্য-সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা, এক কথায় তাঁর ঐতিহাসিক অবদান নাকি অতটা প্রশংসার যোগ্য নয়। অত্যাচার না হলেও তাঁর সময় হিন্দু পীড়ন হয়েছিল। বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ ও আনুকূল্য হুসেন শাহের চেয়ে বরবক শাহ এবং নসরৎ শাহই বেশি দেখিয়েছেন। উচ্চ পদে হিন্দু নিয়োগ নাকি কূটনীতির প্রয়োগ মাত্র। যাই হোক, এই মতের স্বপক্ষে প্রমাণ দেওয়া হলেও এখনও ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত বলে গৃহীত হয় নি।

[খ] **বহমনির রাজ্য ঃ** মহম্মদ বিন্ তুঘলকের রাজত্বের শেষ দিকে দাক্ষিণাত্যে হাসান নামে এক বিদ্রোহী নেতা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন (১৩৪৭ খৃঃ)। পারস্যের বীর রাজা বহমন শাহের বংশধর বলে তিনি দাবি করতেন, তাই রাজা হয়ে তিনি বহমন শাহ উপাধি নেন। সেই থেকে রাজ্যের নাম বহমনি রাজ্য। তাঁর সময়ে বহমনি রাজ্য উত্তরে পেনগঙ্গা নদী, পশ্চিমে সমুদ্র, দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী ও পূর্বে বরঙ্গল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। পশ্চিমে সমুদ্রতীরে গোয়া ও দাভোল বন্দর দুটি বহমনি রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। বহমনি রাজ্যের প্রথম রাজধানী ছিল গুলবর্গা। হাসান ঐ নগরের নতুন নামকরণ করেন 'হাসনাবাদ'।

প্রতিষ্ঠাতা হাসান,

বহমনি রাজ্যসীমা, গুলবর্গা বা হাসানাবাদ

হাসানের মৃত্যুর পর তাঁর বংশের চৌদ্দ জন সুলতান ১৫২৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত

রাজত্ব করেন। এঁরা বেশির ভাগ যুদ্ধবিগ্রহ নিয়েই থাকতেন ও অনেকে ভীষণ অত্যাচারী ছিলেন। এই সুলতানদের মধ্যে ছয় জন পদচ্যুত হন, চার জন নিহত হন ও দুজন অন্ধ হয়ে কারাগারে জীবন যাপন করেন। পঞ্চম সুলতান ছাড়া সবাই অত্যাচারী ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির ছিলেন। বহমনি রাজারা প্রায় সর্বদাই দাক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য ও দক্ষিণ-পূর্বে বরঙ্গল রাজ্যের হিন্দুদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকতেন। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী উর্বর রায়চুর ভূমি নিয়ে বিজয়নগরের রাজাদের সঙ্গে তাঁদের বিবাদ চলত। আর এই যুদ্ধের জন্য বহমনি সুলতানরা সদাসর্বদা পাঁচ থেকে দশ লক্ষ সশস্ত্র সৈন্য প্রস্তুত রাখতেন।

চৌদ্দ সুলতান, হিন্দু রাজাদের সঙ্গে সংঘর্ষ

হাসানের পরবর্তী সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহের (১৩৫৮-৭৩) সময়ই বিজয়-নগরের সঙ্গে ভীষণ যুদ্ধ শুরু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছরের মধ্যে পাঁচজন সুলতান রাজত্ব করেন। তাঁদের সময়েও এই রকম যুদ্ধবিগ্রহ চলে। অষ্টম ও শ্রেষ্ঠ সুলতান ফিরুজ শাহের রাজত্বে মহারাষ্ট্রে বারো বছর ধরে ভীষণ দুর্ভিক্ষ চলে। এই সুলতানও বিজয়নগরের সঙ্গে অনেক যুদ্ধবিগ্রহ করেছিলেন এবং হিন্দু রাজা প্রথম দেবরায়কে পরাস্ত করে তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। কিন্তু সন্ধি স্থায়ী হয়নি। আবার বিজয়নগর আক্রমণ করলে ফিরুজ শাহ পরাজিত হন। তবে তিনিই বহমনি রাজ্যকে গৌরবশিখরে তুলেছিলেন। ফিরুজ শিল্পমোদী ছিলেন এবং ফিরোজাবাদ শহরে এক প্রকাণ্ড রাজপ্রসাদ তৈরি করেন। কেউ কেউ তাঁকে 'দাক্ষিণাত্যের আকবর' বলে থাকেন।

মহম্মদ শাহ, বিজয় নগরের সঙ্গে যুদ্ধ

অষ্টম, ও শ্রেষ্ঠ সুলতান ফিরোজ শাহ, আহমদ শাহ,

ফিরুজের ভাই সুলতান আহমদ শাহ (১৪২৬-৩৫ খৃঃ) শাসনভার গ্রহণ করে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। এই যুদ্ধে বহু হিন্দু গ্রাম ও নগর ধ্বংস হয়। তাঁর সময় বিদর নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং গোলকুণ্ডার বিখ্যাত হীরার খনিগুলি বহমনিদের অধিকারে আসে।

পরবর্তী সুলতান আলাউদ্দিন আহমদের রাজত্বকালে স্থানীয় দাক্ষিণী মুসলমান আর বিদেশী ভাগ্যান্বেষী তুর্কী-ইরানী মুসলমানদের মধ্যে ঝগড়া ও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রাজ্যশাসনে যথেষ্ট বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তাঁর উত্তরাধিকারী হুমায়ুন নৃশংসতার প্রতিমূর্তি ছিলেন। ক্রমে, এই যথেচ্ছাচারী বহমনি রাজ্যের অবনতি শুরু হয়। বিদেশী সৈনিক আর দাক্ষিণী সর্দারদের মধ্যে দলাদলির ফলে বহমনি রাজ্য গোল যোগে পূর্ণ হয়ে ওঠে। শেষ কয়েকজন সুলতানের সময় খাজা মামুদ গাওয়ান নামে এক মন্ত্রী রাজ্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন কিন্তু তিনি শিয়া ও বিদেশী ছিলেন বলে মদ্যপায়ী তৃতীয় মহম্মদ তাঁকে প্রাণদণ্ড দেন। মামুদ গাওয়ান তিন জন সুলতানের মন্ত্রিত্ব করেন। তাঁর মত সুদক্ষ বিচক্ষণ শাসক ও কৌশলী যোদ্ধা সে যুগে বিরল। বেলগাঁওয়ের সুদৃঢ় দুর্গ এবং কোঙ্কনের হিন্দু রাজাদের আর

আলাউদ্দিন আহমদ, অবনতি, তৃতীয় মহম্মদ মামুদ গাওয়ান, কৃতিত্ব

কয়েকটি দুর্গ অধিকার, বিজয়নগরের কবল থেকে গোয়ার পুনরুদ্ধার, ওড়িশা আক্রমণ এবং রাজমহেন্দ্রী অধিকার মামুদ গাওয়ানের জন্যই সম্ভব হয়। তাঁরই কৃতিত্বে পড়ন্ত বহমনি রাজ্যে শান্তিশৃংখলা বজায় ছিল। রাজ্যের মধ্যে দুর্গ নির্মাণ ও সীমান্তরক্ষা, গ্রন্থাগার ও বিদ্যাপীঠ স্থাপন, কৃষির উন্নতির জন্য জলসেচের বন্দোবস্ত প্রভৃতি কাজগুলি তাঁর সৃষ্টিকর্মের পরিচয় দেয়। তিনি একাধারে যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞ, ন্যায়পরায়ণ ও দানশীল ব্যক্তি ছিলেন।

মামুদ শাহ

চতুর্দশ রাজা মামুদ শাহের এক মন্ত্রী কাশিম বারিদ রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতা আত্মসাৎ করেন এবং শেষে তাঁরই বংশধররা বিদরে এক নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন। অন্য প্রদেশগুলিও ক্রমে স্বাধীন হয় ও ১৫২৬ খৃস্টাব্দে বহমনি রাজ্য এই পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যায়—(১) আহম্মদনগরের নিজামশাহী বংশ, (২) বেরারের ইমাদশাহী বংশ, (৩) বিদরের বারিদশাহী বংশ, (৪) বিজাপুরের আদিলশাহী বংশ ও (৫) গোলকুণ্ডার কুতবশাহী বংশ। কিছুকাল পরে এই পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে বিজাপুর বিদরকে আর আহম্মদনগর বেরারকে দখল করে নেয়। কালক্রমে আহম্মদনগর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা, এই রাজ্য তিনটি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। শাহজাহানের সময় আহম্মদনগর মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় (১৬৩৭)। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি তার পরেও বহুদিন স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। শিয়া মতাবলম্বী রাজারা এখানে রাজত্ব করতেন। পরে সম্রাট আওরঙজীব এই দুটি রাজ্য জয় করেন। বহমনি রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে রুশ পর্যটক নিকিতিন লিখে গেছেন যে বহমনি রাজ্যে বহু প্রজার বাস ছিল। ধনী লোকরা সাড়ম্বরে জীবন যাপন করতেন। কিন্তু দরিদ্র কৃষকদের দীন অবস্থা তাঁর তীক্ষ্ন দৃষ্টি এড়ায়নি।

মন্ত্রী কাশিম বারিদ

বহমনি রাজ্যের পতন ও পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত, রুশ পর্যটক নিকিতিনের সাক্ষ্য

[ঘ] **বহমনি ও বিজয়নগরের সুদীর্ঘ সংগ্রামের প্রকৃতি ঃ** বহমনি ও বিজয়নগর ছিল প্রধানতঃ সামরিক রাষ্ট্র। সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারতে প্রাধান্য বিস্তারে উভয় রাষ্ট্রই যথেষ্ট ছিল। এই কারণে রাজ্যদুটির মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের সূচনা হয়। দ্বিতীয়তঃ, এই সুদীর্ঘ আত্মঘাতী সংঘর্ষের একটি অর্থনৈতিক দিকও আছে। শক্তি পরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল রায়চুর দোয়াবের মত উর্বর ভূখণ্ডের কৃষিজ ও খনিজ সম্পদ হস্তগত করা। তাছাড়া এই অঞ্চলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলিও উভয় রাজ্যকেই প্রলুব্ধ করেছিল। তৃতীয়তঃ, বিজয়নগরের হিন্দু রাজারা দক্ষিণ ভারতে হিন্দু ধর্মের রক্ষাকারী বলে মনে করতেন এবং এই অঞ্চল বিধর্মীর অনুপ্রবেশ প্রতিহত করতে সর্বদা সতর্ক ছিলেন।

সংগ্রামের কারণ—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও ধর্মীয়

[ঘ] বিজয়নগর রাজ্য ঃ বহমনি রাজ্যের দক্ষিণে বিস্তৃত এই বিশাল হিন্দু রাজ্যটি প্রতিষ্ঠা করেন হরিহর ও বুক্ক নামে দুজন হিন্দু সর্দার। বিদ্যারণ্য মাধব বলে এক নীতিকুশল ব্রাহ্মণ তাঁদের মন্ত্রণাদাতা ছিলেন।

প্রতিষ্ঠাতা—হরিহর ও বুক্ক

হরিহর যে নতুন রাজবংশ স্থাপন করেন তা সঙ্গম বংশ বলে অভিহিত। ১৩৩৬ খৃস্টাব্দে বিজয়নগর শহর স্থাপিত হয়। বহমনি সুলতানদের সঙ্গে বিজয়নগরের দীর্ঘকাল বিরোধ চলেছিল, কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহের মধ্যেও দ্বিতীয় হরিহর এবং দ্বিতীয় বুক্ক রাজ্যটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। পরবর্তী রাজা প্রথম দেবরায়ের সময় মুসলমানদের সঙ্গে আবার যুদ্ধ হয় এবং যুদ্ধে হেরে গিয়ে তিনি বহমনি সুলতান ফিরুজের সঙ্গে তাঁর কন্যার বিবাহ দিতে বাধ্য হন। তাঁর পৌত্র দ্বিতীয় দেবরায় আর এক শক্তিশালী রাজা ছিলেন, সঙ্গম বংশের তিনিই শ্রেষ্ঠ নৃপতি। তাঁর সময়ে বিজয়নগর রাজ্য সুদূর দক্ষিণে সিংহলের উপকূল পর্যন্ত বিস্তৃত হয় এবং ইরানী দূত আবদুর রজাক বিজয়নগরের ঐশ্বর্য ও সমৃদ্ধি দেখে অভিভূত হন। এদিকে বহমনি সুলতান আহমদ শা ফিরুজ শাহের পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার জন্য পূর্বের সন্ধি অগ্রাহ্য করে বিজয়নগর আক্রমণ করেন। হত্যা ও ধ্বংসের পালা শেষ হলে, অগত্যা দ্বিতীয় দেবরায়কে সন্ধি করতে হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র মল্লিকার্জুন কিছুদিন দৃঢ়ভাবে রাজ্য শাসন করেন। ১৪৬৫ খৃস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলে, রাজ্যে অন্তর্বিবাদ শুরু হয়।

সঙ্গম বংশ, প্রথম দেবরায়

দ্বিতীয় দেবরায়, আহমদ শাহ্ কর্তৃক বিজয়নগর আক্রমণ, দ্বিতীয় দেবরায়ের পরাজয় ও সন্ধি

কৃষ্ণদেব রায় ঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে নরসিংহ শালুভ নামে এক সুদক্ষ সামন্তরাজ সঙ্গম রাজবংশের অকর্মণ্য রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করেন। তারপর তুলুব নামে আর এক নতুন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বংশের কৃষ্ণদেব রায় (১৫০৯-২৯) সবচেয়ে বিখ্যাত ও মহানুভব রাজা ছিলেন। পোর্তুগীজদের বর্ণনা থেকে তাঁর শক্তির ও মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণদেব পোর্তুগীজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন এবং নিজের সৈন্যদের জোরদার করে বিজাপুরের সুলতানকে বার বার পরাজিত করেন। বিজাপুর রাজ্যের প্রধান নগর অধিকার করে তিনি রায়চুর দুর্গটি বিধ্বস্ত করেন। বিজাপুরের কাছ থেকে উর্বর রায়চুর-দোয়াব পুনরধিকার তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি। তিনি গুলবর্গা ধ্বংস করেন কিন্তু যুদ্ধকালে তিনি শত্রুর প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন। পোর্তুগীজ গভর্নর আলবুকার্কের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা ছিল। পোর্তুগীজ পর্যটক পাএস তাঁকে সর্বগুণসম্পন্ন বীর নৃপতি বলে প্রশংসা করেছেন। কৃষ্ণদেব রায় সাহিত্যানুরাগী ছিলেন এবং রাজধানীতে অনেক মনোহর প্রাসাদ ও মন্দির তৈরি করেন।

শালুভ ও তুলুব বংশ, কৃষ্ণদেব রায়, রায়চুর-দোয়াব পুনরধিকার, সাহিত্য, শিল্প ও স্থাপত্যের প্রতি অনুরাগ

তাঁর মৃত্যুর পর রাজ্য শাসনের ভার অচ্যুত ও সদাশিব রায় নামে দুই দুর্বল

রাজার হাতে পড়ে। ১৫৪২ খৃস্টাব্দ থেকে বিজয়নগরের রাজা সদাশিব তাঁর মন্ত্রী রামরায়ের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। রামরায় দাক্ষিণাত্যের সুলতানদের বিবাদের মধ্যে ঢুকে অকারণ যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে পড়েন। শেষে তাঁর ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে বিজাপুর বিদর গোলকুণ্ডা ও আহম্মদনগর একত্র হয়ে বিজয়নগর আক্রমণ করে (১৫৬৬ খ্রীঃ)। রামরায়ও পিছু না হঠে চার সুলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তালিকোটের কাছে হিন্দু-মুসলমানে ঘোর যুদ্ধ হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রামরায় শত্রুহস্তে বন্দী ও নিহত হন। মুসলমান সৈন্যবাহিনী বিজয়নগর অধিকার করে এবং হিন্দু অধিবাসীদের হত্যা করে শহরটি একেবারে বিধ্বস্ত করে দেয়। প্রায় ছ'মাস ধরে এই ধ্বংসলীলা চলেছিল। কালক্রমে বিজয়নগর রাজ্য ভেঙে অনেকগুলি ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

অচ্যুত ও সদাশিব রায়, রামরায়, চতুঃ শক্তির জোট, তালিকোটের যুদ্ধ, ধ্বংস লীলা

বিজয়নগর সাম্রাজের শাসনব্যবস্থা, সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি : বিস্তৃত সাম্রাজ্য : সিউয়েল সাহেব তাঁর 'The Forgotten Empire-গ্রন্থে বিজয়নগরকে বিস্মৃত সাম্রাজ্য বলেছেন। বিজয়নগরের অতীত সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে বিদেশী পর্যটকদের বহু প্রশংসাসূচক বর্ণনা আছে। এঁদের মধ্যে ইতালীর পর্যটক নিকালো কোন্তি, পোর্তুগীজ পর্যটক পাএস ও নুনিৎস এবং পারস্য দেশের দূত আবদর রজাকের নাম উল্লেখযোগ্য। কোন্তির বর্ণনায় দেখা যায় যে, 'বিজেনগালিয়া'র পরিধি ছিল পঞ্চাশ মাইল। নগরের মধ্যে প্রায় নব্বুই হাজার সৈন্য সর্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকত। আবদর রজাক 'বিসনগর' বা বিজয়নগরে এসেছিলেন। তাঁর সময়ে নগরের চারপাশে একটির পর একটি করে সাতটি বিশাল প্রাচীর ছিল এবং ঐ প্রাচীরের মধ্যে সাতটি সিংহদ্বার ছিল। নগরের মধ্যে অনেক বিশাল প্রাসাদ, প্রকাণ্ড মন্দির ও অনেকগুলি বাজার ছিল। বর্ণনা শেষ করে রজাক লিখেছেন—'বিজয়নগরের মত সমৃদ্ধ শহর পৃথিবীর আর কোথাও মানুষের দৃষ্টিগোচর হয় নাই এবং জগতে আর কোথাও এইরূপ শহর আছে, ইহাও মানুষের কর্ণগোচর হয় নাই বা হইবে না।'

বিদেশীদের চোখে বিজয়নগর

বিসনগর

শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা : বিজয়নগর রাজ্যের শাসনব্যবস্থা মধ্যযুগোচিত সামন্তধর্মী অন্যান্য রাষ্ট্রের মতই ছিল। বিশাল রাজ্যটি দু'শ' এলাকায় বিভক্ত ছিল। প্রতি এলাকার শাসনকর্তাকে সামন্ত-নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট রাজস্ব ও সৈন্যদল সরবরাহ করতে হত। এরকম রাজ্যে মন্ত্রিমণ্ডলী, প্রাদেশিক শাসনকর্তা সেনাপতি ও পুরোহিতের দল থাকা স্বাভাবিক। রাজা সর্বময় কর্তা, অতএব বিজয়নগরে স্বৈরতন্ত্র প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণদের মর্যাদা স্বীকৃত হত, তাঁরা প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হতেন না। রাজস্বের আয় ছিল প্রচুর কিন্তু গুরু

রাষ্ট্রের কাঠামো

স্বৈরতন্ত্র, রাজস্ব ও সৈন্য

করভারে পীড়িত প্রজাবর্গ দুঃখে জীবনযাপন করত সর্বদা যুদ্ধরত রাজ্যের সৈন্যসংখ্যাও ছিল প্রচুর। রজাকের মতে এই রাজ্যে এক হাজার যুদ্ধহস্তী এবং এগার লক্ষ সৈন্য ছিল। দ্বিতীয় দেবরায় অশ্বারোহী সৈন্যের বিশেষ উপযোগীতা বুঝে সামরিক বিভাগে মুসলমান সৈনিক আমদানি করেন। নুনিৎস এবং পাএস উভয়েই সৈন্যদের দৈহিক শক্তিমত্তা ও সাহসের প্রশংসা করেছেন।

সমাজ ও সংস্কৃতি ঃ এই নগরের শোভা ও ঐশ্বর্যের কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। রাজসভায় জাঁকজমকের অভাব ছিল না, মন্ত্রণা বা সভাগৃহটিও স্থাপত্য-শিল্পের উৎকৃষ্ট প্রমাণ। শহরের বাজারে প্রকাশ্যভাবে চুনী মুক্তা ও হীরা বিক্রি হত। এদেশের মাংসাহার, সতীদাহ, দ্বন্দ্বযুদ্ধ প্রভৃতি কয়েকটি সামাজিক প্রথা পর্যটকেরা উল্লেখ করেছেন। স্ত্রীলোকের বেশ স্বাধীনতা ছিল, অনেক মহিলা কেরানী ও জ্যোতিষী ছিলেন। এমন কি কয়েকজন মহিলা রাজসরকারে হিসাব-রক্ষকের কাজও করতেন। সমাজে বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। ধনীদের মধ্যে পণপ্রথা ও বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। সতীদাহ প্রথা প্রশংসনীয় ছিল। সমাজ ও রাষ্ট্র শাসনে ব্রাহ্মণদের অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হত।

পৌর সমৃদ্ধিশোভা, সামাজিক অবস্থা

ধর্মে গোঁড়া হিন্দু হলেও রাজারা সংকীর্ণচিত্ত ছিলেন না তাঁরা তেলেগু ও সংস্কৃত সাহিত্যের পরম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কৃষ্ণদেব রায় নিজে বিদ্বান এবং শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহার সভায় 'অষ্টদিগ্‌গজ' নামে প্রসিদ্ধ আটজন বিখ্যাত কবি থাকতেন। বেদের টীকাকার সায়ন, তাঁর পণ্ডিত ভ্রাতা মাধবাচার্য এবং ভক্তিবাদী দার্শনিক বল্লভাচার্য রাজ্যের অলঙ্কারস্বরূপ ছিলেন। এ ছাড়া, শৃঙ্গেরি মঠ রাজাদের আনুকূল্যে পুষ্ট হয়; স্থপতি ও চিত্রশিল্পীর দলও রাজানুগ্রহে বঞ্চিত হয় নি। প্রাসাদ নির্মাণ, পূর্তকর্ম, সাধারণ-সৌধ রচনা এবং দাক্ষিণাত্য রীতির সুন্দর নিদর্শনস্বরূপ হাজারার দেবায়তন ও বিট্‌ঠলদেবের বিখ্যাত মন্দির গঠন, এগুলি বিজয়নগর রাজাদের স্থায়ী কীর্তি। বিজয়নগরের এই অতুল বৈভব ও শক্তিসমৃদ্ধির বর্ণনায় কিন্তু নিম্ন-সাধারণ জীবনের অসচ্ছলতা এবং শোষিত কৃষকবর্গের দুর্দশার কথা ভুলবার নয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে বিজয়নগর উন্নত ছিল। কিন্তু জনসাধারণের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি। জলসেচের ভালো ব্যবস্থা ছিল। কৃষি ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। জমিদারগণ ক্ষমতাশালী ছিলেন, কিন্তু কৃষি-মজুরদের অবস্থা ভালো ছিল না। তারা সুদের বিনিময়ে মঠ ও মন্দিরের কর্তাদের কাছ থেকে ঋণ গ্রহণ করত। অনাদায়ে তাদের জমি বাজেয়াপ্ত হত। বস্ত্রশিল্প ও মৃৎশিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল। শিল্পী ও বণিক সংঘগুলি সমৃদ্ধ ছিল। দেশের অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই সংঘগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

ধর্ম ও সংস্কৃতি

শিল্প ও পূর্ত কার্য,

অর্থ নৈতিক জীবন, জনসাধারণ

[দশ] ইসলামের সংঘাতে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি : বিদেশী সংঘাত : হিন্দু যুগে শক, যবন, পারদ, কুষাণ প্রভৃতি জাতি উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পথে ভারতে প্রবেশ করে। তারা প্রথমে ছোট ছোট রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে বসতি শুরু করে। এরা সকলেই কালক্রমে ভারতীয় নাম, আচার ও ধর্ম গ্রহণ করে ভারতবাসী হিসেবেই পরিচিত হয়। মুসলিম যুগের শুরুতে আরবগণের সিন্ধুদেশ জয়ের ফলে হিন্দু-মুসলিম সমাজে পারস্পরিক সংস্পর্শের সূত্রপাত হয়। অবশ্য এই সংস্পর্শের প্রত্যক্ষ প্রভাব কার্যকরী হতে বেশ কিছুটা সময় লেগেছিল। যে কোন বিদেশী সংঘাতে এরূপ প্রতিক্রিয়াই স্বাভাবিক। কারণ, অপরিচিত বিধর্মী সমাজকে প্রথমে অপ্রসন্নভাবেই গ্রহণ করা হয়। সুলতানী যুগেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। বিদেশী ও বিধর্মী সমাজের প্রথম সংঘাতে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজ নড়ে ওঠে।

বিদেশী সংস্পর্শের প্রতিক্রিয়া

ভারতে মুসলমান সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বহু মুসলমান এদেশে বসবাস শুরু করে এবং অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর ফলে মধ্যযুগে ভারতের সামাজিক জীবনে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা দেয়। পূর্বে যে সব বিদেশী ভারতে এসেছিল তারা ভারতবাসীর সঙ্গে মিশে গিয়েছিল এবং স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে এক জাতিতে পরিণত হয়েছিল। মুসলমানগণ কিন্তু তাদের বৈশিষ্ট্য হারায় নি, হিন্দু জাতি থেকে নিজেদের পৃথক সত্তা বজায় রেখেছিল। আবার তারা যে উচ্চতর শাসকশ্রেণীর লোক, এ বিষয়ে তারা সর্বদা সচেতন ছিল। শাসক-শাসিতের মধ্যে এই ব্যবধান রাজনীতি ক্ষেত্রে এবং সমাজে অনেক সময় মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ অবস্থায় হিন্দুদের সঙ্গে নানা ব্যাপারে তাঁদের সংঘর্ষ হয়েছিল। এই সমন্বয় ও সংশ্লেষণের যুগে হিন্দু সমাজ যেমন ইসলামের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল, তেমনি আবার এর প্রভাব থেকে মুক্ত হতেও চেষ্টা করেছিল। ভারতীয় জীবনে ধর্মের সংঘাতে হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায়, যার প্রকাশ পর্দা-প্রথার ব্যাপক প্রচলনে। হিন্দু সমাজের এক অংশ আত্মরক্ষার জন্য এই সময় জাতিভেদ প্রথার নিয়মগুলি সুদৃঢ় ও কঠিন করে তুলতে যত্নবান হয়। হিন্দুশাস্ত্র ও স্মৃতিগ্রন্থে এই মনোভাব পরিস্ফুট হয়েছে।

সামাজিক জীবনে সংঘাত, মুসলমানদের স্বাতন্ত্র্য

শাসক ও শাসিতের মধ্যে ব্যবধান, হিন্দু রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি

কিন্তু উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধের তীব্রতা ধীরে ধীরে কমতে লাগল। পাশাপাশি থাকলে মেলামেশা অনিবার্য হয়। সেই সূত্রে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা সুবিবেচক ব্যক্তি, তাঁদের চেষ্টাতেই দুটি সভ্যতার সংযোগ হল। হিন্দু সমাজ ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আসার জন্য নিম্ন শ্রেণীর মানুষরা খুব অসুবিধায় পড়ল। অনেক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগল, মুসলিম সমাজও তাদের স্বীকার করে নিল। এদিকে দুটি সমাজের মধ্যেই যে সব গোঁড়ামি ও দুর্নীতি ছিল, তার বিরুদ্ধে চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আন্দোলন গড়ে তুললেন। তখন দুই

সাম্প্রয়িক সহযোগিতা

ধর্ম ও সমাজের মধ্যে যোগাযোগের ফলে এক উদার নতুন ধর্মভাব দেখা দিল। তার সার কথা হল—সাম্য প্রেম ও ভক্তি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কয়েকজন ধর্ম প্রচারক হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের ভাল ভাল উপদেশগুলি একত্র মিশিয়ে মিলনের সেতু রচনা করতে থাকেন। তাঁরা প্রচার করলেন যে হিন্দুর ভগবান আর মুসলমানের ভগবানে কোনও তফাৎ নেই। সাধু জীবন যাপনের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে লাভ করা যায়। আসল জিনিস হল ঈশ্বরে ভক্তি, সকল মানুষকে সমান ভালোবাসা। বাইরের আড়ম্বর, আচার অনুষ্ঠান অর্থহীন। উচ্চজাত আর নিচ জাতের মধ্যে কোনও প্রভেদ নেই। এই ধর্ম-প্রচারকদের মধ্যে রামানন্দ, কবীর, চৈতন্য ও নানকের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁরা সকলেই একেশ্বরবাদ জাতিপ্রথার অসারতা, পৌত্তলিকতা ও বহু দেবদেবীর উপাসনায় অযৌক্তিকতা প্রচার করেন। তাঁদের প্রচারিত বাণীর মাধ্যমে হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথ সুগম হয়েছিল। তাঁরাই মধ্যযুগের ভগবৎপ্রেম ও ভক্তি-আন্দোলনের পূর্ণ প্রতীক। সর্বমানবের সমতা ও মানবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার অভিন্নত্ব এই নব আন্দোলনের সারতত্ত্ব ছিল।

নতুন ধর্মভাব

ধর্মীয় সমন্বয়

ভক্তি আন্দোলন

রামানন্দ ঃ রামানন্দ ছিলেন চতুর্দশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারক। তিনি ছিলেন রামের উপাসক। তিনি ব্রাহ্মণে ও চণ্ডালে কোনও তফাৎ করতেন না। উত্তর ভারতে ঘুরে ঘুরে তিনি ঈশ্বরের একত্ব আর সকল মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রচার করতেন। তাঁর বারো জন প্রধান শিষ্য ছিলেন, তার মধ্যে একজন ছিলেন নাপিত, একজন মুচি আর একজন জোলা। রামানন্দের অন্যতম বিখ্যাত শিষ্য হলেন কবীর।

কবীর ঃ কবীর এক জোলার বংশে জন্মান। কেউ কেউ বলেন, তাঁর জন্ম উচ্চ হিন্দু বংশে। মা-বাপ ফেলে যান বলে এক জোলা তাঁকে মানুষ করে। লোকে তাঁকে জোলা ও মুসলমান বলেই জানত। কবীর ক্রমে জপ করে ঈশ্বরের চিন্তা করে নিজেও একজন মহাপুরুষ হলেন। তাঁর রচিত অনেক হিন্দী গান আছে। সেগুলিতে তিনি মানুষের কষ্টের কারণ কি, তা বুঝিয়েছেন, একমনে ভক্তিভরে ভগবানকে ডাকার উপদেশ দিয়েছেন। কবীরের শিষ্যদের 'কবীরপন্থী' বলা হয়। উত্তর ভারতে এখনও অনেক কবীরপন্থী আছেন। কবীরের দোঁহা বা কবিতাগুচ্ছ হিন্দী সাহিত্যের বড় সম্পদ। কবীর তাঁর মত প্রচার করে হিন্দু মুসলমানকে এক সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। তিনি বলতেন, আল্লাই বল আর হরিই বল, রাম বল বা খোদা বল—মানুষের মনের ভক্তি প্রার্থনা একজনেরই কাছে পৌঁছবে। মানুষে মানুষে জাতিভেদ নেই, সকলেই মনুষ্যজাতি। সব ধর্মই এক, সকল ধর্মের মূল কথায় তফাৎ নেই। এই সব কারণে, হিন্দু মুসলমান, উভয়শ্রেণীর লোক কবীরকে শ্রদ্ধা করত এবং এখনও করে।

শ্রীচৈতন্য ঃ বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারকদের মধ্যে চৈতন্যদেবের নাম সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য।

তাঁর জন্ম নবদ্বীপে, পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতা শচীদেবী। বাল্যকালে তাঁর নাম ছিল নিমাই। বাল্যকালে তিনি নাকি ভারী দুরন্ত ছিলেন। অল্প বয়সে তাঁর প্রখর বুদ্ধি, ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য দেখে প্রবীণরা আশ্চর্য হয়ে যেতেন। তিনি নানা বিদ্যার চর্চা করেছিলেন এবং অনেক পণ্ডিতকে তর্ক-বিচারে হারিয়েছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়ার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। ঈশ্বরপুরী নামে এক সন্ন্যাসীর শিষ্য হয়ে তিনি কিছুদিন পরে সংসার ত্যাগ করেন ও পরম হরিভক্ত হন। তাঁর চরিত্র ছিল নির্মল, মনে কোনও লোভ, অহংকার ছিল না। চৈতন্যদেব লোককে ঈশ্বরে প্রেম শেখাতেন। তাঁর মূল নীতি হল, ভক্তি ও নামকীর্তন। সর্বজীবে দয়া, বিনয়, সদাচার ও ঈশ্বরপ্রেমই যে মুক্তির উপায়, এই ছিল তাঁর উপদেশ। তাঁর সুমধুর শিক্ষায় লোকে মোহিত হত। অনেক দুষ্ট লোক প্রথমে তাঁর শত্রু হয় ও অনিষ্ট চেষ্টা করে কিন্তু শেষে তাঁর অগাধ কৃষ্ণপ্রেমে মুগ্ধ হত। তিনি মানুষে মানুষে ভেদাভেদ করেননি, জাতি ধর্ম না মেনে সকলকেই ভালোবেসেছেন। এক মুসলমানকে তিনি হরিনামে দীক্ষা দেন, তিনি 'যবন হরিদাস' বলে খ্যাত। নিত্যানন্দ ছিলেন তাঁর নিত্য সঙ্গী, অপর শিষ্যদের মধ্যে রূপ ও সনাতনের নাম উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমে বৃন্দাবন, দক্ষিণে ওড়িশা আর দাক্ষিণাত্যে চব্বিশ বছর ঘুরে চৈতন্যদেব তাঁর ধর্মপ্রচার করেন। পুরীর রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর শিষ্য হয়েছিলেন। তবে দাক্ষিণ্যাত্যে তাঁর প্রচারের প্রভাব সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। নীলাচলে (পুরীধামে) মাত্র ৪৮ বছর বয়সে চৈতন্যদেবের তিরোভাব হয়। কি করে তাঁর দেহান্ত ঘটে তার কোনও হদিস মেলে না। যাই হোক, বাঙলায় ও বাঙলার বাইরেও তিনি এক মহাপুরুষ বলে পূজিত হন। ভারতবর্ষে তাঁর আগেও বৈষ্ণব মত ছিল কিন্তু তিনিই এই ধর্মে প্রাণ সঞ্চার করেন ও জনসাধারণের মধ্যে বৈষ্ণবভাব ও প্রেম বিতরণ করেন। 'নদীয়ার নিমাই', বাঙলার মহাপ্রভু, চৈতন্যদেবের জীবন ও বাণী নিয়ে বাঙলায় এক মধুর বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হয়েছে।

নানক ঃ নানকের জন্ম পাঞ্জাবে। নিজ চরিত্রগুণে তিনি সেখানকার হিন্দু মুসলমান সকলেরই ভক্তির পাত্র হয়েছিলেন। তাঁর সংসার ধর্ম ভাল লাগত না, নিজের দোকানের-জিনিসপত্র সাধু ফকিরদের দান করতেন। পরে তিনি সংসার ছেড়ে ফকিরের বেশে আফগানিস্থান, পারস্য ও মক্কা পর্যন্ত ঘুরেছিলেন। ঈশ্বর এক, তিনি যে সর্বত্র আছেন, এই ভাবটি ক্রমশ তাঁর মনে জাগল। মক্কায় গিয়ে তিনি নাকি পবিত্র 'কাবা'র দিকে পা রেখে শুয়েছিলেন। তাতে এক মোল্লা তাঁকে তিরস্কার করলে নানক রাগ না করে তাঁকে বললেন 'মোল্লা সাহেব, আমি দোষী। খোদা যেদিকে নেই, দয়া করে সেই দিকে আমার পা ফিরিয়ে দিন।' মোল্লা তখন তাঁর জবাবের প্রকৃত মানে বুঝে লজ্জিত হয়ে চলে যান। উপাসনার ব্যাপারেও নানক জাতিভেদ মানতেন না। অনেক মুসলমানকেও তিনি শিষ্য করেন। তাঁর শিষ্যরা 'শিখ' নামে পরিচিত। নানকের উপদেশগুলি প্রাচীন হিন্দিতে লেখা।

শিখরা তাঁর জপজী ও গ্রন্থসাহেবের পূজা করেন। পাঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান সবাই 'বাবা' নানকের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।

নামদেব, একনাথ ও রবিদাস ঃ এই যুগে দাক্ষিণাত্যে নামদেব ও মহারাষ্ট্রে একনাথ জন্মগ্রহণ করেন। নামদেবের জন্ম নিচ শূদ্রবংশে। একনাথ ব্রাহ্মণ হলেও অস্পৃশ্য জাতিকে ধর্ম শিক্ষা দিতেন। রবিদাস (বা রুইদাস) ছিলেন নিম্ন-শ্রেণীর সন্তান, জাতে মুচি। তিনি কবীরের এক প্রধান শিষ্য। এঁরা সকলেই জাতি-ধর্ম-শ্রেণীর প্রভেদ অস্বীকার করে সকল মানুষকে কাছে টেনেছিলেন। ধর্মের মূল ভিত্তি যে ভক্তি ভালোবাসা, সকলের উপরে মানুষ সত্য—এই সার কথাগুলি তাঁরা প্রচার করে গেছেন। এই কারণে এই নতুন শিক্ষাকে **ভক্তি আন্দোলন** বলা হয়। মধ্য যুগে ভারতের যে সব সাধু সন্তদের কথা বলা হল তাঁদের সঙ্গে আর এক সম্প্রদায়ের শিক্ষক ও প্রচারকদের কথা মনে রাখতে হবে। এঁরা সুফী নামে পরিচিত। সাধু চরিত্র, ভক্তি ও আদর্শের বলে এঁরা হিন্দু-মুসলমান সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। এই সব প্রচারক সুফীদের শিক্ষায় ও দৃষ্টান্তে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্‌ভাব জাগে। এঁদের মধ্যে আজমীরের মইনুদ্দিন চিস্তি, দিল্লীর নিজামুদ্দিন আউলিয়া এবং বাঙলার কুতব আলল ও শাহ জালালের নাম বিখ্যাত।

সুফী

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর এই সব ধর্ম-সংস্কারকদের চেষ্টায় হিন্দু ও মুসলমান ধর্মের একটা সমন্বয় সাধিত হয়, সন্দেহ নেই। এই প্রসঙ্গে জৌনপুরের সুলতান কর্তৃক প্রবর্তিত সত্যপীরের পূজা প্রচলনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিজাপুরের সুলতান আদিল শাহ, কাশ্মীরের সুলতান জয়নাল আবেদিন এবং বাঙলার সুলতান হুসেন শাহ প্রভৃতি রাজাদের পরমত সহিষ্ণুতা, জাতিধর্ম নির্বিশেষে কর্মচারী নিয়োগ, প্রজাপালন, সংস্কৃত গ্রন্থের আরবী-ফার্সী ও বাঙলা ভাষায় অনুবাদ করানো এইভাবে হিন্দু- মুসলিমের সাংস্কৃতিক মিলনপথ প্রশস্ত করে। আর এই সব সাধু সন্তদের মাধ্যমে মধ্যযুগে ভারতের সর্বত্র প্রেম ও ভক্তিধর্মের প্রভাব বিস্তৃত হতে থাকে। কৃষ্ণ-প্রেমের মাহাত্ম্যে জনগণের মনপ্রাণ আপ্লুত হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে ব্রহ্মসূত্র ও ভগবদ্‌গীতার টীকাকার দাক্ষিণী পণ্ডিত বল্লভাচার্যের কৃষ্ণ-ভক্তিবাদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সত্যপীর, শাসকদের প্রচেষ্টা, কৃষ্ণপ্রেমতত্ত্ব

মুসলমান সুফীগণ এবং ফকিরেরাও এই সমন্বয়ের কাজে যথেষ্ট সাহায্য করেন। নিজামউদ্দিন আউলিয়া, শাহ জালাল, মৈনুদ্দিন চিস্তি প্রভৃতি সাধুরা হিন্দু-মুসলিম সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। উভয় সম্প্রদায়ের লোক আজও ফকিরদের দরগায় 'সিন্নি' দেন ও মানত করেন। বাঙলা দেশে এই হিন্দু-মুসলিম ভাবধারার মিলন সবচেয়ে সুস্পষ্ট এবং পীরের গান, গ্রাম্য ছড়া প্রভৃতি লোকসাহিত্যরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

সুফী ও ফকির সম্প্রদায়, 'সিন্নী', গান ও ছড়া

উর্দুভাষা ও বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের প্রসার ঃ তুর্কীদের বংশধরেরা ক্রমে তুর্কী ও ফার্সী ভাষা ছেড়ে এ দেশের ভাষায় কথাবার্তা বলতে শিখল। সরকারী কাজে ফার্সী ভাষার ব্যবহার চললেও সাধারণ মুসলমানরা নিজেদের মধ্যে যে ভাষায় কথা কইত, তাকে উর্দু বলা হয়। উর্দু শব্দের অর্থ ছাউনি বা তাঁবু। হিন্দী আর ফার্সী, দুই ভাষার মিশ্রণে উর্দুর উৎপত্তি। কালে অনেক হিন্দু ও মুসলমান এই উর্দু ভাষায় গান কবিতা রচনা করে উর্দু সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছেন। উর্দু ছাড়া তুর্ক আফগান পাঠান যুগে প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও উন্নতি হয়।

উর্দু ভাষার প্রসার

রামানন্দ ও কবীর হিন্দীতে, একনাথ মারাঠী এবং গুরু নানক ও তাঁর শিষ্যরা পাঞ্জাবী (গুরুমুখী) ভাষায় তাঁদের বাণী প্রচার করেন। কাজেই ঐ সব ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্যের মর্যাদা বাড়তে থাকে। একদিকে যেমন আরবী-ফার্সীর প্রচলন বাড়ে, অপর দিকে দেখা যায়, সংস্কৃত ভাষায় অনেক কবি ও দার্শনিক গ্রন্থ লিখেছেন, যেমন সায়নাচার্য, মাধবাচার্য, বল্লভাচার্য ও বাঙলার স্মার্ত পণ্ডিত রঘুনন্দন। এ যুগে বাঙলা সাহিত্যের খুব উন্নতি হয়। বাঙলার সাহিত্য রচনায় হুসেন শাহ বিশেষ উৎসাহ ও সাহায্য দিয়েছিলেন মনসামঙ্গল-কাব্যের কবি বিজয়গুপ্ত ও বিপ্রদাস নিজ নিজ রচনায় হুসেন শাহকে মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন। এই যুগে বর্ধমানের কবি মালাধর বসু 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' কাব্য রচনা করেন। চট্টগ্রামের কবি শ্রীকরনন্দী মহাভারতের কিছু অংশ অনুবাদ করেন। এ ছাড়া, অনেক বৈষ্ণব কবি হিন্দীতে গান ও দোঁহা রচনা করেন। মিথিলার কবি বিদ্যাপতি ও বাঙালী কবি চণ্ডীদাস এই যুগেই জন্মে ছিলেন। হিন্দী কবি ও বাঙলার বৈষ্ণব কবিদের মধ্যে কেউ কেউ মুসলমানও ছিলেন। এই যুগে আরও অনেক বাঙলা বই লেখা হয়, যেমন চৈতন্যচরিতামৃত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও বিজয় পণ্ডিতের পদ্মপুরাণ।

বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্য, বাংলা ভাষা

ইলতুৎমিস, বলবন, মহম্মদ তুঘলক সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। কাজেই তাঁদের রাজত্বে অনেক কবি ও ঐতিহাসিক ফার্সী ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। কবিদের মধ্যে ছিলেন আমীর খসরু ও হাসান আর ইতিহাস-লেখকদের মধ্যে মিনহাজউদ্দিন, জিয়াউদ্দিন বরানীর নাম উল্লেখযোগ্য। কবি আমীর খসরু তুঘলক-নামা লিখেছিলেন। এদের রচনা থেকে তুর্ক-আফগান আমলে ভারতের অনেক পরিচয় পাওয়া যায়।

ফার্সী সাহিত্য, আমীর খসরু, ইতিহাস-চর্চা, বরানী

আর একটি কথা এই প্রসঙ্গে মনে রেখো। মুসলিম যুগে গোটা ভারতের ইতিহাস মানে কেবল হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ, মারামারি আর কাটাকাটির ইতিহাস নয় অনেক সুলতান হিন্দু মন্দির ধ্বংস করেছিলেন, হিন্দুদের উৎপীড়ন করেছিলেন, গোঁড়া ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তা সত্য। কিন্তু ব্যতিক্রম ছিল, কাশ্মীরের জয়নাল আবেদিনের মত কয়েকজন উদার-হৃদয় রাজাও ছিলেন। তাঁরা হিন্দুদের উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করতেন, মন্ত্রী রাখতেন। গোপীনাথ বসু,

পুরন্দর খাঁ প্রভৃতি কায়স্থ আর দুই ব্রাহ্মণ ও পরম বৈষ্ণব রূপ ও সনাতন (চৈতন্যদেবের শিষ্য) বাঙলার সুলতান হুসেন শাহের প্রধান রাজকর্মচারী ছিলেন। সুলতানদের হিন্দু বিদ্বেষের প্রধান কারণ হল, ইসলাম প্রতিমা পূজার বিরোধী। সুলতানরা ভাবতেন, পৌত্তলিকতা বন্ধ করা, মন্দির ও দেবদেবীর মূর্তি ভেঙে দেওয়া পুণ্যের কাজ। কিন্তু এ কথাও ঠিক যে তাঁরা দেশের সমস্ত লোককে জোর করে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেন নি। প্রতিমা পূজা নিষিদ্ধ হলেও সুলতানরা সব সময়ে হিন্দুদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় করতেন না বা সাধারণ লোকের ধর্মে হাত দিতেন না। সে দিক থেকে বলা যায়, মধ্যযুগের ইউরোপে ধর্মের জন্য এর চেয়ে বেশি কঠোর অত্যাচার হত।

উচ্চপদে হিন্দু মন্ত্রী ও রাজ-কর্মচারী নিয়োগ

নতুন শিল্প-রীতি: হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয়ের ফলে ভারতে সুলতানী যুগে একটি বিশেষ ধরনের শিল্পরীতি গড়ে ওঠে। একে ইন্দো-ইসলামী (Indo-Islamic) শিল্প বা স্থাপত্য বলা হয়। এই রীতি হিন্দু ও মুসলমান সভ্যতার সংমিশ্রণের একটি অনিবার্য ফল। সেকালের দিল্লীর সুলতানদের ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আনুকূল্যে একটি অভিনব স্থাপত্যরীতি জন্মলাভ করে। স্যর জন মার্শ্যালের মতে, ভারতীয়-ইসলামী শিল্প কেবলমাত্র মুসলিম স্থাপত্যের একটি স্থানীয় নমুনা নয়, একে হিন্দু শিল্পের সংশোধিত সংস্করণও বলা চলে না। এর আসল রূপ হিন্দু-মুসলিম শিল্প থেকে উদ্ভূত। সুলতানী যুগের স্থাপত্য-শিল্পের ভিতর একটি আঞ্চলিক ছাপ বা বৈশিষ্ট্য ছিল। দিল্লীর কুতব-শ্রেণীভুক্ত মসজিদ অট্টালিকা প্রভৃতি; তুঘলক বংশের ফিরুজ শাহ নির্মিত মসজিদ ও রাজপ্রাসাদ; জৌনপুর, মালব পাণ্ডুয়া গৌড় গুজরাট গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য-শিল্প 'ইন্দো-ইসলামীয়' শিল্পের বিভিন্ন সংস্করণ বলেই মনে হয়।

ইন্দো-ইসলামী স্থাপত্য

মার্শ্যালের অভিমত

প্রাদেশিক প্রয়োজনেই ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন স্থাপত্য-রীতি গড়ে ওঠে। বাঙলার আদিনা ও একডালা মসজিদ এবং গৌড়ের সোনা মসজিদ প্রাদেশিক রীতিতে তৈরি। ওদিকে গুজরাট স্থাপত্যের এক বিশিষ্ট নিদর্শন মামুদ নির্মিত সুবৃহৎ মসজিদ। দক্ষিণে আহমদ শাহের আমলে নির্মিত আমেদাবাদের বিখ্যাত জামি মসজিদ এবং সিদ্দি সৈয়দ মসজিদে অপূর্ব সুন্দর জালির কাজ গুজরাটের স্থাপত্য-শিল্পের উৎকর্ষ প্রমাণ করে। আমেদাবাদের আর এক বৃহৎ মসজিদ 'হেলানো মিনার' নামে পরিচিত একটি মিনার আছে যা ঈষৎ হেলানো অবস্থায় বিরাজ করছে এবং যার গায়ে ঠোকা মারলে ফাঁপা আওয়াজ বের হয়। এই মসজিদের নির্মাণ-কৌশল এবং হিন্দু মন্দিরের মত স্তম্ভের উপর অসংখ্য চিত্র-অলংকার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাই শিল্পকলা-রসিক

আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের নমুনা

গুজরাটী রীতি

পণ্ডিতরা বলেন যে, গুজরাটের স্থাপত্যরীতিরম ধ্যে হিন্দু প্রভাব ও মালবের স্থাপত্যরীতিতে মুসলিম প্রভাব পুরা মাত্রায় বর্তমান।

যাই হোক, প্রথম অবস্থায় এই স্থাপত্যশিল্প হিন্দু ও ইসলামী আদর্শে গঠিত হয়, কারণ শিল্পীরা ছিলেন অধিকাংশই হিন্দু এবং হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাংশ দিয়েই অনেক মসজিদ নির্মিত হয়। বাঙলায় পাণ্ডুয়ার ভগ্ন মসজিদে এমন পাথর আছে যার উল্টো পিঠে দেবতার মূর্তি আজও নিশ্চিহ্ন হয় নি। দিল্লীর স্থাপত্যে ইসলামী প্রভাবই বেশি বলে মনে হয়, তবে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রভাবশূন্য স্থাপত্য বিরল। চিত্র ও সঙ্গীতশিল্পেও উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণ ও বিনিময় প্রতিফলিত হয়েছে। অবশ্য এর উন্নত বিকাশ হয় মুঘল আমলে।

হিন্দু-মুসলমানের মিলিত প্রভাব

দেশের অবস্থা ঃ তুর্ক-আফগান (পাঠান) সাম্রাজ্যের যে বিবরণ দেওয়া হল, তাতে বোঝা যায় সব দিকেই কিছু না কিছু ভালো কাজ হয়েছিল। বিশেষ করে সমাজে ও ধর্মে মিলনের চেষ্টা, স্থাপত্য শিল্পের উন্নতি, লেখাপড়ার চর্চা, হিন্দী ও ফার্সী ভাষার মিশ্রণে উর্দু ভাষার জন্ম, বাঙলা মারাঠী পাঞ্জাবী প্রভৃতি প্রাদেশিক সাহিত্যের সৃষ্টি, এগুলি নিশ্চয়ই গৌরবের কারণ। কিন্তু দেশে স্থায়ী শান্তি ছিল না, দূর প্রদেশগুলিতে প্রায়ই বিদ্রোহ হত। সামরিক শক্তির জোরে দেশ শাসনের চেষ্টা দৃঢ় ও কঠোর হলেও শৃঙ্খলা বজায় রাখা যেত না।

শৃঙ্খলার অভাব

এই সময়ে দেশের কি রকম অবস্থা ছিল, তা কিছু কিছু জানতে পারি পর্যটকদের বিবরণ আর এ দেশের লেখকদের রচনা থেকে। নিকিতিন, নিকোলো কোন্তি, ইবন বতুতা, রজাক. পাএস্ প্রভৃতি অনেক বিদেশী ভারত ভ্রমণ করে তাঁদের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করে গেছেন। অধিকাংশ লেখকই ভারতের বাণিজ্য ও আর্থিক অবস্থার সুখ্যাতি করে বলেছেন, বিদেশী বণিকরা সোনা হাতে করে ভারতে আসে কিন্তু ভারতেই সে সোনা রেখে যায়। নিকিতিন বহমনি রাজ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে মনে হয় রাজধানীর ঐশ্বর্য, সম্ভ্রান্ত লোকদের জাঁকজমক, রাজদরবারের আড়ম্বর ছিল বটে কিন্তু জনসাধারণের অবস্থা মোটেই ভালো ছিল না। কৃষক-প্রজাদের দুর্দশা তাঁর তীক্ষ্ণ নজর এড়াতে পারেনি। রজাকও বিজয়নগরের অতুল ঐশ্বর্য, প্রাসাদ ও রাজধানীর শোভার খুব প্রশংসা করেছেন, কিন্তু দেশের দরিদ্রদের কোনও উন্নতি হয়নি বলে উল্লেখ করেছেন।

ঐশ্বর্য ও দৈন্য

ভারতের অধিকাংশ মানুষ থাকত গ্রামাঞ্চলে, বিলাস-ঐশ্বর্যে ভরা রাজধানী থেকে বহু দূরে। তাই রাজায় প্রজায় সম্পর্ক ছিল খুব কম। সামন্ত প্রথার যুগে সর্বত্র এই রকম দেখা যায়। অর্থাৎ সবার উপরে রাজা তাঁর অনুচর সভাসদ ও সামন্তদের নিয়ে হয় যুদ্ধ বিগ্রহে নয় তো বিলাসিতায় কিংবা প্রাসাদ-সমাধি ইত্যাদি তৈরি করায় অজস্র টাকা খরচ করতেন। আর সকলের নিচে বান্দা বা ক্রীতদাসরা নির্যাতন ভোগ করত। বড় মানুষদের

সামন্ত প্রথার বৈশিষ্ট্য

হাতে জমি, বাণিজ্য আর সুখ সমৃদ্ধি। আর সাধারণ কৃষক প্রজারা খাজনার চাপে উৎপীড়িত, এই ছিল দেশের সাধারণ অবস্থা। এ যুগের জীবন-যাপনের নিখুঁত ছবি পাওয়া যায় না। তবে আমীর খসরু যখন সমবেদনার সুরে লিখেছিলেন, 'রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা দরিদ্র-সাধারণের চোখ থেকে ঝরে-পড়া জমাট রক্ত বিন্দু, তখন তিনি সত্য কথাই বলেছিলেন।

ধনীদের সমৃদ্ধি, সাধারণ মানুষের দৈন্য

দেশের সামাজিক অবস্থার কথাও কিছু কিছু জানা যায়। এই সময়ে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে হিন্দু সমাজে জাতিভেদের খুব কড়াকাড়ি দেখা যায় এবং পর্দা প্রথারও প্রচলন হয়। অবশ্য সর্বত্র তা হয়নি। বিজয়নগর রাজ্যে স্ত্রীলোকদের যথেষ্ট স্বাধীনতা ছিল, সে কথা আগে বলা হয়েছে।

জাতিভেদ ও পর্দা প্রথা

ভারতের সঙ্গে বাইরের দেশের বাণিজ্য ভালই চলত। জলপথে আফ্রিকা, মালয়, চীনদেশের সঙ্গে এবং স্থলপথে মধ্য এসিয়া, তিব্বত, আফগানিস্থান, পারস্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ ছিল। আর তাতে ভারতেরই লাভ হত কারণ আমদানির চেয়ে জিনিসের রপ্তানি ছিল বেশি। বাইরে থেকে আসত ঘোড়া, চামড়া, বড় মানুষ ও রাজাদের জন্য বিলাসসামগ্রী আর ভারত থেকে চালান যেত শস্য, বস্ত্র, নীল, রেশম, মরিচ মসলা প্রভৃতি। ইবন বতুতা বলেছেন, বাঙলায় জিনিসপত্রের দাম ছিল খুব সস্তা, মাত্র এক টাকায় তিনজন লোকের মাসিক সংসার খরচ চলত। কিন্তু ঐ টাকা-পয়সারই অভাব ছিল গরীব সাধারণের। দেশে দুর্ভিক্ষ হলে তো কথাই নেই, দুর্ভিক্ষের প্রতিকার ব্যবস্থাও ভালো ছিল না। কৃষিকাজই ছিল সাধারণ জীবনের প্রধান অবলম্বন, কিন্তু চাষ নষ্ট হলে গরীবদের দুর্দশার অন্ত থাকত না। আর শ্রম-শিল্প বা কারিগরি কাজের উন্নতির জন্য সরকারী বন্দোবস্তও তেমন ভালো ছিল না।

বহির্বাণিজ্য, জিনিসপত্র সুলভ, দুর্ভিক্ষ প্রতিকারে অব্যবস্থা,

শ্রমশিল্পী ও কারিগরদের প্রতি সরকারী উদাসীন্য

মোটের উপর বলা চলে, সুলতানী আমলে ভারতে ধনীর ঐশ্বর্য ও নির্ধনের দুর্দশা পাশাপাশি বিরাজ করত। নিকিতিন, নিকোলো কোন্তি, বার্বোসা, বার্থেমা, বতুতা ও রজাক প্রভৃতি অধিকাংশ বিদেশী পর্যটকই ভারতের বাণিজ্য ও সমৃদ্ধির সুখ্যাতি করে বলেছেন, বিদেশীরা সোনা হাতে করে ভারতে আসে এবং ভারতেই সে সোনা রেখে যায়। কিন্তু জনসাধারণের অসচ্ছল অবস্থা সকলের দৃষ্টি এড়ায় নি। সামন্ত প্রথার যুগে পৃথিবীর সর্বত্র যা দেখা যায়, ভারতেও তার ব্যতিক্রম ছিল না।

অর্থাৎ সমাজ ও রাষ্ট্রের মাথায় রাজা তাঁর অনুচর সামন্ত ও জায়গীরদারদের সঙ্গে বিলাসিতায় অর্থব্যয় করতেন, সাড়ম্বরে প্রাসাদ ও দেবালয় গড়তেন। আর সকলের নিচে আমীর-ওমরাহদলের আশ্রিত ক্রীতদাসেরা নির্যাতন ভোগ করত। তাদেরই পরিশ্রমে ইমারত উঠত, খাল কাটা হত। বড় মানুষদের হাতে জমি ও ব্যবসায়, সাধারণ কৃষক খাজনার চাপে উৎপীড়িত। এ যুগের প্রকৃত সমাজ-ইতিহাস ও আর্থিক অবস্থার চিত্র পাওয়া কঠিন।

সামাজিক ও আর্থিক অবস্থা

সুলতানী শাসন পদ্ধতি : সুলতানী আমলে শাসনপ্রণালীর বৈশিষ্ট্যগুলি এখন সংক্ষেপে বলি। সুলতানী শাসনকে স্বৈরতন্ত্র বলা যায়। অর্থাৎ সুলতান ছিলেন সর্বেসর্বা, তবে উলেমাদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁরা কোরানের নির্দেশ মেনেই চলতেন, অবশ্য আলাউদ্দিন খলজী তাঁদের প্রাধান্য দিতেন না। যাই হোক, দিল্লী সুলতানী ছিল মোটের উপর ইসলামী রাষ্ট্র এবং শাসন-পদ্ধতির ভিত্তি ছিল সামরিক। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বে-সামরিক রাজকর্মচারীদের দিয়ে শাসন-কাজ চালানোর তেমন বন্দোবস্ত ছিল না।

স্বৈরতন্ত্র, উলেমাদের পরামর্শ ও কোরানের নির্দেশ, ইসলামী রাষ্ট্র

সুলতানী শাসন ছিল বংশানুক্রমিক। কিন্তু বাঁধা-ধরা উত্তরাধিকার আইন ছিল না বলে সিংহাসনের দাবী নিয়ে প্রায়ই মারামারি ও রক্তপাত হত। আমীর-ওমরাহদের যথেষ্ট প্রভাব থাকায় তাঁরা দলে ভারি হয়ে যাঁকে সমর্থন ও সাহায্য করতেন, তিনিই গদিতে বসতেন। আলাউদ্দিন খলজী এই চক্রান্তকারী ক্ষমতালোভী ওমরাহদের দাবিয়ে রেখেছিলেন।

বাঁধা-ধরা উত্তরাধিকার আইনের অভাব

এই সবই সামন্ত প্রথার লক্ষণ। সম্রাটের যিনি প্রধান উপদেষ্টা বা মন্ত্রী থাকতেন, তিনি উজীর। সম্রাট উজীরের পরামর্শে দরবারে বসেই আবেদন শুনতেন ও বিচার করতেন। মামলার বিচার করতেন কাজীরা মুসলিম আইন অনুসারে। তবে হিন্দুদের বেলায় স্থানীয় প্রথা ও আচার অগ্রাহ্য করা হত না। রাজস্ব বিভাগে বেশির ভাগ হিন্দু কর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন। খাজনা উসুল করা, রাজকোষে রাজস্ব পাঠানো, জমি সংক্রান্ত মামলার মীমাংসা করা, এইগুলি ছিল তাদের দায়িত্ব।

মুসলিম আইন অনুসারে কাজীর বিচার

———

নবম অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্য (১৫২৬—১৭০৭ খ্রীঃ)

০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০

[এক মুঘলযুগের ভারত ইতিহাসের বিভিন্ন উপাদান :

মুঘল যুগের ভারত-ইতিহাস রচনার বহু উপকরণ আছে। এগুলিকে চার ভাগে ভাগ করা যায় (১) সরকারী দলিল পত্র, (২) ইতিহাস আশ্রিত সাহিত্য ও ইতিহাস গ্রন্থ, (৩) বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী, এবং (৪) মুদ্রা ও শিল্প স্থাপত্যের নিদর্শন।

সরকারী দলিল পত্র, আত্মজীবনী

মুঘল যুগের সরকারী দলিলপত্রের বেশির ভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। যেগুলি পাওয়া গেছে সেগুলি এই যুগের ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করে। তবে মুঘল যুগ ঐতিহাসিক গ্রন্থে সমৃদ্ধ। ইতিহাস রচনার রীতিও ছিল উন্নত মানের। দরবারী ঐতিহাসিক ছাড়া মুঘল সম্রাটদের আত্মচরিত গ্রন্থগুলিও এ যুগের ইতিহাসের বহু উপকরণ সরবরাহ করে। বাবরের 'আত্মচরিত', ও জাহাঙ্গীরের 'তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী' মুঘলযুগের গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপাদান। বাবরের কন্যা গুলবদন বেগমের

দরবারী সাহিত্য, ইতিহাস গ্রন্থ

'হুমায়ুননামা' থেকে মুঘল যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের কথা জানা যায়। তবে মুঘল যুগের দরবারী ইতিহাস গ্রন্থগুলি সর্বাধিক গুরুত্ব দাবী করে। কেননা এগুলি সরকারী দলিল, ফরমান প্রভৃতি নির্ভর যোগ্য তথ্যের উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল। আকবরের রাজত্বকাল সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আবুল ফজল-রচিত 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর নামা' গ্রন্থে পাওয়া যায়। 'পাদ্‌শাহ্‌নামা' গ্রন্থে শাহজাহান ও আওরঙ্গজীবের রাজত্ব কালের ইতিহাস জানা যায়। এছাড়া কাফী খাঁ রচিত 'মাসির-ই-আলমগীরী' এবং বদাউনী রচিত 'মুন্তাখাব-উল-তোয়ারিবা মুঘল যুগের অতি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

বিদেশী পর্যটকগণের বিবরণী

বহু বিদেশী পর্যটক মুঘল যুগে ভারতে এসেছিলেন। তাঁদের বিবরণী থেকে সে যুগের মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন জানা যায়। র‍্যালফ ফিচ্‌, স্যার টমাস রো, হকিন্স, বার্নিয়ার, টেভার্নিয়ে, মানুচি প্রভৃতি য়ুরোপীয় পর্যটকগণ তাঁদের বিবরণীতে ভারত সম্পর্কে তাঁদের অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছেন। মুঘল যুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এই বিবরণী গুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ।

চিত্র স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের, নিদর্শন

মুঘল যুগের মুদ্রাগুলি মুঘল আমলের মুদ্রানীতি ও ধাতু শিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে। সেযুগের চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি থেকে সমকালীন ভারতের শিল্পী ও স্থপতিদের অসামান্য দক্ষতা ও উন্নত শিল্পচেতনার কথা জানা যায়।

[দুই] মুঘলদের উৎপত্তি ঃ

বাবর ঃ দুর্ধর্ষ মোঙ্গল বীর চিঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এক পুত্র চঘ্‌তাই পিতৃরাজ্যের এক অংশ, মধ্য এসিয়া লাভ করেন। তাঁর বংশধরগণ এই চঘ্‌তাই রাজ্য শাসন করতেন। এই রাজ্যে তাতার জাতিও বাস করত। তাই কালক্রমে মোঙ্গল-তাতার জাতির রক্ত মিশ্রণ ঘটে। তৈমুর লঙ সেই হিসেবে মোঙ্গল-তাতার (বা তুর্কী) বংশ থেকে উদ্ভূত। বাবর প্রভৃতি তৈমুরলঙ্গের বংশধরগণ ভারতীয় ইতিহাসে 'তৈমুর-বংশীয়' এবং 'মোঙ্গল' থেকে প্রাপ্ত 'মোগল' (বা মুঘল) নামে পরিচিত।

ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ঃ বাবর (১৫২৬—১৫৩০ খ্রীঃ) ঃ ভারতের সর্বত্র যে অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মেঘ ঘনিয়ে উঠছিল, বাবর সেই অবস্থার পূর্ণ সুযোগ নেন। ১৫২৬-১৫৩০ খৃস্টাব্দের মধ্যে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধে জয়লাভ করে তিনি ভারতে এক নতুন রাজবংশ ও নতুন যুগের সূচনা করে যান। কিন্তু এত অল্প সময়ের মধ্যে বাবরের কাজ সম্পূর্ণ হতে পারেনি, পৌত্র আকবরকে আবার নতুন করে গোড়াপত্তন করতে হয়।

বংশ পরিচয়, প্রথম জীবন

যুদ্ধজয় ঃ জহীরউদ্দিন মহম্মদ বাবর ১৪৮৩ খৃস্টাব্দে মধ্য এসিয়ায় ফরগনায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবনে বিচিত্র ঘটনা ও অভিজ্ঞতা হয়েছিল। বাল্যকালে তাঁকে অনেক দুঃখ কষ্ট ও ঝড়-ঝাপটা সহ্য করতে হয়। তাঁর পিতা উমর মির্জা তৈমুরের বংশজাত, মায়ের দিকে বাবরের সঙ্গে মোঙ্গল নেতা চিঙ্গিস খাঁর সম্পর্ক ছিল, সুতরাং এসিয়ার দুই দুর্ধর্ষ বীর যোদ্ধার রক্ত তাঁর মধ্যে ছিল। পিতার মৃত্যুর পর মাত্র এগার বছর বয়সে তিনি ফরগনার সিংহাসন লাভ করেন এবং তৈমুরের রাজধানী সমরখন্দ কালক্রমে তাঁর হস্তগত হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ শত্রুদের চক্রান্তে তাঁকে ফরগনা ও সমরখন্দ, দুইই হারাতে হয়। আত্মবিশ্বাসী বাবর কিন্তু নিরাশ ও নিশ্চেষ্ট থাকেননি। ১৫০৪ খৃস্টাব্দে তিনি কাবুল অধিকার করে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫২২ খৃস্টাব্দে কান্দাহার তাঁর অধিকারে আসে। কাবুলে বাইশ বছর রাজত্ব করবার পর বাবরের জীবনে শ্রেষ্ঠ সুযোগ এল। ইব্রাহিম লোদীর পরম শত্রু ও লাহোরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ তাঁকে ভারত অভিযানে নিমন্ত্রণ করলেন। বাবর তিনবার ভারত আক্রমণ করেন। তৃতীয় অভিযানে তিনি সকল প্রতিরোধ ব্যর্থ করে অগ্রসর হন এবং প্রথম পানিপথের যুদ্ধে (১৫২৬) মিত্রপক্ষ সমেত ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করে মুঘল সাম্রাজ্যের পত্তন করেন। এইভাবে উত্তর ভারতবর্ষে নতুন রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হল। বাবর জাতিতে চঘ্‌তাই তুর্কী ছিলেন, এই চঘ্‌তাই তুর্কীরাই ভারতে মুঘল বা মোগল নামে অভিহিত।

কাবুল ও কান্দাহার, অধিকার, ভারত অভিযান

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, ১৫২৬ খ্রীঃ

পানিপথের যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের প্রধান কারণ, তাঁর কামান ছিল। এই যুদ্ধাস্ত্র তখন সবে মাত্র পশ্চিম এসিয়া ও য়ুরোপে ব্যবহার করা হচ্ছিল। তা ছাড়া,

বাবরের অদম্য সাহস ও নেতৃত্ব, সুশিক্ষিত অশ্বারোহী সৈন্য তাঁর জয়লাভের অন্যান্য কারণ। এক বিশেষ পদ্ধতিতে সৈন্য সাজিয়ে তিনি আক্রমণ চালাতেন। এই পানিপথের যুদ্ধ তাঁকে দিল্লী ও আগ্রার অধীশ্বর করল বটে, কিন্তু হিন্দুস্থানে তাঁর রাজ্য নিষ্কণ্টক হল না। বাবর যখন আফগান সর্দারদের বশে আনবার চেষ্টায় ছিলেন, তখন মেবারের রানা সঙ্গ (সংগ্রাম সিংহ) দেশের গোলযোগ ও বৈদেশিক আক্রমণের সুযোগ নিয়ে ভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সংকল্প করছিলেন। ১৫২৭ খৃস্টাব্দে ফতেপুর সিক্রির কাছে খানুয়ার প্রান্তরে বাবর রানা সঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন এবং প্রথমে বিচলিত হলেও শেষ পর্যন্ত কামানের জোরে রাজপুত বীরকে পরাস্ত করেন। বাবরের হিন্দুস্থান জয়ের ইতিহাসে খানুয়ার এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে উত্তর ভারতে রাজপুত প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল ও হিন্দুস্থানে মুঘল অধিকার এবং হিন্দুস্থানে মুঘল পাদশাহী প্রতিষ্ঠা সম্ভব হল।

বাবরের সমর কৌশল, খানুয়ার যুদ্ধ

রানা সঙ্গের পরাজয়

তারপর ১৫২৯ খৃস্টাব্দে মধ্যভারতে চন্দেরী দুর্গ অধিকার করে বাবর পাটনার কাছে ঘর্ঘরা নদীর তীরে বাঙলা-বিহারের দুর্দান্ত আফগান সর্দারদের পরাজিত করেন। এই ঘর্ঘরা বা ঘোঘরার যুদ্ধের পর মুঘল-আফগান সংঘর্ষের প্রথম পর্ব শেষ হল। ১৫৩০ সালে সাতচল্লিশ বছর বয়সে বাবরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে তাঁর রাজ্য কাবুল কান্দাহার থেকে বাঙলার সীমান্ত পর্যন্ত সুদূরবিস্তৃত ছিল।

ঘোঘরার যুদ্ধ ও আফগান পরাজয়

বাবরের চরিত্র ঃ বাবরের চরিত্রে নানা গুণ ছিল। একদিকে অধ্যবসায়, সাহস, শৌর্য ও যুদ্ধকৌশল ; অপরদিকে ক্ষমা ও উদারতা, দানশীলতা, বন্ধু-প্রীতি, সাহিত্যানুরাগ ও শিল্পবোধ বাবরের চরিত্রকে অসামান্য করেছে। নিষ্ঠুরতা ও মদ্যপানে আসক্তি ছিল তাঁর স্বভাবের দোষ, কিন্তু যুদ্ধের আগে তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে মদ আর ছোঁবেন না।

রাজকীয় ও মানবিক গুণাবলী পানাশক্তি

তুর্কী ভাষায় লেখা বাবরের বিখ্যাত 'তুজক' বা আত্ম-জীবনী এবং ফার্সী ও তুর্কী ভাষায় স্বরচিত গদ্য ও কবিতা তাঁর সাহিত্যানুরাগ ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় বহন করে। এটি ইতিহাসের একখানি আকর-গ্রন্থ। 'আত্মকথা'য় তিনি তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ উন্মোচিত করেছেন। এতে তিনি দোষত্রুটি সরল ও সুস্পস্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। আবার এই আত্ম-জীবনী থেকেই ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতির একটি চিত্র পাওয়া যায়। এই বিবরণী পড়লে মনে হয়. ভারতবর্ষ জয় করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করলেও বাবর এই দেশকে ও তার অধিবাসীদের মোটেই ভালোবাসতে পারেন নি। স্বদেশের ফল ফুল পাহাড় ও ঠাণ্ডা ঝরনার কথা তাঁর সর্বদাই মনে পড়ত। হিন্দুস্থানের অসহ্য গরম, দারিদ্র্য ধূলিমলিন ধূসরতা এবং এ দেশের লোকের অপরিচ্ছন্নতা বন্ধুত্ব-বন্ধনের

আত্মকথা

ভারতীয় চিত্র

অক্ষমতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার অভাব তাঁকে পীড়িত করেছিল। হিন্দুস্থানের প্রধান বৈশিষ্ট্য যে এটি এক বিশাল দেশ আর এখানে সোনা রূপা অপর্যাপ্ত।

বাবর সত্যিই জীবন-রসিক, সুলেখক ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। আর মুঘল রাজত্বের সূচনা এবং বাদশাহীর সূত্রপাত করে গেলেও একটি সাম্রাজ্য গড়বার মত তাঁর সময়, হয়তো তেমন তীব্র ইচ্ছাও ছিল না। তবে একথা ঠিক, শক্তি, গৌরব লুপ্ত হলেও তাঁর জীবন-স্মৃতির আবেদন আজও ক্ষুণ্ণ হয়নি। শাসক হিসেবে তাঁর কৃতিত্ব তেমন উল্লেখযোগ্য নয়, পৌত্র আকবরকেই নতুন করে সাম্রাজ্য গড়তে হয়। কিন্ত মানুষ বাবর ইতিহাসে আকর্ষণের বস্তু। কন্যা গুলবদন ও আকবরের সভাসদ ঐতিহাসিক আবুল ফজল লিখে গেছেন, বাবর কেমন করে মুমূর্ষু পুত্র হুমায়ুনের কঠিন ব্যাধিকে একান্ত প্রার্থনায় নিজের দেহে টেনে নিয়ে পুত্রের প্রাণ রক্ষা করেন। এই হল জনশ্রুতি।

ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব আলোচনা

[ক] মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা :

হুমায়ুন (১৫৩০-৩৯, ১৫৫৫-৫৬ খৃঃ) : বাবরের মৃত্যু হলে তাঁর বড় ছেলে হুমায়ুন দিল্লীর বাদশাহ হলেন ; কিন্তু সমগ্র রাজ্যের উপর তাঁর কর্তৃত্ব ছিল না। সেই সময় পূর্ব ভারতে বিহার অঞ্চলে শের খাঁ অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। চৌসার যুদ্ধে (১৫৩৯) এবং পরের বছর বিলগ্রাম বা কনৌজের যুদ্ধে শের খাঁর হাতে হুমায়ুন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত হলেন। তারপর পনের বছর ধরে হুমায়ুনকে হৃতরাজ্যে পলাতকের জীবন যাপন করতে হয়। এই সময়ে সিন্ধু দেশে অমরকোট নামক স্থানে ১৫৪২ খৃস্টাব্দে তাঁর পুত্র আকবরের জন্ম হয়। ইতিমধ্যে শের শাহের মৃত্যু হলে হুমায়ুন দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নেন। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই পাঠাগারের সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। 'হুমায়ুন' নামের অর্থ 'ভাগ্যবান' কিন্তু তাঁর মত ভাগ্যহীন সম্রাট বড় দেখা যায় না।

মুঘল-আফগান সংঘর্ষের দ্বিতীয় পর্ব : শের শাহ (১৫৪০—১৫৪৫) : ভারতের ইতিহাসে শের শাহ এক অসামান্য ব্যক্তি। তিনি জাতে আফগান (পাঠান) তাঁর পিতা হাসান সুর ছিলেন বিহারে সাসারামের জায়গীরদার। শের খাঁর আসল নাম ছিল ফরিদ। তলোয়ারের কোপে একটি বাঘ মেরেছিলেন বলে বিহারের সুলতান নাকি তাকে শের খাঁ উপাধি দেন। ফরিদের প্রথম জীবন খুব অশান্তিতে কেটেছিল। বিমাতার চক্রান্তে পনের বছর বয়সেই বাড়ি ছেড়ে তাঁকে ভাগ্য সন্ধানে বেরুতে হয়। এই সময় তিনি কিছুকাল জৌনপুরে থেকে আরবী ও ফার্সী ভাষা শেখেন। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর ফরিদ দেশে ফিরলেন কিন্তু বিমাতার দুর্ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে সাসারাম থেকে চলে গেলেন। ইতিমধ্যে পিতার মৃত্যু হলে ফরিদ তাঁর জায়গীর পেলেন এবং বিহারের সুলতান বহর খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরী নিলেন। কিন্তু ঐ জায়গীর হস্তচ্যুত হওয়াতে বুদ্ধিমান শের খাঁ বাবরের

জন্ম পরিচয়

কর্ম গ্রহণ

শিবিরে যোগ দিলেন (১৫২৬)। বাবর তখন দিল্লী আগ্রা অধিকার করে পূর্ব দিকে আসছিলেন। শের খাঁর সাহায্যে বাবরের সুবিধা হল এবং বাবরের সহায়তায় শের খাঁ পৈতৃক জায়গীর ফিরে পেলেন।

এদিকে বহর খাঁর মৃত্যু হলে শের খাঁ সুলতানের ছেলে জালাল খাঁর অভিভাবক হিসেবে বিহার শাসন করতে লাগলেন। এই সময় চুনারের কেল্লাদার তাজ খাঁর

চুনারের শাসনভার

বিধবা পত্নীর সঙ্গে শেরের বিবাহ হয়। তার ফলে চুনার দুর্গটি তার দখলে আসে (১৫৩০)। এর আগেই তিনি রোটাস দুর্গ জয় করেছিলেন। এখন ওমরাহের দল শের খাঁর শক্তি ক্রমেই

সুরজগড়ের যুদ্ধ জয়

বাড়ছে দেখে ভয় পেলেন এবং বাঙলার সুলতান মামুদ শাহের সঙ্গে একজোট হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। সুরজগড়ের যুদ্ধে শের খাঁ শত্রুদের হারিয়ে দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ পরিষ্কার করলেন।

যুদ্ধ ও রাজ্যবিস্তার ঃ বাবরের মৃত্যুর পর মোগল বাদশাহীকে ধ্বংস করার জন্য আফগানদের মধ্যে যে ষড়যন্ত্র হচ্ছিল, শের খাঁ তাতে সরাসরি যোগ দেননি।

চুনার অবরোধ, বঙ্গ আক্রমণ

হুমায়ুন চুনার অবরোধ করলে শের খাঁ প্রথমে বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু হুমায়ুন যখন গুজরাট অভিযানে ব্যস্ত, শের খাঁ সুযোগ বুঝে বাঙলা আক্রমণ করলেন, পর পর দু বার। এ দিকে হুমায়ুন আগ্রায় ফিরে এলেন। মামুদের আমন্ত্রণ পেয়ে আবার চুনার দুর্গ দখল করে তিনি পূর্ব দিকে গৌড় পর্যন্ত জয় করলেন। আট মাস কাল

চৌসার যুদ্ধ

বাঙলায় থেকে হুমায়ুন যখন আগ্রায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন শের খাঁ হঠাৎ আক্রমণ চালিয়ে চৌসার যুদ্ধে মোগল সৈন্যদের চূড়ান্তভাবে হারিয়ে দিলেন। এই যুদ্ধের পর শের খাঁ 'শের শাহ' উপাধি নিয়ে নিজেকে স্বাধীন সম্রাট বলে ঘোষণা করলেন। পরের বছর হুমায়ুন রাজ্য উদ্ধারের আশায় শের শাহকে আক্রমণ করতে গিয়ে কনৌজের কাছে বিলগ্রামের যুদ্ধে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হন (১৫৪০) এবং ইরানে গিয়ে আশ্রয় নেন। শের শাহের জীবিতকালে হুমায়ুন কিছুই সুবিধা করতে পারেননি।

শের শাহ মাত্র পাঁচ বছর দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন। কিন্তু এই অল্পকালের মধ্যেই তিনি রাজ্যবিস্তার ও ভালো শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন করে যান। প্রথমে হুমায়ুনের ভাই কামরান বিনা যুদ্ধে তাঁকে পাঞ্জাব ছেড়ে দিলেন। তারপর শের

রাজ্যবিস্তার ও শাসন প্রতিষ্ঠা

শাহ বাঙলায় খিজির খাঁর বিদ্রোহ দমন করে শাসনকর্তার পদটি উঠিয়ে দিলেন। এর পরে একে একে মালব, গোয়ালিয়র ও রণথম্বোর দুর্গও তার রাজ্যভুক্ত হল। মালবের কাছে রায়সিন দুর্গটিও তিনি কৌশলে হস্তগত করেন আর যুদ্ধকালে একখানি জাল চিঠি দিয়ে মাড়বারের রাজাকে প্রতারিত করে ঐ রাজ্যটিও দখল করে নেন। অবশেষে কালঞ্জর দুর্গ অবরোধ করবার সময় বারুদের আগুনে পুড়ে শের শাহের মৃত্যু হয় (১৫৪৫)।

শাসন ও অন্যান্য সংস্কার ঃ শের শাহের সাম্রাজ্যে সর্বসমেত সাতচল্লিশটি সরকার ছিল। এই সরকারগুলি আবার কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত ছিল। সরকারের শাসনভার ছিল দুজন রাজপুরুষের উপর—প্রধান সিকদার এবং প্রধান মুনসেফ। দেশরক্ষা ও প্রজাশাসনের ভার ছিল প্রথম রাজপুরুষের উপর আর দ্বিতীয় জনের কাজ ছিল রাজস্ব-সংক্রান্ত। রাজপুরুষ ও অন্যান্য কর্মচারীদের বদলি করার প্রথা ছিল। রাজস্ব-বিভাগের সংস্কার শের শাহের এক বড় কীর্তি। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা এ বিষয়ে তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। জমি জরিপ, তার পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যবস্থা এবং রায়তদের সুখ-সুবিধার প্রতি মনোযোগ, এই ছিল শেরের রাজস্ব-ব্যবস্থার প্রধান বিশেষত্ব। ফসলের সময় জমি জরিপ করান হত, সেই প্রত্যাশিত শস্যের এক-তৃতীয়াংশ ছিল দেয় রাজস্ব। খাজনার হার কিছু গুরুভার হলেও কৃষকশ্রেণী উৎপীড়ন ভোগ করত না। খাজনা টাকায় অথবা শস্যে দেওয়া চলত এবং আদায়ের ভার ছিল 'মকদ্দম' নামক কর্মচারীদের উপর। দুর্ভিক্ষ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটলে ঋণ ও আগাম দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় শের শাহ খুব নজর দিতেন। কর্মচারীদের উপর তাঁর আদেশ ছিল যে খাজনা ধার্য করার সময়ে কৃষকদের উপর যেন জুলুম করা না হয়, কিন্তু আদায় কালে শিথিল হলে চলবে না। পাট্টা দিয়ে এবং কবুলিয়ত নিয়ে দলিলে প্রজাদের অধিকার ও দায়িত্ব তিনি ঠিক করে দেন। শের শাহ মুদ্রানীতিরও সংস্কার করেন। নির্দিষ্ট ওজনের যে রুপার মুদ্রা প্রচলিত হল সেই সব 'তঙ্কা'র (টাকা) উপর ফার্সী ও দেবনাগরী অক্ষরে তাঁর নাম ছাপা থাকত। তিনি দেশের মধ্যে অনেক শুল্ক রদ করে দিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যের পথ সুগম করেন। যাতায়াতের সুবিধার জন্য তিনি বাঙলা থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত শাহী সড়ক (গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড) ও আগ্রা থেকে মালব পর্যন্ত অন্যান্য রাজপথ তৈরি করান এবং পথের দুই পাশে গাছ পুঁতে ও দীঘি খুঁড়িয়ে দেন। ধর্মেকর্মে দান এবং গরীবদের জন্য লঙ্গরখানার ব্যবস্থা ছিল। রাস্তার ধারে হিন্দু মুসলমানের জন্য সরাইখানাও স্থাপিত হয়। এই সরাইখানাগুলি ডাক অফিসের কাজও করত। শের শাহ ঘোড়ায় ডাক বহনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

প্রদেশ বিভাগ, সরকার ও পরগনা

রাজস্ব সংস্কার, শের শাহের শ্রেষ্ঠ কীর্তি

ফসলের সময় জমি জরিপ, মকদ্দমা, কৃষকদের স্বার্থরক্ষা

পাট্টা কবুলিয়ৎ, মুদ্রা-সংস্কার, শুল্ক ও বাণিজ্য রাজপথ

জনকল্যাণ, ডাকব্যবস্থা

গ্রামাঞ্চলে চুরি-ডাকাতি দমনের দায়িত্ব ছিল বাসিন্দাদের উপর। তা ছাড়া গুপ্তচর ও পুলিস-বাহিনী শান্তি ও পথ-ঘাটের নিরাপত্তা রক্ষা করত। প্রজাসাধারণের ধনপ্রাণ রক্ষা করা এবং সরকারী জুলুম বন্ধ করা রাজার শ্রেষ্ঠ কর্তব্য, এ কথা শের শাহ নিজেই বলে গেছেন। দার-উল-আদালতে কাজী ও মীর আদল দেওয়ানী বিচার করতেন। হিন্দুরা সম্পত্তি বিষয়ে হিন্দু আইন মেনে চলত।

শান্তিরক্ষা গুপ্তচর ও পুলিশ বাহিনী

দেওয়ানী বিচার, ফৌজদারী বিচার

তবে ফৌজদারী বিচারে একই সরকারী আইন এবং সে আইন ছিল রীতিমত কড়া। সুবিচারের ফলে পদমর্যাদার জন্য কেউ কম শাস্তি পেত না। তিনি 'ফৌজ' বা সেনা-বিভাগে কঠোর নিয়ম প্রবর্তন করেন এবং সৈন্যরা যাতে সরকারকে না ঠকায়, সেজন্য ঘোড়াদের পিঠে ছাপ মেরে দিতেন। অতএব দেখা যায় যে মাত্র পাঁচ বছর রাজত্বকালের মধ্যে শের শাহ দেশশাসনে ও নানাবিধ সংস্কারে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। বাবর চার বছর রাজত্ব করে মোগল বাদশাহী প্রতিষ্ঠা করেন কিন্তু কোন শাসন ব্যবস্থা মজবুত করতে পারেননি। অথচ শেরশাহ ঐ সময়ের ভিতর যুদ্ধ ও রাজ্যজয় করে ভালো শাসন ও রাজস্ব-বন্দোবস্ত করেন এবং সাম্রাজ্যকে পাকা ভিত্তির উপর দাঁড় করিয়ে যান।

সামরিক সংস্কার, সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ়

গোঁড়ামির বশে শেরশাহের হিন্দু বিদ্বেষ ছিল না। তাঁর অনেক বড় কর্মচারী ছিলেন হিন্দু, ব্রহ্মজিৎ গৌড় ছিলেন তাঁর এক প্রধান সেনাপতি। উপরন্তু তাঁর রাজস্ব প্রথা ও অন্যান্য সংস্কারের সুফল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরাই বেশি পরিমাণে ভোগ করেছিল। শের শাহ শুধু যোদ্ধা ও সুশাসক নন, সাহিত্যে শিল্পেও তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তারই পৃষ্ঠপোষকতায় মালিক মহম্মদ জয়সী 'পদ্মাবতী' কাব্য রচনা করেন। দিল্লীর পুরানো কেল্লায় তাঁর একটি সুন্দর মসজিদ আছে। সকলেই স্বীকার করেন যে রাজস্ব ব্যবস্থায়, শাসন ও মুদ্রা-সংস্কারে আকবর শের শাহের কাছে অনেকটা ঋণী। শেরশাহ যদিও পাঠান, নিজের কৃতিত্বে তিনি মোগল যুগের মধ্যে থেকে স্থায়ী নাম রেখে গেছেন। সাসারামে তাঁর জন্ম, সাসারামেই তাঁর সুন্দর সমাধি-ভবন। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মধ্যে কেউ কেউ শের-শাহের কৃতিত্বকে কিছু কমানোর চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তিনি যে প্রথম ভারতীয় সুসংস্কারক সম্রাট এবং নানা বিষয়ে আকবরের পূর্বসূরী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

উদার শাসন, সাহিত্য ও শিল্পের প্রতি অনুরাগ

শের শাহের কাছে আকবরের ঋণ

[খ] মুঘল সাম্রাজ্যের প্রসার ও সংহতি সাধন :

আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) : হুমায়ুনের বেগম হামিদা বানুর পুত্র আকবর ১৫৫৬ সালে তেরো বছর বয়সে দিল্লীর বাদশাহ হলেন। তখন তিনি নামে মাত্র পাঞ্জাবের শাসক; আফগান শত্রুদের আক্রমণে তাঁর পৈতৃক রাজ্য বিপন্ন। হুমায়ুন ন'বছর রাজত্ব করে রাজ্যবৃদ্ধি তো দূরের কথা, রাজ্য রক্ষাও করতে পারেননি। আকবর যখন বাদশাহ হন, হিন্দুস্থানে তখন আফগানরা দুর্বল হলেও একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। পাঞ্জাবে সিকন্দর শূর, গুজরাট অঞ্চলে ইব্রাহিম শূর আর হিন্দুস্থানে আদিল শাহ মুঘলদের ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। ১৫৫৬ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি আদিল শাহের হিন্দু মন্ত্রী ও সেনাপতি হিমু আকবরের কর্মচারীদের তাড়িয়ে দিয়ে দিল্লী ও আগ্রা দখল করেন এবং বিক্রমাজিৎ উপাধি নিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

পরিস্থিতি প্রতিকূল

হিমু কর্তৃক দিল্লী ও আগ্রা অধিকার

বৈরাম খাঁ ঃ সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে আকবরের অভিভাবক ছিলেন বৈরাম খাঁ। বৈরাম একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরই কৌশলে ও সাহায্যে আকবর দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৫৫৬) হিমুর নেতৃত্বে হিন্দু-পাঠান সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করেন। যুদ্ধ শেষে আহত হিমুকে বন্দী ও হত্যা করা হয়। তারপর সিকন্দর শুর আত্মসমর্পণ করলে আকবর দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করেন। অল্পদিন পরে আদিল শাহের মৃত্যু হল। এই দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধে ভারতের ভবিষ্যৎ স্থির হয়ে গেল, মুঘল-পাঠান রেষারেষির নিষ্পত্তি হল এবং হিন্দুস্থানে মুঘল সাম্রাজ্য নিষ্কণ্টক হল। বৈরামের চেষ্টায় জৌনপুর এবং গোয়ালিয়রও শীঘ্রই মুঘল রাজ্যভুক্ত হল। ১৫৬০ সাল পর্যন্ত বৈরাম আকবরের অভিভাবক ছিলেন। এই সময়ে তাঁর কর্তৃত্ব বাড়ছে দেখে মুঘল দরবারে এক শক্তিশালী দল তাঁকে সরাবার চেষ্টা করতে থাকে। তার ফলে বৈরাম পদচ্যুত হন কিন্তু মক্কায় যাবার আগেই এক ঘাতকের হাতে তিনি নিহত হন।

দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ ১৫৫৬, ফলাফল

জৌনপুর ও গোয়ালিয়র অধিকার, বৈরাম খাঁর পতন

রাজ্য জয় ঃ আকবর নিজ হাতে শাসনভার নিয়েই রাজ্য জয় ও সাম্রাজ্য গঠনে মন দিলেন। ১৫৬১ সাল থেকে একাদিকক্রমে চল্লিশ বছর ধরে তিনি একটির পর একটি রাজ্যের স্বাধীনতা খর্ব করে নিজ রাজ্যের আয়তন বাড়িয়েছিলেন। তাঁর রাজ্য জয়ের কাহিনীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়—হিন্দুস্থান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত ও দাক্ষিণাত্য। জৌনপুর ও গোয়ালিয়রের পর আকবর মালবের মুসলিম রাজা রাজ বাহাদুরকে হারিয়ে তাঁর রাজ্য দখল করে নেন। রাজস্থানের মার্তা দুর্গটিও মুঘল অধিকারে আসে তারপর ১৫৬৪ খৃস্টাব্দে আকবরের সেনাপতি আসফ খাঁ গণ্ডোয়ানা রাজ্য আক্রমণ করেন। সেখানকার নাবালক রাজা বীর নারায়ণ ও রাজমাতা দুর্গাবতী খুব বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেন কিন্তু প্রাণ দিয়েও স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারলেন না। গণ্ডোয়ানা জয় করে আকবর বহু অর্থ পেয়েছিলেন।

সাম্রাজ্যবাদ, মালব জয়

মার্তা দুর্গ, গণ্ডোয়ান ও রানী দুর্গাবতী

রাজস্থান ঃ চিতোর জয় ঃ আকবর প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন, বীর রাজপুত জাতকে অস্ত্রবলে বশে আনার চেষ্টা না করে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা উচিত। তাই ১৫৬২ সালে অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যাকে তিনি বিবাহ করেন। তারপরে একে একে মাড়বার, বিকানীর, জয়শলমীর, বুন্দির রাজারা স্বেচ্ছায় আকবরের বশ্যতা স্বীকার করে খানিকটা সম্মান ও নিজ নিজ রাজ্যের মধ্যে স্বাধীনতা লাভ করেন। কেউ কেউ আকবরের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করলেন, তাঁর সভাসদ হলেন কিন্তু শিশোদীয় বংশের মেবারের রানা উদয়সিংহ নতি স্বীকার করলেন না। ফলে ১৫৬৭ খৃস্টাব্দে আকবর মেবারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করলেন। তখন উদয়সিংহ চিতোর ছেড়ে

রাজপুত নীতি, রাজপুত রাজাদের বশ্যতা

বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন, মেবারের প্রতিরোধ

উদয়পুরে গিয়ে সেখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে জয়মল্ল ও পুত্ত নামে দুই সাহসী দেশভক্ত সর্দার ৮০০০ সৈন্য নিয়ে শত্রুপক্ষকে বাধা দিলেন। চার মাস অবরোধের পর তাঁরা নিহত হলে রাজপুত সৈন্যরা সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করলেন এবং রমণীরা জহরব্রত পালন করে অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। এইভাবে দুর্ভেদ্য চিতোর দুর্গ মুঘল অধিকারে এল। চিতোর জয়ের পর আকবর রণথম্বোর ও কালঞ্জরের দুর্গ দুটি সহজেই হস্তগত করেন (১৫৬৯)।

চিতোর দুর্গ অধিকার, রণথম্বোর ও কালঞ্জর

এইভাবে রাজস্থানের অধিকাংশই আকবরের করায়ত্ত হয়। যে সব রাজপুত আকবরের আধিপত্য মেনে নিয়ে তাঁকে যুদ্ধ বিগ্রহে ও সাম্রাজ্য গঠনে সাহায্য করেন, তাঁদের মধ্যে রাজা মানসিংহ ও ভগবান দাসের নাম উল্লেখযোগ্য।

মানসিংহ ও ভগবান দাসের সহযোগিতা

কিন্তু রাণা প্রতাপই একমাত্র বীর যিনি মুঘল শক্তির কাছে মাথা নত করেন নি। আকবর চিতোর জয় করেছিলেন, কিন্তু মেবারকে বশে আনতে পারেন নি। রাজা মানসিংহ আকবরের আদেশ নিয়ে প্রতাপের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামলেন। ১৫৭৬ খৃস্টাব্দে হলদিঘাটের সংকীর্ণ গিরি প্রান্তরে উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ বাধে। রানা প্রতাপ পরাস্ত হন।

গুজরাট জয়ঃ ১৫৭২-৭৩ খৃস্টাব্দে গুজরাট জয় আকবরের রাজত্বের একটি প্রধান ঘটনা। প্রথমে আহম্মদনগর অধিকার করে আকবর সুরাট অবরোধ করেন এবং অবশেষে ঐ নগর দখল করেন। গুজরাটে বিদ্রোহ ও অশান্তি থামছে না দেখে আকবর ফিরে আসেন এবং বিদ্রোহ দমন করে গুজরাটকে সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। এই অঞ্চলের রাজস্ব-ব্যবস্থা তিনি সুযোগ্য মন্ত্রী তোডরমলের হাতে ন্যস্ত করেন। এর ফলে আকবরের রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হল। এখানকার বাণিজ্যকেন্দ্র বড় বন্দরগুলি মুঘলদের অধিকারভুক্ত হওয়াতে সাম্রাজ্যের অর্থ সমৃদ্ধি অনেক বেড়ে গেল।

গুজরাট জয়, সুরাট অবরোধ

গুজরাটের রাজস্ব ব্যবস্থা ও তোডরমল, গুজরাট জয়ের ফল

বাঙলা জয়ঃ গুজরাটের পর বাঙলাদেশ। বাঙলায় তখন আফগান সর্দার সুলেমান দাউদ কররানী স্বাধীনভাবে শাসন করছিলেন। কিন্তু তোডরমল ও মুনিম খাঁর পরিচালনায় মুঘল বাহিনীর সঙ্গে তিনি পেরে ওঠেননি। অবশেষে মেদিনীপুরে দাঁতনের অদূরে তুকরোর কাছে আফগান সৈন্যরা সম্পূর্ণ হেরে যায় (১৫৭৫)। তারপর দাউদ রাজমহলের যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত হন। এই সময়ে গৌড়ে ভীষণ মহামারীতে মুঘল সেনাপতি ও অনেক সৈন্য মারা যায়। বঙ্গদেশ মুঘল রাজ্যভুক্ত হল বটে কিন্তু সেখানকার 'বারভূঁইয়া'দের মধ্যে অনেকেই স্বাধীনভাবে চলছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মুঘল শক্তির কাছে পরাস্ত হন। যশোরের রাজা প্রতাপাদিত্যও আকবরের সেনাপতি মানসিংহের কাছে হেরে যান।

বঙ্গ বিজয়

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত ঃ বিহার ও বাঙলায় ব্যাপক বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে আকবরের বৈমাত্র ভাই কাবুলের রাজা মির্জা হাকিম ভারত আক্রমণ করেন, কিন্তু শেষে পিছু হঠতে বাধ্য হন। হাকিমের মৃত্যু হলে কাবুল মুঘল রাজ্যভুক্ত হয়। তারপর দশ বারো বছরের মধ্যে আকবরের সৈন্য-বাহিনী কাশ্মীর, সিন্ধুদেশ, ওড়িশা, বেলুচিস্তান ও কান্দাহার একে একে দখল করে নেয়। কান্দাহার অধিকার সামরিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কারণ নিচের দিকে পারস্য আর উপর দিকে উজবেগ প্রভৃতি দুর্ধর্ষ আফগান দল। মাঝখানে কান্দাহার প্রদেশ কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ মুঘল সাম্রাজ্যের সীমান্ত রক্ষা করছে। আকবর কাবুল-কান্দাহার থেকে আসাম-সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। উত্তরে হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলটি ছিল তাঁর রাজ্যসীমা। ভবিষ্যতে বিদ্রোহ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি আটক এলাহাবাদ প্রভৃতি প্রধান জায়গাগুলিতে দুর্গ তৈরি করে রাখেন।

মির্জা হাকিমের আক্রমণ, কাবুল জয়

কাশ্মীর, ওড়িশা, বেলুচিস্তান ও কান্দাহার

সাম্রাজ্য সীমা

দাক্ষিণাত্য ঃ উত্তর ভারত জয় সমাধা করে আকবর দাক্ষিণাত্যের রাজ্যগুলির দিকে মন দিলেন। বিনাযুদ্ধে বশ্যতা স্বীকার করাতে না পেরে তিনি বলপ্রয়োগই স্থির করলেন। আহম্মদ নগরের রাণী চাঁদবিবি মুঘল সৈন্যদের প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন কিন্তু সফল হননি। শেষে বেরার প্রদেশ ছেড়ে দিয়ে সন্ধি করেন। এরপর খান্দেশ রাজ্য আক্রমণ করা হলে রাজধানী বুরহানপুর আত্মসমর্পণ করল এবং পরের বছর খান্দেশের দুর্ভেদ্য দুর্গ আসিরগড় আকবরের হস্তগত হল (১৬০১)। এইভাবে চল্লিশ বছরের উপর দীর্ঘকাল আকবর রাজ্যজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। ছলে বলে কৌশলে ভারতের অধিকাংশ তিনি একশাসনে এনে রাষ্ট্রের ঐক্য সাধন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা।

বল প্রয়োগের নিদর্শন, আহমদ নগর, খান্দেশ

আসিরগড় দুর্গ, অধিকার, ১৬০১

আকবরের উদার নীতি ঃ আকবরের রাজত্বের ইতিহাস শেষ করার আগে তাঁর সম্বন্ধে আরও কিছু বলতে হবে। কেননা, আকবর কেন ও কিসে বড়, তাঁকে 'গ্রেট মোগল' বলা হয় কী জন্য, তা আমাদের জানা উচিত। আকবর অনেক রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এ কথা সত্য। কিন্তু শুধু যোদ্ধা ও বিজেতা বলেই তাঁর পরিচয় নয়। শাসক ও মানুষ হিসেবে তাঁর চরিত্র ও কৃতিত্ব না বুঝলে, মুঘল যুগের ইতিহাসই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। প্রকৃতপক্ষে আকবরই মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা। ভারতে সাম্রাজ্যের ভিত্তি মজবুত করতে হলে হিন্দু-মুসলমান সকল প্রজারই সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া দরকার, এই কথা তিনিই প্রথম বুঝেছিলেন। পাঠান সুলতানরা দেশ শাসন করেছিলেন বিজেতা শাসক হিসেবে। আকবরের

সাম্রাজ্য হল ভারতীয়। সকল জাতের মানুষ তাঁর কাছে সমান সুবিচার পাবে, স্বধর্ম পালন করবে, এই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। হিন্দু প্রজা ও রাজপুত রাজাদের প্রতি তিনি এই জন্য উদার নীতি অনুসরণ করেন। তিনি হিন্দুদের উপর জিজিয়া ও তীর্থযাত্রী কর বন্ধ করে দেন এবং অনেক হিন্দুকে উচ্চ রাজপদে নিযুক্ত করেন। সাম্রাজ্যের স্বার্থের জন্য আকবর এই সব কাজ করেছিলেন, এ কথা সত্য। তবু স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর যথেষ্ট রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল। পৌত্র আওরঙজীবের এই উদারতা ও দূরদৃষ্টি ছিল না বলেই তাঁর ব্যর্থতা।

উদারপন্থী আকবর

ধর্মমত ঃ আকবর লেখাপড়া জানতেন না কিন্তু তাঁকে অশিক্ষিত বলা যায় না। তিনি পণ্ডিতদের আহ্বান করে তাঁদের সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন। এই জ্ঞানের স্পৃহা এবং স্বাভাবিক তীক্ষ্ম বুদ্ধির বলে তাঁর মনের প্রসার বেড়েছিল। এই জন্য ধর্মের ব্যাপারে তাঁর কোনও গোঁড়ামি ছিল না। ফতেপুর সিক্রিতে তিনি সেখানে বসে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, পার্শী, খৃস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের পণ্ডিতদের তর্ক-বিতর্ক শুনতেন, তার নাম ইবাদৎখানা। তিনি মনোযোগ দিয়ে সেই আলাপ-আলোচনা শুনে সকল ধর্মের সার-কথা বুঝে নিতেন। এইভাবে তাঁর এক উদার মনোভাব তৈরি হয় যার ফলে তিনি 'দীন ইলাহি' নামে একটি নতুন ধর্মমত প্রবর্তন করেন। সেই সঙ্গে তিনি নিজেকে ধর্মের ব্যাপারে প্রধান বিচারকর্তা বলে ঘোষণা করেন। এই ধর্মমত সম্রাট ও তাঁর কয়েকজন বন্ধু ও পার্শ্বচর ছাড়া আর কেউ গ্রহণ করেননি। কেউ কেউ বলেন যে আকবর ইদানীং ইসলাম ধর্ম মানতেন না। কিন্তু এ কথা সত্য নয়, কারণ আকবর নিজেই বলেছেন যে ইসলামের সত্য প্রচার ও আল্লার অসীম গৌরব প্রকাশ করাই তাঁর অন্তরের কামনা। আসল কথা, নানা সম্প্রদায়ের জ্ঞানী ও গুণীদের সঙ্গে আলাপ করে তাঁর মন থেকে সংকীর্ণতা দূর হয়, একটি উদার ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করার ইচ্ছা জাগে। আকবর সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান দেখাতেন, গোঁড়া মুসলমান সমাজ তাঁর এই আচরণকে ভালো চোখে দেখেনি। কিন্তু আকবর ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেছিলেন, এ কথা বলা যায় না। আধুনিক ঐতিহাসিকদের মতে, দীন ইলাহি ইসলাম বিরোধী নবধর্ম ছিল না। স্বাধীন ও জিজ্ঞাসু মন বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টাকে সমালোচকরা স্বধর্মত্যাগ বলে সন্দেহ করেন। ইংলণ্ডের অষ্টম হেনরীর ন্যায় আকবর নিজেকে ইসলামের ও মুসলিম আইনের চরম ব্যাখ্যাতা বলে ঘোষণা করেছিলেন। তাই সংকীর্ণমনা উলেমাদের সন্দেহ হয় যে, সম্রাট হয়তো নিজেকে ধর্ম ও আইনের ঊর্ধ্বে স্থাপন করতে চান। ভিনসেণ্ট স্মিথও আকবরকে ধর্মত্যাগী বলে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ এই প্রসঙ্গে

ইবাদৎ খানা

দীন ইলাহি

আকবর ও ইসলাম

গোঁড়া মুসলমান সমাজের বিরোধিতা

আকবর নিজেই বলেছেন, ইসলামের সত্য প্রচার ও আল্লার অসীম গৌরব প্রকাশ তাঁর অন্তরের কামনা।

শাসন-সংস্কার ঃ শাসন সংস্কারে আকবর অনেকগুলি নতুন ও ভালো ব্যবস্থা করেছিলেন। সুশাসনের জন্য তিনি তাঁর সাম্রাজ্যকে পনেরোটি প্রদেশে বা সুবায় বিভক্ত করেন, যেমন—কাবুল, লাহোর, মুলতান, দিল্লী, আগ্রা, অযোধ্যা, এলাহাবাদ, আজমীর, মালব, গুজরাট, বিহার, বাঙলা এবং দাক্ষিণাত্যের খান্দেশ, আহমদনগর ও বেরার। সুবাগুলি আবার কতকগুলি সরকার ও পরগনায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সুবার শাসনভার ছিল সুবাদারের উপর। আবুল ফজলের বই আইন-ই-আকবরীতে সুবাদার ও তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীদের (দেওয়ান, সিকদার, ফৌজদার, কাজী, মীর আদল, আমিন, কানুনগো ইত্যাদি) ও তাঁদের দায়িত্বের কথা লেখা আছে। রাজ্যের সর্বময় কর্তা ছিলেন সম্রাট, তবে কেন্দ্র সরকার চালানোর জন্য অন্যান্য উচ্চ রাজকর্মচারী নিযুক্ত ছিলেন যথা—ভকিল, উজীর, মীর বক্‌সী, সদর প্রভৃতি। এই সব মন্ত্রী, অমাত্য ও আমলাদল বিভিন্ন বিভাগে সরকারী কাজ করে যেতেন।

সুবা বিভাগ, সরকার ও পরগনা, সুবেদার

সিকদার ও ফৌজদার, কেন্দ্রীয় সরকার

আকবরের মন্ত্রী রাজা তোডরমল শের শাহের ব্যবস্থামত রাজস্ব বিভাগের সংস্কার করেন। দেশের সমস্ত জমি জরিপ করানো হয়। কৃষির জমি চারটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, যথা—পোলাজ, পরান্তি, চাচর ও বান্‌জর। প্রথম তিন শ্রেণীর প্রত্যেকটিকে আবার ফসল ও উর্বরতা অনুযায়ী তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়। তারপর উৎপন্ন শস্যের গড়ে তিন ভাগের এক ভাগ রাজস্ব ধার্য করা হয়। উৎপন্ন দ্রব্যে অথবা নগদ টাকায় প্রজারা খাজনা দিতে পারত। 'ক্রোরী'রা তা আদায় করতেন এবং রাজকোষে জমা দিতেন। শস্যের দর ঠিক করবার জন্য উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যতালিকা রাখা হত। সুব্যবস্থার ফলে সে সময় রাজস্বের পরিমাণ ছিল বছরে তিরিশ থেকে চল্লিশ কোটি টাকা। আকবরের আমলে তিন রকম ভূমিব্যবস্থা ছিল—খাস, জায়গীর ও জমিদারী। তোডরমলের নানা পরীক্ষা ও সংশোধনের পর আকবরী রাজস্ব-বিভাগের দৃঢ় প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা সমালোচকদের কাছেও বহু প্রশংসা পেয়েছে। এ বিষয়ে আকবর যেমন শের শাহের কাছে ঋণী, পরবর্তী ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীও তেমনি আকবরী প্রথার অনেকাংশই গ্রহণ করেছেন। রাজস্বের যে হার উচ্চ ছিল, আইন-ই-আকবরীতে তা স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু রাজস্ব-নির্ধারণ ও আদায়ের সময় প্রজাদের স্বার্থ ও নিরাপত্তা যে অবহেলিত হয় নি, তার প্রমাণ সরকারী কর্মচারীদের উপর নানা রূপ নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞার প্রবর্তন।

রাজস্ব বিভাগের সংস্কার, কৃষিজমির শ্রেণী বিভাগ ও রাজস্ব হার

তোডরমলের পরীক্ষা-মূলক সংস্কার

আকবর সৈন্যবিভাগেরও আমূল সংস্কার করেন। তিনি জমিদারী সৈন্য আর বাদশাহী সৈন্য, দুটি বিভাগ আলাদা করে দেন। যাতে সেনাবিভাগে দুর্নীতি না ঢোকে, রাজ্যের অর্থক্ষতি না হয়, সে দিকে তাঁর কড়া নজর ছিল। তিনি জায়গীর-প্রথার বদলে মনসবপ্রথা চালু করেন। দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে এক একটি দল বা মনসব গঠন করা হয়। নায়কদের বলা হত মনসবদার। সাধারণতঃ রাজবংশের লোক এবং রাজপুত রাজারা উচ্চপদস্থ মনসবদার নিযুক্ত হতেন। আগে সৈন্য ও সেনাপতিরা জমি ও জায়গীর পেতেন, এখন থেকে মনসবদাররা পদমর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট বেতন পেতে লাগলেন। জমির স্বত্বভোগী, অলস জায়গীরদারের বদলে যোগ্য ও কর্মঠ মনসবদার সৃষ্টি করাই ছিল আকবরের উদ্দেশ্য। এ ছাড়া, তাঁর বন্দুকধারী সৈন্যদল, যুদ্ধহস্তী ও অনেক রণতরী ছিল।

জায়গীরদারের বদলে মনসবদার

শিল্প ও সাহিত্য ঃ আকবর শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁর আমলে অনেক সুন্দর প্রাসাদ, অট্টালিকা ও দুর্গ তৈরি হয়। স্থাপত্য-শিল্পে ফতেপুর সিক্রির বিশাল প্রাসাদ আকবরের শ্রেষ্ঠ কীর্তি। লালপাথরে তৈরি আকবরের এই নির্জন প্রাসাদ-নগরীর শোভা ও গাম্ভীর্য সত্যই অতুলনীয়। অদূরে বাবরের যুদ্ধক্ষেত্র—খানুয়ার প্রান্তর। সম্মুখে বিরাট চওড়া উঁচু সিঁড়ি, তারই উপর বিস্ময়কর বিশাল প্রবেশতোরণ—বুলন্দ দরওয়াজা। তোরণের ভিতর দিয়ে দেখা যায় বাঁ দিকে জামি মসজিদ, সামনের চত্বরে সাধু সেলিম চিস্তির সুন্দর সমাধি, আরও পিছনে শূন্য রাজকক্ষ ও অন্দরমহল। ফতেপুর সিক্রির ফাঁকা চেহারা সম্রাটের বিপুল পরিকল্পনা ও তার ব্যর্থতার সাক্ষী হয়ে আছে। দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধি-সৌধ, আগ্রার কেল্লা, এ সবই আকবরের সময়ে তৈরি হয়। আকবরের নিজের সমাধি রয়েছে আগ্রা শহরের কাছেই, সিকান্দ্রায়। এ সমস্তই লালপাথর দিয়ে গড়া, যে সব জায়গায় শাদা মার্বেল পাথরের কাজ সেগুলি শাহজাহান পরে যোগ করেছিলেন।

ফতেপুর সিক্রি

স্থাপত্য

প্রাচীন হিন্দু রাজাদের মত আকবরের একটি 'নবরত্ন' সভা ছিল—'নওরতন দরবার'। গুণী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মন্ত্রী আবুল ফজল, তাঁর ভাই ফৈজী ও খান-খানান। হিন্দু সভাসদদের মধ্যে রাজা মানসিংহ, তোডরমল, সুরসিক রাজা বীরবল এবং বিখ্যাত সঙ্গীতকার মিঞা তানসেন। এই সময়ে চিত্রশিল্পে 'মুঘল চিত্রকলা' নামে পরিচিত ছবি আঁকার একটি নতুন পদ্ধতির বিকাশ দেখা যায়। ইতিহাসের দলিল হিসেবে আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা' খুবই মূল্যবান। তা ছাড়া কবি ফৈজী, এমন কি গোঁড়া মুসলিম বদাওনি পর্যন্ত অনেক সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন। আকবরের আমলে বিখ্যাত ভক্ত কবি তুলসীদাস 'রামচরিতমানস' নামে হিন্দী রামায়ণ রচনা করেন, যা সারা

সঙ্গীত, চিত্রকলা

ইতিহাস, সাহিত্য

ভারতে আজও লোকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে। আর এক হিন্দী কবি সুরদাস তাঁর মধুর কবিতা রচনা করেন। এই সময় বৈরাম খাঁর ছেলে আবদুর রহিমও হিন্দী কবি হিসেবে নাম করেন। আর বাঙলা দেশেও এই আমলে বৈষ্ণব সাহিত্যের প্রসার হয়। 'চৈতন্যচরিতামৃত' গ্রন্থের লেখক কৃষ্ণদাস কবিরাজ আর নরহরি কবিরাজও এ যুগেরই মানুষ।

আকবর সম্বন্ধে যেসব কথা বলা হল, তা থেকে বুঝতে পারবে আকবর শুধু ভারতে নয়, মধ্যযুগের পৃথিবীর ইতিহাসেও এক সম্মানিত স্থান পেয়েছেন। তাঁর দৈহিক শক্তি, মনের সাহস ও পরিশ্রম করার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। ইউরোপীয় পাদ্রীদের বর্ণনা থেকে জানা যায়, তাঁর বলিষ্ঠ শরীর, চওড়া কপাল, সুগঠিত নাক, ঠোঁটের উপরে একটি তিল এবং আশ্চর্য উজ্জ্বল চোখ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তিনি দরকার মত ধূর্ত ও নিষ্ঠুর হতে পারতেন কিন্তু তাঁর স্বভাবে যথেষ্ট দয়া ও ক্ষমাশীলতা ছিল। বিদ্রোহী ও শত্রু অনুতাপ করলে তিনি সহৃদয় ব্যবহার করতেন। আকবরের চরিত্রে অনেক গুণ ছিল যেমন, ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, রাজনীতিতে বিচক্ষণতা, হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে প্রভেদ না করে রাজ্যশাসন, প্রশাসন সংস্কার, শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ এবং সবচেয়ে বড় গুণ, একটি সর্বভারতীয় মনোভাব। তাই পণ্ডিত নেহেরুর মতে আকবরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা চলে। শুধু হিন্দু-মুসলমান মিলনের বাণী প্রচার করেই তিনি ক্ষান্ত হন নি; সমগ্র ভারতবর্ষকে একসূত্রে গ্রথিত করে তিনি দেশের রাষ্ট্রীয় ঐক্যের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। মুসলমান হলেও তিনি হিন্দু সমাজের কয়েকটি কুপ্রথা নিবারণের চেষ্টা করেন, যেমন সতীদাহ, গঙ্গাসাগরে সন্তান-বিসর্জন। এছাড়া, রবিবারে পশুহত্যা, যুদ্ধবন্দীদের ক্রীতদাস করার প্রথা এবং অপরাধীদের হাত-পা কেটে দেওয়া নিষেধ করে দেন। তবে আকবরের শেষ জীবন নানা অশান্তি দেখা দেয়। প্রায় পঞ্চাশ বছর রাজত্বের পর ১৬০৫ খৃস্টাব্দে আকবরের মৃত্যু হয়।

চরিত্র ও কৃতিত্ব, উদারতা

শিল্পকলার প্রতি অনুরাগ

জাতীয়তাবাদের জনক, কুপ্রথা নিবারণ, মৃত্যু, ১৬০৫

[তিন] জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান :

জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭ খৃঃ): ১৬০৪ খৃীস্টাব্দে সেলিম জাহাঙ্গীর নাম নিয়ে সিংহাসনে বসেন। ১৬১১ খৃীস্টাব্দে জাহাঙ্গীর পারস্যদেশের মির্জা গিয়াসের বিধবা কন্যা মেহেরুন্নিসাকে বিবাহ করেন। বিবাহের পর তিনি নূরজাহান (জগতের আলো) নামে পরিচিত হন। নূরজাহান অত্যন্ত বুদ্ধিমতীও চতুর ছিলেন। তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষার সীমা ছিল না, তাই জাহাঙ্গীরের শাসনকালে নূরজাহানের প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়। জাহাঙ্গীর সুরাপানে দুর্বলচিত্ত

সিংহাসনে আরোহণ, ১৬০৫, বিবাহ ১৬১১, নুরজাহানের প্রতিপত্তি

ও বিলাসী ছিলেন, সুতরাং রাজমহিষী নূরজাহানই রাজ্যের আসল কর্ত্রী হয়ে ওঠেন। শেষ দিকে তাঁর ক্ষমতা ও খ্যাতির নষ্ট হয়। জাহাঙ্গীর উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মুঘল শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করেন। তাঁর তৃতীয় পুত্র খুরম মেবার আক্রমণ করলে প্রতাপের ছেলে রানা অমরসিংহ সন্ধি করে মোঘলদের বশ্যতা স্বীকার করেন। দাক্ষিণাত্যেও রাজপুত্র খুরম আহম্মদনগর জয় করেন। তাতে 'জাহাঙ্গীর' খুব খুশী হয়ে খুরমকে 'শাহজাহান' উপাধিতে ভূষিত করেন। এদিকে নূরজাহান গোপনে চেষ্টা করেছিলেন যাতে জাহাঙ্গীরের কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়র সিংহাসন পান। নূরজাহানের চক্রান্ত বুঝতে পেরে শাহজাহান বিদ্রোহী হন। সম্রাটও নূরজাহান উভয়েই লাহোরে বন্দী হন এবং সেখানেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় (১৬২৭)।

উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে মুঘল শক্তি বৃদ্ধি, অমর সিংহের বশ্যতা, শাহজাহানের বিদ্রোহ, জাহাঙ্গীর ও নূরজাহান বন্দী



জাহাঙ্গীর

ইউরোপীয় বণিকদের প্রতি জাহাঙ্গীরের নীতিঃ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে মুঘল ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্য সম্পর্ক আরম্ভ হয়। পোর্তুগীজরা এ দেশে ইতিপূর্বেই ব্যবসা করছিলেন। ১৬০৯ খৃস্টাব্দে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে **ক্যাপ্টেন হকিন্স** বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধার জন্য মুঘল দরবারে আসেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমস **স্যার টমাস রো**-কে দূত হিসাবে আগ্রায় পাঠিয়েছিলেন। এ সময়ে নূরজাহান আর পোর্তুগীজদের চক্রান্তেই ইংরেজদের যথেষ্ট অসুবিধা হয়। খুরমের সাহায্যে ইংরেজ রাজদূত জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে বিনা শুল্কে বাণিজ্যের সুযোগ পেয়েছিলেন। তাতে ইংরেজদের কুঠি নির্মাণের অধিকার দেওয়া হয়। স্যার টমাস রো একাধিকবার দরবারে আমন্ত্রিত হন। সেখানে বিলাস-ব্যসন ও মদ্যপানের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছেন যে সম্রাট মোটের উপর ভালো লোক, অমায়িক ও বুদ্ধিমান। তাঁকে তুলাদণ্ডে বসিয়ে ধনরত্নের পাল্লার সঙ্গে ওজন করে

ক্যাপ্টেন হকিন্স, স্যার টমাস রো

বিনাশুল্কে বাণিজ্য অধিকার ও কুঠি নির্মাণের অধিকার

বিশিষ্ট উৎসবের দিনে যে সব বিতরণ করা হত। জাঁকজমক আড়ম্বরে ত্রুটি ছিল না। কিন্তু এত ঐশ্বর্য সত্ত্বেও, কৃষকদের অবস্থা দরিদ্রই ছিল এবং প্রদেশগুলিতে শাসন তেমন দৃঢ় ছিল না। যাই হোক, তিনি চার বছর মুঘল দরবারে ছিলেন। তাঁর এই সুলিখিত ভারতবিবরণী থেকে মুঘল যুগের অনেক দরকারী কথা জানতে পারা যায়।

টমাস রোর বিবরণ

জাহাঙ্গীরের চরিত্রে এক সঙ্গে কঠোরতা ও ভদ্রতা, শুভবুদ্ধি ও খামখেয়াল দেখা যায়। ন্যায় বিচারের জন্য তিনি সুনাম অর্জন করেন। সাহিত্য ও চিত্রশিল্পে তাঁর অনুরাগ ছিল। তিনি ভাল ছবি আঁকতে পারতেন এবং তাঁর সাহিত্যক্ষমতার ভালো নমুনা হল তাঁর আত্মজীবনী বা 'তুজুক'। চরিত্রের দুর্বলতা, অতিরিক্ত মদ্যপান ও বিলাসপ্রিয়তার দোষে জাহাঙ্গীর কর্তৃত্ব হারিয়ে নূরজাহানের করতলগত হয়ে পড়েন। তা ছাড়া জাহাঙ্গীরের সময়েই ইংরেজ বণিক-সম্প্রদায় অদূরদর্শী মুঘল অনুগ্রহে ভারতে প্রথম শিকড় গেড়ে বসে।

সাহিত্য ও চিত্রশিল্পের প্রতি অনুরাগ

শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮): জাহাঙ্গীরের হিন্দু পত্নী যোধপুরী বেগমের পুত্র শাহজাহান ১৬২৮ খৃস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। মুঘল সাম্রাজ্যের ইতিহাসে শাহজাহানের রাজত্বকাল একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। তখন মুঘলদের গৌরবকাল। শাহজাহান প্রথম বুন্দেলখণ্ডের জুঝর সিং ও তার পরে দাক্ষিণাত্যের ভূতপূর্ব শাসনকর্তা বিদ্রোহী খাতজাহান লোদীকে সহজেই দমন করেন। এর পরে শাহজাহান 'নওরোজ' নামে একটি বড় উৎসব অনুষ্ঠান করে। কিন্তু ঐ বছরেই গুজরাটে এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় (১৬৩০) এবং তাতে বহু লোকের প্রাণহানি ঘটে। সে সময় দুর্ভিক্ষ নিবারণের ভালো ব্যবস্থা ছিল না। ১৬৩১ সালে সম্রাটের প্রিয় মহিষী মমতাজ বেগমের মৃত্যু হলে তিনি গভীর শোক পেয়েছিলেন।

মুঘল যুগে এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায়



শাহজাহান

এদিকে বাঙলায় তখন পোর্তুগীজ জলদস্যুদের রীতিমত উৎপাত চলছিল। এই 'ফিরিঙ্গী'র দল লুঠতরাজ, খুন-জখম করে বেড়াত, লোকদের ধরে নিয়ে ক্রীতদাসের মত বিক্রি করত। হুগলীতে ছিল পোর্তুগীজদের কুঠি। জলদস্যুরা ঐ ঘাঁটির সঙ্গে যোগাযোগ রাখত। তা ছাড়া পোর্তুগীজরা ব্যবসায় অন্যায় রকম ফাঁকি দিত, দেশী লোকদের উপর জুলুম করত। এই সব অত্যাচারে বিরক্ত হয়ে

সম্রাট হুগলীতে তাদের কুঠি দখল করার আদেশ দেন। ১৬৩২ সালে বাঙলার ফৌজদার কাশিম খাঁ হুগলী অধিকার করেন এবং তিন মাসের মধ্যে অনেক পোর্তুগীজকে বন্দী করে আগ্রায় পাঠিয়ে দেন। এর পর তারা ব্যাণ্ডেল-হুগলী অঞ্চল ছেড়ে অনেক দক্ষিণে হিজলীতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৫১ সালে ইংরেজ বণিকেরা তখন হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে বসে গেলেন।

পোর্তুগীজদের প্রতি নীতি

রাজ্যবিস্তার ঃ শাহজাহান ১৬৩৩ খৃস্টাব্দে আহম্মদনগর পুরোপুরি দখল করেন। কিন্তু তার ফলে দাক্ষিণাত্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য দুটি বাদশাহের বিরুদ্ধে দাঁড়ালে সম্রাট অনেক সৈন্য নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। গোলকুণ্ডার সুলতান তখন ভয় পেয়ে নতি স্বীকার করলেন। বিজাপুরের সুলতানও বাদশাহের সঙ্গে আপস করতে বাধ্য হলেন। ১৬৩৬ খৃস্টাব্দে সন্ধির সর্ত অনুসারে এই দুটি রাজ্যে মুঘল আধিপত্য স্বীকৃত হল। বিজাপুরের সুলতান কথা দিলেন যে ভবিষ্যতে তিনি মারাঠা দলপতি শাহজীকে সাহায্য দেবেন না আর মারাঠা সৈন্যদের সাহায্যও নেবেন না। এইখানে জেনে রাখো, শাহজাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙজীব মাত্র ১৮ বছর বয়সে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। সম্রাটের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি খুব দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখান। দাক্ষিণাত্যে, দৌলতাবাদ, তেলিঙ্গানা, খান্দেশ ও বেরার, এই চারটি সুবায় তখন অনেক দুর্গ ছিল। রাজস্বের আয় ছিল পাঁচ কোটি টাকা। কিন্তু লোভী অত্যাচারী কর্মচারীদের দাপটে এক কোটি টাকার বেশি জমা হত না। যা টাকা উঠত, বেশির ভাগ খরচ হয়ে যেত সৈন্যদের ভরণপোষণে। রাজস্বের উপর এই চাপ ও কৃষকদের অবনতির কথা আওরঙজীব তাঁর পিতাকে পরিষ্কার জানিয়েছিলেন।

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

আওরঙ্গজীব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল আর মধ্য এসিয়ার দিকে মুঘল অধিকার বিস্তারের চেষ্টা শাহজাহানের রাজত্বকালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। কিন্তু শাহজাহান তিন তিন বার (১৬৪৯, ১৬৫২ ও ১৬৫৩ সালে) চেষ্টা করেও কান্দাহার দখলে আনতে পারেন নি। মুঘল বাহিনীর পরাজয়ে কান্দাহার পারস্যের অধিকারেই থেকে গেল। ও দিকে দূর মধ্য এসিয়ায় বল্‌খ ও বদক্‌সান জয় করার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। শেষ পর্যন্ত ঐ দুটি প্রদেশ উজবেগদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়। কান্দাহার ও মধ্য এসিয়ার অভিযানে বহু লোকক্ষয় এবং অজস্র অর্থ ব্যয় হয়। কোটি কোটি টাকা খরচ করেও কোন ফল হয়নি। আর একটি কথা। বিজাপুর গোলকুণ্ডার দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে শাহজাহানের রাজত্বের শেষ দিকে মারাঠা জাতির অভ্যুদয় হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত

মুঘল সামরিক শক্তি হ্রাস, মারাঠাদের অভ্যুদয়

শিল্পকলা ঐশ্বর্য ঃ শিল্পকলার অসামান্য উন্নতির জন্য শাহজাহানের

শাসনকাল ইতিহাসে বিখ্যাত। কোটি কোটি টাকা খরচ করে সম্রাট রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক ইমারত তৈরি করান। তাঁর আমলে মর্মরনির্মিত সৌধগুলির কারুকার্য ও সৌন্দর্য অনেক বেশি। দিল্লীতে শাহজাহানাবাদ নাম দিয়ে তিনি যে নতুন দুর্গপ্রাসাদ তৈরি করান, তাকেই লালকেল্লা বলা হয়। তার মধ্যে দেওয়ান-ই-খাস ও দেওয়ান-ই-আমের শিল্পকাজ অতি সূক্ষ্ম ও সুন্দর। শ্বেত পাথর ও সোনা রুপায় তৈরি এই দুটি হর্ম্য শোভায় ঝলমল করত। তা দেখে বিদেশীরা চমৎকৃত হয়েছিলেন। দেওয়ান-ই-খাসের মাঝখানে ছিল ময়ূর সিংহাসন (তখ্‌ত-ই-তাউস)। দরবারে বসবার জন্য এই সিংহাসন অজস্র হীরা জহরত এবং এক লক্ষ তোলা সোনা দিয়ে তৈরি করান হয়। এই বিচিত্র আসনের চারদিকে বারোটি স্তম্ভ, আর মাথার উপরে ছিল সোনার চাঁদোয়া। প্রত্যেক স্তম্ভের উপর এক জোড়া রত্নখচিত ময়ূর। শাহজাহানের মৃত্যুর অনেক পরে পারস্যের নাদির শাহ ভারত আক্রমণ করে এই সিংহাসন নিয়ে চলে যান। এখন তার কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না। আগ্রার বিখ্যাত মোতি মসজিদ আর এক অপূর্ব শিল্পকীর্তি। তবে শাহজাহানের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল আগ্রার যমুনার ধারে তাজমহল। মমতাজের সমাধি-সৌধ জগতের অন্যতম বিস্ময়। পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাইশ বছর ধরে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নানা রকম পাথর ও মণি-মাণিক্য আনিয়ে এই শ্বেত পাথরের সৌধ নির্মাণ করা হয়। এর নক্‌সা তৈরি করেন সিরাজ-নিবাসী ওস্তাদ ঈশা খাঁ, তবে গঠনের সময় হিন্দু মুসলমান শিল্পী ও কারিগর একত্র কাজ করেছিলেন।

মর্মর সৌধ, দিল্লী আগ্রা

শাহজাহানের রাজত্বকালকে মুঘল সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ বলা হয়। তার কারণ, রাজভাণ্ডারে অর্থের অভাব ছিল না। দেশের লোকই সেই অর্থ জুগিয়েছে এবং বাদশাহ তাঁর ভাণ্ডার থেকে ঐশ্বর্য ঢেলে দিয়েছিলেন রাজদরবারের জাঁকজমকে। অবশ্য তিনি শিল্পকলার সমঝদার ছিলেন। আগ্রা, দিল্লী, আজমীর, লাহোর ও শ্রীনগর প্রভৃতি শহরে শাহজাহানের সে সব শিল্পকীর্তির নমুনা আছে, তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, সে আমলে কতটা ঐশ্বর্য ও আড়ম্বর ছিল। সম্রাট নিজে চিত্রশিল্পের অনুরাগী ছিলেন এবং পণ্ডিত ও লেখকদের সমাদর করতেন। তাঁর আমলে কয়েকজন নাম করা লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী, এনায়েৎ খাঁ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেন। সম্রাটের প্রিয় জ্যেষ্ঠপুত্র হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত দারা শিকোহ্‌ বিভিন্ন সংস্কৃতশাস্ত্র ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। এ যুগের আশ্চর্য শিল্পকলার বিকাশ দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলার সাক্ষ্য দেয়। বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে দেশের সমৃদ্ধি ও ঐশ্বর্য বৃদ্ধি পেয়েছিল।

বাদশাহী ঐশ্বর্য

চিত্রশিল্প, ইতিহাস

কিন্তু ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের আড়ালে নিম্নস্তরের দারিদ্র্য ঢাকা পড়েনি। সমসাময়িক য়ুরোপীয় পর্যটকদের লেখায় ও ইংরেজ কুঠিগুলির নথিপত্রে জানা যায় যে কৃষকরা উৎপীড়িত হত, প্রাদেশিক শাসকরা অত্যাচারী ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন।

দুর্ভিক্ষ নিরোধের সুব্যবস্থা ছিল না, রাজ্যবিস্তারের চেষ্টাতেও অজস্র অর্থব্যয় হয়েছিল। তা ছাড়া, গোঁড়া মুসলমান শাহজাহান পিতামহ আকবরের ধর্মবিষয়ে উদারনীতিও পরিত্যাগ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্যের শিয়াপন্থী মুসলিম রাজ্যগুলিকে তিনি উচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন। এতে মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষতি হয়। শাসন-ব্যাপারে অনেক ক্ষেত্রে তিনি নিষ্ঠুরতা ও হিন্দু-বিদ্বেষের পরিচয় দিয়েছিলেন। তা ছাড়া শাহজাহানের আমলে মুঘল সৈন্যশক্তির কিছু অবনতি লক্ষ্য করা যায় এবং ভারতের মাটিতে ইংরেজদের পদক্ষেপ বন্ধ করা যায়নি। সুতরাং বাইরে থেকে যাকে চরম উন্নতি বলে মনে হয়, তারই মধ্যে ভবিষ্যৎ ধ্বংসের বীজ নিহিত ছিল।

ঐশ্বর্যের আড়ালে,সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য

ভবিষ্যৎ ধ্বংসের বীজ নিহিত

[ঘ] আওরঙজীব মারাঠা অভ্যুদয় ও শিবাজী :

আওরঙজীব (১৬৫৮-১৭০৭ খ্রীঃ) : ১৬৫৭ সালে শাহজাহান অসুস্থ হয়ে পড়াতে তাঁর চার ছেলের মধ্যে উত্তরাধিকার নিয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হয়। জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা গুণবান ও সুপণ্ডিত, কিন্তু শাসকের যোগ্যতা তাঁর ছিল না। মধ্যম পুত্র সুজা ছিলেন বাঙলার সুবাদার, বিলাস প্রিয় ব্যক্তি। কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদ সাহসী. কিন্তু মদ্যপায়ী ও অসংযত। এ অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের শাসন কর্তা, রাজ নীতিতে অভিজ্ঞ ও ধুরন্ধর তৃতীয় পুত্র আওরঙজীব কুট কৌশলে আগ্রা অধিকার করে সিংহাসন লাভ করলেন। দারার ছেলে সুলেমান ও রাজা জয়সিংহের অধীনে সম্রাটের সৈন্যদল সুজাকে পরাস্ত করলে তিনি পালিয়ে যান। ইতিমধ্যে আওরঙজীব সরল মুরাদকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে স্বপক্ষে আনেন ও উভয়ে মিলে সম্রাট সৈন্যকে ধর্মৎ পুরের যুদ্ধে পরাস্ত করেন। তারপর আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়ে তিনি সমুগড়ের যুদ্ধে দারাকেও হারিয়ে দেন। তখন বৃদ্ধ পিতাকে বন্দী করে আলমগীর উপাধি নিয়ে আওরঙজীব সিংহাসনে বসেন (১৬৫৮ খ্রীঃ)। সম্রাট বর্তমানেই তিনি সম্রাট হলেন। তাই তাঁর দুবার অভিষেক হয়. একবার ১৬৫৯ সালে আর দ্বিতীয় বার শাহজাহানের মৃত্যুর পর ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দে।

উত্তরাধিকার যুদ্ধ, বন্দী শাহজাহান



আওরঙজীব

আওরঙজীবের সিংহাসন লাভ

ইতিমধ্যে এলাহাবাদে সুজা আওরঙজীবের কাছে হেরে গিয়ে আরাকানে আশ্রয় নেন এবং সেখানেই মারা যান। আর দারা আজমীরের কাছে শেষ বারের মত পরাস্ত হয়ে আওরঙজীবের কবলে পড়েন। নানা অজুহাতে মুরাদ ও দারার প্রাণদণ্ড হল। দারার দুই ছেলেকেও মেরে ফেলা হয়। এই বিষময় ভ্রাতৃযুদ্ধের পরে আওরঙজীব নিষ্কণ্টক হলেন।

সুজার পরাজয় মৃত্যু মুরাদ ও দারার প্রাণদণ্ড

১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বার অভিষেকের পর আওরঙজীব আলমগীর-দিল্লীর সিংহাসনে বসেন। উত্তরাধিকার যুদ্ধের পরিণতি ও সিদ্ধান্তকে ভালভাবে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় অভিষেকের অনুষ্ঠান হয়। তখন মুঘল সাম্রাজ্য গৌরবের শিখরে উন্নীত হয়েছে এবং এর আয়তন বিশাল। আওরঙজীবের রাজত্বের শেষভাগে সাম্রাজ্যের আয়তন সর্বাপেক্ষা বিস্তৃত হওয়ায় তাঁর জীবদ্দশাতেই ধ্বংসের সূচনা হয়। তৈমুরবংশের এই শেষ শক্তিমান সম্রাটের রাজত্বকালকে দুভাগে ভাগ করা হয়, যথা ১৬৫৮ থেকে ১৬৮১ ও ১৬৮১ থেকে ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দ।

রাজত্বের কালপর্ব

প্রথমভাগে তিনি উত্তর ভারত নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, দাক্ষিণাত্যে নজর দেননি। শেষ ভাগে দাক্ষিণাত্যেই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সুদীর্ঘ ছাব্বিশ বছর দাক্ষিণাত্যে বাস করে তিনি বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা রাজ্য ধ্বংস করেন, কিন্তু জাতীয়তায় উদ্বুদ্ধ মারাঠদের সঙ্গে তিনি এঁটে উঠতে পারেন নি। ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গাবাদে তাঁর মৃত্যু হয়। দৌলতাবাদে সাধু বুরহানুদ্দিনের কবরের কাছে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। আচার্য যদুনাথ সরকারের মতে, দাক্ষিণাত্যে সম্রাটের নশ্বর দেহ ও রাজনৈতিক কীর্তি, উভয়েরই অন্তিম শয্যা।

শেষ পর্ব : দাক্ষিণাত্য

পূর্ব ও উত্তর পশ্চিম-সীমান্ত : সম্রাট আওরঙজীবের সমস্ত জীবন যুদ্ধ ও রাজ্যজয়ের মধ্যে কেটেছে। ১৬৬১ খৃস্টাব্দে বাঙলার শাসনকর্তা মীরজুমলাকে আসাম বিজয়ে পাঠান হয়। এই অভিযানে মুঘল সেনাপতি প্রথমে জয়যুক্ত হলেও আসাম-বিজয় সম্ভব হয় নি। অহোমরাজ জয়ধ্বজ মুঘলদের সঙ্গে সন্ধি করেন। পরবর্তী সুবাদার শায়েস্তা খাঁ আরাকান রাজের কাছ থেকে চাটগাঁও দখল করেন। দুর্ধর্ষ পোর্তুগীজ জলদস্যুরা তাঁর কাছে পরাজিত হয়েছিল।

মীরজুমলা ও আসাম, অভিযান

উত্তর পশ্চিম সীমান্ত নীতি : উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আওরঙজীব 'অগ্রসর নীতি' অনুসরণ করেছিলেন। এই অঞ্চলের দুর্ধর্ষ আফগান উপজাতিগুলি পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চলে সুযোগ পেলেই লুঠতরাজ চালাত। ১৬৬৭ খ্রীস্টাব্দে ইউসুফ জাইগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলে মুঘল সেনাপতি মহম্মদ আমিন সেই বিদ্রোহ দমন করেন। কিন্তু ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে সেনাপতি সুজাত খাঁ বিদ্রোহী আফ্রীদি ও খতক উপজাতির কাছে পরাজিত ও নিহত হন। তখন আওরঙজীব উপজাতি গুলির মধ্যে ভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ করেন। দলপতিদের মধ্যে বিরোধ

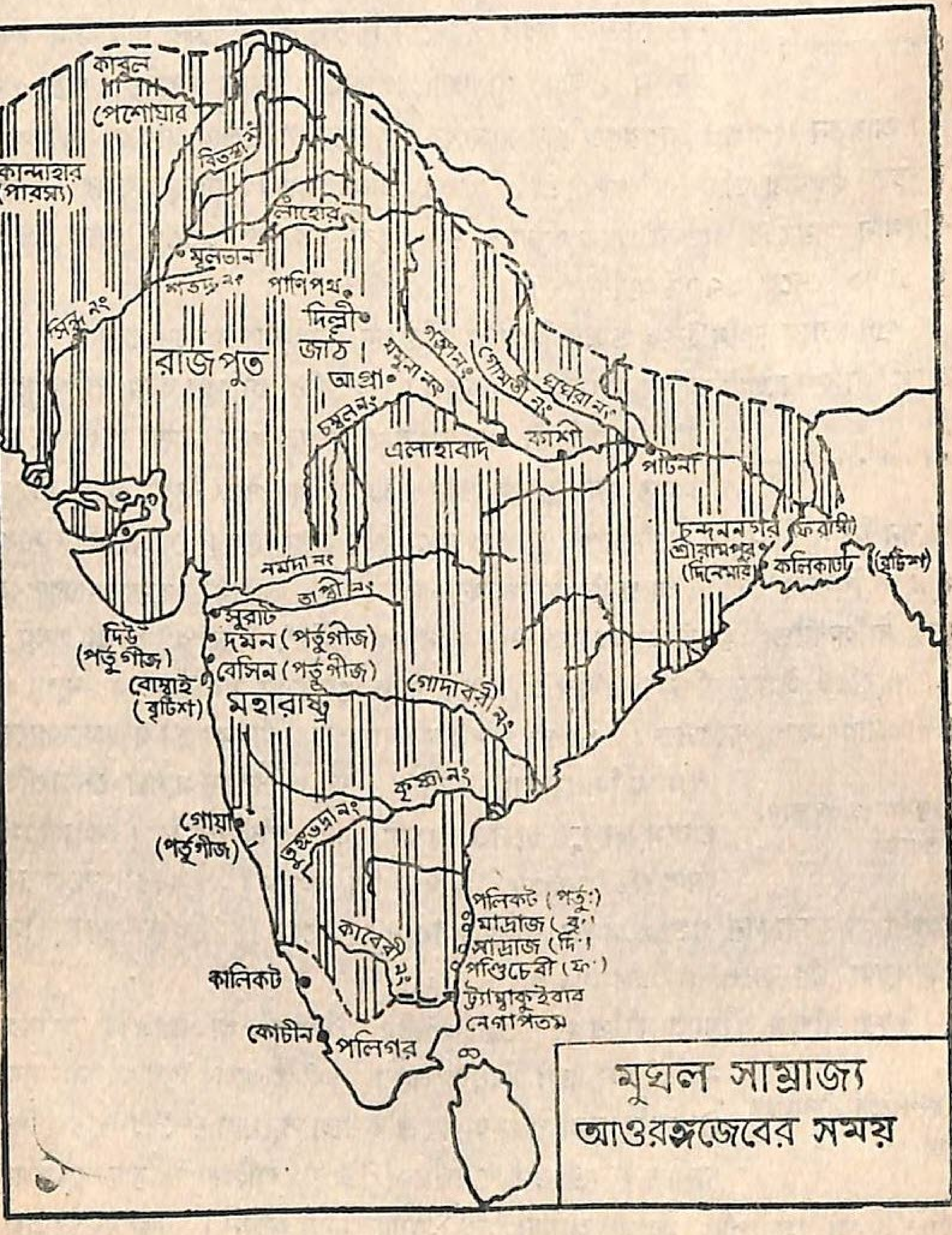
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সমস্যা

সমস্যার সমাধান

সৃষ্টি করে তিনি ঐ অঞ্চলে নিজ প্রভুত্ব বজায় রাখেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তাঁর প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল।

কিন্তু উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত যুদ্ধের ফলে মুঘল রাজকোষ প্রায় শূন্য হয়ে যায়। এর পর ঐ অঞ্চল থেকে রাজপুতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা সম্ভব হল না। তাছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে যুদ্ধের জন্য দাক্ষিণাত্য থেকে বহুসংখ্যক মুঘল সৈন্য সরিয়ে আনতে

ফলাফল



মুঘল সাম্রাজ্য
আওরঙ্গজেবের সময়

হয়েছিল। সেই সুযোগে শিবাজীর পক্ষে মুঘলগণকে পরাজিত করা ও দাক্ষিণাত্যে ক্ষমতাবৃদ্ধি করা সম্ভব হয়।

ধর্ম-নীতি ও হিন্দু বিদ্রোহ: আওরঙজীব হানাফি সম্প্রদায় ভুক্ত গোঁড়া

মুসলমান ছিলেন। তাঁর ধর্মানুরাগ ছিল অত্যন্ত প্রবল। ইসলামের প্রতিটি নির্দেশ তিনি বিশেষ ভাবে মেনে চলতেন। মুসলমানরা তাঁকে 'জিন্দা পীর' বলতেন। ভারতে ইসলামের প্রচার ছিল তাঁর লক্ষ্য। এই কারণে তাঁর শাসন ও রাজনীতি ধর্মমতের দ্বারা এতটা প্রভাবিত। তিনি অমুসলমানদের উপর নানা রকম কর ও শুল্ক ধার্য করেন। ১৬৭৯ খৃস্টাব্দে তিনি আবার জিজিয়া প্রবর্তন করেন। হিন্দুদের অনেক দেব-মন্দির ও শিক্ষাপীঠ তাঁর আদেশে ধ্বংস করা হয় এবং হিন্দুদের সরকারী কাজ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, এমন কি, তাদের অস্ত্রব্যবহারও নিষিদ্ধ হয়। রাজপুত ছাড়া অন্য কোনও হিন্দু পাল্কি ঘোড়া ও হাতি ব্যবহার করতে পারত না, অমুসলমান ও মুসলমান ব্যবসায়ীদের মধ্যে শুল্কের হার তিনি তফাৎ করে দেন। আওরঙজীবের ধর্মনীতি ও হিন্দুবিদ্বেষের ফল বিষময় হয়েছিল।

চট্টগ্রাম অধিকার, পাঠান বিদ্রোহ

ইসলাম প্রীতি, হিন্দু নীতির নমুনা

আওরঙ্গজীবের অনুদার নীতি ও হিন্দুদের প্রতি বিরূপ আচরণের ফলেই বিভিন্ন হিন্দু সম্প্রদায় বাধ্য হয়ে সম্রাটের বিদ্রোহ করে। ১৬৬৯ খৃস্টাব্দে মথুরার জাঠরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই বিদ্রোহ দমনে বিলম্ব হয়নি, কিন্তু কিছুদিন পরেই বুন্দেল-নায়ক ছত্রসাল মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামেন। মৃত্যুর পূর্বে তিনি মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রাম করে একটি স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। নিরীহ অসামরিক হিন্দুরাও সম্রাটের সংকীর্ণ নীতি সহ্য করতে পারেনি। মেওয়াটের সৎনামী বিদ্রোহ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। সৎনামী সম্প্রদায় ছিল কর্মকার, স্বর্ণকার, চর্মকার প্রভৃতি জাতি নিয়ে গঠিত একটি দল। পাঞ্জাবের শিখ-সম্প্রদায়ও মুঘলদের অত্যাচারে উত্যক্ত হয়েছিল পঞ্চম গুরু অর্জুন জাহাঙ্গীরের আদেশে প্রাণ হারান। নবম গুরু তেগবাহাদুর ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে অস্বীকার করায় আওরঙজীব তাঁর মৃত্যুদণ্ড দেন। তাঁর এই আত্মোৎসর্গ শিখদের নতুন প্রেরণা দিয়েছিল। দশম গুরু শিখ-সম্প্রদায়কে একটি সামরিক শক্তিতে পরিণত করেন। এখন থেকে শিখরা মুঘলদের প্রধানতম শত্রু বলে গণ্য হয়।

হিন্দুবিরোধী নীতির প্রতিক্রিয়া

জাঠ বিদ্রোহ, বুন্দেলা বিদ্রোহ

সৎনামী বিদ্রোহ, শিখ সম্প্রদায়

রাজপুত নীতি ঃ আকবরের সময় থেকে রাজপুতেরা মুঘলদের মিত্র হয়ে যুদ্ধ করেছেন কিন্তু আওরঙজীবের ব্যবহারে রাজপুতদের অসন্তোষ বৃদ্ধি পায়। মুঘলদের সেনাপতি মাড়বারের (যোধপুর) রাজা যশোবন্ত সিংহের মৃত্যু হলে সম্রাট মাড়বার অধিকার করবার জন্য রানী ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে দিল্লীতে আটক রাখতে চেষ্টা করেন। এই সময় রাঠোর বীর দুর্গাদাস রানী ও শিশুপুত্রকে নিয়ে দিল্লী থেকে যোধপুরে পালিয়ে আসেন। আওরঙজীবের রাজপুত অভিযানের এই সূত্রপাত। এবার বাদশাহ যুদ্ধে নেমে যোধপুর ও অন্যান্য শহর দখল করলেন। মেবারের রানা

মাড়বার, যোধপুর, অধিকার, মেবার যুদ্ধ

রাজসিংহ যখন অজিত সিংহের পক্ষ নিলেন, আওরঙজীব তখন মেবার আক্রমণ করলেন। জিজিয়া কর আবার চাপানোর জন্য রানা রাজসিংহ অসন্তুষ্ট হয়ে ছিলেন। অনেক দিন ধরে রাজস্থানে যুদ্ধ চলল, মুঘল সৈন্যদল বহু শহর ও মন্দির ধ্বংস করল। এই যুদ্ধে আওরঙজীবের এক ছেলে আকবর রাজপুতদের সঙ্গে যোগ দেন এবং পিতার কুনজরে পড়েন। ১৬৮১ খৃস্টাব্দে মেবারের যুদ্ধ থামল কারণ দাক্ষিণাত্যের সমস্যা ক্রমশঃ জটিল হচ্ছে দেখে সম্রাট রানা রাজসিংহের পুত্র জয়সিংহের সঙ্গে সন্ধি করলেন ও জিজিয়া করের পরিবর্তে তিনটি পরগনা পেলেন। কিন্তু মাড়বারের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে।

পুত্র আকবরের আচরণ

আট বছর পরে বাদশাহ মাড়বারের সঙ্গে সন্ধি করলে অজিত সিংহ পিতৃরাজ্যে ফিরে আসেন। রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধে আওরঙজীবের কোনও লাভ হয়নি। বরং মাড়বার ও মেবার মুঘলের শত্রু হয়ে রইল, সারা রাজস্থানে অশান্তি দেখা দিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রধান স্তম্ভ ভেঙে গেল। যে রাজপুতদের মিত্রতায় ও সমর্থনে আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করেন. আওরঙজীবের অনুদার অসহিষ্ণু নীতিতে তারা ঘোর শত্রুপক্ষে পরিণত হয়। দাক্ষিণাত্যের শক্তি ক্ষয়কারী অভিযানে আর উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানদের দমনে সম্রাট রাজপুত যোদ্ধাদের মূল্যবান সাহায্য থেকে বঞ্চিত হলেন।

মাড়বারের সঙ্গে সন্ধি

ব্যর্থ রাজপুত নীতি, কুফল

দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধঃ মারাঠা অভ্যুদয়ঃ আওরঙজীবের দাক্ষিণাত্য নীতি মোটের উপর ব্যর্থ হয়েছিল। তাঁর যেটুকু সাফল্য, তা বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা বিজয়। এই দুটি মুসলমান রাজ্য তিনি সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে বহমনি রাজ্যের শেষ চিহ্ন লুপ্ত করেন। এখন নতুন মারাঠা শক্তির উত্থান এবং মুঘল ও মারাঠাদের মধ্যে দীর্ঘ সংগ্রামের কথা বলছি।

শিবাজীঃ সতেরো শতকে শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বিশেষ কতকগুলি কারণে জাতীয় মারাঠা রাষ্ট্র স্থাপন সম্ভব হয়েছিল। নর্মদা ও তাপ্তি নদী, বিন্ধ্য, সাতপুরা ও পশ্চিমঘাট পাহাড়শ্রেণী ও দুর্ভেদ্য দুর্গদ্বারা সুরক্ষিত মহারাষ্ট্র অঞ্চল জয় করা সহজ ছিল না। মহারাষ্ট্র দেশের পাহাড় জমি ও জলবায়ু অধিবাসীদের শরীর মন শক্ত ও মজবুত করে গড়েছিল। আর শিবাজীর গুরু রামদাস স্বামী সমাজ সংস্কারের ভিতর দিয়ে মহারাষ্ট্রে এক নবজাগরণের সূচনা করেছিলেন। ইতিমধ্যে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজ্যগুলিতে সৈন্য ও কর্মচারী হিসেবে মারাঠারা শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে।

শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠাদের উত্থান

মহারাষ্ট্রদেশের পরিচয়, অনুকূল পরিবেশ

১৬২৭ খৃস্টাব্দে (মতান্তরে ১৬৩০) শিবাজী পুণার নিকট পার্বত্য দুর্গ শিবনগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহজী ভোঁসলা তখন আহম্মদনগরের সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। পুণায় তাঁর জায়গীর ছিল। শাহজাহানের আক্রমণে আহম্মদনগরের পতন হলে শাহজী

জন্ম ও বাল্যজীবন

বিজাপুরের অধীনে কাজ নিয়ে কর্ণাটকে চলে যান। মাতা জীজাবাঈএর সঙ্গে দাদাজী কোণ্ডদেব নামে শাহজীর এক বিশ্বস্ত ব্রাহ্মণ কর্মচারীর অভিভাবকত্বে পুণায় শিবাজীর বাল্যজীবন কাটে। জীজাবাঈ ও দাদাজীর শিক্ষা ও উপদেশ শিবাজীকে বিশেষ ভাবে প্রভাবিত করে। অল্প বয়স থেকেই তিনি সাহস ও দুর্ধর্ষতার পরিচয় দেন। মাতার কাছে ক্রমাগত প্রাচীন হিন্দু গৌরবের কাহিনী শুনে হিন্দু রাষ্ট্র-শক্তির পুনরুদ্ধার করবার সংকল্প তাঁর মনে জাগে। মহারাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য তিনি প্রস্তুত হতে লাগলেন। কালক্রমে তিনি পার্বত্য মাওলি জাতির তরুণদের নিয়ে একটি ক্ষুদ্র সেনাদল গঠন করেন।

শাহজী ও জীজাবাঈ, দাদাজী কোণ্ডদেব

মাওলি সেনা গঠন



ছত্রপতি শিবাজী

এই সময় দাক্ষিণাত্যের সুলতানী রাজ্য বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মুঘলরা উত্তর ভারতে ব্যস্ত ছিল, তাই মারাঠা শক্তিবিস্তারের মস্ত সুযোগ উপস্থিত হল। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মারাঠা বীর তাঁর কর্মপদ্ধতি ঠিক করে ফেললেন। ১৬৪৬ খৃস্টাব্দে বিজাপুরের তোর্না দুর্গ অধিকার শিবাজীর প্রথম অভিযান। পরের বছর তিনি রায়গড়ে দুর্গ নির্মাণ করলেন এবং আরও কয়েকটি দুর্গ দখল করেন। তখন বিজাপুর-সুলতান শাহজীকে বন্দী করলেন। শিবাজী বিজাপুর রাজ্য আর হানা দেবেন না, এই প্রতিশ্রুতি দেওয়াতে শাহজী মুক্তি পেলেন।

সুবর্ণ সুযোগ
তোর্না ও রায়গড় দুর্গ,
শাহজীর মুক্তি

মুঘল মারাঠার সংঘর্ষের প্রথম পর্ব : শিবাজী ও আওরঙজীব (১৬৫৬-৭৪) : প্রায় পাঁচ বছর চুপচাপ থেকে শিবাজী ১৬৫৬ খৃস্টাব্দে চন্দ্ররাও মোরে নামক একজন জায়গীরদারের কাছ থেকে জাউলী দুর্গ অধিকার করে নিলেন। ১৬৫৭ খৃস্টাব্দে শিবাজীর সঙ্গে মুঘলদের প্রথম সংঘর্ষ বাধল। সুবাদার আওরঙজীব যখন বিজাপুর অভিযানে ব্যস্ত, সেই সময় শিবাজী মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত আহম্মদনগর ও জুন্নার আক্রমণ করলেন এবং আওরঙজীবের কাছে হেরে গিয়ে সন্ধি করলেন। এর পর শিবাজী কোংকনের উত্তরাংশ জয় করেন। এদিকে শিবাজীর শক্তি ক্রমেই বাড়ছে দেখে বিজাপুর-সুলতান তাঁকে দমন করবার জন্য প্রধান সেনাপতি আফজল খাঁকে পাঠালেন। শিবাজী তখন প্রতাপগড় দুর্গে আশ্রয় নিলেন, বহু চেষ্টা করেও আফজল খাঁ

জাউলী দুর্গ অধিকার,
মুঘল রাজের সঙ্গে সংঘর্ষ

শিবাজীর পরাজয় ও সন্ধি,
আফজল খাঁ

সুচতুর শিবাজীকে সম্মুখযুদ্ধে আনতে পারলেন না। অবশেষে তিনি সন্ধি আলোচনার জন্য শিবাজীকে আমন্ত্রণ করলেন। দুরভিসন্ধি আশঙ্কা করে আগে থেকেই শিবাজী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করেন। নির্দিষ্ট জায়গায় সাক্ষাতের সময় তিনি লুকিয়ে রাখা 'বাঘনখ' দিয়ে আফজল খাঁকে বধ করেন। বিজাপুরী সৈন্যরা পরাস্ত হলে সুলতান বাধ্য হয়ে শিবাজীকে স্বাধীন নৃপতি বলে স্বীকার করলেন। দক্ষিণ কোঙ্কন ও কোলাপুর মারাঠাদের দখলে এল, কিন্তু ১৬৬০ খৃস্টাব্দে বিজাপুরী সৈন্য শিবাজীকে পানহালা দুর্গ থেকে বিতাড়িত করল।

বিজাপুর সুলতানের স্বীকৃতি

এদিকে সিংহাসনে বসেই সম্রাট আওরঙজীব শিবাজীকে জব্দ করার জন্য মাতুল শায়েস্তা খাঁকে পাঠিয়ে দিলেন (১৬৬০)। চাকান ও কল্যাণ জেলা জয় করলেও শায়েস্তা খাঁ শিবাজীর হঠাৎ আক্রমণে হেরে গিয়ে অতিকষ্টে প্রাণ বাঁচালেন (১৬৬৩)। পরের বছর সুরাট লুণ্ঠন হল, তখন শিবাজীকে দমন করবার জন্য সম্রাট জয়সিংহ ও দিলীর খাঁকে পাঠালেন। মুঘল বাহিনীর হাতে শিবাজী পরাজয় স্বীকার করে ১৬৬৫ খৃস্টাব্দে পুরন্দরের সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। বাদশাহের বশ্যতা স্বীকার করলে তাঁকে আগ্রায় আহ্বান করা হল। কিন্তু শিবাজী রাজদরবারে যথাযোগ্য সম্মান পেলেন না। কিছুকাল পরে অসুস্থতার ভাণ করে কৌশলে তিনি আগ্রা ত্যাগ করলেন। স্বরাজ্যে ফিরে এসে তিনি তিন বছর যুদ্ধবিগ্রহ করেন নি। এই সময় আওরঙজীব শিবাজীকে 'রাজা' উপাধি দেন। ১৬৭৪ খৃস্টাব্দে আবার সংগ্রাম আরম্ভ হল। শিবাজী হৃত দুর্গগুলি পুনরুদ্ধার করলেন এবং দ্বিতীয়বার সুরাট বন্দর লুণ্ঠন করলেন। ১৬৭০ খৃস্টাব্দে 'ছত্রপতি' ও গো-ব্রাহ্মণ-পালক' উপাধি নিয়ে রায়গড়ে স্বাধীন নৃপতি হিসেবে শিবাজীর অভিষেক সম্পন্ন হল ওদিকে গোলকুণ্ডার সুলতানের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে শিবাজী জিঞ্জি, ভেলোর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল দখল করলেন। ১৬৮০ খৃস্টাব্দে এই মহারাষ্ট্র বীরের মৃত্যু হয় মৃত্যুকালে উত্তরে সুরাটের কাছে ধরমপুর ও দক্ষিণে কানাড়া পর্যন্ত শিবাজীর রাজ্য বিস্তৃত ছিল। শিবাজীর জীবিতকালে মুঘল বাদশাহের পক্ষে মারাঠাদের দমন করা সম্ভব হয়নি। তিনি তখন উত্তর ভারত নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলেন, শিবাজীকে 'পার্বত্য মূষিক' বলে বিদ্রূপ করলেও তাঁর সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নি। শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙজীব দাক্ষিণাত্যে বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয় করেন (১৬৮৬-৮৭)। তারপর আরও দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে তিনি তাঞ্জোর ও ত্রিচিনপল্লী পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্য বিস্তৃত করেন। সেই হিসেবে আকবরের চেয়ে তাঁর সাম্রাজ্য আরও বড় ছিল।

শায়েস্তা খাঁ, জয়সিংহ ও দিলীর খাঁ

শিবাজীর পরাজয় ও পুরন্দরের সন্ধি

আগ্রায় শিবাজী, 'রাজা' উপাধি

দ্বিতীয়বার সুরাট লুণ্ঠন, শিবাজীর অভিষেক

জিঞ্জি ও ভেলোর অধিকার, মৃত্যু

শিবাজীর শাসন ব্যবস্থা ঃ রাজ্যবিস্তারই শিবাজীর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। তাঁর প্রতিভা ছিল বহুমুখী। শাসন ও সামরিক ব্যবস্থা থেকে তাঁর গঠন শক্তির ও প্রজাহিতৈষণার পরিচয় পাওয়া যায়। রাজা হিসেবে সর্বময় প্রভূশক্তির অধিকারী হয়েও তিনি ক্ষমতার অপব্যবহার করেন নি। 'অষ্টপ্রধান' নামে আট জন মন্ত্রীর সাহায্যে তিনি রাজকার্য চালাতেন। প্রধান মন্ত্রীকে পেশবা বলা হত। পেশবা বা মুখ্যপ্রধান ছাড়া অন্যান্য মন্ত্রীদের অমাত্য, মন্ত্রী, সচিব, সামন্ত, সেনাপতি, পণ্ডিত, রাও এবং ন্যায়াধীশ নাম দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন। এ ছাড়া, চিৎনিস ও মুন্সী কায়স্থগণ লিখন-দফ্তরের কাজ করতেন। সবসুদ্ধ আঠারটি বিভাগে শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হত। মন্ত্রিদল রাজার নির্দেশেই কাজ করতেন। তবে নিজস্ব মতামত অনুযায়ী কার্যক্ষমতার অভাবে শাসন-নীতিতে তাঁদের বিশেষ কিছু হাত ছিল না। মন্ত্রিমণ্ডলীর যৌথ দায়িত্ব-প্রচেষ্টারও অভাব ছিল। পেশবার পদমর্যাদা অবশ্য সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। পরবর্তী কালে ইনিই প্রকৃত রাজ্যশাসক হয়ে ওঠেন। অষ্টপ্রধানদের মধ্যে এক সেনাপতি ছাড়া সকলেই ব্রাহ্মণ ছিলেন। শিবাজী একটি ভাল নিয়ম প্রবর্তন করেন যে প্রধানদের পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্য হবে না।

শিবাজীর প্রতিভা

'অষ্টপ্রধান'।

শিবাজীর 'স্ব-রাজ্য' প্রান্ত বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল প্রত্যেক প্রদেশ একজন শাসনকর্তা ও আটজনের মন্ত্রিসভা কর্তৃক শাসিত হত। রাজস্ব বিভাগের ব্যবস্থা সুন্দর ছিল। জায়গীর প্রথা ছিল না। জমি জরিপ করিয়ে উৎপন্ন শস্যের $\frac{2}{5}$ অংশ রাজকর ধার্য হয়েছিল। পার্শ্ববর্তী রাজ্য থেকে চৌথ (রাজস্বের $\frac{1}{4}$) ও সরদেশমুখী (রাজস্বের $\frac{1}{10}$) আদায় করা হত। রাজস্ব আদায় ও শাসনের সুবিধার জন্য রাজ্যটিকে প্রান্ত তরফ ও মৌজায় বিভক্ত করা হয়েছিল।

প্রান্ত বা প্রদেশ, রাজস্ব প্রথা, প্রান্ত তরফ ও মৌজা

মন্তব্য ঃ ইংরাজ পর্যটক ফ্রায়ার শিবাজীর রাজ্যস্ব ব্যবস্থার নিন্দা করে বলেছেন যে বিজাপুরী ব্যবস্থার চেয়ে এই ব্যবস্থা খারাপ এবং এতে কৃষকদের অন্যায় রকমে শোষণ করা হত। কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাবে ফ্রায়ার সাহেবের উক্তি নির্ভরযোগ্য নয়। শাসন-ব্যবস্থার যে গলদ ছিল না এবং কর্মচারীদের অত্যাচার হত না, তা নয়। তবে শিবাজীর শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা প্রশংসনীয়ই ছিল এবং গ্র্যাণ্টডফ্ সাহেবের মতে তা ভাল ভাবেই পরিচালিত হত।

সামরিক ব্যবস্থা ঃ শিবাজীর সামরিক সংগঠন অত্যন্ত সংঘবদ্ধ ও দৃঢ়ভাবে পরিচালিত ছিল। এই সংগঠন মৌলিক প্রতিভারই পরিচায়ক। গিরিদুর্গ নির্মাণ শিবাজীর মূল কীর্তি, কারণ পশ্চিম ঘাটের দুর্ভেদ্য স্থানে এই সব দুর্গ তাঁর শক্তির উৎস ছিল। হাবিলদারের জিম্মায় রক্ষিত এই দুর্গগুলি শিবাজীর সামরিক শাসনের এক একটি প্রাণ-কেন্দ্র স্বরূপ। রবিনসন সাহেব ঠিকই বলেছেন, মারাঠা গিরিদুর্গ জনগণের ধাত্রীস্বরূপ। শিবাজী

সমর-বাহিনী

স্থায়ী সৈন্যদল সংগঠন করে যান। তাঁর সৈন্যবাহিনীতে ৪০ হাজার অশ্বারোহী ও ১০ হাজার, পদাতিক ছিল। অশ্বারোহী সৈন্য দুই ভাগে বিভক্ত ছিল, 'বর্গীর' ও 'শিলাদার'। যারা সরকারের কাছে অশ্ব অস্ত্র-শস্ত্র ও পোশাক পেত তাদেরকে 'বর্গীর' আর যারা নিজেরাই ঐ সব যোগাড় করে নিত তাদেরকে 'শিলাদার' বলা হত। পদাতিক মধ্যে নায়েক, হাবিলদার ও জুমলাদার, এই তিন শ্রেণী। শিবাজীর সেনাবাহিনীতে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই লোক ছিল। দেশরক্ষার জন্য তিনি বহু দুর্গ নির্মাণ করেন, প্রতি দুর্গের শাসনভার সমশ্রেণীর তিন জন কর্মচারীর উপর দেওয়া হয়। শিবাজীর একটি প্রধান কীর্তি নৌবহর সৃষ্টি। এই নৌবহর জনজিরা দ্বীপের সিদ্দিগণের সঙ্গে যুদ্ধ করে। পরবর্তী যুগে মারাঠা নৌ-বাহিনীই আংগ্রিয়া সর্দারের অধীনে ইংরেজ, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের জলপথে বাধা দিয়েছে। অথচ মুঘল সম্রাটের বিশাল সমরবাহিনী এই নৌশক্তির অভাবেই বিদেশীদের ভারতে আগমন ও ক্রমিক প্রসার বন্ধ করতে পারেনি।

বর্গীর ও শিলাদার
দুর্গ, নৌবাহিনী

শিবাজীর কৃতিত্ব ও চরিত্র ঃ ভারত-ইতিহাসে শিবাজী এক গৌরবময় স্থান অধিকার করে আছেন। বহু-বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত মারাঠা জাতিকে 'এক ধর্মরাজ্যপাশে' আবন্ধ করে শিবাজী তাকে এক প্রবল জাতিতে রূপায়িত করেন। এটি তাঁর একমাত্র কৃতিত্ব নয়। মানুষ ও শাসক হিসেবেও তিনি ছিলেন হৃদয়বান ও উদার। ধর্মান্ধতা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন, তাঁর কাছে ধর্ম ছিল সৎ প্রবৃত্তি ও কর্মের উৎস। তাঁর মধ্যে আদর্শ ও বাস্তবের অপূর্ব সমাবেশ ঘটেছিল। শিবাজীকে 'নরকের কুক্কুর'ও 'শয়তানের অবতার' নামে অভিহিত করেও ঐতিহাসিক কাফি খাঁ স্বীকার করেছেন ঃ 'কোরানগ্রন্থ হস্তগত হলে শিবাজী কোনও মুসলমানকে সেটি দান করতেন এবং মসজিদের ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি জমি দান করেছিলেন। নৈতিক দৃঢ়তা এবং উদাত্ত আদর্শবাদও তাঁর চরিত্রকে ভাস্বর করে তুলেছিল।

জাতীয় ঐক্য সৃষ্টি,
মানুষ ও শাসক

কাফি খাঁর স্বীকারোক্তি

রাজনৈতিক কারণে চাতুরী ও নিষ্ঠুরতা আশ্রয় গ্রহণ করলেও বিশাল মুঘল সাম্রাজ্য, বিজাপুরী সুলতান, জনজিরার দুর্ধর্ষ সিদ্দিগণ ও পোর্তুগীজ শক্তির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করে শিবাজী যে কর্মক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। মারাঠা জাতির মধ্যে তিনি যে অনুপ্রেরণার সঞ্চার করেন, তাঁরই ফলে বিশাল মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। তাঁকে হিন্দু সমাজের শেষ 'সৃজনী প্রতিভা' ও 'জাতিস্রষ্টা' বললেও অত্যুক্তি হয় না। আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের অন্যতম নেতা লোকমান্য তিলক তাঁর আদর্শেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শিবাজী-প্রশস্তি রচনা করেও শিখ জাতির তুলনায় মারাঠা রাষ্ট্রীয় সংগঠনের পিছনে উগ্রতর জাতীয়তাবোধের সমালোচনা করেছেন। কিন্তু শিবাজীর নেতৃত্বে বিজয়নগর

চাতুরী ও সাহসের বলে
সফলতা

মহারাষ্ট্র জাতির জনক,
বিজয়নগরের প্রথম ও
স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র

সাম্রাজ্যপতনের পর এই প্রথম স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

শিবাজী শুধুই উচ্চ আদর্শবাদী ছিলেন না। রাজনীতিতে তিনি যে বাস্তব জ্ঞানের পরিচয় দেন তার প্রমাণ, তিনি যুগ-লক্ষণ ভাল ভাবে বুঝে মহারাষ্ট্রকে ঠিক তার প্রয়োজনীয় জিনিসটি সরবরাহ করেছিলেন। সংঘবদ্ধতাই সংহত শক্তি এবং এই শক্তিই সামরিক কৃতকার্যতার ভিত্তি। মুঘল সাম্রাজ্য আর দক্ষিণী সুলতানদের মধ্যে শক্তিসাম্য রক্ষা করতে হলে কূটনীতি ও সামরিক বলে মহারাষ্ট্রকে আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে হবে। এই সত্য উপলব্ধি করেই শিবাজী পরিস্থিতির পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন; এবং একাধারে পার্বত্য দুর্গ, পার্বত্য রণনীতি ও নৌশক্তির সমাবেশ ঘটিয়ে রাজনীতির মানচিত্রে মহারাষ্ট্রকে যথোপযুক্ত স্থানে প্রতিষ্ঠিত করে যান। তাঁর নেতৃত্বে মারাঠারা ক্রমাগত যুদ্ধ করেও ক্লান্ত বা দুর্বল হয় নি। ছত্রপতির দেহান্তের পরও বহুদিন পর্যন্ত পেশবারা শক্তিশালী মহারাষ্ট্রে আধিপত্য ভোগ করেন। ক্ষয়িষ্ণু মুঘলদের যেমন তাঁরা ভাগ্যনিয়ন্তা, উদীয়মান ইংরেজ শক্তিরও তেমনই তাঁরা ঘোর প্রতিরোধক ছিলেন। মুঘলদের নিকট থেকে ব্রিটিশরাজ ভারতের গদি ঠিক পায় নি। শিবাজীর হাতে-গড়া মারাঠাদেরই পরাক্রান্ত রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে তিনটি বড় যুদ্ধ জয় করে তবে তাকে ভারতের প্রভুত্ব অর্জন করতে হয়েছিল।

সংহতি নির্মাণ

রণনীতি উপযোগিতা

মুঘল-মারাঠা যুদ্ধ (দ্বিতীয় পর্ব ১৬৮০-১৭০৭ খৃঃ): শিবাজীর মৃত্যুর পর আওরঙজীব মারাঠা-দলনে বদ্ধপরিকর হলেন। সম্রাট স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে আসেন অনেকটা এই উদ্দেশ্যে। ১৬৮১ থেকে ১৭০৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল-মারাঠা সংগ্রাম চলে। শিবাজীর বড় ছেলে শম্ভুজী সাহসী হলেও বিলাসপ্রিয় ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। ১৬৮৯ খৃস্টাব্দে শম্ভুজী অসাবধান অবস্থায় মুঘল সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে নির্মমভাবে নিহত হন। তারপর মুঘল সৈন্য শীঘ্রই মারাঠা রাজধানী অবরোধ করে এবং অনেকগুলি মারাঠা দুর্গ অধিকার করে নেয়। শম্ভুজীর শিশুপুত্র শাহু (দ্বিতীয় শিবাজী) শত্রুর হাতে বন্দী হয়ে মুঘল শিবিরে আটক থাকেন। মারাঠা জাতির এই দুর্দিনে শম্ভুজীর ভাই রাজারাম রাজ্যের শাসনভার নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যান। এই সময়ে রাজারাম যে কয়েকজন মারাঠা নায়কের সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে সন্তাজি ঘোরপাড়ে ও ধনাজী যাদবের নাম উল্লেখযোগ্য। মুঘল সেনাপতি জুলফিকার খাঁর অত্যাচারে রাজারামকে সাতারা ছেড়ে চলে যেতে হয়। ১৭০০ খৃস্টাব্দে রাজারামের মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নী তারাবাঈ মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দাক্ষিণাত্যে মুঘল-মারাঠা সংঘর্ষের ফলে বাদশাহের সৈন্যবাহিনী মারাঠাদের দ্বারা উত্যক্ত হয়ে মনোবল হারিয়ে ফেলে। সম্রাট আওরঙজীবের মারাঠা শক্তি খর্ব করার চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে যায়। এই সংগ্রামে

শম্ভুজীর মৃত্যু, শাহু বন্দী

রাজারাম, তারাবাঈ

মারাঠা জাতীয়তা জয়যুক্ত

মুঘল পক্ষে অজস্র অর্থব্যয় ও সৈন্যক্ষয় হয় এবং মারাঠা জাতীয়তা জয়লাভ করে।

আওরঙজীবের দাক্ষিণাত্য নীতির সুদূর প্রসারী ফলাফল ঃ

সর্বনাশের কারণ কুফল

'স্পেনীয় ক্ষত' যেমন নেপোলিয়নের পতনের কারণ হয়েছিল, 'দাক্ষিণাত্য ক্ষতও' তেমনি আওরঙজীবের সর্বনাশের কারণ হয়েছিল। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যে নিষ্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। জনৈক ঐতিহাসিক তাই মন্তব্য করেছেন—'ঐ দাক্ষিণাত্যে তাঁর দেহ আর কৃতিত্ব, উভয়েরই সমাধি'।

সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি

আওরঙজীবের দাক্ষিণাত্য-নীতি মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। দাক্ষিণাত্য মুঘল সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় সাম্রাজ্যের আয়তন এত বিশাল হয়েছিল যে কোন একজন লোকের পক্ষে সমগ্র সাম্রাজ্য ঠিকমত শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। আওরঙজীবকে দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান করতে হয়েছিল। এর ফলে উত্তর ও মধ্যভারতে মুঘল শাসন দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। চতুর্দিকে বিদ্রোহ ও অসন্তোষ দেখা দিল। দীর্ঘ যুদ্ধের ফলে রাজকোষ শূন্য হয়ে গেল। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে শিক্ষা, শিল্প-চর্চা ও সাহিত্যের অবনতি শুরু হল। মাইনে না পেয়ে সেনা বাহিনীর অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। ক্রমাগত যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সামরিক দক্ষতা নষ্ট হল।

দীর্ঘকাল দাক্ষিণাত্যে অবস্থান

উত্তর ও মধ্যভারতে শাসনব্যবস্থা বিশৃঙ্খলা

অনেকে মনে করেন, বিজাপুর গোলকুণ্ডার ধ্বংসসাধন করে আওরঙজীব দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন নি। মারাঠা শক্তি নষ্ট করার পর ঐ দুটি রাজ্য অধিকার করা উচিত ছিল। কিন্তু মারাঠাশক্তি বিধ্বস্ত করবার জন্য এই দুটি শিয়া রাজ্যের সাহায্য লাভের সম্ভাবনা আওরঙজীবের ছিল না। তা ছাড়া একথা ভুলে যাওয়া উচিত নয় যে আকবরের আমল থেকেই দাক্ষিণাত্যে মুঘল আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু হয়। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে সেই নীতিই দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করা হয়। সুতরাং এ ব্যাপারে আওরঙজীবেরই উপর দোষ ও দায়িত্ব আরোপ করা যুক্তিযুক্ত নয়। আসল কথা, বিজাপুর, গোলকুণ্ডা আর মারাঠা, এই ত্রিশক্তির সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই মুঘল সাম্রাজ্যকে ক্ষীণবল ও পর্যুদস্ত করে ফেলে। আওরঙজীবের ব্যর্থতা ও মৃত্যু ঐতিহাসিক পরিণতি মাত্র।

রাজকোষ শূন্য
সেনাবাহিনীর অসন্তোষ

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা জয়ের সমালোচনা

আওরঙজীবের আমলে শাসন ব্যবস্থা ঃ (সামরিক ও বেসামরিক) ঃ মূলতঃ সম্রাট আকবর কর্তৃক প্রবর্তিত শাসন পদ্ধতি আওরঙজীবের আমলে অনুসৃত হয়। আওরঙজীব ক্ষেত্র বিশেষে সামান্য কিছু পরিবর্তন সাধন করেন।

সামান্য কিছু পরিবর্তন

সম্রাট ছিলেন শাসনব্যবস্থার শীর্ষে, সামরিক ও বেসামরিক সমস্ত বিভাগের সর্বোচ্চ অধিনায়ক। সুষ্ঠু শাসনের জন্য কতকগুলি বিভাগ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং বিভিন্ন মন্ত্রীকে বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হ'ত। সমগ্র সাম্রাজ্য ২১ টি 'সুবাতে' বিভক্ত ছিল। 'সুবাতে' সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন সুবাদার। প্রদেশের রাজস্ব আদায়ের দায়িত্বে ভারপ্রাপ্ত ছিলেন দেওয়ান। কোন প্রজা সম্রাটের কাছে কোন উৎপীড়ক রাজস্ব কর্মচারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে সম্রাট সেই রাজস্ব কর্মচারীকে বরখাস্ত করতেন। আওরঙজীবের আমলে দাক্ষিণাত্যেও রায়তওয়ারী 'বন্দোবস্ত চালু হয়। শান্তিরক্ষার দায়িত্ব ছিল ফৌজদারের উপর। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ আদালত এবং কাজীগণ ছিলেন বিভিন্ন অঞ্চলের বিচারক। জায়গীর প্রথার পরিবর্তে আকবর যে মনসবদারী প্রথা চালু করেছিলেন আওরঙজীবের আমলে তা কিছু পরিমাণে পুনর্গঠিত হয়। একশতী মনসবদারদের পক্ষে $\frac{1}{5}$ অংশ অশ্বারোহী ও সম সংখ্যক অশ্ব রাখার নিয়ম করা হয়। এ ছাড়া আওরঙজীব 'দাগ' ও 'চিহ্নিতকরণ' প্রথা আরও সুনির্দিষ্টভাবে প্রণালীবদ্ধ করেন। তাঁর আমলে 'নগদ' মনসবদারগণকে 'দাগ' পরীক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীর কাছে থেকে বছরে দু'বার সার্টিফিকেট নিতে হ'ত। অন্যথায় মাইনে কেটে নেওয়ার নিয়ম চালু করা হয়। জায়গীর ভোগী মনসবদারদের এ ব্যাপারে বছরে একবার সার্টিফিকেট নিতে হত। আওরঙজীব তাঁর রাজত্বের ২৩ তম বছরে এক ফরমান জারী করেন। এতে বলা হয় 'নগদি' মনসবদারের সেনাবাহিনী প্রতি তিনমাস অন্তর পরিদর্শন করা হ'বে। জায়গীর—ভোগী মনসবদারের ক্ষেত্রে প্রতি ছয় মাস অন্তর পরিদর্শনের ব্যবস্থা হয়। আওরঙজীবের সেনাবাহিনী পদাতিক, অশ্বারোহী, গোলন্দাজ ও নৌবাহিনী এই চার ভাগে বিভক্ত ছিল। সম্রাট ছিলেন সর্বোচ্চ অধিনায়ক এবং তাঁর অধীনে একাধিক অধিনায়ক ছিলেন। মুঘল যুগে আওরঙজীবের আমলেই গোলন্দাজ বাহিনী সর্বোচ্চ নৈপুণ্য অর্জন করেছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা

প্রাদেশিক শাসন, ২১ টি সুবা, সুবাদার

দেওয়ান ফৌজদার, কাজী

মনসবদারী প্রথায় সংস্কার, সেনাবাহিনী

গোলন্দাজ বাহিনীর, দক্ষতা বৃদ্ধি

আওরঙজীবের চরিত্র, ব্যক্তিত্ব ও কৃতিত্ব ঃ আওরঙজীব খুব সরল জীবনযাপন করতেন, তাঁর জীবনে কোনও আড়ম্বর ছিল না। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলমান। অবসর সময়ে পবিত্র কোরান নকল করতেন, মদ স্পর্শ করতেন না, বিলাস ব্যসন পরিত্যাগ করেছিলেন। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল না। আওরঙজীবকে সাধারণতঃ নির্দয় হৃদয়হীন বলা হয়। ভাইদের মেরে ফেলে তিনি সিংহাসন দখল করেন সত্য, কিন্তু তিনি পিতৃহন্তা ছিলেন না। কাফী খাঁর মতে, তাঁর সাহস, কষ্টসহিষ্ণুতা, কর্তব্য নিষ্ঠা, মিতাচার ও ন্যায়পরায়ণতা অতুলনীয়। রাজকার্যে তার অত্যন্ত মনোযোগ ছিল, তার জন্য খুব পরিশ্রমও করতেন। তবে খাঁটি মানুষ, বুদ্ধিমান,

চরিত্রের গুণাবলী

কৌশলী ও সাহসী যোদ্ধা হয়েও শাসক হিসাবে তিনি ব্যর্থ। তাঁর মনে সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি মাত্রায় থাকার জন্য তিনি সুখী ও কাজে সফল হতে পারেন নি। কূটনীতি ও চাতুর্য দ্বারা চালিত হয়ে তিনি সাম্রাজ্যের ক্ষতি করেছিলেন, সেই জন্য মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্য তাঁকে অনেকটা দায়ী করা যায়। শেষ জীবনে পুত্রদের কাছে লেখা কয়েকখানি চিঠিতে তাঁর মনের ক্ষোভ ও ব্যর্থতার সুর ফুটে উঠেছে। মৃত্যুর মুখোমুখি এসে সম্রাট পুত্র আজমকে লেখেন, 'আমি আমার সাম্রাজ্য ও পুত্রদের জন্য যা করেছি, তাতে সুফলের কোন আশা দেখি না। তিনি রাজ্যের খরচ কমিয়েছেন, জমির ও খাজনার ন্যায্য বিলি-বন্দোবস্তের কথা প্রথম ভেবেছেন, কিন্তু প্রজাদের ও কৃষকদের কোন মঙ্গল হয়নি। তার কারণ, সুদীর্ঘ যুদ্ধবিগ্রহে প্রচুর ব্যয় হয়ে যায়। সুতরাং বুদ্ধি-বিবেচনা ও সদিচ্ছা থাকলেও, তিনি কোনো স্থায়ী কাজ রেখে যেতে পারেন নি। তাঁর ধর্মমত ছিল উগ্র, শাসন কঠোর। হিন্দু, রাজপুত, শিখ, কোনো সম্প্রদায়ের সঙ্গে তিনি সদ্ভাব রেখে চলেন নি। সব কাজ নিজে দেখতে, কাউকে পুরা বিশ্বাস করতেন না, ফলে এত বড় সাম্রাজ্য এক মুঠিতে ধরে রাখা যায় নি। দীর্ঘ ছাব্বিশ বছর তিনি দাক্ষিণাত্যে নিষ্ফল যুদ্ধ চালিয়ে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর নির্দেশমত দৌলতাবাদের কাছে সামান্য লোকের মত সমাধি দেওয়া হয়। তাই এক ঐতিহাসিক বলেছেন—'ঐ দাক্ষিণাত্যে তাঁর দেহ আর কৃতিত্ব, উভয়েরই সমাধি।'

সন্দেহ ও অবিশ্বাস

উগ্র ধর্মমত, ব্যর্থ দাক্ষিণাত্য নীতি

[ঙ] য়ুরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির কার্যকলাপ:

য়ুরোপীয় বণিকদল: য়ুরোপীয় বণিকরা আগে ভারতে পণ্য কিনত আরব বণিকদের কাছ থেকে। তাই মুসলমান নাবিক ও বণিকদের একচেটিয়া দখল দূর করে তারা সরাসরি ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য করতে উন্মুখ হল। নতুন সমুদ্রপথের সন্ধান পেয়ে বিখ্যাত পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা দক্ষিণ আফ্রিকা ঘুরে ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে কালিকট বন্দরে এসে পৌঁছলেন ১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে।

ভাস্কো দা-গামার কালিকট বন্দরে আগমন

পোর্তুগীজ: এই জলপথের আবিষ্কার হলে পোর্তুগীজরা দলে দলে ভারতে আসতে লাগল। কালিকটে টিঁকতে না পেরে তারা কোচিন এবং সেখান থেকে গোয়া, দমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং সিংহলের অনেক জায়গায় এসে ঘাঁটি তৈরি করল। য়ুরোপের বণিকদের মধ্যে তারাই প্রথম বাঙলার সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), পরে তাদের ব্যান্ডেল এবং চট্টগ্রামে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা আয়ত্ব করে নিতে থাকে। ব্যান্ডেলে তাঁদের প্রতিষ্ঠিত সুন্দর গীর্জাটি সবচেয়ে প্রাচীন এবং এখনো বর্তমান। মুঘল সরকারের সঙ্গে বিবাদ হলে তারা ব্যান্ডেল হুগলী অঞ্চল ছেড়ে অনেক দক্ষিণে

১৪৯৮ খৃঃ গোয়া, দমন দিউ, চৌল, বোম্বাই মাদ্রাজ সিংহল

বাঙলা দেশ

হিজলিতে চলে যেতে বাধ্য হয়। ১৬৫১ সালে ইংরেজ বণিকেরা তখন হুগলিতে কুঠি স্থাপন করে বসে গেলেন।

ওলন্দাজ ঃ পোর্তুগীজদের ঠিক পরেই এল ওলন্দাজ (ডাচ), তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে। কয়েক বছরের মধ্যে ওলন্দাজ বণিকরা পোর্তুগীজদের একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট করে দেয়। মাদ্রাজে নাগাপত্তন আর বাঙলার চুঁচুড়ায়, তারা কুঠি তৈরি করে। কিন্তু আঠারো শতকে ইংরেজ বণিকদের কাছে হেরে গিয়ে তারা মালয় সুমাত্রা, যবদ্বীপ অঞ্চলে চলে যায় এবং সেখানে এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে যা এখন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া। এক সময়ে ওলন্দাজদের মশলার ব্যবসায় একচেটিয়া অধিকার ছিল।

নাগা পত্তন চুঁচুড়া
ইন্দোনেশিয়া সাম্রাজ্য

দিনেমার ঃ ডেনমার্কের অর্থাৎ দিনেমার ব্যবসায়ীরাও এসেছিল শ্রীরামপুরে বাণিজ্যের জন্য কিন্তু তেমন সুবিধা করতে পারে নি। ইংরেজরা শক্তিশালী হয়ে উঠলে, শ্রীরামপুর ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দেয়।

ইংরেজ ঃ ওলন্দাজদের সঙ্গে সঙ্গেই ইংরেজ ভারতে এলেন বাণিজ্যের প্রতিযোগিতায়। ১৬০০ খৃস্টাব্দে ইংলন্ডের রানী এলিজাবেথ ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য করার জন্য সনদ দেন। ভারতে প্রথম ইংরেজ কুঠি স্থাপিত হয় সুরাটে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি পেয়ে। পোর্তুগীজ প্রভাব যখন কমছে আর ফরাসীরা প্রবল হয়ে ওঠে নি, ঠিক সেই সময়ে ইংরেজরা নানা জায়গায় বাণিজ্যকেন্দ্র গড়ে তুলল—মাদ্রাজে, সেখান থেকে বালেশ্বর হয়ে হুগলীতে এবং শেষকালে কলকাতায়। শাহজাহানের আমলে বালেশ্বর, পাটনা হুগলী ও কাশীমবাজারে ইংরেজদের ব্যবসা করতে দেওয়া হয় এই সর্তে যে তাঁরা মুঘল সরকারকে বছরে তিন হাজার টাকা নগদ দিলে আর অন্যান্য বাণিজ্য শুল্ক তাঁদের দিতে হবে না। এই শুল্ক নিয়ে ইংরেজ কোম্পানির সঙ্গে বাঙলায় রাজকর্মচারীদের বিবাদ শুরু হল। কিছু দিন পরে কোম্পানির এজেণ্ট জব চার্ণক হুগলীর আরও দক্ষিণে গঙ্গার তীরেই একটি সুবিধামত জায়গা খুঁজতে লাগলেন যেখানে নির্বিবাদে কুঠির ব্যবসা করা যায়, সমুদ্রপথে বিলাতী জাহাজ এসে সহজে দাঁড়াতে পারে। অতঃপর ১৬৯০ সালে সুতানুটিতে একটি কুঠি স্থাপন করলেন। তারপর সুতানুটি, কলকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ইজারা নিয়ে ১৬৯৮ সালে কলকাতা শহরটি গড়ে উঠল। সেখানে বাঙলার সুবাদারের অনুমতি নিয়ে ১২০০০ টাকা খাজনায় প্রথম ইংরেজ বসতি স্থাপিত হল।

সুরাট, মাদ্রাজ, বালেশ্বর

জব চার্ণক কর্তৃক
কলকাতার পত্তন
১৬৯০ খ্রীঃ

ফরাসী ঃ ভারতের সঙ্গে লাভজনক ব্যবসায় ভাগ নেবার জন্য শেষে এল ফরাসী বণিকদল। এরাও ইংরেজদের মত গোড়ায় মাদ্রাজ অঞ্চলে ঘাঁটি তৈরি করে যেটি পরে পণ্ডিচেরি নগরে পরিণত হয়। ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে তারা বাঙলার নবাবের কাছ থেকে চন্দননগর লাভ করে। এর ফলে ইংরেজদের সামনে এক প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হল আঠারো শতকের মাঝামাঝি ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে দাক্ষিণাত্যে দুবার সংঘর্ষ

হয় প্রথম ও দ্বিতীয় কর্ণাটক যুদ্ধ। উভয়েরই উদ্দেশ্য, এদেশের ভিতরকার কলহ ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে নিজেদের শক্তি বিস্তার। ইংরেজদের সেনাপতি ক্লাইভ, শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ভাগ্য ফিরিয়ে দিলেন। য়ুরোপে, আমেরিকায় এবং ভারতে একই সময়ে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধে ইংলণ্ডই শেষে জয়ী হয়। তারপর থেকে বাঙলায় এবং বাঙলা থেকে সারা উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যেও ঈস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিপত্য বিস্তার হতে থাকে। অবশেষে ইংরেজদের হাতেই ভারতের বাণিজ্যলক্ষ্মী বাঁধা রইল আর বাঙলা দেশে পলাশীর যুদ্ধের পর তাদের টাকা পয়সার স্বার্থ ও কর্তৃত্ব কায়েম হয়ে গেল।

পণ্ডিচেরি, চন্দননগর

পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকরা হটে যাওয়াতে ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকারের চরম মীমাংসার জন্য দুটি য়ুরোপীয় জাতি, ইংরেজ ও ফরাসী, এবার মুখোমুখি দাঁড়াল, আঠারো শতকের প্রথমার্ধে তারা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে বাণিজ্য করছিল। ভারতে আধিপত্য বা সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা তখনও ছিল না। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি উভয় পক্ষই এদেশে রাজনৈতিক শক্তি ও প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে লাগল। এ বিষয়ে অগ্রণী হল ফরাসীরা। তার ফলে ১৭৪০ সাল থেকে য়ুরোপে এবং সেই সূত্রে ভারতে প্রাধান্য লাভের জন্য ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। বাঁধল ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ দক্ষিণ ভারতে কর্ণাটক অঞ্চলে, ১৭৪৬ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এই সংঘর্ষ শুধু ভারতে নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকাতেও বিস্তৃত হয়।

দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

[তিন] মুঘল যুগে ভারত :

শাসন পদ্ধতি : মুঘল রাজতন্ত্র ছিল পুরোপুরি স্বৈরতান্ত্রিক। শাসন, বিস্তার, সমর ও শান্তি সব কিছুই সম্রাটের কেন্দ্রশক্তির করায়ত্ত ছিল। এই বাদশাহীর অর্থ সম্রাটের সর্বময় কর্তৃত্ব এবং সীমাহীন ক্ষমতা। তবে এরূপ শাসনব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ গুণ ছিল। মুঘল শাসনতন্ত্রে সর্বত্র পার্সী ভাষার ব্যবহার একটি ঐক্য বোধের সহায় হয়েছিল। এই ঐক্য জাতিগত না হলেও রাষ্ট্রীয় সংহতি গঠনে এর সার্থকতা লক্ষ্য করা যায়। আকবর থেকে মহম্মদ শাহের সময় পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের অধিকাংশেই এক সরকারী ভাষা, একই শাসন পদ্ধতির প্রয়োগ, একই কথ্য ভাষা উর্দুর প্রচলন, একই বাদশাহী মুদ্রার প্রবর্তন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলকে একসূত্রে গ্রথিত করে।

স্বৈরতন্ত্র

রাষ্ট্রীয় সংহতি

যাই হোক, এইরূপ স্বৈরতন্ত্রের সাফল্য সম্রাটের ব্যক্তিগত গুণাগুণের উপর নির্ভরশীল ছিল। বিভিন্ন বিভাগীয় মন্ত্রীবর্গ বাদশাহকে পরামর্শ দিতেন। তবে সেই মন্ত্রণা গ্রাহ্য অথবা অগ্রাহ্য করা সম্রাটের ইচ্ছাধীন ছিল। যে সব কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শাসনযন্ত্রের প্রধান অঙ্গ স্বরূপ ছিলেন, তাঁরা হলেন সদর-ই সুদূর খান-ই-সামান, মীরবকশী, মুহাৎসিব,

কেন্দ্রীয় শাসন

কাজি-উল-কাজাৎ এবং দেওয়ান। এ ছাড়া বহু রকমের ভারপ্রাপ্ত উচ্চ কর্মচারী, যেমন শহর অঞ্চলের কোতোয়াল আর মফঃস্বলের ফৌজদার বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত থাকতেন।

প্রাদেশিক ও স্থানীয় শাসন

আকবর সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবায় ভাগ করেন। দাক্ষিণাত্য জয়ের ফলে সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য আওরঙজীব তাঁর সাম্রাজ্যকে ২১টি সুবাতে বিভক্ত করেন। এই সুবাগুলিতে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অনুরূপ সুবাদার, তাঁর অধীনে প্রাদেশিক সরকারী কর্মচারী, প্রাদেশিক দেওয়ান, ফৌজদার, বক্‌শী প্রভৃতি বিভিন্ন ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। অন্যান্য প্রাদেশিক কর্মচারী যথা কারফুন, পাটোয়ারী এবং কানুন-গো, সকলেই রাজস্ব বিভাগে কাজ করত। গ্রামাঞ্চলের স্বায়ত্ত শাসনে পূর্বের প্রথাই প্রচলিত ছিল। মুঘলরাজ এখানে হস্তক্ষেপ করেন নি।

দুর্গপুরী

মুঘল শাসনপদ্ধতির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল দুর্গপুরী ও প্রাসাদ নির্মাণ। এগুলি সামরিক প্রয়োজনে কতকগুলি বিশেষ জায়গায় বা ঘাঁটিতে নির্মিত হয়েছিল। তখন দিল্লী, লাহোর, আগ্রা প্রভৃতি বিভিন্ন শহরে সম্রাটরা থাকতেন। ইচ্ছায় ও সামরিক প্রয়োজনে, সংবাদ এবং যোগাযোগ রক্ষার খাতিরে সম্রাটের বাসস্থান প্রায়ই বদল হত। কাজেই সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে বড় বড় দুর্গ-প্রাসাদ গঠন করা হত। এলাহাবাদ, আগ্রা, দিল্লীতে এগুলির অস্তিত্ব আজও টিঁকে রয়েছে।

মনসব

মনসব-প্রথা আকবরের অভিনব সৃষ্টি। পদমর্যাদা সামরিক, কিন্তু মন্‌সবদার কার্যতঃ বেসামরিক রাজকর্মচারী। তাঁকে সেনাবাহিনীতে ফৌজ যোগান দিতে হত। তবে একদিকে বে-সামরিক শাসন-ব্যবস্থা, অপরদিকে সেনাবাহিনী—এই উভয় শাখার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন মনসবদার। মনসব প্রথার একটি অর্থনৈতিক দিক আছে। আবুল ফজল এবং মোরল্যাণ্ড উভয়েই দেখিয়েছেন, মনসবদারের আয় ছিল প্রচুর এবং সে আয় অনেক সময় বেআইনী। অনেকের ধারণা আকবর জায়গীর দান একেবারে রহিত করেন। কথাটি আংশিক সত্য। আকবরের আমলে জায়গীর ছিল। আবার রাজকর্মচারীদের বেতন-ব্যবস্থাও ছিল। জায়গীর দানের সময় নিয়ম ছিল বেতন অপেক্ষা জায়গীরের আয় বেশি হলে উদ্বৃত্ত আয় রাজ-সরকারে জমা দিতে হবে। কিন্তু কার্যতঃ উদ্বৃত্ত আয় জমা পড়ত না। গলদ বুঝে আকবর জায়গীর বদল করতেন। একই জায়গীরে মনসবদারকে বেশিদিন রাখতেন না। কাজেই মনসবদার কখনও জায়গীর ভোগ করত, কখনও বা শুধু নগদ অর্থ পেত। আকবর মনসবদার প্রথার মধ্যে সরকারের আর্থিক ক্ষতি উপলব্ধি করে অনেক জায়গীরভূমি 'খালসায়' বা খাস জমিতে পরিণত করেন এবং শের শাহের প্রথার অনুসরণ করে বেতন প্রথার প্রচলন করেন। কিন্তু জায়গীর একেবারে উঠে যায় নি। দু'রকমের ব্যবস্থাই চলতে থাকে। মনসব-প্রথার এই যে ত্রুটি আর বেসামরিক শাসনের সাথে যুক্ত

জায়গীরদার

খালসা জমি

থাকায় যে গোলযোগ সৃষ্টি হয়, তা পরবর্তী মুঘলদের সময় আরও পরিস্ফুট হয় এবং শাসনতন্ত্রকে অনেকটা দুর্বল করে ফেলে।

রাজস্ব-ব্যবস্থা আকবরের শাসনব্যবস্থা প্রসঙ্গে বিশদভাবে আগেই বলা হয়েছে। তবে স্থায়িত্বের দিক থেকে, রাজস্ব সংস্কার ও আদায় প্রথাই মুঘল পদ্ধতির শ্রেষ্ঠত্বের প্রধান নিদর্শন। গুজরাটে তোডরমল ভূমি রাজস্ব নিয়ে যে সব পরীক্ষা করেন, তা পরে মুঘল সাম্রাজ্যের সর্বত্র প্রচলিত হয়, কেবল সুবা বাঙলা, কাশ্মীর ও সিন্ধু অঞ্চল ছাড়া। অর্থাৎ 'রায়তওয়ারী' বন্দোবস্ত প্রচলন করা হয়। পরে দাক্ষিণাত্যেও আওরঙজীব রাষ্ট্রপ্রতিনিধিরূপে মুর্শিদকুলি খাঁর সহযোগিতায় ঐ ব্যবস্থা চালু করেন। কৃষি-ভূমির প্রকারভেদ অনুসারে চারটি শ্রেণী নির্ণয়, উৎকৃষ্ট জরিপ ব্যবস্থা, তদনুযায়ী খাজনা নির্দেশ, কর্মচারীদের অত্যাচার নিবারণের বিরুদ্ধে সতর্কতা—এগুলি মুঘল রাজস্ব বিভাগের বৈশিষ্ট্য। এই সব উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা রাজস্ব আদায় ও আয়বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিত হয়।

তোডরমল

রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত

রাজস্ব ব্যবস্থা

সমাজ ঃ বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী ও ভারতীয় সাহিত্য ভাল করে পড়লে মুঘল যুগের সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি ও সাংস্কৃতিক জীবন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়। মুঘল যুগে সমাজ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল, (১) সম্ভ্রান্ত ধনিক শ্রেণী, (২) ব্যবসায়ী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও (৩) দরিদ্র জনসাধারণ।

বিদেশী পর্যটকদের বিবরণী থেকে প্রাপ্ত তথ্য

বাদশাহ ছিলেন সমাজের শীর্ষস্থানে। সমাজের সর্বোচ্চ স্থানে রাজা ও তাঁর নিচে ছিল তিন শ্রেণীতে বিভক্ত অনেকটা সামন্ততান্ত্রিক সমাজ। অভিজাত শ্রেণী ছিল অত্যন্ত বিত্তশালী এবং সরকারের যাবতীয় উচ্চ পদ ও সুযোগ সুবিধার একমাত্র অধিকারী। তাঁরা সর্বদা বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতেন। মদ্যপান ও নিম্নস্তরের আমোদ প্রমোদ তাঁদের নিত্যসহচর ছিল। অর্থের প্রাচুর্যে আরামে ও আলস্যে তাঁদের জীবনের গতি ছিল মন্থর।

শ্রেণীবিভাগ, বিত্তশালী অভিজাত ও উচ্চ রাজকর্মচারীদের সমাজ জীবন

ঐতিহাসিক আবুল ফজল বলেন যে, বাদশাহের অন্তঃপুরে ৫০০০ স্ত্রীলোকের স্থান ছিল। আবার সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় ওলন্দাজ পর্যটক পেলসার্ট আগ্রায় ধনিক শ্রেণীর জীবন সম্পর্কে নিখুঁত ছবি তুলে ধরেছেন। এই সম্প্রদায়ের লোকেরা আড়ম্বরপূর্ণ স্বেচ্ছাচারী ও দুর্নীতিবহুল জীবন যাপন করত। মধ্যবিত্ত শ্রেণী এবং ব্যবসায়িগণের জীবনযাত্রার ধরনে তবু সংযম, সদাচার ও সরলতার নিদর্শন ছিল। ধনী ব্যবসায়ীরা অবশ্য অশনে ব্যসনে উচ্চ ধরনের জীবন যাপন করত। কিন্তু সর্বনিম্ন জনসাধারণের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। বাবর থেকে টের্রি সকল বৈদেশিক লেখকই শ্রমজীবী

আবুল ফজল ও পেলসার্টের সাক্ষ্য, মধ্যবিত্ত জীবন শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর দুরবস্থা

শ্রেণীর দুরবস্থার চিত্র এঁকেছেন। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কৃষকদের উপর নির্যাতন করত। এই অত্যাচার ও চাষীদের দুর্দশা পেল সার্টের বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

শিল্প ও বাণিজ্য : ব্যবসা-বাণিজ্য, যাতায়াত ও সৈন্য সরবরাহের জন্য ছিল বড় বড় রাজপথ আর যানবাহনের মধ্যে ছিল গরুর গাড়ি, পালকি, ঘোড়া, উট ও হাতি। শিল্পদ্রব্য ও নৌকা তৈরির জন্য অনেক কারখানা ছিল, চাষী ও জেলেরা নিজেদের কাজ না থাকলে এই সব কারখানায় সাময়িকভাবে কাজে নিযুক্ত হত। শিল্প ও খনির কাজ ছোট আকারে বিভিন্নস্থানে গড়ে উঠেছিল। সরকারী কারখানাগুলি শিল্পোৎপাদনের উৎস ছিল। কোনও কোনও আমীর ওমরাহ, এমনকি রাজকুমার সুজাও ব্যবসা-বাণিজ্যে টাকা খাটিয়ে অনেক রোজগার করতেন। এ যুগে এসিয়া ও য়ুরোপের বিভিন্ন দেশের সঙ্গে স্থলপথে ও জলপথে ভারতের বাণিজ্য চলত। বিদেশে রপ্তানি হত নীল, আফিম, লঙ্কা, রেশম, মসলিন, হাতির দাঁতের জিনিস ও সুগন্ধি গাছ-গাছড়া। ইংরেজ কুঠিয়ালদের কাগজপত্র থেকে জানা যায় যে বাঙলাদেশ থেকে সুতির কাপড়, সোরা, তেল ও ঘি সস্তায় কিনে ইংরেজ বণিকরা বাইরে চালান দিয়ে মোটা রকম মুনাফা পেত। আকবরের আমলে ভারতের আমদানি ও রপ্তানি কারবারে ইংরেজ ও ওলন্দাজ বণিকরা অংশগ্রহণ করত। আওরঙজীবের মৃত্যুর পর রাজ্যের বিশৃঙ্খলা, সামন্তদের ষড়যন্ত্র, বিদেশী আক্রমণ ও মারাঠাদের লুণ্ঠনে ভারতের আর্থিক অবস্থার অবনতি ঘটে।

জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য

বাঙলাদেশে উৎপন্ন রপ্তানি দ্রব্য

আওরঙজীবের মৃত্যুর পর বাণিজ্যের অবনতি

সাহিত্য : মুঘল বাদশাহগণ সকলেই সাহিত্যানুরাগী ছিলেন, তাই মুঘল যুগে ফার্সী ও দেশীয় সাহিত্য ও ভাষার প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। বাবর তুর্কী ভাষায় আত্মজীবনী রচনা করেন, ফার্সীতেও তাঁর বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পুত্র হুমায়ুনও সুপণ্ডিত সাহিত্যরসিক ছিলেন। রাজপরিবারের মহিলাদেরও সাহিত্য-প্রতিভা কম ছিল না। বাবরের কন্যা গুলবদন 'হুমায়ুন-নামা' গ্রন্থ লিখেছিলেন, আওরঙজীবের কন্যা জেবউন্নিসা সুন্দর কবিতা রচনা করতেন। স্বয়ং শিক্ষিত না হলেও আকবরের মেধা, বিদ্যোৎসাহিতা ও সাহিত্যানুরাগ সর্বজনপ্রসিদ্ধ। তাঁর সভায় বহু পণ্ডিত ও কবির সমাদর ছিল। কবি ফৈজী, ঐতিহাসিক ও সমালোচক আবুল ফজল, পণ্ডিতপ্রবর বদাওনি, সুরসিক বীরবল রাজসভা অলঙ্কৃত করতেন। আকবরের উৎসাহে অথর্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত ও লীলাবতী নামে একখানি গণিতশাস্ত্রের পারস্য ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছিল। কাব্য সাহিত্যে ফৈজী এবং 'আইন-ই-আকবরী' ও 'আকবর-নামা'র রচয়িতা হিসেবে ভ্রাতা আবুল ফজলও অখণ্ড যশ অর্জন করেছিলেন।

মুঘল সম্রাটগণের সাহিত্যানুরাগ বাবর ও হুমায়ুন, গুল-বদন, জেবউন্নিসা

আকবরের পণ্ডিত-সমাজ, হিন্দু গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ

ইতিহাস চর্চা : আবুল ফজল ছাড়াও আকবরের রাজত্বে আর যে দুইজন

খ্যাতনামা ব্যক্তি ফার্সী ভাষায় ইতিহাস রচনা করেন, তাঁদের নাম বদাওনি ও নিজামউদ্দিন। এঁদের ইতিহাস প্রামাণ্য গ্রন্থ। জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক ঐতিহাসিক কাসিম ফিরিস্তার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য, ইনি দাক্ষিণাত্যের লোক ছিলেন। তাঁর লিখিত 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' একখানি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে ভারতীয়-পারস্য সাহিত্যের গ্রন্থ প্রণয়ন হ্রাস পায়নি। শাহজাহানের সময় আবদুল হামিদ লাহোরী-কৃত 'বাদশাহ-নামা' লিখিত হয় এবং আওরঙজীব ইতিহাস রচনা নিষেধ করলেও গোপনে কাফি খাঁ 'মুন্‌তাখাব-উল-লুবাব' গ্রন্থে তাঁর রাজত্বকালের বিবরণ লিখে যান। এই যুগে সুজন রায়, ঈশ্বর দাস প্রভৃতি হিন্দু লেখকগণও ইতিহাস রচনা করেন।

মুঘল যুগের ঐতিহাসিক, বদাওনি, নিজামউদ্দিন, ফিরিস্তা, আব্দুল হামিদ, লাহোরী, কাফি খাঁ, সুজন রায় ও ঈশ্বর দাস

দেশীয় সাহিত্য ঃ এই যুগে বহুসংখ্যক লেখক তাঁদের সুললিত রচনার মাধ্যমে দেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধন করেন। হিন্দী সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তুলসীদাস। তাঁর 'রামচরিত-মানস' হিন্দী সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। আগ্রার অন্ধ কবি সুরদাস, কেশবদাস ও ভুষণ হিন্দী সাহিত্যে নব উন্মাদনা এনেছিলেন। এই যুগে বাঙলা সাহিত্যও বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়। কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', কৃত্তিবাসের 'রামায়ণ' এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর অমৃতময়ী লেখনী বাঙলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে। মুঘল যুগের শেষ দিকে দু'জন বাঙালী বিদগ্ধ কবি ভরতচন্দ্র ও সাধক রামপ্রসাদ চিরস্মরণীয়। এ যুগে মারাঠা সাহিত্যের দানও নগণ্য নয়। মহারাষ্ট্রে কতকগুলি ইতিহাস গ্রন্থ রচিত হয়। ছত্রপতি শিবাজীর সমকালীন লেখক রামদাস ও তুকারাম মারাঠাদের অভিনব প্রেরণা দিয়েছিলেন সন্দেহ নেই। এ যুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন বামন, ময়ুর ও মহীপতি। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য বহু টোল ও চতুষ্পাঠী এবং আরবী-ফার্সীর জন্য মক্তব ও মাদ্রাসা ছিল। জমিদার ও রাজন্যবর্গ পণ্ডিতদের যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

দেশীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ, কবি তুলসীদাস ও সুরদাস

কাশীরাম দাস, কৃত্তিবাস ও কবিকঙ্কণ, ভরতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ, রামদাস ও তুকারাম, টোল-চতুষ্পাঠী মক্তব-মাদ্রাসা

শিল্প ও স্থাপত্য ঃ ধনিক-সম্প্রদায় ও রাজাদের অনুগ্রহে মুঘল যুগে ভাস্কর্য ও স্থাপত্য-শিল্পের অভূতপূর্ব উন্নতি হয়েছিল। তৈমুরের বংশধরগণ প্রায় সকলেই সৌন্দর্যের উপাসক ছিলেন। শিল্পকলার শ্রীবৃদ্ধিকল্পে তাঁরা অনেকেই মুক্তহস্ত ছিলেন। আকবর জাহাঙ্গীর শাহজাহান প্রভৃতি মুঘল সম্রাটগণ যে অসংখ্য সুরম্য প্রাসাদ, মসজিদ ও সৌধ নির্মাণ করেন, এ কথা বলা বাহুল্য। মুঘল যুগে ভারতবর্ষে নতুন স্থাপত্যরীতি প্রবর্তিত হয়, একে ইন্দো-পারসীক (Indo-Persian) শিল্প বলা হয়। ভারতে মুঘলরা যে স্থাপত্যরীতির প্রবর্তন করেন, তা পারসীক ও ভারতীয় রীতির মিশ্রণে একটি অভিরাম স্থাপত্য-শৈলী। আকবরের বিশিষ্ট সৌধগুলি নির্মিত হয়েছিল ফতেপুর সিক্রিতে।

মুঘল সম্রাটদের সৌন্দর্য-প্রিয়তা, প্রাসাদ সৌধ ও মসজিদ

স্থাপত্যরীতি

এখানকার স্থাপত্যে ভারতীয় প্রভাব পরিস্ফুট। ফতেপুর সিক্রির মসজিদের সৌন্দর্য ও কারুকার্যের তুলনা নেই। আকবরের সময়ে নির্মিত অন্যান্য বিখ্যাত সৌধের মধ্যে দিল্লীতে হুমায়ুনের সমাধিমন্দির এবং আগ্রা ও দিল্লীর প্রাসাদদুর্গের নাম করা যেতে পারে। সেকেন্দ্রায় আকবরের লাল পাথরে তৈরি অপরূপ শ্বেতপ্রস্তর-চূড় সমাধিসৌধ আড়ম্বরহীন, গাম্ভীর্যপূর্ণ শিল্পনিদর্শন।

বিভিন্ন নমুনা

জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালেও স্থাপত্য শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হয়। জাহাঙ্গীরের আমলে নূরজাহানের পিতা ইত্মদ্দৌলার সমাধিমন্দির স্থাপত্যশিল্পের সূক্ষ্ম সৃষ্টি। শাহজাহানের শাসনকাল তো ধনসম্পদে স্থাপত্য-শোভায় ও ঐশ্বর্যে বিশ্ববিশ্রুত হয়ে আছে। সম্রাট স্বয়ং শিল্পকলার পরম অনুরাগী ছিলেন। দিল্লীর সন্নিকটেই তিনি শাহজাহানাবাদ নামে শহর নির্মাণ করান। এই প্রাসাদদুর্গে তাঁর প্রধান কীর্তি দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান ই-খাস। আগ্রার প্রাসাদদুর্গে মোতি মসজিদ বিস্ময়কর নির্মাণকৌশলের পরিচায়ক। তিনিই বিশ্ববিখ্যাত বহুমূল্য রত্নখচিত ময়ূর সিংহাসন তৈরি করেন। শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি তাঁর পত্নী মমতাজের স্মৃতি-সৌধ অনিন্দ্যসুন্দর তাজমহল। এর শিল্পসুষমা ও অনুপম শোভা বাস্তবিকই অতুলনীয়, পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য বলে গণ্য। স্থাপত্যশিল্পে ও চারুকলায় শাহজাহানের রাজত্বকাল এতই সুবিখ্যাত যে, তাঁর শাসনকালের ত্রুটি অনেক লেখকেরই দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে।

ইত্মদ্দৌলা

শাহজাহানের কীর্তি-নিদর্শন

চিত্রকলা ও সঙ্গীত : শুধু স্থাপত্য নয়, মুঘল যুগে চিত্রকলারও এক নতুন রূপ দেখা যায় ছবি আঁকার এই পদ্ধতির বিশেষত্ব হল, রঙের ব্যবহার, নক্সাদার কিনারা এবং ছোট আকার। শিল্পরসিকদের কাছে এই মুঘল 'মিনিয়েচর' খুব সমাদর ও সংগ্রহের সামগ্রী। আকবরের আমলেই মুঘল চিত্রকলার প্রবর্তন হয়, আবুল ফজল সতেরোজন চিত্রকারের নাম উল্লেখ করেছেন। জাহাঙ্গীরও দেশী বিদেশী চিত্রশিল্পের বিশেষ কদর করতেন, উৎসাহ দিতেন। তাঁর সময়ে মনসুর ও বিশেন দাস ছিলেন দুই বিখ্যাত চিত্রশিল্পী। হস্তলিপির কৌশল (যাকে 'ক্যালিগ্রাফি' বলা হয়) এবং পুঁথির পৃষ্ঠায়, বিশেষ করে চার কিনারায়, বিচিত্র অলংকার ও রঙিন চিত্রকর্মের জন্য মুঘল যুগ প্রসিদ্ধ। এই সময়ে 'কাংড়া' নামে আর একটি বিশিষ্ট চিত্রশিল্প-রীতি গড়ে ওঠে। এই রীতি গড়ে উঠেছিল রাজপুতনায় ও পাঞ্জাবের পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে।

আকবরের আমলেই মুঘল চিত্রকলার প্রবর্তন

জাহাঙ্গীর, ক্যাংড়া চিত্র-শিল্পরীতি

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও মুঘল আমল বিখ্যাত। মুঘলরা গান-বাজনার যথেষ্ট অনুরাগী ছিলেন, তাঁদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় সঙ্গীতবিদ্যার চর্চা ও প্রসার বাড়তে থাকে। আকবরের সভায় ছত্রিশজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিল্পী ছিলেন অদ্বিতীয় গায়ক ও সুরস্রষ্টা তানসেন। মালবের সুলতান সঙ্গীতজ্ঞ রাজ-বাহাদুর ছিলেন আকবরের সভাসদ। জাহাঙ্গীর ও শাহজাহান, দুজনেই কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের চর্চা ও সমাদর করতেন। কিন্তু শুচিতা ও সংযমের ভক্ত আওরঙজীব শিল্প ও সঙ্গীতচর্চা, এমনকি ইতিহাস-রচনাও বন্ধ করে দেন।

তানসেন, রাজবাহাদুর

দশম অধ্যায়

ভারতের ইতিহাস ১৭০৭ থেকে ১৮৫৭

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

[এক] মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতন

আওরঙ্গজীব মুঘল শক্তির পতনের জন্য অনেকখানি দায়ী। তাঁর দাক্ষিণাত্য অভিযানে শুধু লোকক্ষয় নয়, প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল। আওরঙজীবের বিশাল সাম্রাজ্যের রাজস্ব দিয়েও ক্রমাগত যুদ্ধের খরচ জোগান কঠিন হয়ে ওঠে। এই আর্থিক দৈন্য ক্রমে স্থায়ী ব্যাধি হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শাসনে শিথিলতা আসে এবং সম্রাটের মৃত্যুর পর (১৭০৭) থেকে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুঘল সাম্রাজ্যের এমন দুরবস্থা হল যে বাবর ও আকবরের প্রতিষ্ঠিত বাদশাহীর আর মর্যাদা রইল না। কিন্তু এই পরিণামের জন্য সমস্ত দায়িত্ব আওরঙজীবের উপর চাপানো চলে না। আরও অন্য কারণ ছিল। মুঘলদের বিশাল সাম্রাজ্য শাসন ও পালন করার মত দক্ষতা ও রাজনীতি-জ্ঞান পরবর্তী মুঘলদের মধ্যে দেখা যায় না। রাজপরিবারেও ভাঙন ধরেছিল, পরিবেশও অনুকূল ছিল না। যখন রাজ্যময় বিশৃঙ্খলা, চারদিকে বিদ্রোহ, তখন আওরঙজীবের বংশধররা উত্তরাধিকার যুদ্ধে লিপ্ত। স্বার্থ কলহে, অযোগ্যতায়, অপরের হাতে আপনার ভাগ্য সমর্পন করে তাঁরা কিভাবে অধঃপতনের ভূমিকায় নামলেন, তার কাহিনী এখন সংক্ষেপে বলি।

আওরঙজীবের আমলেই মুঘল সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা

যুদ্ধের জন্য আর্থিক দৈন্য, আওরঙ্গজীবের দায়িত্ব

পরবর্তী মুঘলদের দুর্বলতা, রাজপরিবারে ভাঙন, অনেক কারণের সমন্বয়

বাহাদুর শাহ (১৭০৭-১২) : ১৭০৭ সালের পর যাঁরা বাদশাহী তখ্‌তে বসলেন, তাঁদের বলা হয় (Later Mughals) বা 'পরবর্তী মুঘল'। আওরঙজীবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন ছেলের মধ্যে সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব বাধল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুত্র কুমার আজম ও কামবক্স ছিলেন দাক্ষিণাত্যে। সেই সুযোগে বড় ছেলে মুয়াজ্জম লাহোরের শাসক মুনিম খাঁর সাহায্যে আজমকে হারিয়ে দিয়ে সিংহাসন অধিকার করলেন বাহাদুর শাহ নাম নিয়ে। ওদিকে কামবক্সও পরাজিত ও নিহত হলেন। বাহাদুর শাহ বার্ধক্যে মসনদে বসেন, তবে মোটের উপর তিনি মন্দ মানুষ ছিলেন না। তাই গোড়া থেকেই তিনি আপসের পক্ষপাতী হলেন। শম্ভুজীর ছেলে শাহুকে মুক্তিদান ও কিছু বিজিত অঞ্চল প্রত্যর্পণ করা হল জুলফিকর খাঁর পরামর্শে, যাতে শাহুর সঙ্গে রাজারামের পত্নী তারাবাঈয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধে মুঘল সরকারের কূটনীতি

সিংহাসন নিয়ে দ্বন্দ্ব

শিখদের সঙ্গে যুদ্ধ, দেশ শাসনের অযোগ্যতা

সফল হল। তারপর রাজপুতদের সঙ্গেও বাহাদুর শাহ সন্ধি করলেন, তাদের স্বাধীনতা এক রকম মেনে নিয়ে তবে শিখদের সঙ্গে তাঁকে যুদ্ধ করতে হয়, কারণ আওরঙজীবের সময়ে শিখ-মুঘল সম্পর্ক খুব তিক্ত হয়ে যায়। বান্দার নেতৃত্বে শিখরা সরহিন্দ শহর দখল করলে বাহাদুর শাহ যুদ্ধে নামলেন। শিখ সৈন্য পরাস্ত হয়ে হটে গেল কিন্তু বান্দাকে ধরা গেল না, তিনি অদৃশ্য হলেন। সম্রাট মোটের উপর ভদ্র ও শান্তিপ্রিয় ব্যক্তি হলেও দেশশাসনে তাঁর সমুচিত যোগ্যতা ছিল না।

জাহান্দর শাহ (১৭১২-১৩) ও ফররুকশিয়র (১৭১৩-১৯)ঃ সম্রাটের মৃত্যুর পর আবার সেই ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব শুরু হল। চার ভাইয়ের মধ্যে প্রথমে প্রাণ হারালেন আওরঙজীবের প্রিয় পৌত্র আজিমুস্সান যিনি ছিলেন বাঙলার সুবাদার। তারপর অপর দুই ভাইয়ের প্রাণনাশ করে বড় ভাই জাহান্দর শাহ সিংহাসন পেলেন। অকর্মণ্য জাহান্দর মন্ত্রী জুলফিকর খাঁর সাহায্যে রাজ্য পেলেও এক বছরের বেশি রাজ্য ভোগ করেন নি। আজিমুস্সানের ছেলে ফররুক্শিয়র জুলফিকরকে বন্দী ও নিহত করে দিল্লীর মসনদে বসলেন। তাঁর সহায় ছিলেন সৈয়দ ভ্রাতারা, আবদুল্লা ও হুসেন আলি। এঁদের প্রতিপত্তি এই সময় থেকে এত বেড়ে গেল যে ইতিহাসে তাঁরা 'রাজকর্তা' নামে পরিচিত। এঁরা স্বার্থ ও ইচ্ছামত সিংহাসনে লোক বসিয়েছেন, সরিয়েছেন এবং যাবতীয় ক্ষমতা আপনাদের হাতে রেখেছেন। ফররুক্শিয়রকেও যেতে হল ছয় বছর পরে। সৈয়দ ভ্রাতাদের কবল থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি তাঁর বিশ্বাসভাজন মীর জুমলার সঙ্গে গোপন মন্ত্রণা করছেন দেখে আবদুল্লা ও হুসেন আলি নির্মম ভাবে প্রথমে তাঁকে বন্দী, পরে অন্ধ করে অনাহারে রেখে দিয়ে তাঁর প্রাণনাশ করেন। ফররুক্শিয়রের এই শোচনীয় পরিণাম চার দিকের চক্রান্ত, বিশৃঙ্খলা ও রাজ্যের আসন্ন দুর্দিনের অশুভ ইঙ্গিত। তাঁর রাজত্বের তিনটি প্রধান ঘটনা হল—মারবাড়ের অজিত সিংহের বিদ্রোহ ও সন্ধিস্থাপন, সেনাপতি অম্বররাজ জয়সিংহের হাতে জাঠ বিদ্রোহ দমন এবং গুরুদাসপুরে শিখ নেতা বান্দার পরাজয় ও নিধন। আর একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সম্রাটকে শাস্তি দেওয়ার জন্য হুসেন আলি পেশবা বালাজী বিশ্বনাথের সঙ্গে সন্ধি-সর্ত করে মারাঠা বাহিনীর সাহায্যেই তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করেন। জেনে রাখো, দিল্লী-বাদশাহের ভাগ্য নির্ধারণে এই হল মারাঠাদের প্রথম হস্তক্ষেপ।

বাদশাহী ভাগ্য নির্ধারণে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হস্তক্ষেপ

সাম্রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণে মারাঠা হস্তক্ষেপ

মহম্মদ শাহ (১৭১৯-৪৮)ঃ সৈয়দ ভাইদের প্রতাপ ক্রমেই অরাজকতা সৃষ্টি করল। তাঁরা পর পর দুই রাজকুমার রফি-উদ্-দরজত্ ও রফি-উদ্-দৌলাকে হাতের পুতুলের মত সিংহাসনে বসিয়ে নিজেরা সর্বময় কর্তৃত্ব চালাতে থাকলেন। শেষকালে বাহাদুর শাহের এক পৌত্র মহম্মদ শাহ নাম নিয়ে গদীতে বসলেন। রাজকর্তাদের সাহায্যে। সকলেই সৈয়দ ভাইদের যথেচ্ছ ক্ষমতায় উত্ত্যক্ত হয়ে উঠল। তখন তুরানী ও

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের কতৃত্ব ও প্রতাপ

ইরানী, এই দুই দলের দ্বন্দ্ব সাময়িকভাবে স্থগিত রেখে তাদের সহায়তায় সৈয়দ ভাইদের অপসারিত ও নিহত করা হল। কিন্তু অবস্থার কোন উন্নতি দেখা গেল না। অলস বিলাসপ্রিয় মহম্মদ শাহ সাম্রাজ্যের অধঃপতন রোধ করতে পারেন নি। একের পর এক অঞ্চল হস্তচ্যুত হতে থাকল। তুরানী দলপতি চিন কিলিচ খাঁ দাক্ষিণাত্যে হায়দরাবাদে রাজধানী করে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন এবং নিজাম-উল-মুল্‌ক নাম নিয়ে সেখানে নিজাম বংশ প্রতিষ্ঠা করলেন। অযোধ্যায় সুবাদার সদত খাঁ স্বাধীন নবাব বংশের সূত্রপাত করলেন, আর বাঙলার সুবেদার আলিবর্দি খাঁও স্বাধীন নবাব হয়ে বসলেন। ওদিকে জাঠরা আগ্রার কাছে স্বাধীন হয়ে উঠল, আফগান রোহিলারা কার্যতঃ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল আর মারাঠাগণ সুযোগ বুঝে পেশবার নেতৃত্বে দিল্লী পর্যন্ত তাদের প্রভাব ও শক্তি বিস্তার করল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় নিহত, বিভিন্ন অঞ্চল হস্তচ্যুত

নিজাম বংশ, অযোধ্যা, বাঙলা

জাঠ, আফগান,রোহিলা, পেশবার প্রভাব ও শক্তি বৃদ্ধি

এই অবস্থায় এল দুই বিভীষিকা, দুটিই ভারত-সীমান্তের বাইরে থেকে। একটি নাদির শাহের আক্রমণ, অপরটি আহম্মদ শা আবদালীর প্রথম অভিযান। নাদির শাহ এক তুর্কী যোদ্ধা। আফগানদের বিতাড়িত করে তিনি পারস্যের সিংহাসন দখল করেন। তারপর কান্দাহার জয় করে ভারতের দিকে অগ্রসর হন। তাঁর ভারত আক্রমণের অজুহাত হল, মহম্মদ শাহ পলাতক আফগানদের আশ্রয় দিয়েছেন। পেশোয়ার লাহোর দখল করে দিল্লীর পথে কর্নালের যুদ্ধে তিনি মুঘল বাহিনীকে পরাস্ত করেন। অতঃপর দিল্লী প্রবেশ ও লুণ্ঠন। অগ্নিকাণ্ড, অগণিত নরহত্যা দ্বারা তিনি যে ভয়ংকর প্রতিশোধ নিলেন তা অবর্ণনীয়। রাজধানীর শোচনীয় অবস্থা দেখে মহম্মদ শাহ সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। তারপর ব্যাপক জরিমানা আদায় করে বিশ্ববিখ্যাত কোহিনুর হীরা, ময়ূর সিংহাসন ও অজস্র ধনরত্ন নিয়ে, ৫৮ দিনব্যাপী লোমহর্ষক তাণ্ডব শেষ করে নাদির শাহ দেশে ফিরে গেলেন। এর ফলে পতনমুখী মুঘল সাম্রাজ্য যে আর্থিক ক্ষতি, লোকক্ষয় ও মর্যাদাহানির প্রচণ্ড আঘাত পেল, তা কাটিয়ে ওঠার সামর্থ্য আর রইল না।

নাদির শাহের আক্রমণ

আহম্মদ শাহ (১৭৪৮-৫৪)ঃ এর পরেই এল দ্বিতীয় আঘাত। মহম্মদ শাহের পর আহম্মদ শাহ তখন দিল্লীর মসনদে। এই সময়ে নাদির শাহের অনুচর দুরানী দলপতি আহম্মদ শাহ আবদালী ভারতে হানা দিলেন পর পর তিন বার। এইসব অভিযানের ফলে পাঞ্জাব ও কাশ্মীর আফগান অধিকারভুক্ত হয়। এইভাবে সংকুচিত বাদশাহী পরাজয়ের গ্লানিতে অসহায় হয়ে পড়ল। ইতিমধ্যে নিজামের পৌত্র গাজিউদ্দিন রাজ্যের কর্তৃত্ব হস্তগত করে আহম্মদ শাহকে অন্ধ করে দিয়ে জাহান্দর শাহের এক পুত্রকে সিংহাসনে বসালেন। তাঁর নাম ছিল দ্বিতীয় আলমগীর।

আহম্মদ শাহ আবদালির অভিযান

দ্বিতীয় আলমগীর (১৭৫৪-৫৯) ঃ দ্বিতীয় আলমগীর আওরঙজীবের উপাধি নিলেও তাঁর কোন যোগ্যতা ছিল না। পাঞ্জাব পুনরধিকারের চেষ্টা হচ্ছে দেখে আবদালী চতুর্থ বার ভারত আক্রমণ করেন। দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠিত হল। কাশ্মীর পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে আফগান অধিকার প্রতিপন্ন করে তিনি ফিরে গেলেন। কিন্তু শিখ বিদ্রোহে আর রঘুনাথ রাও-এর মারাঠা বাহিনীর আক্রমণে লাহোর হস্তচ্যুত হওয়ায় আবদালী ক্ষিপ্ত হয়ে পঞ্চম বার হানা দিয়ে পাঞ্জাব আবার দখল করে নিলেন (১৭৫৯)।

আবদালী কর্তৃক দিল্লী ও মথুরা লুণ্ঠিত ও পাঞ্জাব অধিকার

দ্বিতীয় শাহ আলম (১৭৫৯-১৮০৬) ঃ বাদশাহ আহম্মদ শাহ ইতিমধ্যে নিহত হলে গাজিউদ্দিন শাহজাদা আলি গহরকে (দ্বিতীয় শাহ আলম) মসনদে বসিয়েছিলেন। এঁর সময়েই আবদালী পঞ্চম ও ষষ্ঠ অভিযান চালিয়েছিলেন। আপনার কর্তৃত্ব বজায় রাখা ও শত্রুদের চক্রান্ত ভাঙার জন্য গাজিউদ্দিন শক্তিশালী মারাঠাদের সাহায্য চাইলেন। দিল্লীতে কর্তৃত্ব লাভের সুযোগ বুঝে পেশবা বাজী রাও আসরে নামলেন। তাঁর ভাই রঘুনাথ রাও মারাঠা বাহিনী নিয়ে মুঘলদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পাঞ্জাব থেকে আফগান প্রভুত্ব বাতিল করে দেওয়াতে আবদালী শেষ অভিযানে অগ্রসর হলেন। একদিকে মারাঠা-মুঘল, অপর দিকে আবদালীর নেতৃত্বে উত্তর-পশ্চিম ভারতের যাবতীয় মুসলিম শক্তি জোট। ১৪ই জানুয়ারি ১৭৬১ উভয় পক্ষ ঐতিহাসিক অঙ্গনে তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে সম্মুখীন হলে, আহম্মদ শাহ আবদালী জয়লাভ করেন। মুঘল-মারাঠার তথা ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। নাদির শাহের আক্রমণ আর আবদালীর শেষ অভিযানের মধ্যে অল্পকালের ব্যবধান। এরই মধ্যে সবসুদ্ধ সাতটি আক্রমণ ও ধ্বংসলীলা পতনোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যকে ধরাশায়ী করে দিল।

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ, ১৭৬১

মুঘল-মারাঠা জোটের পরাজয়

দ্বিতীয় আকবর ও দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ (১৮০৬-৫৮) ঃ এদিকে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার স্বাধীন নবাবী আমলও শেষ হল পলাশীর পরে (১৭৫৭)। এখন পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের পর বাদশাহীর কিছুই অবশিষ্ট রইল না, শুধু শত্রুবেষ্টিত দিল্লী দুর্গনগরী। সেখানেই শেষ দুই সম্রাট দ্বিতীয় আকবর (১৮০৬-২৭) আর দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ সিপাহী বিপ্লব পর্যন্ত নামে মাত্র মসনদে আসীন ছিলেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় শাহ আলম বার্ষিক বৃত্তির বিনিময়ে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী দিয়েছিলেন। ফলে সেখানে ইংরেজ আধিপত্য কায়েম হল। শেষ দুই মুঘলের সময়ে সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিকার বলতে দিল্লীর কেল্লাই ছিল। সিপাহী বিপ্লবে লিপ্ত থাকার অপরাধে দ্বিতীয় বাহাদুর শাহকে রেঙ্গুনে নির্বাসিত করা হয়।

বাঙলা, বিহার, ওড়িশায় ইংরেজ আধিপত্য

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহের নির্বাসন

সেখানেই ১৮৬২ সাল পর্যন্ত দীন-হীন অবস্থায় বিখ্যাত মুঘল বংশের শেষ প্রতিনিধি কোন মতে জীবন যাপন করেন।

১৭০৭ সাল পর্যন্ত যে সাম্রাজ্য ক্ষমতায়, ঐশ্বর্যে বিদেশী আগন্তুকদের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল, পরের পঞ্চাশ বছরে তার এত দ্রুত অবসান যেন নাটকীয় মনে হয়। অপ্রত্যাশিত হলেও এই পতন হঠাৎ ঘটেনি, পিছনে পুঞ্জীভূত নানা কারণ রয়েছে। ধ্বংসের বীজ উপ্ত হয়েছিল আওরঙজীবের রাজত্বকালেই। তাঁর স্বভাব রাজনীতি ও ধর্মনীতিতে বড় ত্রুটিগুলির ফল যে বিষময় হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সন্দিগ্ধ মন, গোঁড়ামি এবং রাজপুত ও দাক্ষিণাত্য নীতির কথা তোমরা পড়ে এসেছ। শুধু মনে রাখতে হবে, অধঃপতনের দায়িত্ব একা আওরঙজীবের নয়। তাঁর মৃত্যুকালেও সাম্রাজ্যের যে বৃহৎ আয়তন ও শক্তি ছিল, তা রক্ষা করার মত লোক ছিল না। ১৭০৭ সালের পর যাঁরা দিল্লীর মসনদে বসেছিলেন, তাঁরা প্রায় সবাই দুর্বল বিলাসী ও অক্ষম ছিলেন। উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট আইন না থাকায় জাহাঙ্গীরের সময় থেকে প্রায় সব রাজত্বেই সিংহাসন নিয়ে বিরোধ ও যুদ্ধ বেধেছে। দাবীদারদের মধ্যে কারও রাজ্যলাভ, কারও বা প্রাণহানি। মুঘল বংশধররা মন্ত্রীদের হাতের পুতুল হয়ে পড়েন। ইংরেজ বণিকদল যখন শাসক হবার চেষ্টা করছিলেন, তখন কেবল 'বাদশাহ' নামের মোহটুকুই ছিল। বাদশাহ আছেন, তাঁর স্থায়িত্ব ও জীবনই অনিশ্চিত, রাজ্য তো দূরের কথা। প্রদেশগুলির শাসনে বিশৃঙ্খলা, সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করার মত দক্ষতার অভাব, আর রাজদরবারে হীন বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র। মন্ত্রী ও ওমরাহদল পরস্পর শক্তি পরীক্ষায়, আত্মকলহে ও চক্রান্তে মুঘল রাষ্ট্রের ভিত্তিই নষ্ট করে দেয়।

আওরঙজীবের দায়িত্ব ছাড়াও অন্যান্য কারণ—সাম্রাজ্যের বিশালতা

দুর্বল ও অযোগ্য বংশধর, অনিশ্চিত উত্তরাধিকার, বাদশাহীর দুরাবস্থা

প্রাদেশিক শাসনে বিশৃঙ্খলা, সামরিক দক্ষতা হ্রাস, রাজদরবারে আত্মকলহ ও চক্রান্ত

১৭৫৭ সাল পর্যন্ত এই আধা-সামরিক সামন্ত-সমাজে একদিকে স্বার্থান্বেষী সামন্তের দল, অপর দিকে অকর্মণ্য আমলা সরকার। তার উপর দাক্ষিণাত্য থেকে নবোত্থিত মারাঠাদের আক্রমণ ও শক্তি বিস্তার এবং পারস্য ও আফগানিস্থান থেকে নাদির শাহ ও আহম্মদ শা আবদালীর পর পর ধ্বংসাত্মক অভিযান। এই সব কারণে এমন একটি জটিল দূষিত নৈরাশ্যজনক অবস্থার সৃষ্টি হয় যে দুর্বল মুঘল সরকারের এই পরিণতি অনিবার্য হয়ে ওঠে। মুঘলদের সবই ছিল—বিশাল দুর্গ প্রাসাদ, পূর্ণ রাজকোষ, মনসবদার, সুবাদার, কামান ও অশ্বারোহী সৈন্য ; রাজসভার আড়ম্বর ও মণিময় সিংহাসন, আর দরবারী শিল্পকলা, সংগীত ও শ্বেতমর্মরের সমারোহ। বিপুল উপকরণের কিছুই অভাব ছিল না। অভাব ছিল শাসকদের সঙ্গে এ দেশের

স্বার্থান্বেষী সামন্ত-সমাজ ও অকর্মণ্য আমলা সরকার, মারাঠাদের আক্রমণ ও শক্তি বৃদ্ধি, নাদির শাহ ও আবদালীর অভিযান

জনসমাজের সংযোগ। আওরঙজীব ছাড়া কোন সম্রাট ব্যয়-সংকোচ করেন নি। জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় রাজস্বের পরিমাণ কমে গিয়েছিল জায়গীরদারগণ ছিলেন দুর্নীতি-পরায়ণ। ফলে কৃষকদের নিকট থেকে আদায় করা রাজস্বের উদ্বৃত্ত অংশ রাজকোষে জমা পড়ত না। জমি থেকে রাজস্বই আদায় করা হত কিন্তু কৃষকদের সমস্যা এবং জমি ও খাজনার নতুন কিছু বন্দোবস্ত নিয়ে কোনও চিন্তা বা পরীক্ষা করা হয় নি। তাই মুঘল সরকারের আর্থিক ভিত্তি পাকা ছিল না। এই সব কারণ বিবেচনা করলে বোঝা যায়, মুঘল সাম্রাজ্যের পতন একটা আকস্মিক ছন্দোপতন নয়।

জায়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি রাজস্ব হ্রাস

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন কোনআকস্মিক ঘটনা নয়

[দুই] আঞ্চলিক শক্তিগুলির অভ্যুত্থান

মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্বে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব শিথিল হয়ে পড়ে। তখন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ কার্যতঃ নিজেদের স্বাধীন বলে ঘোষণা করেন। দিল্লীর প্রতি তাঁদের আনুগত্য ছিল বাহ্যিক। এই ভাবে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েকটি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন শক্তির উত্থান ঘটে। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বাঙলা, হায়দরাবাদ, মহীশূর, অযোধ্যা এবং পাঞ্জাবের শিখগণ। ওদিকে জাঠরা আগ্রার কাছে স্বাধীন হয়ে উঠল, আর আফগান রোহিলারা কার্যতঃ স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করল।

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষ থেকে কয়েকটি স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন শক্তির উদ্ভব

বাঙলাদেশ ঃ সম্রাট আকবরের আমল থেকে আওরঙজীব পর্যন্ত বাঙলাদেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ হিসেবে সম্রাটের মনোনীত প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদার কর্তৃক শাসিত হত। কিন্তু আওরঙজীবের মৃত্যুর পর মুঘল কেন্দ্রীয় শাসন শিথিল হয়ে পড়ে। তখন বাঙলাদেশ ধীরে ধীরে স্বাধীন হয়ে যায়। আওরঙজীব সুযোগ্য প্রশাসক মুর্শিদকুলি জাফর খাঁকে ১৭০০, খ্রীস্টাব্দে বাঙলার 'দেওয়ান' এবং মুর্শিদাবাদের ফৌজদার হিসেবে নিযুক্ত করেন। সম্রাট ফররুখশিয়ার ১৭১৩ খৃস্টাব্দে মুর্শিদ-কুলিকে দেওয়ান ছাড়াও বাঙলার নায়েব-সুবাদার পদে নিযুক্ত করেন। ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি বাঙলার সুবাদার পদ লাভ করেন এবং ১৭২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। মুর্শিদকুলি ছিলেন শক্তিশালী ও সুযোগ্য শাসক। অবশ্য স্থানীয় জমিদারগণের কাছে থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে মাঝে মাঝে তিনি খুব কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। বাঙলার অর্থনৈতিক স্বার্থের তাগিদে তিনি ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক 'দস্তকের' অপব্যবহার রোধ করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং ভারতীয় বণিকদের মতোই ইংরেজ বণিকদের কাছে থেকে বাণিজ্য শুল্ক আদায়ের জন্য চেষ্টা করেছিলেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ

১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার সুবাদার পদ লাভ

ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক

১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে মুর্শিদকুলির মৃত্যু হয়। তখন তাঁর জামাতা সুজা-উদ্-দিন বাঙলার মসনদে আরোহণ করেন। তাঁর আমলে বিহার সুবা অধিকৃত হয়। তিনি আলিবর্দি খাঁকে বিহারের নায়েব পদে নিযুক্ত করেন। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে সুজাউদ্দিনের মৃত্যু হ'লে তাঁর পুত্র সরফরাজ খাঁ বাঙলার মসনদে আরোহণ করেন। শাসক হিসেবে সরফরাজ খাঁ ছিলেন অযোগ্য। ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে আলিবর্দি'র হাতে সরফরাজ পরাজিত ও নিহত হন।

সুজাউদ্দীন

সরফরাজ খাঁ

বাঙলার মসনদ দখল করার পর আলিবর্দি ওড়িশার বিদ্রোহ দমন করেন। ওড়িশায় তাঁর আধিপত্য স্থাপিত হয়। তিনি মুঘল সম্রাটকে উপঢৌকন প্রেরণ করেন এবং এইভাবে সিংহাসনে নিজের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ক্রমাগত মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ওড়িশার একাংশ এবং বাৎসরিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ হিসেবে মারাঠাগণকে দিতে সম্মত হন এবং এইভাবে মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির উত্তরোত্তর শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে আলিবর্দি সজাগ ছিলেন। তাই বাণিজ্য করার অধিকার দিলেও ইংরেজগণকে দুর্গ নির্মাণ বা সামরিক শক্তি বৃদ্ধির সুযোগ দেন নি। যাই হোক, মৃত্যু কাল পর্যন্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাথে আলিবর্দি সদ্ভাব-রক্ষা করে চলেছিলেন।

আলিবর্দি খাঁ, ওড়িশায় আধিপত্য স্থাপন, মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে সম্পর্ক

১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিবর্দি খাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দৌহিত্র মির্জা মহম্মদ সিরাজ-উদ্-দৌলা উপাধি নিয়ে বাঙলার সিংহাসনে আরোহণ করেন। সিরাজের মাত্র ১ বৎসর দু'মাস রাজত্বকাল ভারত ইতিহাসের এক যুগান্তকারী অধ্যায় রচনা করেছিল।

আলিবর্দির মৃত্যু, সিরাজের মসনদলাভ

হায়দরাবাদ ঃ মুঘল দরবারের জনৈক প্রভাবশালী অভিজাত তুরাণী দলপতি চিন কিলিচ খাঁ হায়দরাবাদে রাজধানী করে নিজাম-উল-মুলক নাম নিয়ে ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রচেষ্টায় সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতন হয়। এর বিনিময়ে সম্রাট মহম্মদ শাহ তাঁকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। এর পর ১৭২৩-২৪ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের উজীর ছিলেন। কিন্তু সম্রাটের সাথে মত পার্থক্য ঘটায় তিনি পদত্যাগ করেন এবং ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। স্বাধীনতা ঘোষণা না করলেও তিনি একপ্রকার স্বাধীন রাজাই ছিলেন। তাঁর শাসন দক্ষতা ছিল অসাধারণ। যথোপযুক্ত রাজস্ব সংস্কারের মাধ্যমে তিনি রাজ্যের অর্থনীতিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। বিদ্রোহ দমনে ও মারাঠাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠনে তাঁর শাসন দক্ষতার পরিচয়

নিজাম-উলমুলক

দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা, পদত্যাগ

হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা, শাসন দক্ষতা

পাওয়া যায়। কাফী খাঁ নিজামের দাক্ষিণাত্যে সুশাসন প্রতিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। নিজাম-উল্-মুলক ৯১ বছর বয়সে ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দের ২১শে মে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এর ফলে ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির পক্ষে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হয়।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, দাক্ষিণাত্যে কোম্পানীর হস্তক্ষেপের সুযোগ

কর্নাটক : মুঘল আমলে কর্নাটক (মহীশূর) ছিল দাক্ষিণাত্যের একটি সুবা বা প্রদেশ। কিন্তু সম্রাট মোহম্মদ শাহের আমলে নিজাম স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর কর্নাটকের সহকারী শাসনকর্তা নিজেকে কর্নাটকের স্বাধীন নবাব বলে ঘোষণা করেন। তাছাড়া 'নবাব' পদকে তিনি বংশানুক্রমিক করে তোলেন। নিজামের সম্মতি না নিয়ে কর্নাটকের নবাব সাদাত উল্লাহ্ খাঁ ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্ত আলিকে নবাব পদের জন্য উত্তরাধিকার হিসেবে মনোনীত করে যান। কিন্তু ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দের পর কর্নাটকে নবাব পদের জন্য তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়। এই সুযোগে বিভিন্ন ইউরোপীয় বাণিজ্য-কোম্পানি দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করার প্রথম সুযোগ লাভ করেন।

সাদাত উল্লাহ খাঁ
দোস্ত আলি

উত্তরাধিকার দ্বন্দ্ব ও কোম্পানি

অযোধ্যা : মুঘল যুগের শেষ পর্বে অযোধ্যা সুবার মধ্যে শুধু বর্তমানের অযোধ্যা অঞ্চলই ছিল না, তার সাথে ছিল পূর্বে বেনারস, পশ্চিমের কিছু অঞ্চল এবং এলাহাবাদ ও কানপুরের কাছাকাছি কয়েকটি জেলা। খোরাসান থেকে আগত সাদাত খাঁ ছিলেন অযোধ্যা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ১৭২৪ খ্রীস্টাব্দে অযোধ্যায় শাসনকর্তা-রূপে নিযুক্ত হ'ন। তারপর খুব কম সময়ের মধ্যে তাঁর যশ ও ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। তাঁর আমলে অযোধ্যার অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নত হয়। ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর আগে তিনি কার্যতঃ অযোধ্যাকে স্বাধীন করে যান এবং বংশানুক্রমিক শাসনের ব্যবস্থা করে যান। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জামাতা সফদর জং অযোধ্যার শাসনকর্তা রূপে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৭৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের উজির পদে নিযুক্ত হন। ১৭৫৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর কিছুকাল আগে সফদর জং নিজাম-উল্-মুলকের বংশধরগণের বিরোধিতা সত্ত্বেও সমকালীন ভারত-ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। সফদর জং রোহিলা ও পাঠানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে মারাঠা ও জাঠদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মুঘল সম্রাটকে সাহায্যের উদ্দেশ্যে পেশবার সঙ্গে চুক্তি করেন, তবে পেশবা দিল্লীতে তাঁর বিরোধী শিবিরে যোগ দেওয়ায় এই চুক্তি অকার্যকর হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র সুজা-উদ্-দৌলা অযোধ্যার শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করেন এবং তিনিও মুঘল সাম্রাজ্যের উজির হন। ১৭৭৫ খ্রীস্টাব্দে

আয়তন

সাদাত খাঁ

সফদর জং

সুজা-উদ্-দৌলা

তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত সুজা-উদ্-দৌলা উত্তর ভারতের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

শিখ শক্তির উত্থান ঃ ইংরেজদের বিরুদ্ধে শিখদের প্রতিরোধের কথা পড়তে গিয়ে তাদের পূর্ব ইতিহাস কিছু জানা উচিত। তাই শিখজাতির উদ্ভব থেকে রণজিৎ সিংহের উত্থান পর্যন্ত কাহিনী সংক্ষেপে বলি। পাঠান যুগের শেষ দিকে গুরু নানকের পবিত্র জীবন ও উপদেশ তোমরা আগে পড়েছ। গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি হল শিখ ধর্মের প্রধান অঙ্গ। নানকের পরবর্তী গুরুদেবের নাম অঙ্গদ, অমরদাস ও রামদাস যিনি 'অমৃত সরোবর' খনন করেন। কালে সেই 'অমৃতসরে' বিখ্যাত স্বর্ণ মন্দির তৈরি হয় এবং শিখদের পবিত্রতম তীর্থ বলে গণ্য হয়। গুরুর অনুগামী ভক্তরা শিষ্য বা 'শিখ' নামে একটি নতুন সম্প্রদায়ে পরিণত হল। রামদাসের ছেলে পঞ্চম গুরু অর্জুন, সম্রাট জাহাঙ্গীর তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেন। সেই থেকে মুঘলদের সঙ্গে শিখদের স্থায়ী বিরোধ ও যুদ্ধ। অর্জুনের পরবর্তী গুরুদের নাম হরগোবিন্দ, হররায় ও হরকিষণ। নবম গুরু ছিলেন তেগ বাহাদুর, আওরঙজীবের নির্দেশে যাঁর প্রাণদণ্ড হয়। তাঁর পুত্র দশমগুরু গোবিন্দ সিংহ পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নেন। সৈন্য ও সামরিক শক্তি সঞ্চয় করে তিনি মুঘলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন ও কয়েকবার মুঘল সৈন্যদের হারিয়ে দেন। তিনি শিষ্যদের 'পহল' দীক্ষা দিয়ে তাদের একতাবদ্ধ যোদ্ধার জাতিতে পরিণত করেন। প্রত্যেক শিখ হলেন গুরুর পুত্র। দীক্ষামত শিখদের 'পঞ্চ কক্কার' ধারণ অবশ্য কর্তব্য—হাতে লোহার কড়া, মাথায় দীর্ঘ কেশ ও কাঙ্গা (চিরুনী), কোমরে কচ্ছ (ছোট ইজের) এবং মুষ্টিতে কৃপাণ বা তরবারী। জাতিভেদ না মেনে শিষ্যরা পরস্পর ভ্রাতৃভাব পোষণ করবে, এই ছিল গুরু গোবিন্দের আদেশ। এরপর তিনি গুরুর পদ উঠিয়ে দিয়ে 'খালসা' (মুক্ত) নামে পবিত্র ধর্ম-সংঘ স্থাপন করেন। শিখরা 'গ্রন্থসাহেবে' গুরুর উপদেশমত সাধন ভজন করতে থাকে।

নানক

শিষ্য বা শিখ, পঞ্চম গুরু অর্জুনকে জাহাঙ্গীরের মৃত্যুদণ্ড

নবম গুরু তেগবাহাদুরের প্রাণদণ্ড, দশম গুরু গোবিন্দ, খালসা

মুঘলদের কাছে অনেক নির্যাতন সহ্য করার পর গুরু গোবিন্দের দেহান্ত হল। তারপর তাঁর এক শিষ্য মাধোদাস (তিনি 'বান্দা' বা গুরুর দাস নামে পরিচিত) শিখদের একত্র করে মুঘল রাজ্যে হানা দিতে থাকেন। মুঘল সাম্রাজ্যের তখন পতনদশা। শেষে ফররুক-শিয়রের আমলে সৈয়দ ভ্রাতারা বান্দাকে তাঁর সৈন্যসমেত বন্দী করেন এবং দিল্লীতে নিয়ে তাঁদের মেরে ফেলেন। এই নিয়েই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'পঞ্চনদীর তীরে '। আহম্মদ শা আবদালী যখন পাঞ্জাব আক্রমণ করেন, তখন শিখদের সঙ্গে আফগানদের যুদ্ধ হয়। পরে লুধিয়ানার যুদ্ধে অনেক শিখ সৈন্য নিহত হয়। শিখদের এই গোড়ার ইতিহাস পড়ে নিশ্চয়ই বুঝেছ, শিখরা গুরুর মন্ত্রে কেমন করে উজ্জীবিত হয় এবং নির্মম নির্ভীক যোদ্ধার জাত হয়ে ওঠে।

বান্দা

শিখ আফগান যুদ্ধ

এইবার রণজিৎ সিংহের কথায় আসি। কেননা রণজিৎ সিংহের কথা আলোচনা না করলে পরবর্তী শিখ-ইতিহাস বুঝতে অসুবিধা হবে। আহম্মদ শা আবদালী চলে যাওয়ার পর শিখরা আবার প্রবল হয় এবং লাহোর দখল করে খালসার নামে মুদ্রা প্রচলন করে। এই সময়ে কয়েকটি 'মিশল' বা শিখ দলের উৎপত্তি হয়, যেমন ভাঙ্গী, কানহাইয়া, সুকর-চাকিয়া ইত্যাদি। এই সব সর্দার যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত অনেক শিখ সৈনিক নিয়ে প্রায় সমস্ত পাঞ্জাব অধিকার করেন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে 'রাখী' নামে এক রকম কর আদায় করতে থাকেন। ক্রমে অন্যান্য দলের মধ্যে সুকর-চাকিয়া মিশলটি সবচেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রণজিৎ-সিংহ এই মিশলের নেতা মহাসিংহের পুত্র। ১৭৮০ সালে তাঁর জন্ম। বাল্যকালে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়ে যায় বসন্ত রোগে। তিনিই প্রথম সুসংবদ্ধ শিখরাজ্য গঠন করে পাঞ্জাবের বিরাট শিখ শক্তি প্রতিষ্ঠা করেন। কাবুলের রাজা জামান শাহ রণজিৎ সিংহকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮০৩ সালে রণজিৎ অমৃতসর দখল করেন এবং ক্রমে শতদ্রু নদীর পশ্চিম পারে শিখ মিশলগুলি তাঁর আধিপত্য স্বীকার করে। তারপর রণজিৎ সিংহ শতদ্রু পার হয়ে লুধিয়ানা শহর অধিকার করেন।

রণজিৎ সিংহ, বিভিন্ন শিখ মিশল

পাঞ্জাবে আধিপত্য 'রাখী' আদায়

সুসংবদ্ধ শিখ রাজ্য গঠন

১৮০৩ সালে অমৃতসর দখল, লুধিয়ানা অধিকার

বড়লাট মিণ্টো রণজিতের তৎপরতায় ভয় পেয়ে তাকে শতদ্রু নদীর পশ্চিমাঞ্চলে সীমাবদ্ধ রাখতে মনস্থ করলেন। ১৮০৯ সালে রণজিৎ সিংহ ও ইংরেজদের মধ্যে অমৃতসরের সন্ধি হল। স্থির হল, শতদ্রু নদী তাঁর রাজ্যের পূর্বসীমা নির্দিষ্ট হবে ঐ নদীর দক্ষিণে ও পূর্বে তিনি রাজ্য বিস্তার করবেন না। রণজিৎ তাঁর জীবদ্দশায় এই প্রতিশ্রুতি অমান্য করেন নি।

অমৃতসরের সন্ধি ১৮০৯

১৮১৭ থেকে ১৮২৩ সালের মধ্যে রনজিৎ সিংহের ক্ষমতা বিস্তার হয় সব চেয়ে বেশি। তিনি ফরাসী ও বিদেশী সেনাপতির তত্ত্বাবধানে একটি সুশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠন করেন। ঐ সৈন্যদলের সাহায্যে তিনি জম্মু কাশ্মীর মুলতান জয় করেন এবং সীমান্ত প্রদেশে পাঠানদের কাছ থেকে পেশোয়ার দখল করেন। এইভাবে সমগ্র পাঞ্জাবে ও সিন্ধুনদের কিছুদূর পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করে রণজিৎ সিংহ পাঞ্জাব কেশরী বলে বিখ্যাত হয়েছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন রণজিৎ সিংহ ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি করে ভালো কাজ করেন নি। কিন্তু শিখ রাজ্য তখন সদ্য স্থাপিত, তাকে স্থিতিশীল করা আগে দরকার ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৩৯) শিখদের অধোগতি শুরু হয়।

ক্ষমতা বিস্তার পাঞ্জাব কেশরী

মারাঠা শক্তির প্রসার ও রাজ্যবিস্তার: আওরঙজীবের রাজত্বকালে মুঘল-মারাঠা যুদ্ধের কথা জেনেছ। এখন মারাঠাদের শক্তিপ্রসার ও সাম্রাজ্যগঠনের

কাহিনী বলছি। শিবাজীর মৃত্যুর পর মারাঠাদের যে গৃহবিবাদ শুরু হয় তখন থেকে রাজার চেয়ে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী পেশবারই প্রাধান্য বেশি হতে থাকে। এই পেশবাদের নেতৃত্বে মারাঠা জাতি আরও শক্তিশালী হয়, মুঘলদের অবনতির সুযোগ নিয়ে তাঁরা একটি 'হিন্দু-পাদ পাদশাহী' বা হিন্দু সাম্রাজ্য গঠনে সচেষ্ট হন। ১৮১৮ সাল পর্যন্ত তাদের খানিক প্রতিপত্তি ছিল। তাই বলা যায়, ইংরেজরা মুঘলদের কাছ থেকে নয়, মারাঠাদের হাত থেকেই ভারতের সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করে নেয়।

শিবাজীর মৃত্যুর পর আত্মকলহ, পেশবা প্রাধান্য

আওরঙজীবের মৃত্যুর পর থেকেই মারাঠা শক্তির প্রসার শুরু হয়। খাস মহারাষ্ট্র থেকে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলিতে মারাঠারা হানা দিতে থাকে। কিন্তু এই সময়ে গৃহবিবাদের সূত্রপাত হল শাহু ও তারাবাঈ-এর মধ্যে (১৭৬০ খ্রীঃ)। সৌভাগ্যক্রমে বালাজী বিশ্বনাথ নামে এক বুদ্ধিমান রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ শাহুর প্রধানমন্ত্রী ও সহায় হন। তাঁরই সাহায্যে শাহু সিংহাসনে বসেন এবং এখন থেকে মারাঠারা মুঘলরাজ্যের মিত্রশক্তি হিসেবে গণ্য হল। এই মুঘল-মারাঠা সন্ধি বালাজী বিশ্বনাথের কৃতিত্ব। তিনি কয়েকজন মারাঠা নায়কদের নিয়ে মারাঠাচক্র সৃষ্টি করেন এবং পেশবার নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রের প্রসার ও প্রতিপত্তি বাড়ান।

বালাজী বিশ্বনাথ, মুঘল মারাঠা সন্ধি

বালাজী বিশ্বনাথের ছেলে প্রথম বাজী রাও-এর আমলে মারাঠাদের আরও শক্তি-বিস্তার হয়। রণকৌশলে ও রাজনীতি জ্ঞানে তাঁর কৃতিত্ব পিতার চেয়ে বেশি। মুমূর্ষু মুঘল সাম্রাজ্যকে নষ্ট করে সিন্ধু থেকে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত একটি হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা তিনি গ্রহণ করেন। একেই 'হিন্দু-পাদ-পাদশাহী' বলা হয়। মারাঠারা একদিকে গুজরাট ও মালব, অপরদিকে ভূপালের যুদ্ধে নিজামকে হারিয়ে দিয়ে নর্মদা থেকে চম্বল নদী পর্যন্ত সমস্ত ভূভাগ দখল করে নিল। পোর্তুগীজদের কাছ থেকে সালসেট ও বেসিন অধিকার (১৭৩৯) বাজী রাওএর আর এক কৃতিত্ব। ১৭৪০ সালে তাঁর মৃত্যুর সময়ে মারাঠাদের প্রতিষ্ঠা অনেক বেড়েছিল। তবে উত্তর ভারতে বেশি নজর দেওয়ার ফলে তাঁর দাক্ষিণাত্যের কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নিজাম, সিদ্দি ও য়ুরোপীয়দের সমূলে বিনষ্ট না করার জন্য ঐ দাক্ষিণাত্যেই ইংরেজের প্রথম প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়। মনে হয়, শাসকের চেয়ে সেনাপতি হিসেবেই বাজী রাও আরও বড় ছিলেন।

প্রথম বাজীরাওএর পরিকল্পনা, হিন্দুপাদ-পাদশাহী

মারাঠা রাজ্য বিস্তার, সালসেট ও বেসিন, অধিকার, বাজীরাওএর ত্রুটি, প্রথম বাজীরাও

বাজী রাওএর ছেলে বালাজী বাজী রাও পিতার মত বিচক্ষণ না হলেও উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তি প্রসারে সচেষ্ট হন। তাঁর সময় থেকে পেশবার পদ বংশানুক্রমিক

হয়, এবং তাঁর আমলে মারাঠা রাজ্য আরও বিস্তৃত হয়। দাক্ষিণাত্যে নিজাম সৈন্য পরাস্ত হয় এবং দৌলতাবাদ বুরহানপুর আহমদনগর প্রভৃতি অঞ্চল মারাঠা রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। এছাড়া ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে আবদালীর অনুপস্থিতির সুযোগে মারাঠারা পাঞ্জাব অধিকার করে। ক্ষীণবল বাদশাহের কাছে মারাঠারা অনেক সুবিধা আদায় করে নেয়। কিন্তু দুটি বড় গলদ তিনি সৃষ্টি করে যান। প্রথমতঃ, মারাঠা সেনাবাহিনীতে তিনি অ-মারাঠা ভাড়াটিয়া সৈন্য নিযুক্ত করেন। এতে ভবিষ্যতে অনর্থ সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়তঃ, তিনি মারাঠা নায়কদের বংশগত উচ্চ আকাঙ্ক্ষার প্রশ্রয় দেন। বরোদার পিলাজী গাইকোয়াড়, গোয়ালিয়রের রণজি সিন্ধিয়া, ইন্দোরের মলহর রাও হোলকার এবং নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলা প্রথমে পেশবার কর্তৃত্ব স্বীকার করলেও পরে স্বতন্ত্রভাবে নিজ নিজ এলাকায় এক একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মারাঠার কেন্দ্রশক্তি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তার পতনের পথও পরিষ্কার হয়। তবু এ কথা সত্য যে বালাজী বাজী রাওএর আমলে মারাঠাদের সমকক্ষ কোনও শক্তি ভারতে ছিল না, তারা ভারতের ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে ওঠে।

বালাজী বাজীরাও, মারাঠা রাজ্যের চরম বিস্তার

ভাড়াটিয়া সৈন্য নিয়োগ, মারাঠা চক্র সৃষ্টি

কিন্তু মারাঠাদের এই গৌরবদীপ্ত রাজ্য জয়ের ভিত্তি ছিল দুর্বল। রোহিলাদের আমন্ত্রণে আবদালী ১৭৫৯ সালে আবার ভারতে এসে প্রথমে সিন্ধিয়া ও পরে হোলকারকে হারিয়ে দিয়ে পাঞ্জাব থেকে মারাঠা প্রভাব দূর করেন। বালাজী বাজী রাও এই পরাজয় স্বীকার করলেন না। তাঁর নির্দেশে পুত্র বিশ্বাস রাও ও পরামর্শদাতা সদাশিব রাও এক বিশাল বাহিনী নিয়ে পাঞ্জাব আবার দখল করার জন্য এগিয়ে গেলেন।

বালাজী বাজীরাও ও আহমদ শাহ আবদালী, পাঞ্জাব পুনর্দখলের জন্য বিশ্বাসরাও ও সদাশিব রাওএর যুদ্ধ যাত্রা

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ ঃ পানিপথের ঐতিহাসিক রণক্ষেত্রে মারাঠা সৈন্য আহম্মদ শা'র সৈন্যদলের সম্মুখীন হল এইবার চূড়ান্ত সংগ্রামে। অযোধ্যার নবাব ও রোহিলাদের সাহায্য পাওয়াতে আবদালীর সৈন্যসংখ্যা ছিল বেশি। যুদ্ধকৌশলেও তিনি আরও নিপুণ। উত্তর ভারতের মুসলিম শক্তিরা তাঁর পিছনে দাঁড়াল, অপরপক্ষে মারাঠারা রাজপুত ও জাঠদের কাছে কোনও সাহায্য পায়নি। তাছাড়া, মারাঠারা অযথা সময় নষ্ট করে বসে রইল আর সুচতুর আবদালী দিল্লী থেকে তাদের রসদ সংগ্রহের পথ বন্ধ করে দিলেন। এই অবস্থায় মারাঠা বাহিনী অসীম সাহসে যুদ্ধ শুরু করলেও দুর্বার পাঠান সৈন্যের আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সদাশিব ও বিশ্বাস রাও দুজনেই নিহত হলেন এবং চল্লিশ হাজারের উপর মারাঠা সৈন্য যুদ্ধক্ষেত্রে বন্দী হয়ে প্রাণ হারাল। এই দারুণ পরাজয়ের সংবাদ পেয়ে পেশবা আর বেশি দিন

উভয় পক্ষের শক্তি তুলনা

পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আবদালীর হস্তে মারাঠাদের পরাজয়

বাঁচেন নি। ১৭৬১ সালের জানুয়ারি মাসে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠাদের ভাগ্য এক হিসাবে নির্ধারিত হয়ে গেল।

ঐতিহাসিকরা বলেন, প্রথমতঃ সদাশিবের জিদ ও ঔদ্ধত্যই মারাঠা পরাজয়ের মুখ্য কারণ দ্বিতীয়তঃ, হোলকার সুরযমল প্রভৃতি প্রবীণ নেতাদের পরামর্শ তিনি অগ্রাহ্য করেন এবং দীর্ঘকাল ধরে সফল বলে প্রমাণিত মারাঠাদের অভ্যস্ত 'গেরিলা' রণকৌশল বর্জন করেন। তৃতীয়তঃ, দিল্লী থেকে এত দূরে পানিপথে যুদ্ধস্থল নির্বাচন সমীচীন হয়নি, কারণ দিল্লী থেকে রসদ নিয়ে আসা আর সুদূর পুনার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ ছিল না। চতুর্থতঃ, বালাজী বাজী রাও পাঞ্জাবের জটিল পরিস্থিতিও ঠিকমত বোঝেননি। একবার পাঞ্জাব অধিকার করেই তিনি নিশ্চিন্ত রইলেন। যাতে আবদালীর সঙ্গে অযোধ্যার নবাব ও রোহিলাদের একজোট না হয়, সেদিকে তিনি সতর্ক ছিলেন না। পঞ্চমতঃ, আবদালীর সৈন্য সংখ্যা ছিল বেশি। যুদ্ধ কৌশলে তিনি বালাজী বাজী রাও অপেক্ষা আরও নিপুণ। ষষ্ঠতঃ, মারাঠারা রাজপুত, শিখ ও জাঠদের কাছে কোনও সাহায্য পায়নি। ফলে উত্তর ভারতে তারা সহায়হীন হয়ে পড়ে এবং যুদ্ধে পরাস্ত হয়।

মারাঠাদের পরাজয়ের কারণ

এই যুদ্ধের ফলাফল খুব গুরুত্বপূর্ণ। পেশবার নেতৃত্বে গাইকোয়াড় সিন্ধিয়া প্রভৃতি মিলে যে মহারাষ্ট্র রাজ্যসংঘ গড়ে ওঠে, পাঞ্জাব-দিল্লী পর্যন্ত যে মারাঠাচক্রের প্রতাপ বিস্তৃত হয়, এখন সেই ঐক্য সংহতি নষ্ট হয়ে গেল, পেশবার পদমর্যাদাও ক্ষুণ্ণ হল। এখন থেকে ঐ সদস্য রাজ্যগুলি স্বপ্রধান হয়ে পৃথক ভাবে ইংরেজ শাসকদের কাছে আপন আপন স্বার্থ সন্ধান করতে থাকল। শাহুর সময় থেকে ছত্রপতি শিবাজীর বংশমর্যাদা যেমন পেশবার ক্ষমতার কাছে ম্লান হয়ে যায়, এখন থেকে মারাঠা রাজ্যগুলিও তেমনি পেশবার আনুগত্য থেকে সরে এসে প্রায় স্বাধীন নীতি অনুসরণ করতে থাকে। সাতারায় ছত্রপতিদের কার্যতঃ বন্দী ও বৃত্তিভোগী করে রেখে পেশবারা যে দৃষ্টান্ত দেখান, এখন তার ফলভোগ আরম্ভ হয়। পানিপথের যুদ্ধের পরও সুযোগ্য পেশবা মাধব রাও মারাঠা শক্তিকে আবার অনেকটা প্রতিষ্ঠিত করেন, কিন্তু তাঁর অকাল মৃত্যুতে মহারাষ্ট্র জীবনসন্ধ্যায় অন্ধকার ঘনিয়ে আসে।

ফলাফল

মারাঠা রাজ্য সংঘের পরিণাম, পেশবার পদ-মর্যাদা ক্ষুণ্ণ

পানিপথের পরও প্রায় চল্লিশ বছর মারাঠাদের শক্তি একেবারে নিশ্চিহ্ন হয় নি, দিল্লী অঞ্চলে তারা আবার আধিপত্য ফিরিয়ে আনে। কিন্তু পানিপথে পরাজয়ের প্রচণ্ড আঘাত তারা পুরো সামলাতে পারেনি। আহমদ শাহ আবদালীরও কোন স্থায়ী রাজনৈতিক লাভ হয় নি। একথা সত্য, তিনি ভারতে সাম্রাজ্য দখল করতে চান নি। কিন্তু পাঞ্জাব দখল করার ব্যাপারে তিনি আগ্রহী ছিলেন। শেষ পর্যন্ত শিখদের বিরোধিতার জন্য পাঞ্জাবের উপর স্থায়ী আধিপত্য বজায় রাখতেও তিনি ব্যর্থ হন। তবে মারাঠাদের

পরিণাম, ইংরেজ ও হায়দর আলির লাভ

পরাজয়ে যে জাতি লাভবান হল তারা আফগান নয়, বঙ্গবিজয়ী ইংরেজ ঃ আর সুবিধা হল হায়দর আলির, যিনি এই সুযোগে মহীশূরে নিজ ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করে মারাঠা প্রভাবকে ক্ষুণ্ণ করেন। এ ছাড়া, উত্তর ভারতে মারাঠা প্রভাব ক্ষুণ্ণ হওয়ায় শিখ শক্তির অভ্যুত্থান সহজ হল।

[তিন] ভারতে য়ুরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার ও য়ুরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলির মধ্যে দ্বন্দ্ব ঃ

য়ুরোপীয় বণিকরা আগে আরব বণিকদের কাছ থেকে ভারতের পণ্য কিনত। কিন্তু নতুন সমুদ্র পথের সন্ধান পেয়ে বিখ্যাত পোর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা ১৪৯৮ খৃস্টাব্দে ভারতের কালিকট বন্দরে পেঁছিলেন। এই জলপথের সন্ধান পেয়ে পোর্তুগীজরা দলে দলে ভারতে আসতে লাগল। কালিকটে থাকতে না পেরে তারা কোচিন এবং সেখান থেকে গোয়া, দমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই ও মাদ্রাজ অঞ্চলে এবং সিংহলের অনেক জায়গায় এসে ঘাঁটি তৈরি করে। য়ুরোপের বণিকদের মধ্যে তারাই প্রথম বাঙলার সাতগাঁ (সপ্তগ্রাম), পরে ব্যান্ডেল এবং চট্টগ্রামে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে ব্যবসা আয়ত্ত করে নিতে থাকে। তাদের বড় ঘাঁটি ছিল ব্যান্ডেল-হুগলীর বাণিজ্য কুঠি। তারা নানা কৌশলে বাণিজ্য-সুবিধার অপব্যবহার করত, মুঘল সরকারের প্রাপ্য শুল্ক ফাঁকি দিত। তাছাড়া বালক-বালিকা অপহরণ করে তারা দাস-ব্যবসা চালাত। তাই সম্রাট শাহজাহানের নির্দেশে বাঙলার সুবাদার কাশিম খাঁ পোর্তুগীজদের হুগলী থেকে বিতারিত করেন (১৬৩২)। তখন তারা আরও অনেক দক্ষিণে হিজলিতে চলে যেতে বাধ্য হয়। তাদের প্রতিপত্তি কমে গেল, তবে সুন্দরবন অঞ্চলে তাদের দস্যুবৃত্তি ও উৎপাত চলতে থাকে। ইত্যবসরে ইংরেজ বণিকরা হুগলীতে কুঠি স্থাপন করে বসে গেলেন (১৬৫১)।

পোর্তুগীজ, কালিকট, কোচিন

গোয়া, দমন, দিউ, চৌল, বোম্বাই, মাদ্রাজ, সপ্তগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, চট্টগ্রাম

হুগলী থেকে বিতাড়ন ইংরেজ বণিকগণ কর্তৃক হুগলীতে কুঠি স্থাপন

ওলন্দাজ ঃ পোর্তুগীজদের ঠিক পরেই ডাচ্ বা ওলন্দাজ বণিকদল ভারতে এসে পোর্তুগীজদের পূর্ব সমুদ্রে বাণিজ্য-অধিকার ক্ষুণ্ণ করতে চেষ্টা করে। প্রথম থেকেই ভারতের চেয়ে পূর্ব ভারতীয় বা 'মসলা, দ্বীপপুঞ্জের' দিকে তাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। ১৬৫৮ সালের মধ্যে ওলন্দাজরা ধীরে ধীরে পোর্তুগীজদের একচেটিয়া ব্যবসা নষ্ট করে। আঠারো শতকে ইংরেজদের কাছে পরাস্ত হয়ে তারা মালয় সুমাত্রা, যবদ্বীপ অঞ্চলে চলে গিয়ে সেখানে এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে, যা এখন স্বাধীন ইন্দোনেশিয়া। এক সময়ে মসলার ব্যবসায় তারা অন্যান্য য়ুরোপীয় বণিকদের বাজার থেকে হটিয়ে দিয়েছিল। ভারতে ওলন্দাজ কুঠিগুলির মধ্যে মাদ্রাজে নাগাপত্তন আর বাঙলায় চুঁচুড়া উল্লেখযোগ্য। ভারতে ওলন্দাজ শক্তির

ওলন্দাজের আগমন, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ

মাদ্রাজে নাগাপত্তন, বাঙলায় চুঁচুড়া

অবসানে চুঁচুড়া ইংরেজদের হস্তগত হয়। সিংহল দ্বীপটিও তারা অধিকার করেছিল পোর্তুগীজদের বিতাড়িত করে, পরে এটি ইংরেজদের করায়ত্ত হয়।

দিনেমার : ডেনমার্কের বণিকরা (দিনেমার) ১৬১২ সালে এদেশে বাণিজ্য করতে আসে। প্রথমে তারা সুদূর দক্ষিণে ট্রাঙ্কুইবারে এবং পরে শ্রীরামপুরে (১৬৭৩) কুঠি স্থাপন করে। নানা কারণে দিনেমার বণিকরা ভারতে বাণিজ্য ব্যাপারে সুবিধা করতে পারেনি। ইংরেজ কোম্পানি শক্তিশালী হয়ে উঠলে তারা চলে যায়। শ্রীরামপুর ইংরেজদের কাছে হস্তান্তর হয়। সেখানে দিনেমারদের গির্জাটি এখনও বর্তমান।

ট্রাঙ্কুইবারে ও শ্রীরামপুরে কুঠি স্থাপন শ্রীরামপুর ইংরাজদের কাছে হস্তান্তর

ইংরেজ : ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে রানী প্রথম এলিজাবেথের কাছ থেকে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পূর্ব সমুদ্রে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের সনদ লাভ করে। এই সময়ে ইংরেজের ব্যবসায় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজরা। ১৬১২ সালে পোর্তুগীজদের সঙ্গে একটি সংঘর্ষে জয়লাভ করে তারা পশ্চিম ভারতে সুরাট নগরে একটি কুঠি নির্মাণে সম্রাট জাহাঙ্গীরের অনুমতি পায়। এটিই ভারতে প্রথম ইংরেজ ঔপনিবেশিক বসতি। সুরাটে ইংরেজ কুঠিয়াল ও কর্মচারীদের সমাধি এখনও রয়েছে। ক্রমে পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের প্রাধান্য কমতে লাগল। তখনও বাণিজ্য-ক্ষেত্রে ফরাসীদের আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং ইংরেজ কোম্পানি একে একে পশ্চিম উপকূলে, করমণ্ডল কূলে ও বাঙলা দেশে ব্যবসাকেন্দ্র খুলে বসল। এইভাবে কোম্পানি সপ্তদশ শতকের প্রথমার্ধে চন্দ্রগিরির রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের ইজারা নিয়ে (১৬৩৯) সেখানে একটি বড় ব্যবসাকেন্দ্র স্থাপন করে এবং সেণ্ট জর্জ নামে দুর্গ নির্মাণ করে। ইতিপূর্বে, পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজদের থেকে দূরে নিরাপদ ও লাভজনক ব্যবসার জায়গার খোঁজে ইংরেজ বণিকরা বঙ্গোপসাগরের পথে বাঙলা দেশের দিকে এল। প্রথমে হরিহরপুরে, পরে বালেশ্বরে তাঁদের প্রথম কুঠি। তারপর ক্রমশঃ গঙ্গা নদী ধরে হুগলিতে উপস্থিত হল। পোর্তুগীজরা বিতাড়িত হওয়াতে ইংরেজদের খুব সুবিধা হয়। এই হুগলীতেই তারা কুঠি তৈরি করে ক্রমে কাশিমবাজার, মালদহ, ঢাকা, পাটনা পর্যন্ত তাঁদের বাণিজ্য বিস্তৃত করে। বাঙলা দেশের অভ্যন্তর থেকে হুগলীর প্রধান কুঠিতে নানা পণ্য সামগ্রী কেনা বেচার জন্য জমা হত। হুগলীর প্রথম কুঠিয়াল (গভর্নর) ছিলেন হেজেস সাহেব। কোম্পানির পুরনো কাগজপত্র এবং কুঠিয়ালের ডায়েরি থেকে আমরা কুঠির কর্মচারীদের জীবনযাত্রা, চিনি, গুড়, ঘি, তিলের তেল, মোটা সুতির কাপড় ও সোরা প্রভৃতি জিনিসপত্রের বাজার-দর জানতে পারি। ওদিকে পশ্চিম কূলে কোম্পানি ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহে যৌতুক পাওয়া বোম্বাই দ্বীপটি তাঁর কাছ থেকে দশ পাউণ্ড খাজনায় ইজারা নিল। ইংরেজ বণিকরা

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিষ্ঠা, পোর্তুগীজদের সঙ্গে সংঘর্ষ, সুরাট কুঠি

মাদ্রাজ, বাংলায় ইংরেজ বণিক

বোম্বাই

বাঙলার সুবাদার রাজপুত্র সুজার কাছ থেকে বার্ষিক থোক ৩০০০ টাকার বিনিময়ে বাঙলায় বিনা শুল্কে ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করে। কিন্তু ক্রমেই এই ছাড়পত্র (দস্তক) অন্যায়ভাবে ব্যবহার হতে লাগল। কোম্পানিকে দেওয়া ঐ বিশেষ অনুমতিপত্র দেখিয়ে ইংরেজ বণিকরা যেভাবে নিজেরা ব্যবসায় নেমে ব্যক্তিগত মুনাফা করছিল, তাতে সম্রাট আওরঙজীব ঘোরতর অসন্তুষ্ট হন। এই শুল্ক নিয়ে কোম্পানির সঙ্গে মুঘল সরকারী ফৌজের সংঘর্ষ বাধল। হুগলীর কুঠি আক্রমণ ও মাল আটক করে কোম্পানি মুঘল নৌবহরের সঙ্গে ঘোলঘাটে যুদ্ধ করে (১৬৮৬)। নবাব সৈন্যরা হেরে যায়, কিন্তু সুবাদার শায়েস্তা খাঁ প্রতিশোধ নিলেন বাঙলায় ইংরেজ কুঠিগুলিকে জোরদখল করে। উভয় পক্ষের মিটমাট হলেও ইংরেজরা বুঝলেন হুগলীতে থাকা আর চলবে না।

মুঘল সরকারের সঙ্গে বিবাদের কারণ

ঘোলঘাটের যুদ্ধ, ১৮৮৬

তাই কোম্পানির এজেন্ট জব চার্নক হুগলীর আরও দক্ষিণে গঙ্গাতীরে একটা উপযুক্ত জায়গা খুঁজতে লাগলেন যেখানে বিলাতী জাহাজ এসে সহজে ভিড়তে পারে। মুঘল সরকারের সঙ্গে সন্ধির ফলে কোম্পানি নতুন লাইসেন্স পেয়ে সুতানুটিতে একটি কুঠি স্থাপন করলেন (১৬৯০)। এই হল কলকাতার ভিত পত্তন। তারপর ঐ গঙ্গাতীরে সুতানুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রাম ইজারা নিয়ে ১৬৯৮ সালে কলকাতা শহরটি গড়ে উঠল। কলকাতা তখন জলা-জঙ্গলে অস্বাস্থ্যকর হলেও, এই খানেই বাঙলায় প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ। ক্রমে অনেক লোক অশান্তি অত্যাচার এড়াবার জন্য এই নগরে এসে বাস করতে লাগল। মারাঠা আক্রমণের সময় ইংরেজরা শহরের চারপাশে একটি খাল কাটিয়ে নেন, সেটি এখনও রয়েছে।

কলকাতার পত্তন ১৬৯০

বাঙলায় প্রথম ইংরেজ উপনিবেশ

যখন কলকাতার পত্তন হয়, তখন ইংরেজরা মুঘল সরকারের কৃপাপ্রার্থী ব্যবসায়ী মাত্র। কিন্তু ষাট বছর পরে তাঁরা বাঙলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করলেন। বাঙলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁর আমলে কলকাতায় ইংরেজরা মাথা তুলতে সাহস করে নি। বাঙলার প্রথম স্বাধীন নবাব আলিবর্দি খাঁ য়ুরোপীয় বণিকদের দুরভিসন্ধি বুঝতে পেরেছিলেন। তাই তিনি এদেশে তাদের কোন দুর্গ নির্মাণের অনুমতি দেন নি। অবশ্য তাঁর মৃত্যুর কিছু আগে কলকাতার ইংরেজ বণিকগণ ও চন্দননগরের ফরাসীরা দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ করে।

কলকাতায় দুর্গ নির্মাণ আরম্ভ

ফরাসী ঃ ভারতের লাভজনক বাণিজ্যের অংশ পেতে সব শেষে উপস্থিত হল ফরাসী বণিকদল। ১৬৬৪ সালে ফরাসী ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি স্থাপিত হয়, তার চার বছর পরে সুরাট নগরে প্রথম ফরাসী ব্যবসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৬৯ সালে মসুলিপত্তনে ফরাসীদের দ্বিতীয় কুঠির কাজ আরম্ভ হয়। ১৬৭৩ সালে একজন ফরাসী দক্ষিণ ভারতের পূর্ব উপকূলে একটি ছোট গ্রাম ইজারা নেন,

ফরাসী ঈস্ট ইণ্ডিয়া, কোম্পানী, ১৬৬৪, সুরাট মছলিপত্তন, পণ্ডিচেরী, চন্দননগর মাহে কারিকল

এইখানেই উত্তরকালে পণ্ডিচেরি নগর গড়ে ওঠে। ১৬৯২ সালে ফরাসীরা বাঙলায় নবাবের কাছে পেল চন্দননগর। তারপর দক্ষিণপশ্চিম উপকূলে মাহে (১৭২৫) এবং পূর্ব উপকূলে কারিকল (১৭২৯) তাদের অধিকারে আসে।

পোর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকরা হটে যাওয়াতে ব্যবসার ক্ষেত্রে ইংরেজরা ক্রমেই প্রতিপত্তি বিস্তার করে। এখন ফরাসীদের আবির্ভাবে একটি নতুন অবস্থার সৃষ্টি হল। ভারতে একচেটিয়া বাণিজ্য-অধিকারের চরম মীমাংসার জন্য দুটি য়ুরোপীয় জাতি, ইংরেজ ও ফরাসী, এবার মুখোমুখি দাঁড়াল। আঠারো শতকের প্রথমার্ধে তারা মোটামুটি শান্তিপূর্ণ ভাবে বাণিজ্য করছিল। ভারতে আধিপত্য বা সাম্রাজ্য স্থাপনের কোনও পরিকল্পনা তখনও তাদের ছিল না। কিন্তু আঠারো শতকের মাঝামাঝি উভয় পক্ষই এদেশে রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার সুযোগ খুঁজতে লাগল। এ বিষয়ে অগ্রণী হল ফরাসীরা। তার ফলে ১৭৪০ সাল থেকে য়ুরোপে এবং সেই সূত্রে ভারতেও প্রাধান্য লাভের জন্য ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হল। বাধল ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ দক্ষিণ ভারতে কর্নাট অঞ্চলে, ১৭৪৬ থেকে ১৭৬০ পর্যন্ত যার ব্যাপ্তি। এই সংঘর্ষ শুধু ভারতে নয়, য়ুরোপে ও আমেরিকাতেও বিস্তৃত হয়।

ফরাসী ও ইংরাজদের রাজনৈতিক শক্তি প্রতিষ্ঠার চেষ্টা

কর্নাট অঞ্চলে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা

ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব ঃ কর্নাটের যুদ্ধ ঃ ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য প্রচেষ্টার সঙ্গে দুপ্লের নাম জড়িত হয়ে আছে। ১৭৪২ সালে ফরাসী অধিকারগুলির শাসক রূপে তিনি পণ্ডিচেরিতে আসেন। যে সময়ে তিনি এলেন, তখন ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় খুব দুর্যোগ, মুঘল রাষ্ট্র ভেঙে পড়ার দাখিল। দাক্ষিণাত্যের পরিস্থিতি তখন বিশেষ অনিশ্চিত, রাজ্যগুলির কাঠামোও ছিল দুর্বল। এই সব দেখে দুপ্লের ধারণা জন্মাল যে য়ুরোপীয় প্রথায় শিক্ষিত ভারতীয় সৈন্য ফরাসী শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্য করবে। এই সময়ে য়ুরোপে অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স বিপরীত দলে জড়িত হয়েছিল। ভারতেও দুপ্লের উচ্চাশা আর নিজাম রাজ্যে ও কর্নাটে উত্তরাধিকার নিয়ে বিভেদের ফলে, ইংরেজ ও ফরাসীরা সংঘর্ষে লিপ্ত হল। গণ্ডগোল বাধল ১৭৪৬ সালে, যখন করমণ্ডল উপকূলে এক ইংরেজ নৌবাহিনী পণ্ডিচেরিকে বিপন্ন করে তোলে। সে সময়ে কর্নাটের নবাব আনোয়ারউদ্দিনের সাহায্যে পণ্ডিচেরি রক্ষা পায়। এর কিছু পরেই লা বুর্দোনে মরিশাস দ্বীপ থেকে এক নৌবহর নিয়ে এসে মাদ্রাজ অধিকার করেন। এদিকে ইংরেজরা পণ্ডিচেরিতে নৌ-আক্রমণ চালিয়ে বিফল হয়, তাতে দুপ্লের সুনাম ও প্রভাব বেড়ে গেল। মাদ্রাজ ফরাসীদের হস্তগত হলে, দুপ্লে নবাব আনোয়ারউদ্দিনকে প্রতিশ্রুতি দিয়েও তাঁকে কিছুতেই মাদ্রাজ ছেড়ে দিলেন

দুপ্লে, ভারতের, ইউরোপের পরিস্থিতি

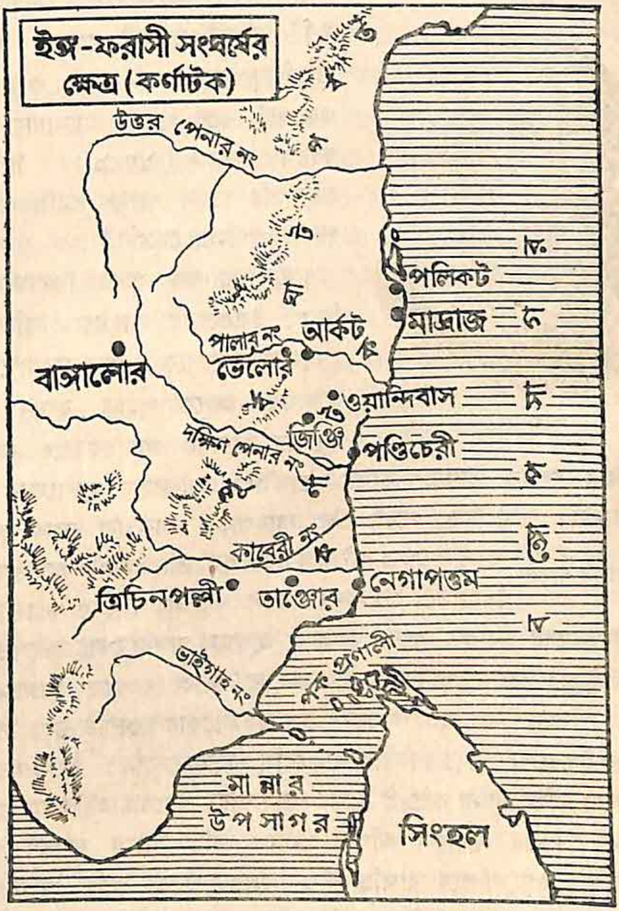
প্রথম কর্নাট যুদ্ধ ১৭৪৬-৪৮

ফরাসীদের মাদ্রাজ অধিকার

পণ্ডিচেরী আক্রমণ ব্যর্থ

না। তখন নবাব ১০,০০০ সৈন্য নিয়ে পণ্ডিচেরি আক্রমণ করলেন: কিন্তু ফরাসীদের শিক্ষিত মুষ্টিমেয় সেনাদলের কাছে নবাবের সৈন্যরা পরাস্ত হল ময়লাপুরের যুদ্ধে (১৭৪৭)। এর ফলে দক্ষিণ ভারতে ফরাসী প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল। য়ুরোপের যুদ্ধে ১৭৪৮ সালে ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সন্ধি হলে, ইংরেজরা মাদ্রাজ ফিরে পেলেন। প্রথম কর্ণাট যুদ্ধ এইভাবে শেষ হল।

ময়লাপুরে যুদ্ধ, ১৭৪৭



য়ুরোপে যে সন্ধি হল, তা সাময়িক, দুই জাতির মধ্যে বিবাদ থামল না। বরং এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটল যাতে উভয় পক্ষের শত্রুতা নতুন করে জাগল এবং সেই সঙ্গে ভারতে দেশীয় রাজাদের ভাগ্য পরিবর্তন হল। ১৭৪৮ সালে নিজামের মৃত্যু

হলে সিংহাসনের দুই দাবিদার দাঁড়ালেন, পুত্র নাজির জঙ্গ ও দৌহিত্র মুজাফর জঙ্গ।

দ্বিতীয় কর্নাট যুদ্ধ

ওদিকে কর্নাটের নবাবী নিয়েও দ্বন্দ্ব বাধল। আর্কটের পূর্ব নবাবের জামাতা চাঁদ সাহেব নিজামের অধীনস্থ কর্নাটের সিংহাসন দাবি করলেন। আনোয়ারউদ্দিন তখনও জীবিত। দুপ্লে দেখলেন এই মস্ত সুযোগ। ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে তিনি এই জটিল রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করলেন।

হায়দরাবাদে ও কর্নাটে ডুপ্লের প্রভাব বৃদ্ধির চেষ্টা

তাঁর অভিপ্রায় হল, চাঁদ সাহেবকে নবাব করে তারপর মুজাফর জঙ্গকে নিজামের পদে বসানো। তাতে হায়দরাবাদে ও আর্কটে (কর্নাট অঞ্চলে) দুটি রাজ্যেই ফরাসী ক্ষমতা দৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে। চাঁদ সাহেব ও মুজাফরকে একজোট করে দুপ্লে আনোয়ার উদ্দিনকে আক্রমণ করলেন (১৭৪৯)। তিনি নিহত হলে তাঁর ছেলে মহম্মদ আলি তিরুচির-পল্লীতে পালিয়ে গেলেন।



ডুপ্লে

মুজাফর জঙ্গ প্রথমে নিজামীপদ পান নি। ইংরেজদের সাহায্যে নাজির জঙ্গ প্রথমে চাঁদ সাহেবকে ও পরে ফরাসীদের মিত্র মুজাফর জঙ্গকে পরাস্ত করেন। এতে দুপ্লের উদ্দেশ্য সাময়িকভাবে ব্যর্থ হয়, কিন্তু নাজির জঙ্গের প্রাণনাশ হতেই ফরাসীপক্ষ অবিলম্বে মুজাফরকে নিজামী পদে বসালেন। এর কিছু পরেই চাঁদ সাহেবকেও আর্কটের নবাব করা হল।

ডুপ্লের কূটনৈতিক সাফল্য

এখন দুপ্লের কূট চাল সফল হল, তাঁর সমর্থিত দুই পক্ষই দুটি সিংহাসন পেলেন। ফলে, দুপ্লের নেতৃত্বে ফরাসীদের এই সাফল্য ইংরেজদের চিন্তিত করে তুলল। মুজাফর জঙ্গ দুপ্লের অনুগত ছিলেন এবং তার মৃত্যুর পর দুপ্লে আর এক অনুচর সলাবৎ জংগকে নিজামের পদে বসালেন। প্রতিদানে সলাবৎ জংগ ফরাসীদের উত্তরসরকার প্রদেশটি ছেড়ে দিলেন।

এতদিন ইংরেজরা তাঁদের প্রার্থীকে খুব বেশি সাহায্য দেননি। কিন্তু ফরাসীদের ক্ষমতা এইবার প্রতিরোধ না করলেই নয়। তাই তাঁরা আনোয়ারউদ্দিনের পলাতক পুত্র মহম্মদ আলির সাহায্যে এগিয়ে এলেন। চাঁদ সাহেব মহম্মদ আলিকে তিরুচিরপল্লীতে অবরুদ্ধ করে রেখেছিলেন। ইংরেজ পক্ষের নায়ক ছিলেন রবার্ট

ক্লাইভের আর্কট অধিকার

ক্লাইভ যিনি আগে কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন, পরে সৈনিক হন। তাঁর পরিকল্পনা হল, আগে আর্কট আক্রমণ করা হোক, তাহলেই তিরুচিরপল্লী থেকে চাঁদ সাহেব তিরুচিরপল্লীর অবরোধ ছেড়ে সসৈন্যে রাজধানী আর্কট বাঁচাতে চলে আসবেন। ক্লাইভের পরামর্শ মতই কাজ করা হল। তাঁর নেতৃত্বে ইংরেজ সৈন্য আর্কট অধিকার করলে চাঁদ সাহেব সৈন্য নিয়ে সেই দিকে

ছুটে এলেন। কিন্তু আর্কট ফিরে পেলেন না। চাঁদ সাহেবের পরাজয় ও নিধন ফরাসীদেরই হার। দুপ্লের বৃহৎ কল্পনা কাজে পরিণত হতে পেল না। য়ুরোপে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স ভারতে এই যুদ্ধ চালনা বন্ধ করল। ১৭৫৪ সালে ভারতে ইংরেজ ফরাসীদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হল। দুপ্লে পদচ্যুত হয়ে দেশে ফিরে গেলেন এবং অনেক দুঃখ-কষ্টে তাঁর মৃত্যু হল। এই দ্বিতীয় কর্নাট যুদ্ধের পর ব্রিটিশ ও ফরাসী সরকার উভয়ে স্থির করলেন, ভারতের ভিতরকার ব্যাপারে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্দ্বন্দ্বে তাঁরা আর জড়িত হবেন না।

দুপ্লের পতন

১৭৫৬ সালে য়ুরোপে সপ্তবর্ষ-ব্যাপী যুদ্ধ (১৭৫৬-৬৩) আরম্ভ হলে ভারতেও ইংরেজ ও ফরাসীরা তৃতীয়বার শক্তি পরীক্ষায় উদ্যত হল। হায়দরাবাদে দুপ্লের সহকর্মী বুসীর মাধ্যমে তখন ফরাসী প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। ১৭৫৮ সালে ফরাসী সরকার লালীকে ইংরেজের বিরুদ্ধে পণ্ডিচেরিতে পাঠালেন। ইতিমধ্যে ইংরেজরা পলাশীর যুদ্ধে (১৭৫৭) জয়লাভ করে প্রতিপত্তি বাড়ান এবং বাঙলার নবাবের সঙ্গে ফরাসীদের জোট বাঁধার সম্ভাবনা দূর করেন। দক্ষিণে নিজামও তাঁদের পক্ষে। তিনি বুসীর অনুপস্থিতির সুযোগে ইংরেজগণকে 'উত্তর সরকার' দান করে ইংরেজপক্ষে যোগ দিয়েছিলেন। ইংরেজদের ভাগ্য এবার ফিরে গেল। ১৭৫৮ সালে মসুলিপত্তন তাঁদের হাতে এল। লালী গোড়ায় দিকে কৃতকার্য হচ্ছিলেন, কিন্তু কয়েকটি ব্যাপারে তিনি ভুল করে বসলেন। লালী মাদ্রাজ আক্রমণ করলে ইংরেজ নৌবহর প্রচণ্ড বাধা দেয়। ফরাসী সৈন্যরা পণ্ডিচেরিতে চলে আসতে বাধ্য হয়। তারপর ১৭৬০ সালে ওয়াণ্ডিওয়াশের যুদ্ধে ব্রিটিশ সেনাপতি স্যার আয়ার কুট লালীকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করেন। পণ্ডিচেরি শহরটি বিধ্বস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনের আশা ধূলিসাৎ হল। ১৭৬৩ সালে সপ্তবর্ষ ব্যাপী যুদ্ধের শেষে য়ুরোপে ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হলে সাব্যস্ত হল, ফরাসীদের কুঠি উপনিবেশগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হবে, কিন্তু সেখানে দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করা চলবে না।

তৃতীয় কর্নাট যুদ্ধ, বুসী ও লালী, পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ জয়ী

উত্তর সরকার মসুলি পত্তন, প্যারিসের সন্ধি ১৭৬৩, ফলাফল

ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের প্রথম ও প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন দুপ্লে। তাঁর কূটনীতি ও দূরদৃষ্টি অস্বীকার করা যায় না এবং তাঁর পরিকল্পনায় কোনও মারাত্মক গলদ ছিল না। কিন্তু ফরাসী সরকার কোম্পানিকে অর্থবল ও লোকবল দিয়ে সাহায্য করেন নি। এইটিই ফরাসীদের ব্যর্থতার মুখ্য কারণ। তাছাড়া, আর্থিক সঙ্গতি ও সংগঠন শক্তিতে ইংরেজ কোম্পানি ছিল আরও বলশালী। এও একটি বড় কারণ। তবে মরিশাস দ্বীপের সামুদ্রিক ঘাঁটি থেকে ভারতের দূরত্ব ফরাসীদের পক্ষে যে প্রধান অন্তরায় ছিল, যুদ্ধের সময় তা প্রমাণিত হয়। ইংরেজদের নৌবলের প্রাধান্য ও সমুদ্রের উপর

ফরাসী ব্যর্থতার কারণ, সরকারী সাহায্যের অভাব, ইংরাজ কোম্পানীর উৎকর্ষ, মরিশাস থেকে ভারতের দূরত্ব, ইংরাজ নৌবল

আধিপত্যই ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের চেষ্টার প্রধান অন্তরায় ছিল। আবার, দক্ষিণ ভারত থেকে এদেশে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা সফল হওয়া শক্ত। তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধের শুরুতে ইংরেজরা বাঙলা অধিকার করে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের মোড় ঘুরিয়ে দিল।

ফরাসীদের ব্যর্থতার জন্য অনেকেই দুপ্লে ও বুসীকে দায়ী করেন। কিন্তু ব্যক্তিগত দোষত্রুটির চেয়ে যে সব কারণ ওপরে উল্লেখ করা হল, সেগুলি আরও গুরুত্বপূর্ণ। হায়দরাবাদে ও কর্ণাটে একসঙ্গে হস্তক্ষেপ করে করে দুপ্লে দুদিকে জড়িয়ে পড়েন। এটি তাঁর বড় ভুল। ইংরেজরাও যে ঠিক ঐ নীতি অনুসরণ করবে, সেটা তিনি আগে ভাবেন নি। স্বদেশ থেকে উপযুক্ত, সময়োচিত সাহায্য ও সমর্থন পেলে ভারতে ফরাসীদের ভবিষ্যৎ হয়তো অন্যরকম হয়ে যেত।

দুপ্লে ও বুসীর দায়িত্ব, দুপ্লের ভুল

কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বুঝবে যে ভারতে ইংরেজ-ফরাসী সংঘর্ষ একটি বিচ্ছিন্ন, একক ঘটনা নয়। ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব য়ুরোপে, আমেরিকায় ও ভারতে, তিনটি অঞ্চলে একত্র শুরু হয়। য়ুরোপে ফ্রান্স বিপন্ন ও পরাজিত হলে ভারতেও তার সাম্রাজ্য-স্বপ্ন চূর্ণ হয়। সপ্তবর্ষের যুদ্ধে ফ্রান্স উত্তর আমেরিকায় ক্যানাডা থেকে বিতাড়িত হলে ভারতেও তার ফলাফল দেখা গেল। বিশ্ব-ইতিহাসের এই পরিস্থিতিতে ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে বিচার করতে হবে। এই দ্বন্দ্ব আসলে উপনিবেশ নিয়ে বিবাদ অর্থাৎ সেখানকার বাণিজ্য দখল নিয়ে স্বার্থের সংঘাত। অতএব যে পক্ষের সমুদ্র অধিকার ও নৌবল বেশি, তার জয়ের সম্ভাবনাও বেশি। ইংরেজদের অর্থবল ও যুদ্ধের উপকরণ ছিল বেশি। সমুদ্রে তাদের আধিপত্য বেশি, দীর্ঘদিন যুদ্ধ চালাবার মত তাদের বেশ সঙ্গতি ছিল। আর বিলাতে কর্তৃপক্ষের সাহায্য ও সমর্থন তো ছিলই। বাঙলাকে প্রধান ঘাঁটি করে পূর্ব দিক থেকে উত্তরে দক্ষিণে ক্রমশঃ আধিপত্য বিস্তার করা এখন নিষ্কণ্টক ইংরেজ কোম্পানির পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এল।

ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষের ব্যাপকতা, ফ্রান্সের পরাজয়, আমেরিকা, ইউরোপ

দ্বন্দ্বের প্রকৃতি ও গুরুত্ব, কারণ-সমন্বয় ইংরেজ কোম্পানি নিষ্কণ্টক

[চার] বাঙলাদেশে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য ও রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রসার (১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত)

বাণিজ্য ঃ ইংরেজ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি অন্যান্য য়ুরোপীয় বাণিজ্য কোম্পানিগুলির তুলনায় মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকে অধিক বাঙলার সুযোগ সুবিধা লাভ করেছিল। ইংরেজগণ ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে সুবাদার যুবরাজ সুজার ফরমান অনুযায়ী বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে বাঙলাদেশে বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার পেয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমেই এই 'দস্তক' বা বিশেষ অনুমতিপত্রের

মুঘল আমলে কোম্পানির বাণিজ্যিক সুযোগ সুবিধা,

অপব্যবহার শুরু হয়। এই কারণে সম্রাট আওরঙজীবের আমলে মোগল-ইংরেজ সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। শেষ পর্যন্ত আওরঙজীবের সঙ্গে সন্ধি-মীমাংসার ফলে ইংরেজগণ ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে নতুন লাইসেন্স লাভ করেন এবং ঐ বৎসর জব চার্নক কলকাতা নগরীর পত্তন করেন। ১৭০০ খ্রীস্টাব্দে সেখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্মিত হয় এবং বাঙলাদেশের বাণিজ্য কুঠিগুলি একটি কাউন্সিলের অধীনে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

কলকাতা নগরী ও ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে বাঙলাদেশে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ব্যবসা-বাণিজ্যের দ্রুত উন্নতি হতে থাকে এবং ইংরেজ বণিকদের অধীনে কলকাতা ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হয়ে উঠে। এ যুগে যে সকল দ্রব্য বাঙলাদেশ থেকে রপ্তানি হ'ত তার মধ্যে প্রধান ছিল সুতী ও রেশমের কাপড়, কাঁচা সিল্ক, লবণ, চিনি, পাট, সোরা এবং আফিম। এই সকল কৃষিজাত ও শিল্পজাত পণ্য সংগ্রহের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলাদেশের বিভিন্ন স্থানে কুঠি স্থাপন করে এবং প্রথমে বাঙালী 'এজেণ্ট' বা দালাল নিযুক্ত করে। যাই হোক, অল্প সময়ের মধ্যে কোম্পানি বাঙলায় ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে প্রচুর মুনাফা অর্জনের সুযোগ পায়।

অষ্টাদশ শতকের শুরু থেকে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্নতি, ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্য-পদ্ধতি

কিন্তু ১৭১৩ খ্রীস্টাব্দে বাঙলার সুবাদার মুর্শিদকুলি খাঁ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির 'দস্তক' প্রথা বা ছাড়পত্র বন্ধ করে দেন এবং প্রচলিত হারে শুল্ক আদায়ের ব্যবস্থা করেন। মুর্শিদ কুলির এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে কোম্পানি মুঘল সম্রাট ফররুকশিয়ারের শরণাপন্ন হয়। ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির প্রতিনিধিরূপে জন সুরম্যানকে ফররুকশিয়ারের দরবারে প্রেরণা করা হয়। দু বছর আলাপ আলোচনার পর সম্রাট ফররুকশিয়ার ১৭১৭ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে একটি ফরমান প্রদান করেন। এই ফরমান অনুযায়ী বার্ষিক মাত্র তিন হাজার টাকার বিনিময়ে কোম্পানি বিনা শুল্কে বাণিজ্য করার অধিকার লাভ করে। তবে এই সুযোগ ও অধিকার কোম্পানির রপ্তানি বাণিজ্য ও আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের কোন উল্লেখ এই ফরমানে ছিল না। কিন্তু শীঘ্রই কোম্পানির কর্মচারীগণও দস্তকের অপব্যবহার করতে থাকে এবং ব্যক্তিগত ব্যবসা বাণিজ্যে ঝুঁকে পড়ে। মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলিবর্দি খাঁর সতর্কতা সত্ত্বেও দস্তকের অপব্যবহার সম্পূর্ণরূপে রোধ করা সম্ভব হয় নি। শেষ পর্যন্ত বাঙলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা কোম্পানির কাছে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য হন। সিরাজ প্রায় ১½ কোটি টাকার শুল্ক প্রতারণার দায়ে কোম্পানিকে অভিযুক্ত করেন। কিন্তু কোন ফল হয় নি। বরং এর ফলে কোম্পানির সঙ্গে সিরাজের সম্পর্কের অবনতি ঘটে এবং পরিণামে সিরাজ মসনদচ্যুত

কোম্পানি ও মুর্শিদ কুলি খাঁ ফররুক-শিয়ারের ফরমান, ১৭১৭ খ্রীঃ

রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ, মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দির আমলে দস্তকের অপব্যবহার

সিরাজের প্রতিবাদ, পরিণামে মসনদচ্যুতি

হন। যাই হোক, ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমদানি ও রপ্তানির পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।

পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাঙলাদেশে কোম্প্যানির রাজনৈতিক প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। ধীরে ধীরে ইংরেজরা বাঙলার অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যের উপর তাঁদের একচেটিয়া অধিকার কায়েম করে। পরবর্তী নবাব মীরজাফরের আমলে ঈস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য-সংক্রান্ত স্থানীয় নিয়ম লংঘন করতে থাকে। কোম্পানির কর্মচারীরা নবাবের কর্মচারীদের প্রকাশ্যে অমান্য করতে থাকে।

মীরজাফরের ব্যর্থ প্রতিবাদ

যে সব সুযোগ-সুবিধা তাদের কখনও দেওয়া হয় নি, এখন তারা সেই সব সুবিধাও দাবি করে। ইংরেজদের দৃষ্টান্তে দেশীয় বণিকরাও ইংরেজদের তাঁবেদার হয়ে করমুক্ত বাণিজ্যের সুযোগ গ্রহণ করতে থাকে। বাংলাদেশের রাজকোষে বার্ষিক রাজস্ব-ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ২৫ লক্ষ টাকায়। একদিকে দেশীয় বণিকগণ সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ে, অপরদিকে কোম্পানির কর্মচারীরা স্থল বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার পেয়ে বিপুল সৌভাগ্য গড়ে তোলে। মীরজাফর ইংরেজ গভর্নরের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েও

মীরজাফরের পদচ্যুতি

কোন ফল পান নি। মীরজাফরের নিকট যে পরিমাণ অর্থ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আশা করেছিল সে পরিমাণ টাকা তিনি দিতে পারেন নি। তা ছাড়া অন্য কারণেও তিনি ইংরেজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাই ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্প্যানি মীরজাফরকে সরিয়ে তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে বাঙলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করে।

মীরকাশিম ছিলেন স্বাধীনচেতা নবাব। বাঙলার মসনদ লাভ করার পরই তিনি কোম্পানির কর্মচারীদের ক্ষমতা অপব্যবহারের দৃষ্টান্তগুলি বারবার কলিকাতায়

মীরকাশিমের প্রতিবাদ

কোম্প্যানির গভর্নরের কাছে তুলে ধরেন। কিন্তু কোম্পানি প্রতিকারের প্রতিশ্রুতি বার বার দেওয়া সত্ত্বেও কোন সুরাহা হয় নি। ১৭৬২ খ্রীস্টাব্দে কোম্পানির তৎকালীন গভর্ণর ভ্যান্সিটার্ট ইংরেজ কর্মচারীদের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কিছু কিছু নিয়মকানুন প্রবর্তন

ভ্যান্সিটার্টের প্রচেষ্টা ব্যর্থ

করেন। স্থির হয়, আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে নিযুক্ত কোম্পানির কর্মচারীরা পণ্যের মূল্যের উপর যথারীতি ৯ শতাংশ কর দিতে বাধ্য থাকবে। কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা অভিযোগ করতে থাকে যে ভ্যান্সিটার্ট তাদের 'আইন সঙ্গত' অধিকার বিসর্জন দিয়েছেন। ভ্যান্সিটার্টের প্রচেষ্টা

মীরকাশিম কর্তৃক শুল্ক রদ

এইভাবে গোড়াতেই বানচাল হয়ে যায়। তখন মীরকাশিম রাজস্ব বিভাগের কর্মচারীদের নির্দেশ দেন যে নবাবের কর্মচারী ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে শুল্ক সংক্রান্ত বিবাদ দেখা দিলে তা যেন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করা হয়। এর পর তিনি ঘোষণা করেন যে দেশী বা বিদেশী সকল বণিকই দু'বছরের জন্য বিনা শুল্কে বাণিজ্য করতে পারবে।

নবাবের এই সিদ্ধান্তে ইংরেজেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হয়। শেষ পর্যন্ত তারা ১৭৬৪ খ্রীস্টাব্দে বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমকে উৎখাত করে। এর কিছু আগে মীরজাফরকে পুনরায় নবাব করা হয়।

বক্সারের যুদ্ধে মীরকাশিমের পদচ্যুতি

মীরজাফর কোম্পানিকে সমস্ত রকম বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দিতে রাজী হলেন। এইরূপ শাসন ব্যবস্থায় বাঙলার বাণিজ্য পুরোপুরি ইংরেজ বণিক ও তাদের তাঁবেদার দেশীয় প্রতিনিধিদের করুণার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। তারা সমস্ত রকম নিয়ন্ত্রণের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে বাঙলার বণিক ও কারিগরদের স্বার্থ ক্ষুন্ন করে বিরাট মুনাফা আত্মসাৎ করতে লাগল।

মীরজাফরের আমলে বাঙলার বণিকদের সর্বনাশ

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি সম্রাট শাহ আলমের নিকট বাংলা, বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী বা রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করে। ফলে এই অঞ্চলে কোম্পানির মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। এ ছাড়া কোম্পানির নিকট দেওয়ানী লাভ ছিল এক বিরাট অর্থনৈতিক আশীর্বাদ। এতদিন বাংলার নবাবদের সঙ্গে সংঘর্ষের জন্য কোম্পানিকে সামরিক খাতে ব্যয় বাড়াতে হয়েছিল এবং এর ফলে বাণিজ্য খাতে আর্থিক বিনিয়োগের পরিমাণ কমে গিয়েছিল। কিন্তু দেওয়ানী লাভের ফলে বাণিজ্যে বিনিয়োগের জন্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে লাগল। বাঙলার রপ্তানী যোগ্য দ্রব্য ক্রয়ের পক্ষে কোম্পানির রাজস্ব-উদ্বৃত্ত সাধারণতঃ পর্যাপ্ত ছিল। কার্যতঃ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি চীন ও অন্যান্য দেশে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয়ের জন্য বাঙলা থেকে সোনা রপ্তানী শুরু করল।

কোম্পানির বাণিজ্যের উপর দেওয়ানি লাভের প্রভাব

বাঙলাদেশে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার : (১৭৬৫ খ্রীঃ পর্যন্ত) বাঙলাদেশেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি তথা ইংরেজদের প্রথম শক্তি প্রতিষ্ঠা এবং সেখান থেকেই উত্তর ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তার হয়েছিল। আলিবর্দি খাঁ বাঙলার নবাব হলেন ১৭৪০ খ্রীস্টাব্দে। তিনি ইংরেজদের সাথে মোটামুটি সদ্ভাব বজায় রেখে চলেছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এরপর বাঙলার মনসদে বসেন আলিবর্দির দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা (১৭৫৬ খ্রীঃ)।

আলিবর্দি ও ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি

ইংরেজ বণিকগণের গতিবিধি সিরাজের ভাল লাগত না। প্রথমতঃ তিনি যখন বাঙলার মসনদে বসেন তখন ইংরেজরা তাঁকে কোন উপঢৌকন পাঠায় নি। তারা প্রচলিত রীতি উপেক্ষা করায় সিরাজ তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয়তঃ দাক্ষিণাত্যে ইংরেজদের সাথে ফরাসীদের যুদ্ধ বাধলে ইংরেজরা বাঙলাদেশে এবং ফরাসীরা চন্দননগরে দুর্গ নির্মাণ শুরু করে। সিরাজ দুর্গ নির্মাণ স্থগিত রাখার আদেশ দিলে ইংরেজরা সেই আদেশ অমান্য করে। তৃতীয়তঃ, ইংরেজরা বাণিজ্যিক সুযোগ-শর্তের অপব্যবহার করে সিরাজের বিরাগভাজন হয়েছিল। চতুর্থতঃ, সিরাজের

ইংরেজদের সঙ্গে সিরাজের বিবাদের কারণ

বিপক্ষ দলীয় ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরেজরা কলকাতায় আশ্রয় দিয়েছিল। সিরাজউদ্দৌলা ইংরেজদের সামরিক সাজ সরঞ্জাম সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দিলে ও কলকাতায় প্রতিনিধি পাঠালে ইংরেজরা রীতিমত অবজ্ঞা দেখায়। এতে নবাবের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। তিনি প্রথমে কাশিমবাজারে ইংরেজদের কুঠি দখল করেন, পরে কলকাতা আক্রমণ করেন। ১৭৫৬ খ্রীস্টাব্দে সিরাজ কলকাতার ইংরেজ দুর্গ অধিকার করেন।

কাশিমবাজারের কুঠি দখল, কলকাতা আক্রমণ

গভর্নর ড্রেক সঙ্গীসহ ফলতায় পালিয়ে গেলেন। কলকাতার ইংরেজদের আত্মসমর্পণের পর ১৪৬ জন বন্দীকে একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ রাখার ফলে তেইশ জন ছাড়া আর সকলের শ্বাসরোধে মৃত্যু হয়। হলওয়েল সাহেব কর্তৃক প্রচারিত এই কাহিনীই তথাকথিত 'অন্ধকূপ হত্যা'। অনেক পণ্ডিত এই কাহিনী বিশ্বাস করেন না। মুসলমান-রচিত ইতিবৃত্তে এর কোনও উল্লেখ নেই। ইংরেজ কাহিনীগুলিতে নির্ভরযোগ্য সমর্থনের অভাব, বন্দী হলওয়েলের প্রত্যক্ষ বিবরণেও স্থান-কাল-পাত্র সম্পর্কে অসঙ্গতি আছে। মনে হয়, অন্ধকূপ সম্পর্কে প্রচলিত ইতিহাস সম্পূর্ণ সত্য নয়। অন্ততঃ সিরাজ স্বয়ং এই ব্যাপারে দোষী নন। নবাবের কর্মচারী ও মত্ত সিপাহীদের দায়িত্বহীন আচরণেই বোধহয় এই ঘটনা ঘটেছিল। কলিকাতায় ইংরেজদের পরাজয়ের সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছাবার পর রবার্ট ক্লাইভ ও নৌ-সেনাধ্যক্ষ ওয়াটসন রণতরী ও সৈন্য সমেত কলকাতায় আসেন ও সহজেই কলিকাতা পুনরধিকার করেন। এরপর উভয়পক্ষে আলিনগরে এক সন্ধি হল। সন্ধির শর্ত অনুসারে ইংরেজগণ তাদের দুর্গ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা ফিরে পেল, নবাবকে ক্ষতিপূরণ দিতে হল। ইংরেজগণ কলকাতা সুরক্ষিত করতে ও মুদ্রা প্রচলন করতে শুরু করল। এই সন্ধি মাত্র পাঁচ মাস স্থায়ী হয়েছিল।

অন্ধকূপ হত্যা ও আলোচনা

আলিনগরের সন্ধি

অল্প দিনের মধ্যেই সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করে নবাবের সেনাপতি ও আত্মীয় মীরজাফরকে নবাব করবার এক ঘোর ষড়যন্ত্র শুরু হল। রায়দুর্লভ, জগৎ শেঠ নামে একজন ধনী বণিক ও উমিচাঁদ নামে এক ব্যবসায়ী এই ঘৃণ্য চক্রান্তে যোগ দিল; রবার্ট ক্লাইভ যোগ দিলেন কার্যোদ্ধারের আশায়। মীরজাফরের সঙ্গে গোপন সন্ধির দুটি খসড়া প্রস্তুত হল। একটিতে উমিচাঁদের প্রার্থিত ঘুষের প্রতিশ্রুতি দান ও উমিচাঁদের সই জাল, অপরটি আসল, যার শর্ত অনুসারে, মসনদ পেলে মীরজাফর কোম্পানিকে ১৭৫ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হলেন। তারপর ক্লাইভ প্রায় ২000 সিপাহী এবং ১000 ইংরাজ সৈন্য নিয়ে মুর্শিদাবাদের নিকট পলাশী গ্রামের আমবাগানে ছাউনি ফেললেন। এর পূর্বেই ইংরেজরা চন্দননগর অধিকার করে নবাবের ফরাসী সাহায্য-প্রাপ্তির পথ বন্ধ করে দিয়েছিল।

সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র

গোপন সন্ধির খসড়া

১৭৫৭ খৃস্টাব্দের ২৩শে জুন সকালে বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধে বাঙলার ভাগ্য নির্ণয় হল। মীরজাফর ও রায়দুর্লভ এই যুদ্ধে নিশ্চেষ্ট ছিলেন। নবাবের সেনাপতি মরীমদন ও মোহনলাল প্রাণপণে যুদ্ধ করে নিহত হন। পরাজয় নিশ্চিত ভেবে নবাবী সৈন্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং ইংরেজগণ পিছন থেকে আক্রমণ চালিয়ে জয়ী হয়। সিরাজদ্দৌলা মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করেন, কিন্তু পথিমধ্যে ধরা পড়ে মীরজাফরের পুত্র মীরন কর্তৃক নিহত হন। 'ক্লাইভের জায়গীর' অর্থাৎ চব্বিশ পরগনার জমিদারী ও প্রচুর অর্থ কোম্পানিকে দান করে মীরজাফর এইরূপে বাঙলার নবাব হলেন। পলাশীর এই সংঘর্ষকে কোনো মতেই বড় যুদ্ধ বলা যায় না, কিন্তু ইতিহাসে এর গুরুত্ব যথেষ্ট, কারণ বাঙলায় এবং বাঙলা থেকে সমগ্র ভারতের আধিপত্য ইংরেজের হাতে আসার এটি প্রথম পর্ব। এ ছাড়া পলাশীর যুদ্ধের পরে বাঙলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার কায়েম হয় এবং দেশীয় বণিকদের স্বার্থ বিপন্ন হয়। মীরজাফর কোম্পানির হাতের ক্রীড়ণকে পরিণত হন এবং কোম্পানি সিংহাসনের পশ্চাতে শক্তি'-তে উন্নীত হয়।

পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের নিধন

ক্লাইভের জায়গীর, মন্তব্য

মীরজাফর (১৭৫৭-১৭৬০) ঃ পলাশীর যুদ্ধের পর মীরজাফরকে নামেমাত্র নবাব করে ইংরেজরা বাঙলার প্রভূ হল। মীরজাফর অকর্মণ্য হলেও ওলন্দাজদের সাহায্যে ইংরাজগণকে বাঙলাদেশ থেকে তাড়াবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ওলন্দাজগণ ইংরেজদের সঙ্গে বিদেরার যুদ্ধে পরাস্ত হল (১৭৫৮)। এই সময়ে মুঘল শাহজাদা আলি গহর অযোধ্যার নবাবের সাহায্য নিয়ে বিহার আক্রমণ করেন। পরের বছর সম্রাট শাহ আলম রূপে তিনি দ্বিতীয় অভিযান করেন। কিন্তু দু'বারই ইংরেজরা তাঁকে হটিয়ে দেন। এর পর ইংরেজ-প্রভুত্ব বাঙলাদেশে কার্যতঃ কায়েম হল। অবশ্য আইনত ও আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরেজ অধিকার তখনও স্বীকৃত হয় নি। ক্লাইভ ছিলেন কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের গভর্নর মাত্র, বাঙলার গভর্নর নয়।

বিদেরার যুদ্ধ, আলি গহর, ইংরেজ প্রভুত্বের প্রতিষ্ঠা

মীরকাশীম (১৭৬০-৬৪) ঃ মীরজাফরের কাছে যে পরিমাণ অর্থ কোম্পানি আশা করেছিলেন, সে পরিমাণ টাকা তিনি দিতে পারেন নি। তা ছাড়া, অন্য কারণেও তিনি ইংরেজদের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাই কোম্পানি মীরজাফরকে সরিয়ে তার জামাতা মীরকাশিমকে বাঙলার মসনদে প্রতিষ্ঠিত করে। ক্লাইভের পর তখন কলকাতার গভর্নর ছিলেন ভ্যান্সিটার্ট। নবাবীর বিনিময়ে কোম্পানি বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের রাজস্ব আদায়ের অধিকার লাভ করল। মীরকাশিম সাহসী ও দৃঢ় চরিত্রের লোক ছিলেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে ইংরেজরাই দেশের আসল শাসক। তিনি ইংরেজদের প্রভুত্ব সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং কলকাতা ছেড়ে তিনি মুঙ্গেরে রাজধানী স্থাপন

মীরজাফরে অপসারণ, গভর্নর ভ্যানসিটার্ট, ইংরেজদের সঙ্গে বিরোধ, বিরোধের কারণ

করলেন এবং শাসন ও সৈন্যবিভাগের সংস্কারে মন দিলেন। ইতিমধ্যে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ শুরু হল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বিনা শুল্কে ব্যবসা করবার অধিকার ছিল, কিন্তু কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালাত অথচ নবাবের প্রাপ্য শুল্ক দিত না। দেশীয় বণিকদের এতে ক্ষতি হতে লাগল। কোম্পানির কর্মচারিগণ, মীরকাশিমের নিষেধ অগ্রাহ্য করলে নবাব সমস্ত শুল্ক রহিত করে দিলেন।

ইংরেজগণ এতে অসন্তুষ্ট হল। কোম্পানির পাটনা-কুঠির অধ্যক্ষ এলিস পাটনা শহর অধিকার করলেন; ফলে মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজের যুদ্ধ আরম্ভ হল।

কাটোয়া ঘেরিয়া উদয়নালা বক্সারের যুদ্ধ

কাটোয়া, ঘেরিয়া ও উদয়নালার যুদ্ধে পর পর তিনবার ইংরেজের হাতে পরাস্ত হয়ে অবশেষে মীরকাশিম অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার কাছে আশ্রয় নিলেন। বক্সারে (১৭৬৪) মীরকাশিম ও সুজাউদ্দৌলার সম্মিলিত বাহিনী কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধে মেজর মনরো কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হল। কলকাতা কাউন্সিল আবার মীরজাফরকে নবাবী দিলেন।

নবাব নিজামুদ্দৌলা ১৭৬৫

১৭৬৫ খৃস্টাব্দে মীরজাফরের মৃত্যু হলে বাঙলার গভর্নর তাঁর সহযোগিগণ মীরজাফরের এক পুত্র নিজামুদ্দৌলাকে মসনদে বসিয়ে আর একবার প্রচুর উৎকোচ আদায় করল। বাঙলায় ইংরেজ শোষণ ও বিশৃংখলা পুরামাত্রায় দেখা দিল। নিজামুদ্দৌলা এক সন্ধিপত্রে তার প্রকৃত ক্ষমতা কোম্পানিকে বিলিয়ে দিলেন।

আলোচনা ঃ ইংরেজের সঙ্গে নবাবী সম্পর্কের এখানেই পূর্ণচ্ছেদ। মীরজাফর ও মীরকাশিম উভয়েই স্বার্থান্বেষী, সন্দেহ নেই। মীরকাশিম যে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন তা নয়। কিন্তু অকর্মণ্য মীরজাফরের পাশে, মীরকাশিমের দৃপ্ত মনোভাব এবং ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি বলিষ্ঠ প্রতিপক্ষের সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় অনেকটা প্রশংসনীয়ভাবেই পরিস্ফুট হয়। মীরজাফরকে কেন্দ্র করে ইংরেজের কূট প্রবেশ,

বক্সার যুদ্ধের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

মধ্যে মীরকাশিমের প্রতিরোধ, আবার সেই দুর্বল মীরজাফরের মিথ্যা নবাবীর পরিণতি ও কোম্পানির প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য পলাশীর চেয়ে বক্সারের যুদ্ধকেই প্রকৃত শক্তি-সংঘর্ষ বলা চলে। এখানে অপরিণত এবং অনভিজ্ঞ নবাবের পিছনে ঘরের শত্রু ও বিদেশী শত্রুর গোপন ও হীন কারসাজি ছিল না। স্বার্থরক্ষায় নবাব ও স্বার্থ-বিস্তারে ইংরেজ, উভয়েরর মধ্যে এটি সম্মুখ ও নিষ্পত্তিকারী যুদ্ধ। পলাশীতে যে ইংরেজ প্রভুত্বের স্বীকৃতি, বক্সারে তারই সমর্থন ও প্রতিষ্ঠা। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৪ সাল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাঙলার রাজনৈতিক পরিবেশ অনেকটাই অনিশ্চিত ও পরিবর্তায়মান ছিল। ভারতে ইংরেজরা সেই সুযোগের সদব্যবহার করেন এবং নিজেদের স্বার্থ ও শক্তি কায়েম করবার জন্য নবাবদের সঙ্গে সুবিধাবাদী আচরণ করেন, এমন কি প্রয়োজনমত সন্ধি ও শর্ত, সততা ও প্রতিশ্রুতি ভাঙতে দ্বিধাগ্রস্ত হন নি।

সাম্রাজ্য গঠন ও ক্লাইভের ভূমিকা ঃ রবার্ট ক্লাইভ ১৭৪২ খৃস্টাব্দে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কেরানীর চাকুরী নিয়ে মাদ্রাজে আসেন। ১৭৪৬ খৃস্টাব্দে ফরাসী নৌবাহিনীর অধ্যক্ষ লা বুরদনে মাদ্রাজ আক্রমণ করলে ক্লাইভ ইংরেজ সৈন্যদলে ভর্তি হন। মাদ্রাজে কোম্পানির দুর্গরক্ষায় ও তাঞ্জোর-অভিযানে তিনি কৃতিত্বের পরিচয় দেন। চাঁদসাহেব কর্তৃক আর্কটের নবাব মহম্মদ আলি ত্রিচিন-পল্লীতে অবরুদ্ধ হলে ক্লাইভ সামান্য সংখ্যক ভারতীয় ও ইংরেজ সৈন্যের সাহায্যে আর্কটের সিংহাসনে বসলেন। দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের প্রতিপত্তি স্থাপিত হল।

প্রথম জীবন

ক্লাইভের দ্বিতীয় কৃতিত্ব ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলার কাছ থেকে কলকাতা পুনরধিকার এবং আলিনগরের সন্ধি (ফেব্রুয়ারী, ১৭৫৭)। এই সন্ধির শর্তে ইংরেজগণ তাদের সকল দাবি আদায় করে নিল। নবাবের বিরুদ্ধপক্ষের সঙ্গে যড়যন্ত্রে যোগ দিয়ে ক্লাইভ বাঙলায় রাষ্ট্রিকবিপ্লব ঘটালেন। সিরাজদৌল্লার পতন, কৌশলে পলাশীর যুদ্ধ ও ক্রীড়ণক-নবাবের সৃষ্টি তাঁরই কীর্তি। তৃতীয় কর্নাট যুদ্ধে (১৭৫৪-১৭৬০) প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসী শক্তির পরাজয়েও ক্লাইভের অবদান সামান্য নয়। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি বাঙলার গভর্নর ছিলেন। তাঁরই তৎপরতায় এই সময়ে ভারতে প্রতিদ্বন্দ্বী ওলন্দাজ শক্তি বিধ্বস্ত হয়।

বাঙলায় ক্লাইভের ভূমিকা, তৃতীয় কর্ণাট যুদ্ধ

১৭৬০ খৃস্টাব্দে ক্লাইভ দেশে ফিরে যান, কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে বাঙলায় বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। তাই ডিরেক্টরগণ ক্লাইভকে দ্বিতীয় বার গভর্নর করে বাঙলা দেশে পাঠান। ১৭৬৫-৬৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এ দেশে ছিলেন। এই সময় তিনি শাসক ও রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে কৃতিত্বের পরিচয় দেন এবং বাঙলায় কোম্পানির রাজত্ব ও ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। ফরাসী শক্তির নাশ, বঙলার নবাবকে অধীনে রাখা ও অযোধ্যা রাজ্যটি ইংরাজের রক্ষিত রাজ্যে পরিণত করাই তাঁর মূল নীতি ছিল। এই তিনটি বিষয়েই তিনি কৃতকার্য হন।

ক্লাইভের সঙ্গে প্রত্যাবর্তন

মূল লক্ষ্য ও সিদ্ধি

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে বক্সারের যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে ক্লাইভ যে বন্দোবস্ত করলেন, তাতে তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও শাসন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। সুজাউদ্দৌলা ৫০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ এবং এলাহাবাদ ও কোরা জেলা ছেড়ে দিলেন এবং তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য ইংরেজসৈন্য রাখতে ও তার ব্যয়ভার বহন করতে স্বীকৃত হয়ে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি করলেন। অযোধ্যা মারাঠাদেশ ও ইংরেজ এলাকার অন্তবর্তী অধীন রাজ্য হল। ক্লাইভ আবার এলাহাবাদ ও কোরা জেলা দুটি মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমকে দান করলেন। তাঁকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন এবং বিনিময়ে বাংলা বিহার ও ওড়িশার দেওয়ানী বা রাজস্ব

অযোধ্যার নবাবের সঙ্গে বন্দোবস্ত, ইংরেজ এলাকার বৃদ্ধি, দ্বিতীয় শাহ আলমের সঙ্গে বন্দোবস্ত

আদায় করবার অধিকার লাভ করলেন। এর কিছু পূর্বেই নবাব নাজিমদ্দৌলার কাছ থেকে কোম্পানি কার্যতঃ নিজামত বা দেশ-শাসনের অধিকার পেয়েছিলেন। নিজামত বা দেশ-শাসন এবং দেওয়ানী বা রাজস্ব সংগ্রহ এই দুটি কাজ দুজন নায়েব নাজিম-এর (নায়েব ও দেওয়ান) উপর অর্পণ করা হয়। তাঁরা ছিলেন প্রকৃত প্রস্তাবে কোম্পানিরই বশংবদ। দেশ-শাসন ও বিচার সংক্রান্ত ব্যয় বাবদ নবাব মাত্র ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পেতে থাকলেন।

'দেওয়ানী' লাভ, 'নিজামত'

ক্লাইভের এই দায়িত্বহীন জটিল শাসনব্যবস্থা দ্বৈতশাসন নামে পরিচিত হলেও এটি অশাসন বা কুশাসনের নামান্তর মাত্র। এতে কোনও পক্ষেরই দায়িত্বের বালাই ছিল না। প্রকৃত শাসক কোম্পানি, কিন্তু ইংরেজরা অর্থের হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। রাজস্ব-সংগ্রহ করাই তাদের মুখ্য কাজ, দেশ-শাসন গৌণ। আর পরাশ্রিত নবাব নামতঃ দেশের সরকার, কার্যতঃ অলস ও অকর্মণ্য বৃত্তিভোগী। এই ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। যাই হোক, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে মুঘল সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলমের কাছে থেকে দেওয়ানী লাভ করে বাঙলাদেশে ঈস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি বৈধ রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়।

দ্বৈতশাসন, মন্তব্য

[পাঁচ] ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার (১৭৬৭ খ্রীঃ—১৮৫৭ খ্রীঃ)

প্রথম পর্ব (১৮১৮ খ্রীঃ পর্যন্ত)ঃ ক্লাইভের আমল থেকে ডালহৌসির শাসনকাল পর্যন্ত ভারতে ইংরেজদের প্রভুত্ব বিস্তারের যুগ। এই কাজে অগ্রণী ছিলেন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস, পরে ওয়েলেসলি, ও ডালহৌসী। ভারতে ইংরেজদের সর্বাধিপত্য স্থাপন নির্বিঘ্ন ছিল না। বাঙলার নবাবরা, পেশবাদের নেতৃত্বে মারাঠারা মহীশূরে হায়দর আলি ও টিপু সুলতান এবং পাঞ্জাবে শিখরা ইংরেজদের শক্তি প্রসারে যথেষ্ট বাধা দিয়েছিলেন।

[ক] মারাঠা যুদ্ধ ঃ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে মারাঠাদের সম্পূর্ণ পতন হয়নি। ইংরেজদের সঙ্গে নানা যুদ্ধে মারাঠারা বলিষ্ঠ প্রতিরোধ করেছিল। তাদের মধ্যে কয়েকজন বিখ্যাত নেতা রাজনীতিতে বিচক্ষণতার পরিচয়ও দেন, যেমন নানা ফড়নবিশ, মহাদজী সিন্ধিয়া, অহল্যাবাই প্রভৃতি। বালাজী বাজীরাও এর মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে মাধব রাও চতুর্থ পেশবা হলেন। কিন্তু অকালে তাঁর মৃত্যু হলে মারাঠাদের গৃহবিবাদ শুরু হল। প্রথমে পেশবা পদ নিয়ে ঘরোয়া ষড়যন্ত্র দেখাদিল। পঞ্চম পেশবা নারায়ণ রাও যখন রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্তে নিহত হলেন, তখন রঘুনাথ নিজেকে পেশবা বলে ঘোষণা করলেন। এই থেকে ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের সূত্রপাত।

মাধব রাও-এর মৃত্যুর পর মারাঠাদের গৃহবিবাদ পঞ্চম পেশবা নারায়ণ রাও নিহত ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের সূত্রপাত

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ ঃ পঞ্চম পেশবা নারায়ণ রাও যে রঘুনাথ রাওয়ের চক্রান্তে নিহত হয়েছেন, একথা ন্যায়াধীশ রামশাস্ত্রী সকলের সামনে প্রকাশ করে দিলে অনেকেই রঘুনাথ রাও-এর বিরোধী হয়। বিপক্ষ দলের নেতা ছিলেন কূটনীতিতে বিচক্ষণ নানা ফড়নবিশ ও মাহাদজী সিন্ধিয়া। এঁরা পেশবা নারায়ণ রাও-এর শিশুপুত্র মাধব রাও নারায়ণকে পেশবা পদে অধিষ্ঠিত করলেন। এই অবস্থায় শিশু পেশবা মাধব রাও-এর অধিকার অস্বীকার করেন রঘুনাথ রাও বা রাঘোবা বোম্বাই-এর ইংরেজদের কাছে সাহায্য চাইলেন। সাহায্যের বদলে যুদ্ধের খরচ, দুটি জায়গা—**সালসেট ও বেসিন,** এবং সুরাট ও ব্রোচের রাজস্বের কিছু অংশ রঘুনাথ ইংরেজদের দিতে স্বীকার করলেন। এই মর্মে ১৭৭৫ সালে সুরাটে এক সন্ধি হয় এবং ইংরেজরা যে সৈন্যদল পাঠান, তার সাহায্যে রঘুনাথ নানা ফড়নবিশের দলকে পরাস্ত করে। গভর্নর-জেনেরাল ওয়ারেন হেস্টিংস এই ব্যাপারের বিরোধী ছিলেন। তাই **পুরন্দরের সন্ধি** (১৭৭৬) অনুসারে ইংরেজরা রঘুনাথের পক্ষ ত্যাগ করলেন। স্থির হল ইংরেজরা যে সব সুবিধা পেয়েছিলেন সেগুলি বজায় থাকবে, উপরন্তু বারো লক্ষ টাকা পাবেন। আর রঘুনাথ রাও পেশবার কাছ থেকে মাসহারা পাবেন। কিন্তু দেখা গেল, কোনও পক্ষই পুরন্দরের সন্ধি-সর্ত পালন করছে না, আর বিলাতে কোম্পানির কর্তৃপক্ষও এই সন্ধি অনুমোদন করলেন না। কাজেই উভয় পক্ষে আবার যুদ্ধ বাধল। যুদ্ধের প্রথমে ইংরেজ সৈন্য ওয়াড়গাঁও নামক স্থানে পরাস্ত হয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হয়। ব্যবস্থা হল, ইংরেজরা রঘুনাথের পক্ষ নেবেন না আর মারাঠাদের কাছ থেকে পাওয়া জায়গাগুলি ছেড়ে দেবেন।

রঘুনাথ রাও-এর চক্রান্ত ফাঁস, মাধব রাও নারায়ণের পেশোয়া পদ লাভ, রঘুনাথ রাও বা রাঘোবার ব্রিটিশ সাহায্য প্রার্থনা

সুরাটের সন্ধি ১৭৭৫ খ্রীঃ, পুরন্দরের সন্ধি, ১৭৭৬ খ্রীঃ,

কোম্পানির কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্ধি নাকচ, ওয়াড় গাঁও-এর যুদ্ধে ইংরেজদের পরাজয় ও সন্ধি

ওয়ারেন হেস্টিংস কিন্তু এই অপমানজনক সন্ধি মানলেন না, গডার্ডের নেতৃত্বে বাঙলা থেকে একদল সৈন্য পাঠিয়ে দিলেন। ১৭৮০ সালে আমেদাবাদ ও বেসিন দখল করা হল। আর এক দল ইংরেজ সৈন্য গোয়ালিয়র অধিকার করল এবং ১৭৮১ সালে সিন্ধিয়ার সেনাবাহিনীকে পরাজিত করল। ইংরেজরা পর পর যুদ্ধে জয়ী হচ্ছে দেখে মাহাদজী সন্ধির জন্য ব্যগ্র হলেন এবং নিজেই মধ্যস্থ হয়ে ১৭৮২ খৃস্টাব্দে **সালবাই-এর সন্ধি-**সর্ত ঠিক করে দিলেন। সন্ধির ফলে ইংরেজরা **মাধব রাও নারায়ণকে** পেশবা বলে স্বীকার করলেন। রঘুনাথের জন্য বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা ভাতার ব্যবস্থা হল। এবং সিন্ধিয়া তাঁর রাজ্যে ইংরেজদের অধিকৃত অঞ্চল ফিরে পেলেন।

ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক সন্ধি অমান্য, আমেদাবাদ, বেসিন ও গোয়ালিয়র দখল সিন্ধিয়ার পরাজয়, সালবাই-এর সন্ধি; ১৭৮২

এই যুদ্ধে দুটি তথ্য পরিষ্কার বোঝা গেল। প্রথমটি হল, মারাঠারা সংঘবদ্ধ হলে ইংরেজদের পরাস্ত করতে পারে ; যেমন, নানা ফড়নবিশের নেতৃত্বে মারাঠা নায়করা সাময়িক ভাবে একত্র হয়ে ইংরেজদের উদ্দেশ্য সফল হতে দেন নি। দ্বিতীয়টি হল, মারাঠা রাজ্যগুলির মধ্যে যদি বিভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করা যায়, তা হলে ইংরেজরা কাউকে স্বপক্ষে টেনে, কাউকে বিপক্ষে ফেলে একের পর এক অঞ্চল অধিকার করে আপনার প্রভুত্ব কায়েম করতে পারবেন, নতুবা নয়। প্রথম মারাঠা যুদ্ধে কোনও নিষ্পত্তি হল না। সালবাই-এর সন্ধির পর প্রায় বিশ বছর মারাঠাদের সঙ্গে আর সংঘর্ষ হয়নি। সেজন্য ইংরেজরা তাঁদের অন্য শত্রুদের সঙ্গে বোঝাপড়া করবার সময় পেয়েছিলেন।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের তাৎপর্য

দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ : দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ পড়বার আগে এই সময়ে ভারতে যে জটিল অবস্থা চলছিল, সেটি জানা দরকার। নিজাম ইংরেজদের সঙ্গে বশ্যতামূলক সন্ধিতে আবদ্ধ। তাই শত্রুর আক্রমণ থেকে হায়দরাবাদকে রক্ষা করার দায়িত্ব ছিল কোম্পানির। এদিকে মারাঠারা তাদের সৈন্যবাহিনীর খরচ জোগানোর জন্য চৌথ আদায় করতে হায়দরাবাদ ও মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করল। মহীশূরের নিরাপত্তা বজায় রাখার ভারও ইংরেজরা নিয়েছিলেন। কাজেই মারাঠাদের উপর কড়া নজর রাখা, তাদের সংযত করার খুবই প্রয়োজন ছিল। সেইজন্য বড়লাট ওয়েলেসলি পেশবাকে অধীনতামূলক মিত্রতায় বাঁধতে চাইলেন। এই সময়ে মারাঠাদের ভাগ্যে দুর্যোগ ঘনিয়েছিল। কারণ, একে একে অহল্যাবাঈ, মাহাদজী সিন্ধিয়ার মৃত্যু হল এবং পেশবা মাধব রাও নারায়ণ আত্মহত্যা করলেন। ১৮০০ সালে প্রবীণ নানা ফড়নবিশও মারা গেলেন।

পটভূমিকা

বিশিষ্ট মারাঠা নেতৃবর্গের মৃত্যু

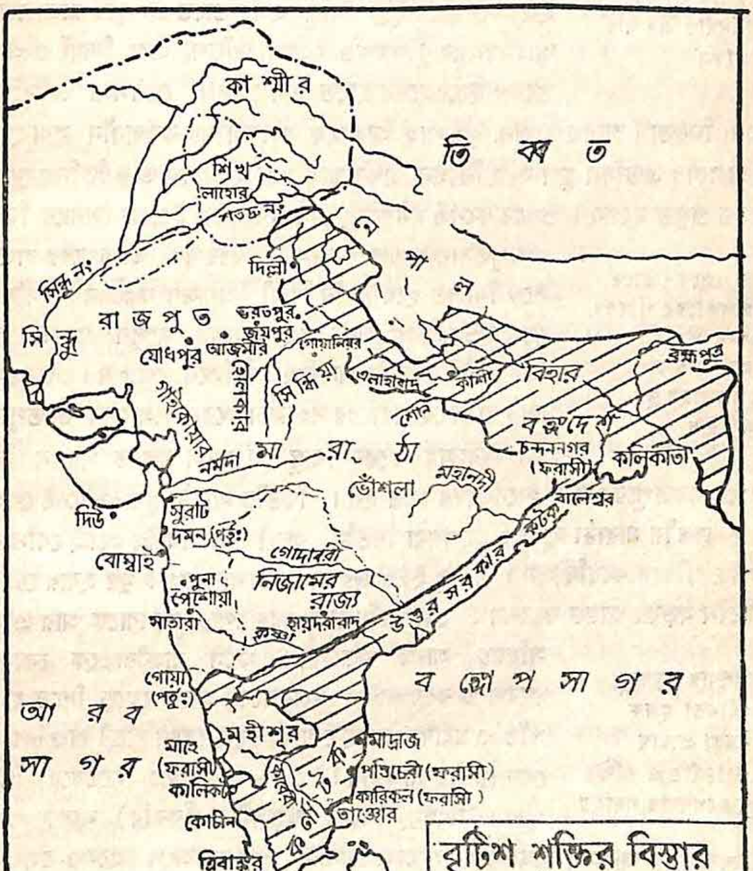
মারাঠাদের মধ্যে একটি দৃঢ় শক্তির অভাবে আর গৃহবিবাদের ফলে ওয়েলেসলির পক্ষে এখন ইংরেজের প্রভুত্ব বিস্তার করা সম্ভব হল। গোয়ালিয়রের গদিতে তখন দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং ইন্দোরে ছিলেন যশোবন্ত রাও হোলকার। পেশবার পদে ছিলেন দ্বিতীয় বাজীরাও। ১৮০২ সালে দৌলত রাও এবং পেশবার মিলিত সৈন্য দলকে যশোবন্ত রাও হারিয়ে দিয়ে পুনা দখল করলেন এবং নিজের মনোনীত এক ব্যক্তিকে পেশবা করে বসালেন। অতঃপর বাজী রাও পদচ্যুত হয়ে বেসিনে গিয়ে ইংরেজদের আশ্রয় নিলেন। তখন লর্ড ওয়েলেসলির ভাই আর্থার ওয়েলেসলি (পরে ডিউক অব্ ওয়েলিংটন) পুনা দখল করে বাজীরাওকেই আবার গদিতে বসালেন। এই অনুগ্রহের বদলে বাজীরাওকে কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জন দিতে হল। তিনি ইংরেজের আনুগত্য স্বীকার করে ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের বেসিনের সন্ধি অনুযায়ী

গৃহবিবাদের ফলে মারাঠাদের দুর্বলতা, যশোবন্ত রাওয়ের পুনা দখল, পেশবা বাজীরাও পদচ্যুত

আর্থার ওয়েলেসলি কর্তৃক পুনা দখল ও বাজীরাওকে পেশবা পদে পুনঃ স্থাপন

ইংরেজ সৈন্যের ব্যয় বাবদ বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে রাজি হলেন। বাজী রাও পেশবা হলেন বটে কিন্তু তাঁর এই বশ্যতা স্বীকারে মারাঠা দলপতিরা ক্ষুব্ধ হলেন। সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন কিন্তু হোলকার সরে দাঁড়ালেন, যোগ দিলেন না। এখানে একটি বড় সুযোগ নষ্ট হল। যদি এই সংকটে

বেসিনের সন্ধি, ১৮০২ খ্রীঃ



সবাই একত্র হয়ে ইংরেজদের রুখতে পারতেন, তা হলে মারাঠাদের তথা ভারতের ইতিহাস হয় তো অন্যরকম দাঁড়াত। যাইহোক, ১৮০৩ সালে যুদ্ধ শুরু হল। ইংরেজ সেনাপতি ছিলেন আর্থার ওয়েলেসলি। নিজামরাজ্যের সীমান্তে আসাই-তে ইংরেজ সেনাবাহিনী সিন্ধিয়া ও ভোঁসলার মিলিত সৈন্যদলকে পরাস্ত করল। তারপর আরগাঁও-এ ভোঁসলার সৈন্য পরাজিত ও বিধ্বস্ত হল।

দ্বিতীয়-ইঙ্গ মারাঠা যুদ্ধের সূচনা, মারাঠা পরাজয়

ওদিকে উত্তর ভারতেও যুদ্ধ চলছিল। সেনাপতি লেক সিন্ধিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হলেন। সিন্ধিয়ার ফরাসী সেনাপতি পেরোঁ এই বিপদের সময় অনুপস্থিত ছিলেন। লেক সহজেই দিল্লী ও লাসোয়ারীতে সিন্ধিয়াকে হারিয়ে দিলেন। তখন ভোঁসলা ও সিন্ধিয়াকে বাধ্য হয়ে সন্ধি করতে হল। ভোঁসলার সঙ্গে দেবগাঁও এবং সিন্ধিয়ার সঙ্গে সুর্জি অর্জনগাঁওতে ইংরেজদের যে দুটি সন্ধি হল, তাতে ঐ দুটি রাজ্য থেকে আহমদনগর বুন্দেলখণ্ড, বেরার, ওড়িশা এবং দিল্লী ও আগ্রা প্রদেশ ইংরেজদের হাতে চলে গেল। ভোঁসলা ও সিন্ধিয়া বশ্য মিত্রতায় আবদ্ধ হলেন, বৃদ্ধ শাহ আলমকে কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন করা হল।

দেবগাঁও ও সুর্জি অর্জনগাঁও এর সন্ধি, ফলাফল

হোলকার এতদিন চুপ করে ছিলেন, এখন স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে তিনিও যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন। প্রথমে কর্নেল মনসনের নেতৃত্বে একদল ইংরেজ সৈন্যকে তিনি রাজপুতনায় পরাস্ত করেন। তারপর ভরতপুরের রাজার সঙ্গে মিলিত হয়ে তিনি দিল্লী আক্রমণ করলেন। দীগের যুদ্ধে লর্ড লেকের কাছে হোলকারের সম্পূর্ণ পরাজয় হল (১৮০৪)। তিনি পাঞ্জাবে পালিয়ে গেলেন। ভরতপুর জাঠ রাজা হোলকারের সহায়তা করেন বলে লেক ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ করেন কিন্তু দুর্গ দখল করতে পারেন নি। পরে ভরতপুরের সঙ্গে ইংরেজদের সন্ধি হয়। দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ এখানেই শেষ।

লর্ড লেকের হাতে হোলকারের পরাজয়, ১৮০৪ খ্রীঃ
লেক কর্তৃক ভরতপুরের দুর্গ অবরোধ

তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ ঃ পেশবা দ্বিতীয় বাজী রাও বিপন্ন হয়েই বেসিনের সন্ধি স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজের অধীনতাপাশ থেকে মুক্ত হবার চেষ্টায় তিনি ষড়যন্ত্র আরম্ভ করলেন। কোম্পানি সেই খবর পেয়ে পেশবাকে আর একটি সন্ধিতে আবদ্ধ করলেন। ফলে বাজীরাওকে কোঙ্কন প্রদেশ ও কয়েকটি দুর্গ ইংরেজদের হাতে ছেড়ে দিতে হল। শক্তি ও মর্যাদা ক্রমেই লোপ পাচ্ছে দেখে বাজী রাও একবার শেষ চেষ্টায় নামলেন। ১৮১৭ সালের নভেম্বরে তিনি পুনার পিছন দিকে **খড়কী** (কিরকি) নামক স্থানে ইংরেজদের আক্রমণ করলেন। ইংরেজ সৈন্যরা সংখ্যায় অল্প হলেও পেশবার সেনাদলকে **কোড়েগাঁও** এবং **অস্টির** যুদ্ধে চূড়ান্ত ভাবে হারিয়ে দেয় (১৮১৮)। ইংরেজরা পুনা দখল করেন। বাজীরাও আত্মসমর্পণ করলে, তাঁকে বার্ষিক আট লক্ষ টাকা বৃত্তি দেওয়ার সর্তে বিঠুরে (উত্তর প্রদেশে) সরিয়ে দেওয়া হল। পেশবার পদ লোপ পেল এবং তাঁর রাজ্য ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হল। শুধু সাতারা ও তার পার্শ্ববর্তী কয়েকটি জায়গা নিয়ে একটি ছোট রাজ্য ছত্রপতি শিবাজীর বংশধর প্রতাপ সিংহকে দেওয়া হল।

পেশবার ষড়যন্ত্র
অধীনতা মূলক মিত্রতা প্রয়োগ
কোড়েগাঁও ও অস্টির যুদ্ধে পেশবার পরাজয়

সন্ধি ও শর্ত, ফলাফল

বাজী রাও যখন যুদ্ধে লিপ্ত, তখন নাগপুরে ও হোলকার রাজ্যেও ইংরেজদের

ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ চলছিল। আপ্পা সাহেব ভোঁসলার সৈন্যরা সীতাবল্‌দি ও নাগপুরের যুদ্ধে পরাস্ত হলে ভোঁসলার রাজ্যের একটি বড় অংশ ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়। ওদিকে মহিদপুরের যুদ্ধে হোলকার সৈন্য ভীষণ ভাবে পরাজিত হয়। হোলকার নিজ রাজ্যের অর্ধেক অংশ ইংরেজদের দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হন। সিন্ধিয়াকেও আর একটি নতুন সন্ধি-সর্তে আবদ্ধ করা হল। এই ভাবে লর্ড হেস্টিংস মারাঠাদের শক্তি চূর্ণ করে তাদের ভবিষ্যতে উত্থানের পথ বন্ধ করে দেন। তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ শেষ হলে ইঙ্গ-মারাঠা সংঘর্ষের অবসান ঘটল। সব মারাঠা রাজ্যই এখন ইংরেজের বশ্য ও অধীন হল। কেবল সিন্ধিয়ার কিছু স্বাধীনতা ও সামরিক ক্ষমতা অবশিষ্ট ছিল। ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে নাবালকের অভিভাবকত্ব নিয়ে গোয়ালিয়র রাজ্যে গোলযোগ দেখা দিতে গভর্নর-জেনেরাল হস্তক্ষেপ করেন ও ইংরেজ সৈন্য পাঠান। **পন্নিয়ার যুদ্ধে** গোয়ালিয়র সৈন্যরা হেরে যাওয়াতে শেষ মারাঠা রাজ্যটিও ইংরেজের অধীন হয়ে গেল। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসি নাগপুরের ভোঁসলাদের বাকি প্রদেশগুলি এবং ক্ষুদ্র সাতারা রাজ্যটি সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন শুধু কোলাপুরের ছোট রাজ্যটিতে শিবাজী-বংশের একটি শাখার অস্তিত্ব রইল।

ভোঁসলা ও হোলকারের পরাজয়, সন্ধিস্থাপন, সিন্ধিয়ার সঙ্গে নতুন সন্ধি

তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান

মারাঠা সাম্রাজ্যের পরিণতি

মারাঠা শক্তির পতন ঃ মারাঠাদের পরাজয়ের বড় কারণ হল, মারাঠাচক্রের প্রবর্তনে সামন্তরা নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজা হিসাবে শাসন করতে লাগলেন। পেশবাদের আমলে মারাঠাদের একটি সুগঠিত কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘর্ষের আগে থেকেই তাঁদের ঐক্যবোধ নষ্ট হচ্ছিল। পেশবার পদ নিয়ে গৃহবিবাদ, দলভেদ আর মারাঠা নেতাদের স্বতন্ত্র নীতি ও কার্যকলাপে ভিতরকার সংহতি লোপ পাচ্ছিল। এই রকম দলীয় বা নিজ নিজ শক্তিবিস্তারের চেষ্টা জাতির শক্তিক্ষয়ের প্রধান কারণ। তাঁদের যুদ্ধনীতি এবং রণকৌশলে কোন উন্নতি হয় নি, ভাড়াটিয়া বিদেশী সৈন্য নিযুক্ত করেও সুফল দেখা যায় নি। চিরাচরিত গেরিলা যুদ্ধ বর্জন করা ঠিক হয় নি। যুদ্ধ বিজ্ঞানের প্রতি ঔদাসীন্যও তাঁদের দুর্বলতা বৃদ্ধি করেছিল। ইংরেজদের সংঘবদ্ধ আয়োজন, তাদের যুদ্ধবিজ্ঞান এবং কূটনীতির কাছে মারাঠাদের পরাজয় ঘটেছিল। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের পরও মারাঠারা নির্বীর্য হয় নি। ১৭৭৯—৮০ সালে ইংরেজদের ছিল খুব দুঃসময়। ঐ বছরে হায়দরাবাদের নিজাম, মহীশূরের হায়দর আলি এবং মারাঠারা ইংরেজদের ভারত থেকে বিতাড়িত করার জন্য একত্র হয়ে-

মারাঠাদের ঐক্যবোধের অভাব

যুদ্ধনীতি ও রণকৌশলে উন্নতির অভাব, ও গেরিলাযুদ্ধ বর্জন

ভারতে ইংরাজদের সর্বাধিপত্য প্রতিষ্ঠা

ছিলেন। এই তিনটি শক্তির মিলন যদি আর কিছুকাল স্থায়ী হয়ে কাজ করত, তা হলে ইংরেজদের কি অবস্থা হত অনুমান করা শক্ত নয়। মারাঠাদের পতনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অগ্রগতি প্রশস্ত হয়ে গেল, লর্ড হেস্টিংসের দৌলতে। ভারতে ইংরেজদের সর্বাধিপত্য কার্যতঃ প্রতিষ্ঠিত হল কেবল এক জায়গায় একটু সঙ্কোচ ও বাধা ছিল। দিল্লীতে তখন দ্বিতীয় আকবর বাদশাহ রয়েছেন যদিও নামে, তাঁকে কোম্পানি প্রতি বছর নজরানা দিয়ে অন্ততঃ মৌখিক সম্মান দেখাতেন। লর্ড হেস্টিংস তাঁকে এই 'বাদশাহীর জের' ছাড়তে বললেন ও নজর দান বন্ধ করে দিলেন। এতদিন কোম্পানির টাকায় বাদশাদ শাহ আলমের নাম ছাপা থাকত। ১৮৩৫ সালের পর সেটিও উঠে গেল।

[খ] **মহীশূরের প্রতিরোধ ঃ** মুঘল সাম্রাজ্য যখন ভেঙে যাচ্ছিল, সেই সময় পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতে মারাঠারা, হায়দাবাদের নিজাম এবং মহীশূরে হায়দর আলি প্রবল হয়ে ওঠেন। ইংরেজরা তখন নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে সুবিধা খুঁজছিলেন, তার ফলে ভারতের রাজনীতির মধ্যে জড়িত হন। কর্নাটের যুদ্ধ, মহীশূর ও মারাঠাদের সঙ্গে ইংরেজ কোম্পানির শক্তিপরীক্ষা তারই সাক্ষ্য। এখন মহীশূরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের ইতিহাস বলছি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে মহীশূরের সংগ্রাম চলেছিল ত্রিশ বছর। বিদেশীর প্রতিরোধে হায়দর আলি ও তাঁর পুত্র টিপু সুলতানের ভূমিকা ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে।

হায়দর আলি ঃ আঠারো শতকে মাঝামাঝি হিন্দু রাজ্য মহীশূরে ওয়াদিয়ার বংশের রাজা ছিলেন দুর্বল। তখন তাঁর মন্ত্রী নন্দরাজ রাজ্যের সর্বময় কর্তা হয়ে ওঠেন। হায়দর আলি প্রথমে এই রাজ্যে এক সামান্য সৈনিক ছিলেন। ১৭৫৫ সালে, তেত্রিশ বছর বয়সে তিনি নিজের দক্ষতায় নন্দরাজের সুনজরে পড়েন এবং ডিণ্ডিগুলের ফৌজদার হন। দাক্ষিণাত্যে তখন ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে যুদ্ধ চলছিল। হায়দর আলি সেই সুযোগে নতুন যুদ্ধ প্রণালীতে একটি ভালো সৈন্যদল গড়ে তোলেন এবং পরে মহীশূরের প্রধান সেনাপতি হন। ক্রমে তাঁর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি বেদনোর প্রভৃতি স্থান অধিকার করে প্রচুর অর্থ পান ও মহীশূর রাজ্যের সীমা বাড়িয়ে নেন। অনেক ফরাসী সৈন্য রেখে তিনি নিজের সৈন্যদলকে সুশিক্ষিত করে তোলেন। কিছুকাল পরে মহীশূর-রাজের মৃত্যু হলে হায়দর তাঁর মনোনীত এক ব্যক্তিকে নামে মাত্র সিংহাসনে বসিয়ে নিজেই রাজ্যের প্রকৃত কর্তা হন।

মন্ত্রী নন্দরাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব, হায়দর আলির ডিণ্ডিগুলের ফৌজদারী পদ লাভ

সামরিক দক্ষতা ও মহীশূরের প্রধান সেনাপতি, মহীশূর রাজের মৃত্যু

প্রথম মহীশূর যুদ্ধ ঃ হায়দর আলির অধীনে দক্ষিণ দিকে মহীশূরের উত্থান দেখে মারাঠাদের মনে আশঙ্কা হল। ওদিকে নিজাম ও মাদ্রাজের

ইংরেজরা হায়দরের প্রতাপ বৃদ্ধিতে বিশেষ বিচলিত হয়ে তাঁকে দমন করার চেষ্টায় রইলেন। ১৭৬৬ সালে মাদ্রাজের ইংরেজরা হায়দরের বিরুদ্ধে নিজামকে সাহায্য করবেন বলে কথা দিয়েছিলেন। কারণ, হায়দার আলি যেভাবে মালাবার, মাল দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি অঞ্চল অধিকার করে রাজ্যবিস্তার করছিলেন, তাতে নিজাম ও ইংরেজদের মধ্যে মিত্রতার প্রয়োজন হয়েছিল। মারাঠারাও এই জোটে যোগদান করে মহীশূর রাজ্য আক্রমণ করে। তখন বেগতিক দেখে হায়দর মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি করেন। ১৭৬৭ সালে নিজাম ও ইংরেজরা মহীশূর আক্রমণ করলেন কিন্তু নিজাম হঠাৎ হায়দরের সঙ্গে সন্ধি করে বসলেন। ঠিক পরের বছর নিজাম আবার দায়দরকে ছেড়ে ইংরেজদের পক্ষে এলেন। এখানে একটি কথা বলা দরকার। নিজাম স্বার্থ ও সুবিধার জন্য অনেকবার দলত্যাগ করলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ভারতে ইংরেজের মিত্র ও অনুগ্রহ-পাত্র হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হায়দরাবাদ রাজ্যটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি স্তম্ভ স্বরূপ হয়ে ওঠে, ভারত স্বাধীন হওয়া পর্যন্ত তাই ছিল।

শক্তি বিস্তার

হায়দার কর্তৃক মারাঠাদের সঙ্গে সন্ধি

নিজামের সঙ্গে সন্ধি

হায়দর আলি ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে যথেষ্ট বীরত্ব দেখান। তিনি তাঁর অশ্বারোহী সৈন্যদল নিয়ে কর্নাট দেশ আক্রমণ করেন। ১৭৬৯ সালে মহীশূরের সেনাবাহিনী যখন মাদ্রাজের উপকণ্ঠে এসে হাজির হল, তখন ইংরেজরা ভীত হয়ে হায়দরের সর্তমত সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। সন্ধি দ্বারা স্থির হল, বিজিত জায়গাগুলি পরস্পরকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে আর নিজাম বা মারাঠারা মহীশূর আক্রমণ করলে ইংরেজরা হায়দরকে সৈন্য দিয়ে সাহায্য করবেন। দুবছর পরেই মারাঠারা হায়দরের রাজ্য আক্রমণ করল। হায়দরের সৈন্যদলকে পরাস্ত করে পেশবা মাধবরাও শ্রীরঙ্গপত্তন অবরোধ করলেন। এখন মাদ্রাজের সন্ধি অনুযায়ী হায়দর আলি ইংরেজদের সাহায্য চাইলেন কিন্তু তাঁরা সর্ত পালন করলেন না। অগত্যা তিনি মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়ে সন্ধি স্থাপন করলেন (১৭৭১)। তবে ইংরেজদের এই বিশ্বাসঘাতকতায় তিনি তাঁদের উপর জাতক্রোধ হয়ে রইলেন।

ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি

ইংরেজের সঙ্গে বিরোধের কারণ

দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধ : প্রথম মহীশূর যুদ্ধের পর দশ বছর ইংরেজদের সঙ্গে আর যুদ্ধবিগ্রহ হয় নি। তবে হায়দর আলি দ্বিতীয় সংঘর্ষের জন্য তৈরি হচ্ছিলেন। যখন উপযুক্ত সময় এল, তখন হায়দর আলি ইংরেজদের বিরুদ্ধে নামলেন। কিন্তু দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধের পূর্ব ইতিহাস এখানে একটু বলা দরকার। কারণ, ১৭৭৮ সালে য়ুরোপে ইংরেজরা ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। আমেরিকায় ব্রিটিশ উপনিবেশগুলি যখন মাতৃভূমি ইংলণ্ডের

হায়দার আলি, নিজাম ও মারাঠাদের ইংরেজ বিরোধী জোট

বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ফরাসীরা তাদের সমর্থন ও সাহায্য দিয়েছিল। সেই কারণে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের আরম্ভ। ১৭৭৯ সালে হায়দর আলি, নিজাম ও মারাঠারা ইংরেজদের বিপক্ষে জোট-বদ্ধ হলেন। এই তিন পক্ষ যদি একত্রভাবে ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে নামতেন, তা হলে ভারতে বিদেশীর অস্তিত্ব বিপন্ন হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু নিজামের মতিস্থিরতা ছিল না আর মারাঠারা তখন ঘরোয়া ব্যাপারে খুবই বিব্রত ছিলেন। তাই ঐ ত্রিশক্তির সমাবেশ কার্যকর হতে পারল না।

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের সূচনা

হায়দর আলির সুযোগ এল যখন ইংরেজরা শত্রুপক্ষ ফরাসীদের পণ্ডিচেরি নগর হস্তগত করে তাদের মাহে বন্দরটিও দখল করলেন। এই বন্দরটি ছিল মহীশূর রাজ্যে, কাজেই হায়দর ক্রুদ্ধ হয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করলেন। ১৭৮০ সালে প্রায় একলক্ষ সৈন্য ও কামান প্রভৃতি নিয়ে তিনি কর্ণাটে প্রবেশ করে কয়েকটি স্থান লুণ্ঠনে ছারখার করে ছিলেন। তখন সেনাপতি বেলীর অধীনে ইংরেজ সৈন্যরা এগিয়ে এলে তারা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। আর এক সেনাপতি মন্‌রো মাদ্রাজে এসে আশ্রয় নিলেন। ওদিকে তাঞ্জোরের কাছে একদল ইংরেজ সৈন্য বিনষ্ট হল। এই বিপন্ন অবস্থায় গভর্নর জেনেরাল ওয়ারেন হেস্টিংস প্রধান সেনাপতি স্যার আয়ার কুটকে দক্ষিণ ভারতে পাঠালেন। সৌভাগ্যক্রমে, নিজাম এবং মারাঠা নেতা মাহাদজী সিন্ধিয়া হায়দরের পক্ষ ছেড়ে দিলেন। সেই ত্রিশক্তির জোট ভেঙে গেল হেস্টিংস-এর কূট চালে। এর ফলে ইংরেজদের খুব সুরাহা হল। পোর্টোনোভো, পলিলুর প্রভৃতি একটির পর একটি যুদ্ধে সেনাপতি কুট হায়দরকে পরাস্ত করতে লাগলেন। নেগাপত্তন ও ত্রিঙ্কোমালী ইংরেজদের হস্তগত হল। কিন্তু এইসব পরাজয়ের পরও হায়দর দমেন নি। তাঁকে সাহায্য করার জন্য একটি ফরাসী নৌবহর সৈন্য নিয়ে ভারত মহাসাগরে উপস্থিত হল। তখন ইংরেজ রণতরী তাদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হল। উভয় পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হতে লাগল। মালাবার উপকূলে এক ইংরেজ সৈন্যদল হায়দরের ছেলে টিপুর কাছে আত্মসমর্পণ করলে ইংরেজদের অবস্থা আবার বিপন্ন হয়ে ওঠে। সেই সময় হায়দর আলির মৃত্যু হল (১৭৮২), কিন্তু টিপু অমিত বিক্রমে যুদ্ধ চালাতে লাগলেন। ১৭৮৩ সালে বোম্বাই থেকে সেনাপতি ম্যাথিউস এলেন টিপুর সঙ্গে যুঝবার জন্য। টিপু তাঁকে সৈন্যসমেত বন্দী করলেন। দক্ষিণ ভারতে ইংরেজদের যখন এই দুরবস্থা, তখন য়ুরোপের যুদ্ধ থামল এবং ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হল (১৭৮৩)। ফরাসীরা টিপুকে আর সাহায্য দিতে পারল না। সেই সুযোগে ইংরেজ সৈন্যরা টিপুর রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের

প্রথম সেনাপতি স্যর আয়ার কুটকে দক্ষিণ ভারতে প্রেরণ

হায়দরের পরাজয়

ফরাসী নৌ-বহর

হায়দরের মৃত্যু ১৭৮২ খ্রীঃ

সেনাপতি ম্যাথিউস টিপুর হাতে বন্দী

কাছে এগিয়ে গেল, কিন্তু মাদ্রাজের গভর্নর শান্তি ফিরিয়ে আনতে চাইলেন। ফলে ১৭৮৪ সালে টিপুর সঙ্গে **ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি** স্থাপিত হল। টিপু ও ইংরেজরা পরস্পরকে বিজিত জায়গাগুলি ফিরিয়ে দিতে স্বীকার করলেন। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংস এই সন্ধিতে খুব বিরক্ত হলেন, কারণ মহীশূরের সঙ্গে কোনও নিষ্পত্তি হল না। অথচ যুদ্ধবিগ্রহ কোম্পানির প্রচুর ব্যয় হয়েছিল।

ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি, ১৭৮৪ খ্রীঃ

কোম্পানি এই জন্য বিলাতের মন্ত্রিসভার কাছে সাহায্য চাইলেন। তখন ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম পিট একটি নতুন আইন প্রবর্তন করলেন (১৭৮৪) ভারতের শাসন কাজ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। এর আগে ১৭৭৩ সালে যে **নিয়ামক আইন (রেগ্যুলেটিং অ্যাক্ট)** পাশ হয়, তার মধ্যে কয়েকটি ত্রুটি ছিল যেগুলি সংশোধন করার প্রয়োজন হয়। এখন পিটের **'ভারত আইন'** অনুসারে কোম্পানির কার্যকলাপের উপর বিলাতের মন্ত্রিসভার কর্তৃত্ব অধিকার আরও বাড়ল। তা ছাড়া, বোম্বাই ও মাদ্রাজ সরকারের উপর স-পরিষদ বড়লাটের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হল। তবে যে নতুন 'বোর্ড অব্ কণ্ট্রোল' স্থাপিত হল, তাতে স্থির হল যে বিলাতের পরিচালক সমিতির বিনা অনুমতিতে এদেশের রাজাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া চলবে না। অর্থাৎ পরিষ্কার বলা হল যে, ভারতে কোম্পানির রাজ্যবিস্তার ব্রিটিশ সরকারের অভিমত নয়।

পিটের ভারত-আইন ১৭৮৪

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ ঃ কিন্তু এই নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বড়লাট কর্নওয়ালিস মহীশূরে টিপু সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধে নামলেন। যুদ্ধের উপলক্ষ্য ছিল এই রকম। ইংরেজের মিত্র নিজাম ও মারাঠারা টিপুকে সব চেয়ে বড় শত্রু মনে করতেন। এখন নিজাম বন্ধুত্বের সর্ত অনুযায়ী কর্নওয়ালিসের কাছে সৈন্য সাহায্য চাইলে কর্নওয়ালিস তাঁকে জানালেন যে পিটের 'ভারত আইন' অনুসারে ইংরেজের পক্ষে সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়। ভবিষ্যতে যখন সম্ভব হবে, তখনও ইংরেজের মিত্রপক্ষদের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে মারাঠাদের বিরুদ্ধে, কোম্পানির সৈন্য ব্যবহার করা চলবে না। এর মধ্যে নামোল্লেখ ছিল না, এই ইঙ্গিত থেকে টিপু বেশ বুঝতে পারলেন যে সুবিধা-সুযোগ পেলেই ইংরেজ, নিজাম ও মারাঠারা একত্র হয়ে মহীশূর আক্রমণ করবে। কোম্পানি ও টিপু সুলতানের মধ্যে যে পারস্পরিক আক্রোশ কমে নি, তা বলা বাহুল্য।

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধের উপলক্ষ্য

হায়দর আলির পর সুলতান হয়ে টিপুর প্রধান লক্ষ্য হল ইংরেজদের শায়েস্তা করা। কয়েক বছর পরে তিনি ইংরেজদের আশ্রিত ত্রিবাঙ্কুর রাজ্য আক্রমণ করেন। তখন কর্নওয়ালিস টিপুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে নিজাম ও মারাঠাদের সঙ্গে আর একটি সন্ধি স্বাক্ষর করলেন যাতে তারাও এই যুদ্ধে যোগ দেয়। কার্যতঃ তাই হল। সেনাপতি মেডোজ

ত্রিবাঙ্কুর আক্রমণ

কৃতকার্য হলেন না দেখে কর্নওয়ালিস মিত্রসৈন্য নিয়ে নিজেই যুদ্ধ পরিচালনা করতে এলেন। ১৭৯২ সালে টিপুর পরাজয় হল। তিনি **শ্রীরঙ্গপত্তনে সন্ধি** করতে বাধ্য হলেন। তাঁকে মহীশূরের অর্ধেক অংশ ছেড়ে দিতে হল, যুদ্ধের খেসারৎ বাবদ তিন কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকাও দিতে হল। উপরন্তু ইংরেজরা তাঁর দুই ছেলেকে কলকাতায় নিয়ে এসে জামিন হিসেবে রেখে দিলেন। এঁরা টালিগঞ্জে থাকতেন,তাই থেকে এঁদের বংশধররা টালিগঞ্জের নবাববংশ বলে খ্যাত।

টিপুর পরাজয় ও শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি, ১৭৯২ খ্রীঃ

চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ ঃ তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে সংঘর্ষের অবসান হয়নি, শেষ পর্বটুকু বাকি ছিল। এই শেষ যুদ্ধের জন্য ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবই দায়ী। মহীশূরের স্বাধীনতা রক্ষায় টিপু সুলতানের অদম্য শক্তিকে তিনি সমূলে বিনষ্ট করতে চাইলেন। ওয়েলেসলির আমলে মিত্রতানীতির একটা নতুন রূপ ও প্রয়োগ আরম্ভ হল। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব পাকা করার উদ্দেশ্যে ওয়েলেসলি আনুগত্য বা 'অধীনতামূলক মিত্রতা' গ্রহণ করবার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলিকে আহ্বান করলেন। একে **'সাব্‌সিডিয়ারি অ্যালায়েন্স'** বলা হয়। এই নীতি যাঁরা গ্রহণ করবেন, তাঁরা ইংরেজের কাছে বশ্যতা স্বীকারে আবদ্ধ থাকবেন। ইংরেজ তাঁদের শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার ভার নেবেন কিন্তু বশ্য রাজারা কোম্পানির অনুমতি ছাড়া অপর রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ চালাবেন না, বিদেশী শক্তির সঙ্গে কোনও রকম সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন না। নিজ ব্যয়ে তাঁদের রাজ্যে একদল ইংরেজ সৈন্য রাখতে হবে, নয় খরচ বাবদ রাজ্যের একাংশ ছেড়ে দিতে হবে। সর্বপ্রথমে নিজাম এই রকম সন্ধিতে আবদ্ধ হলেন, কারণ মারাঠারা তাঁর অবস্থা কাহিল করে ফেলেছিল। টিপু এই রকম অপমানসূচক সন্ধি প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ওয়েলেসলির সঙ্কল্প ছিল দেশী রাজ্যগুলির যাবতীয় শক্তি ও স্বাধীনতা নষ্ট করা। সাম্রাজ্যের প্রসারের উদ্দেশ্যেই তিনি এই নতুন নীতির প্রবর্তন করেন। দেশী রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এবং ব্রিটিশ অধিকার বিস্তারের উদ্দেশ্যে এই নীতি ছিল তার মস্ত হাতিয়ার।

ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব

অধীনতামূলক মিত্রতা

তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে টিপু নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকেন নি। তিনি দুই বিদেশী রাষ্ট্র, তুরস্ক ও ফ্রান্সের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। য়ুরোপে তখন নেপোলিয়ন বোনাপার্টের নেতৃত্বে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজরা তুমুল সংগ্রামে লিপ্ত। টিপু এই সুযোগে ফরাসীদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে উৎসুক হলেন। মরিশাস্ দ্বীপের ফরাসী শাসনকর্তার সঙ্গে টিপু যে পত্র বিনিময় করেন তা প্রকাশ পাওয়াতে ওয়েলেসলি যুদ্ধ ঘোষণা করলেন (১৭৯৯)। ইতিমধ্যে একদল ফরাসী সৈন্য টিপুর সাহায্যে ম্যাঙ্গালোরে এসে গেল।

তুরস্ক ফ্রান্সের কাছে সাহায্য পার্থনা, মরিশাসে পত্র প্রেরণ ওয়েলেসলির যুদ্ধ ঘোষণা

ওয়েলেসলি আর দেরি না করে বোম্বাই ও মাদ্রাজে দুদিক থেকে ইংরেজ সৈন্যদল পাঠালেন টিপুকে আক্রমণ করতে। টিপু কুর্গ ও মালাভেলির যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গে আশ্রয় নিলেন। ইংরেজ সৈন্য দুর্গ অবরোধ করলে টিপু দুর্গের প্রবেশদ্বারে বীরের মত প্রতিরোধ করতে লাগলেন এবং যুদ্ধরত অবস্থায় নিহত হলেন। তখন ইংরেজ সৈন্যরা শ্রীরঙ্গপত্তন লুঠ করে। এই ভাবে হায়দর আলির প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন মহীশূর রাজ্যের অবসান হল। যুদ্ধের পর রাজ্যের কিছু অংশ ইংরেজ ও নিজাম ভাগাভাগি করে নেন। পুরনো হিন্দু রাজবংশের এক নাবালককে রাজা করে মহীশূরের বাকি অংশ তাকে দেওয়া হল।

টিপুর প্রতিরোধ ও মৃত্যু, ফলাফল

ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যনীতি ঃ ওয়েলেসলি ১৭৯৮ সালে যখন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন, তখন দেশের রাজনৈতিক অবস্থা ইংরেজদের অনুকূলে ছিল না। অপর দিকে, দেশীয় রাজাদের মধ্যেও সম্প্রীতি ছিল না। এই সময়ে নিজাম, মারাঠা ও রাজপুতরা পরস্পরের শত্রুতা করছিল। উত্তরে অযোধ্যা রাজ্য আফগান আক্রমণে সন্ত্রস্ত, দক্ষিণে টিপু সুলতান আবার মাথা তুলেছেন ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে। এর ওপর দেশীয় রাজ্যে বিপক্ষ ফরাসীদের ষড়যন্ত্র এবং মিশর থেকে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ভারত অভিযানের সম্ভাবনা ইংরেজদের মনে ফরাসী আতঙ্ক সৃষ্টি করেছিল। মোটের ওপর, ব্রিটিশ শক্তির সামনে এক সঙ্কট দেখা দেয়। সেই সঙ্কটের মোকাবিলা করলেন ওয়েলেসলি। বিলাতের কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল কোম্পানি দেশীয় রাজ্যের সম্পর্কে নিরপেক্ষ থাকবেন। কিন্তু কর্নওয়ালিস তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধে নেমেছিলেন। তাঁর পরবর্তী বড় লাট স্যার জন শোর মোটামুটি উদাসীন নীতি মেনে চলেন, যদিও একবার তিনি অযোধ্যার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করেন। সেখানে নবাবের মৃত্যু হলে তিনি তাঁর ছেলেকে সরিয়ে ভাইকে সিংহাসনে বসান। তাতে ইংরেজদের ক্ষমতা ও অর্থলাভ হয়েছিল।

ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা

কিন্তু ওয়েলেসলির ছিল সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব। তিনি মনে করলেন, ইংরেজের শক্তি যতটা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, সেখানে থেমে থাকা চলে না। অবস্থা আগের চেয়ে এখন জটিল হয়েছে। ভারত ও য়ুরোপে ইংরেজের প্রধান শত্রু ফরাসী। কয়েকটি দেশী রাজ্যেও তাদের প্রভাব ও চক্রান্ত রয়েছে। সুতরাং কোম্পানির পক্ষে উদাসীন হয়ে হাত গুটিয়ে বসে থাকা চলে না। ইংরেজদের হয় এগুতে হবে, আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য শক্তি খাটাতে হবে, নয় এ দেশ থেকে বিতাড়িত হতে হবে। এই সব কারণে ওয়েলেসলি ভিন্ন রীতিনীতি অবলম্বন করলেন। যুদ্ধ ছাড়া তাঁর অপর কৌশল হল **অধীনতামূলক মৈত্রী**। এই নীতির উল্লেখ ও ব্যাখ্যা আগে করা হয়েছে। কোনও কোনও রাজ্য ইংরেজের আনুগত্য সম্বন্ধ স্বীকার করলেন

ওয়েলেসলির সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব

যুদ্ধ, অধীনতামূলক মৈত্রী, কর্নাট অধিকার, তাঞ্জোর রাজ্য কুক্ষিগত

যেমন, বেসিনের সন্ধি দ্বারা পেশবা দ্বিতীয় বাজী রাও, সিন্ধিয়া ও ভোঁসলা। কিন্তু টিপু সুলতান বশ্যতা স্বীকার করেন নি বলে চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ। এখন দেখা যাক, ওয়েলেসলি অন্যান্য অঞ্চলে কতটা শক্তি বিস্তার করেন। কর্নাটের নবাব টিপুর সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, এই অভিযোগ **কর্নাট রাজ্য** কেড়ে নেওয়া হল।

সুরাট, রোহিলখণ্ড গোরক্ষপুর দোয়াব অঞ্চল, পণ্ডিচেরি, শ্রীরামপুর অধিকার

ছোট মারাঠা রাজ্য তাঞ্জোরে সিংহাসন নিয়ে ঝগড়া চলছিল দেখে ওয়েলেসলি রাজাকে ইংরেজদের বৃত্তিভোগী করে **তাঞ্জোর রাজ্যটি** কুক্ষিগত করলেন। সুরাটের নবাবের মৃত্যু হলে **সুরাটও** ইংরেজ অধিকারভুক্ত হল। অযোধ্যার নবাব সাদৎ আলির বিরুদ্ধে কুশাসনের অভিযোগ এনে রাজ্যের এক বৃহৎ অংশ—**রোহিলখণ্ড, গোরক্ষপুর** এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী **দোয়াব অঞ্চল,** হস্তগত করলেন। এখন সরাসরি পাঞ্জাবের পূর্বদিক অবধি ইংরেজ কর্তৃত্বের অধীনে চলে এল। ইংরেজ প্রভুত্ব নিষ্কণ্টক করার জন্য ওয়েলেসলি ফরাসী উপনিবেশ **পণ্ডিচেরি** ও দিনেমার উপনিবেশ **শ্রীরামপুর** অধিকার করলেন। তা ছাড়া ফরাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হিসেবে তিনি ব্রহ্মদেশে পারস্যে ও আফগানিস্থানে ইংরেজ প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলেন।

[গ] **নেপাল যুদ্ধ :** ওয়েলেসলির পর লর্ড হেস্টিংসই ইংরেজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৭৬৮ সালে পৃথ্বী নারায়ণ নামে এক গোর্খা নেতা নেপাল উপত্যকা ও কাঠমাণ্ডু দখল করে একটি গোর্খা রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রমে এই নেপাল রাজ্যের আয়তন বেড়ে ব্রিটিশ সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। লর্ড হেস্টিংস-এর নেতৃত্বে ১৮১৪ সালে গোর্খাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়। ইংরেজ সৈন্যরা প্রথমে গোর্খাদের কাছে বিধ্বস্ত হয়। শেষকালে সেনাপতি অক্টরলোনি এসে গোর্খা নেতা অমর সিংহকে পরাস্ত করেন। তখন নেপালের সঙ্গে **সগৌলির সন্ধি** হয় (১৮১৬)। সন্ধির ফলে ইংরেজরা বর্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল জেলা এবং নেপাল তরাই এর অনেকখানি জায়গা লাভ করে। রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট বা প্রতিনিধি রাখার ব্যবস্থা হয়। অন্যান্য বিষয়ে নেপালের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

পৃথ্বী নারায়ণ কর্তৃক গোর্খা রাজ্য-স্থাপন, ১৭৬৮ খ্রীঃ, নেপাল যুদ্ধ, ১৮১৩ খ্রীঃ, সগৌলির সন্ধি, ১৮১৬

ফলাফল

দ্বিতীয় পর্ব (১৮১৮-৫৭) : এই পর্বে ব্রিটিশ শক্তির প্রসার আরও দ্রুত হয়। বেণ্টিঙ্কের শান্তিপূর্ণ আমলেও আসামে কাছার ও জয়ন্তীয়া জেলা ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হয়। আর দক্ষিণ ভারতেও ক্ষুদ্র প্রদেশ 'কুর্গ' ইংরেজদের হস্তগত হয়। সিন্ধু প্রদেশ অধিকার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। একে নিছক জোরদখল ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। তারপরে লর্ড এলেনবরা সিন্ধুর আমীরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অজুহাত খুঁজলেন। সেনাপতি নেপিয়ারকে

আসামে কাছাড় ও জয়ন্তীয়া জেলা, কুর্গ দখল সিন্ধুপ্রদেশ

পাঠানো হলে তিনি সিন্ধুর অধিকাংশ অঞ্চল দখল করলেন এবং পরপর দুটি যুদ্ধ করে সিন্ধু প্রদেশকে ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন।

রেঙ্গুন অধিকার
ইয়ান্দাবোর সন্ধি,
১৮২৬

ব্রিটিশ সরকারের সীমান্ত নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সীমান্ত প্রসারিত করা। আসাম-সংলগ্ন ব্রহ্মদেশের বিশেষ গুরুত্ব ছিল। এই সব কারণে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ শুরু হয়ঃ ১৭২৪ সালে লর্ড আমহার্স্ট-এর আমলে ব্রিটিশ সৈন্য বর্মীদের আসাম থেকে বিতাড়িত করল এবং অল্পকালের মধ্যে রেঙ্গুন অধিকার করল। ১৮২৬ সালে **ইয়ান্দাবোর সন্ধির** ফলে ব্রহ্ম সরকারকে ইংরেজদের হাতে আরাকান, টেনাসেরিম ও আসাম মণিপুর অঞ্চলটি পুরোপুরি ছেড়ে দিতে হয়।

রঞ্জিৎ সিংহের মৃত্যুর
পর গৃহবিবাদ, মুদকি
ও আলিওয়ালের
যুদ্ধে পরাজয়, ১৮৪৬

[ঘ] দুটি শিখ যুদ্ধ ও পাঞ্জাব অধিকারঃ ১৮৩৯ সালে রণজিৎ সিংহের মৃত্যু হলে শিখ রাজ্যে গৃহ-বিবাদের ফলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়। রণজিতের পর পুত্র খড়্গ সিং রাজা হয়ে কিছুকাল পরে পদচ্যুত হন। এই সুযোগে ইংরেজরা পাঞ্জাব আক্রমণ করার জন্য তৈরি হচ্ছিল। শিখ সৈনাদল কোম্পানির এলাকা আক্রমণ করতেই যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে দাঁড়াল। উভয় পক্ষের মধ্যে পর পর কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। শিখরা হেরে যায়। মুদকি, আলিওয়াল, এই দুটি জায়গায় পর পর যুদ্ধে শিখরা চূড়ান্ত ভাবে পরাজিত হয়ে (১৮৪৬) ইংরেজদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। লাহোরের সন্ধিতে জলন্ধর দোয়াব এবং শতদ্রুর বাম পাশের শিখ রাজ্য বিটিশ অধিকারভূক্ত হল। ক্ষতিপূরণ বাবদ কোম্পানি লাহোর-দরবার থেকে দেড় কোটি টাকা আদায় করেন। ডালহৌসির আমলে দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ হয়। প্রথম শিখ যুদ্ধে শিখ বাহিনী পরাজয় স্বীকার করে বটে কিন্তু শিখরা তাকে চূড়ান্ত বলে মনে করে নি। ১৮৪৮ সালে ডালহৌসি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে **চিলিয়ানওয়ালায়** উভয়পক্ষে তুমুল সংগ্রাম চলল। ইংরেজরা মুলতান অধিকার করলেন। পরের বছর গুজরাটে সেনাপতি গফ্-এর হাতে শিখদের আবার পরাজয় ঘটল। তখন ডালহৌসি এক ঘোষণা পত্রের দ্বারা পাঞ্জাব প্রদেশকে সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। দলীপ সিংহকে পদচ্যুত করা হলে স্বাধীন শিখ-রাজ্যের অবসান হল, এখন শিখদের পতন কেন হল, তার কারণ, রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রণজিৎ সিংহই প্রথম ও শেষ নেতা। দলীপ সিংহের সময়ে শিখদের পতন হয়। তাছাড়া ততদিনে ভারতের অধিকাংশে ইংরেজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কাজেই পাঞ্জাবে শিখদের দমন করে রাজ্য দখল করা খুব শক্ত কাজ হয় নি, যদিও যুদ্ধে ইংরেজদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। মহীশূর ও মারাঠাদের পরাজয় মত

লাহোরের সন্ধি,
চিলিয়ানওয়ালায় দ্বিতীয়
শিখ যুদ্ধ, ১৮৪৮ খ্রীঃ

পাঞ্জাব অধিকার,
শিখদের পরাজয়ের
কারণ

শিখদের পরাজয় প্রায় একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি—স্বার্থনীতি, দলভেদ ও একতার অভাব।

[ঙ] **ডালহৌসির আমল :** পাঞ্জাব অধিকার ছাড়া ডালহৌসি নানা উপায়ে অনেক দেশী রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেন। দেশীয় রাজারা অপুত্রক হলে দত্তক পুত্র নিয়ে তাঁকে উত্তরাধিকারী করতেন। ডালহৌসি নিয়ম চালু করলেন, ইংরেজদের আশ্রিত কোনও রাজ্যে দত্তকপুত্র গদি পাবেন না। যদি হিন্দু প্রথামত দত্তক পুত্র নিতে হয় তা হলে গভর্নর জেনেরালের অনুমতি দরকার। উদ্দেশ্য হল অপুত্রক অবস্থায় কোনও রাজা মারা গেলে তাঁর রাজ্য সরাসরি ইংরেজদের অধিকারে চলে আসবে। এটি **'স্বত্বলোপ নীতি'** নামে ইতিহাসে পরিচিত। এই নীতি প্রয়োগ করে **সাতারা, ঝান্সি, জয়পুর, নাগপুর** প্রভৃতি কয়েকটি ছোট রাজ্য বাজেয়াপ্ত করা হল। পোষ্যপুত্রের অধিকার সম্পূর্ণ বাতিল করে দেওয়াতে দেশীয় রাজারা এবং সাধারণ লোকও ঘোর অসন্তুষ্ট হন।

স্বত্বলোপ নীতি, সাতারা, ঝান্সি, নাগপুর, জয়পুর

এর পর, সিকিমের রাজা দুজন ইংরেজ কর্মচারীকে আটক করেছিলেন বলে তাঁকে শায়েস্তা করার জন্য ডালহৌসি **সিকিম রাজ্যের** খানিক অংশ ইংরেজ রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। ওদিকে **কর্নাটের নবাব** মারা গেলে (১৮৫৩), তাঁরও কোনও উত্তরাধিকারীকে ডালহৌসি নবাব বলে স্বীকার করলেন না। তেমনি **তাঞ্জোরের** রাজাও মারা গেলে তাঁর উত্তরাধিকারীর বৃত্তি ও রাজা উপাধি লোপ করা হল। হায়দরাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যে ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয় বাবদ যে টাকা দিতে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন, তা দিতে না পারায় **বেরার** প্রদেশটি ইংরেজের হাতে ছেড়ে দিতে তিনি বাধ্য হলেন। পেশবা দ্বিতীয় বাজী রাও ছিলেন ইংরেজদের বৃত্তিভোগী। তাঁর মৃত্যুর পর (১৮৫৩) ডালহৌসি পেশবার দত্তকপুত্র **নানা সাহেবকে** বৃত্তি দিতে অস্বীকার করলেন। ডালহৌসি **অযোধ্যা রাজ্যও** গ্রাস করলেন। নবাব ছিলেন অতি সৌখীন ও অলস প্রকৃতির মানুষ। তাঁর রাজ্যে অনেক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় বলে ডালহৌসি অযোধ্যা রাজ্যটিকে বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিলেন। অযোধ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ওয়াজেদ আলি শাহকে বছরে বারো লক্ষ টাকা বৃত্তি দিয়ে কলকাতার উপকণ্ঠে মেটিয়া-বুরুজে নির্বাসিত করা হল। এই রকম নানা উপায়ে, কখনও কৌশলে কখনও বলপ্রয়োগ করে ডালহৌসি ভারতে ইংরেজের সার্বভৌমত্ব স্থাপন করলেন।

সিকিম রাজ্যের খানিক অংশ, কর্নাট, তাঞ্জোর

বেরার অধিকার, নানা সাহেবের বৃত্তি অস্বীকার

অযোধ্যা গ্রাস

[ছয়] ভারতে শাসনতান্ত্রিক ভিত্তি স্থাপন

১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ রাজনৈতিক শক্তি বিস্তারের স্বরূপ : বাঙলা দেশে নবাবদের সঙ্গে কোম্পানির সম্পর্কের কথা আগেই বলা হয়েছে

এবং পলাশী আর বক্সার যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা করা হয়েছে। এখন ক্লাইভ স্বদেশ থেকে ফিরে এসে বাঙলায় বসে কি ভাবে ইংরেজ কর্তৃত্ব বাড়িয়ে নিলেন, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ক্লাইভের কি ভূমিকা, সে কথা সংক্ষেপে বলছি। ১৭৬০ সালে ক্লাইভ ইংলণ্ডে চলে যান, পাঁচ বছর পরে কোম্পানির কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'লর্ড' উপাধিতে সম্মানিত করে আবার পাঠালেন। এবার তিনি ফোর্ট উইলিয়ামের নয়, বাঙলার গভর্নর। মাদ্রাজে ও বাঙলায় ক্লাইভ যে কৃতিত্ব দেখান, তাতে কোম্পানি ভাবলেন ক্লাইভই কূট কৌশলে বাঙলা-বিহার ওড়িশাকে পুরোপুরি ইংরেজ কর্তৃত্বের অধীনে আনতে পারবেন। ক্লাইভ সে আশা পূর্ণ করেছিলেন বাঙলায় কোম্পানির রাজত্ব স্থাপন করে এবং ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন করে। ফরাসী শক্তিকে খর্ব করা, বাঙলার নবাবের হাত থেকে সব কিছু ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া, মুঘল সম্রাটকে মৌখিক সম্মান দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে সুবিধা-অধিকার আদায় করা আর অযোধ্যা রাজ্যটিকে ইংরেজদের রক্ষিত ও আশ্রিত করে রাখাই ছিল ক্লাইভের মূল সঙ্কল্প। সব কয়টিতেই তিনি কৃতকার্য হন।

লর্ড ক্লাইভের পুনরায় ভারতে আগমন, বাঙলার গভর্নর, ক্লাইভের সাফল্য

অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলা মীরকাশিমকে যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। সেই কারণে ক্লাইভ তাঁর উপর চাপ দিয়ে যে সন্ধি করলেন তাতে বন্দোবস্ত হল, সুজাউদ্দৌলা পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেবেন এবং কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুটি ইংরেজদের ছেড়ে দেবেন। উপরন্তু তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য ইংরেজ সৈন্য রেখে তাদের খরচ বহন করবেন। ক্লাইভের কূটনীতি বুঝে নাও। একদিকে মারাঠা রাজ্য, অপর দিকে ইংরেজ এলাকা—এই দুয়ের মধ্যবর্তী অযোধ্যা এখন অধীন ও মিত্ররাজ্য হল। অযোধ্যার নবাবকে হাতে এনে ইংরেজদের আর বাঙলার নবাব বা অন্য কারও মুখাপেক্ষী থাকতে হল না। তারপর ক্লাইভ দেখলেন, কোরা ও এলাহাবাদ বাঙলা থেকে বেশ দূরে। জেলা দুটি ইংরেজ শাসনে রাখতে গেলে শুধু খরচ বাড়বে না, মারাঠা বা অন্য শত্রুর সঙ্গে বিরোধ বাধতে পারে। তাই নতুন পাওয়া জায়গা দুটি ক্লাইভ মুঘল সম্রাট শাহ আলমকে দিয়ে দিলেন। আর তাঁকে বছরে ২৬ লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হলেন এই সর্তে যে এ সবের বদলে শাহ আলম কোম্পানিকে বাঙলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানী অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেবেন।

সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে সন্ধি, বাঙলা-বিহার ওড়িশার দেওয়ানী

দেওয়ানী প্রাপ্তি : ১৭ই আগস্ট ১৭৬৫ সালে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা হল। দুটি টেবিল একত্র করে তাতে গালিচা বিছিয়ে ফাঁকা সম্রাটের আসন তৈরি হল। সেখানে বসে রাজ্যহারা শাহ আলম প্রায় চার কোটি টাকার রাজস্ব আর তিন কোটি প্রজাসুদ্ধ বাঙলা-বিহার-ওড়িশা প্রদেশ থেকে রাজস্ব আদায়ের স্বত্ব তুলে দিলেন ইংরেজদের হাতে, সেই সঙ্গে দক্ষিণ ভারতে উত্তর-সরকার

বাঙলার নবাবের সঙ্গে বন্দোবস্ত. কোম্পানীর হাতে দেওয়ানী ও নিজামত, নবাবের হাতে বিচারের ভার

প্রদেশে ইংরেজদের আধিপত্য স্বীকার করে নিলেন। এর পর ক্লাইভ বাঙলার নবাব নাজিমুদ্দৌলার সঙ্গে একটি বন্দোবস্ত করে নিলেন। এই নতুন ব্যবস্থায় রাজস্ব সংগ্রহ ছাড়া রাজ্যরক্ষার ভারও কোম্পানির হাতে থাকল। অর্থাৎ দেওয়ানী আর নিজামত (দেশ শাসন), দুটিই ইংরেজরা এক সঙ্গে পেয়ে গেলেন। নবাবের কর্মচারীদের হাতে রইল দেশে শান্তিরক্ষা ও বিচারের ভার। এই কাজের খরচ বাবদ নবাব বছরে ৫৩ লক্ষ টাকা বৃত্তি পেতে লাগলেন। ক্লাইভের কার্যসিদ্ধি হল। বাঙলা-বিহার-ওড়িশায় ইংরেজরা কায়েম হয়ে বসলেন। এখান থেকেই ইংরেজদের শক্তিবিস্তার শুরু হয়। ওয়ারেন হেস্টিংস, কর্নওয়ালিস, ওয়েলেস্‌লি প্রমুখ গভর্নর-জেনেরাল ক্রমে ক্রমে উত্তর মধ্য ও দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে প্রসারিত করেন।

দ্বৈতশাসন ঃ এই জটিল ব্যবস্থাকে দ্বৈতশাসন (ডবল গভর্নমেণ্ট) বলা হয়, অর্থাৎ দুই কর্তৃপক্ষের শাসন। এর মধ্যে কোনও পক্ষেরই দায়িত্বের বালাই ছিল না। প্রকৃত শাসক ইংরেজ কোম্পানি, কিন্তু তাঁরা টাকা আদায় ও টাকার হিসেব নিয়ে ব্যস্ত। রাজস্ব সংগ্রহ করাই তাঁদের মুখ্য কাজ, দেশ শাসন করা গৌণ ব্যাপার। আর পরাশ্রিত নবাব নামতঃ দেশের সরকার, কার্যতঃ অলস ও অকর্মণ্য বৃত্তিভোগী। ১৭৭২ সাল পর্যন্ত এই রকম ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থা চলেছিল। এই দ্বৈতশাসন হল অশাসন ও কুশাসনের নামান্তর। তার ফলে শাসন ব্যবস্থা ক্রমেই অকেজো হয়ে উঠল, যারা প্রজাদের কাছে রাজস্ব তোলে, সেই ইজারাদারদের অনাচার ও অত্যাচারের মাত্রা বাড়তে লাগল। ক্লাইভের পর পাঁচ বছরের মধ্যে দেশের অবস্থা হল শোচনীয়। প্রথমে, পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে কোম্পানির কর্মচারীরা যে নির্মম ভাবে শোষণ ও লুণ্ঠন করছিল, তাতে দেশের সর্বত্র হাহাকার পড়ে যায়।

দ্বৈতশাসন—দুই কর্তৃপক্ষের শাসন

বিশেষ করে, মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর অধীনে ইজারাদার দেবী সিং খাজনা আদায়ের জন্য প্রজাদের দারুণ উৎপীড়ন করতেন। শেষে উত্তরবঙ্গে প্রজারা বিদ্রোহ করে। সাধারণ গৃহস্থ ও কৃষকদের দুর্দশার সীমা রইল না। এর উপর, বাঙলা ১১৭৬ সালে (১৭৭০ খৃস্টাব্দে) দেখা দিল প্রচণ্ড খাদ্যাভাব। তাকেই **'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর'** বা মহা-দুর্ভিক্ষ বলা হয়। মন্বন্তরের সঙ্গে এল মহামারী, ফলে বাঙলার বহু অঞ্চল শ্মশানে পরিণত হল। প্রায় বিশ বছর পরেও বড়লাট কর্নওয়ালিস লেখেন যে দুর্ভিক্ষপীড়িত অঞ্চল তখনও বন্য জন্তুর বাসস্থান, জঙ্গলের মত দেখাচ্ছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে দেবী সিং-এর নিষ্ঠুর অত্যাচারের বর্ণনা এবং 'আনন্দ মঠ' উপন্যাসে এই ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ছবি নিপুণ ভাবে এঁকে গেছেন।

দ্বৈত-শাসনের কুফল

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসন সংস্কার ঃ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৭৭২ খ্রীঃ পর্যন্ত ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি দক্ষ শাসন-ব্যবস্থা স্থাপনে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল।

ক্লাইভ যে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, তা অব্যবস্থারই নামান্তর। সেই দ্বৈতশাসনের কুফল বিশদভাবে বলা হয়েছে। যাই হোক কোম্পানি দীর্ঘকাল তার শাসন পরিচালনার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারে নি। বাঙলার অব্যবস্থা ও অপশাসন দূর করার জন্য ১৭৭২ খ্রীঃ ওয়ারেন হেস্টিংস বাঙলার গভর্নরের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

শাসননীতির মূল লক্ষ্য

ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসননীতির মূল লক্ষ্য ছিল ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধিকৃত অঞ্চলে কোম্পানির কর্তৃত্ব ও শাসন সুদৃঢ় করা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ও নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে কোম্পানির আয় বৃদ্ধি করা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকটি শাসন সংস্কারে মন দিলেন।

রাজস্ব সংস্কার

রাজস্ব বোর্ড

পাঁচসালা বন্দোবস্ত

রাজস্ব সংস্কার : হেস্টিংস প্রথমে নবাবের দুই প্রতিনিধি রেজা খাঁ ও সিতাব রায়কে সরিয়ে দিয়ে রাজস্ব আদায়ের ভার দিলেন ইংরেজ কর্মচারী 'কালেক্টর'দের হাতে। কোম্পানির কোষাগার মুর্শিদাবাদ থেকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল এবং একটি রাজস্ব বোর্ড স্থাপিত হল। তারপর রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য হেস্টিংস একটি বন্দোবস্ত করেন। রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট কালের জন্য স্থির করে জমিদারদের সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করলেন। জমিদার যদি চুক্তিমত কর না দিতে পারেন তা হলে তাঁর জমিদারি নীলামে উঠবে এবং অন্য ব্যক্তি বেশি টাকা দিয়ে সেটি কিনে নিতে পারবে। তার ফল দাঁড়াল যে অর্থশালী লোক বেশি খাজনা অঙ্গীকার করে পাঁচ বছরের মধ্যে কোম্পানিকে প্রাপ্য টাকা দিয়ে দিত আর নিজ লাভের জন্য নানাভাবে অত্যাচার করে বেশি আদায় করে নিত। একে বলা হয় **পাঁচসালা বন্দোবস্ত**। জমি বিলির এই নতুন বন্দোবস্তে পুরনো জমিদার ঘরগুলি নষ্ট হতে লাগল এবং মুনাফালোভী নতুন ইজারাদারের উৎপত্তি হল। হেস্টিংস তাঁর ব্যবস্থার ত্রুটি বুঝতে পেরে অন্য রকম বন্দোবস্তের কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু কাজে পরিণত করেন নি। কোম্পানির রাজস্ব বাড়াতে গিয়ে দেখা গেল লাভের চেয়ে লোকসান হচ্ছে বেশি। হেস্টিংস ব্যয় কমানোর জন্য নবাবের বৃত্তি অর্ধেক কেটে দিলেন এবং শাহ আলমের বার্ষিক বৃত্তি ২৬ লক্ষ টাকাও বন্ধ করে দিলেন।

বিচার বিভাগীয় সংস্কার

বিচার বিভাগীয় সংস্কার : হেস্টিংস দেখলেন চারদিকে অরাজকতা। কোম্পানির কর্মচারীরা কাজে মন দেন না, যে যার ব্যবসা নিয়ে ব্যস্ত। দেশের পুরানো আদালতগুলি কোন কাজের নয় শান্তিরক্ষা ও উপদ্রব বন্ধ করতে পারে না। তাই তাঁকে বিচার বিভাগ সংস্কার করতে হল।

তিনি বাঙলাদেশকে মোট ৩৫টি জেলায় বিভক্ত করলেন। এক একটি জেলা ছিল শাসন ও বিচারের ক্ষেত্রে নিম্নতম ভিত্তি। তিনি প্রতি জেলায় একটি মফঃস্বল দেওয়ানী আদালত ও একটি ফৌজদারী আদালত স্থাপন করলেন। দেওয়ানী আদালত কালেক্টরের অধীনে আর ফৌজদারী বিচারের ভার দেশী বিচারকদের হাতে দেওয়া হল। আপীলের জন্য কলকাতায় দুটি উচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হল, একটির নাম **সদর দেওয়ানী,** অপরটির **সদর নিজামত**। এখন থেকে রাজস্ব বিভাগ ও বিচার বিভাগ কোম্পানির কর্তৃত্বে চলে এল, এক বছর পরে রেগুলেটিং অ্যাক্ট বা নিয়ামক আইন পাশ হলে হেস্টিংস ১৭৭৪ সালে গভর্নর-জেনেরাল হলেন। আর কোম্পানির রাজত্বে সব বিচারের জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধান বিচারালয়, রাজস্ব বোর্ড (বোর্ড অব রেভেনিউ) এবং রাজকোষ কলকাতায় স্থাপিত হলে কলকাতাই বাঙলা-বিহার-ওড়িশা তথা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হয়ে উঠল।

প্রতি জেলায় একটি দেওয়ানী ও একটি ফৌজদারী আদালত

সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত, সুপ্রীম কোর্ট, ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতা

পুলিশ ও অন্যান্য সংস্কার ঃ ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে বাঙলাদেশের গ্রামাঞ্চলে কোন থানা বা পুলিশ ছিল না। এ জন্য গ্রামাঞ্চলের আইন শৃঙ্খলার জন্য তাঁকে মূলতঃ জমিদার শ্রেণীর উপর নির্ভর করতে হত। হেস্টিংস ফৌজদার ও থানাদার নামক পদ সৃষ্টি করে অল্প সংখ্যক পুলিশ নিযুক্ত করেছিলেন। কিন্তু এই ধরনের পুলিশ কর্মচারীদের দুর্নীতি হেস্টিংসকে চিন্তিত করে তুলে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ বিভাগের এই পদগুলি তিনি উঠিয়ে দিয়েছিলেন।

পুলিশ

এ ছাড়া অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তিনি কিছু সংস্কার করেছিলেন। তিনি সুদের হার মাসিক শতকরা ৩·১২ পয়সাতে ধার্য করেন; কিন্তু ১০০ টাকার উপরে হলে সুদের হার দু টাকাতে ধার্য হয়। তিনি ব্যয়-সংকোচের নীতি গ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন ভাবে কোম্পানির কোষাগার সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করেন। তাঁর আমলে কোম্পানির শাসনবিভাগকে বাণিজ্য বিভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সংস্কার

এইভাবে বিভিন্ন সংস্কারের মাধ্যমে ওয়ারেন হেস্টিংস এক কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের ভিত্তিস্থাপন করেন।

কেন্দ্রীভূত শাসনের ভিত্তিস্থাপন

কর্নওয়ালিসের শাসন সংস্কার ঃ লর্ড কর্নওয়ালিস ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে গভর্নর জেনেরাল এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যে শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তা 'কর্নওয়ালিস প্রথা' নামে পরিচিত। চার্লস্ গ্রাণ্ট, স্যার জন শোর, জেমস্ গ্রাণ্ট, জোনাথান ডানকান, স্যার উইলিয়ম জোনস্ প্রভৃতি কর্মকুশলী ব্যক্তিগণ তাঁর সহযোগী ছিলেন এবং কেন্দ্রীভূত শাসন প্রতিষ্ঠায় যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

কর্নওয়ালিস প্রথা

কর্মচারীদের মাহিনা বৃদ্ধি

কর্নওয়ালিস প্রথমেই কোম্পানির কর্মচারীদের দুর্নীতি দূর করার কাজে হাত দেন। কর্মচারীদের মাহিনা ছিল কম, তারা বেনামী ব্যবসা ও অন্য অসৎ উপায়ে অনেক টাকা উপার্জন করত। কর্নওয়ালিস তাদের বেতন বৃদ্ধি করলেন। তারপর রাজস্ব সংস্কার ও বিচার বিভাগের সংস্কার শুরু করেন।

রাজস্ব আদায় ও বিচারের পৃথকীকরণ

কর্নওয়ালিসের আগে ইংরেজ কালেক্টর রাজস্ব আদায় করতেন ও দেওয়ানী মামলার বিচার করতেন। কর্নওয়ালিস ঐ দুটি কাজ পৃথক করে দিলেন। কালেক্টরদের হাতে রাজস্ব আদায়, আর ইংরেজ জজদের হাতে বিচারের ক্ষমতা দেওয়া হল।

জেলায় দেওয়ানী আদালত, সিটি কোর্ট, মুন্সেফী আদালত প্রাদেশিক দেওয়ানী আদালত, সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত আদালত

বিচার সংস্কার ঃ কর্নওয়ালিসের আমলে প্রতি জেলায় একজন জজের অধীনে একটি করে দেওয়ানী আদালত স্থাপিত হল। এছাড়া মুর্শিদাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি বড় শহরে 'সিটি কোর্ট' স্থাপন করা হল। জেলার আদালতগুলিতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মামলার বিচারের ব্যবস্থা করা হল। প্রতিটি জেলা আদালতের অধীনে মুনসেফী আদালত স্থাপন করা হল। কলকাতা, মুর্শিদাবাদ, ঢাকা ও পাটনা শহরে প্রাদেশিক দেওয়ানী আপীল আদালত স্থাপন করা হ'ল। আপীল আদালতের উপর সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল কলকাতার সদর দেওয়ানী আদালত, আর ফৌজদারী মামলার সর্বোচ্চ আপীল আদালত ছিল কলকাতার সদর নিজামত আদালত।

কর্নওয়ালিস কোড

কর্নওয়ালিস কোম্পানির কর্মচারীদের আচরণ বিধি ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন তাঁর প্রবর্তিত 'কর্নওয়ালিস কোডে'। এই এই বিধির প্রয়োগে বিচার বিভাগে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়।

কলকাতার পুলিশ কমিশনার, থানা ও দারোগা, গ্রামে চৌকিদার

পুলিশ ব্যবস্থা ঃ কর্নওয়ালিস পুলিস কমিশনারের পদটি সৃষ্টি করেন। পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব ছিল কলকাতায় আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা। এছাড়া প্রতি জেলায় কয়েকটি থানা স্থাপন করা হয়। থানাগুলিতে দারোগা ও পুলিশ বাহিনী আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করত। চৌকিদারগণের দায়িত্ব ছিল গ্রামে শান্তি রক্ষা করা।

পাঁচজন সদস্য বিশিষ্ট বানিজ্য বোর্ড কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি

বাণিজ্য বিভাগের সংস্কার ঃ কর্নওয়ালিস বাণিজ্য বোর্ডের সদস্য সংখ্যা এগারো থেকে কমিয়ে পাঁচজন করেন। রপ্তানিযোগ্য পণ্য ক্রয়ের ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি দেশীয় বণিক ও দালালদের সঙ্গে চুক্তি করার ব্যবস্থা করেন। এতে কোম্পানির মুনাফা বৃদ্ধি পায়।

কিন্তু কর্নওয়ালিসের সর্বাধিক কৃতিত্ব রাজস্ব সংস্কারে।

রাজস্ব সংস্কার : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পটভূমিকা : চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপারে কোম্পানির সঙ্গে প্রজাদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৭২ খ্রীস্টাব্দে প্রথমে পাঁচসালা ও পরে একসালা জমি বন্দোবস্তের নিয়ম চালু করেন। এই নিয়মে সর্বোচ্চ নীলামদার বা ইজারাদারকে প্রথমে পাঁচ বছরের জন্য ও পরে এক বছরের জন্য জমি বন্দোবস্ত করা হত। এই প্রথায় ঘনঘন জমিদার পরিবর্তন হত। তাই জমিদাররা জমির উন্নতির জন্য কোন রকম চেষ্টা করত না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পূর্বে রাজস্ব সংক্রান্ত পরীক্ষা নিরীক্ষা, ফলাফল

উপরন্তু খাজনার হার সুনির্দিষ্ট না থাকায় তারা প্রজাদের কাছে ইচ্ছামত অতিরিক্ত খাজনা আদায় করত। জমিদারদের এই উৎপীড়নে অতিষ্ট হয়ে বহু প্রজা জমি ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে যেত। ফলে বহুক্ষেত্রে খাজনা আদায় হত না এবং কোম্পানিকে নির্দিষ্ট খাজনা দিতে পারত না। এতে কোম্পানির রাজস্বের ঘাটতি হতে থাকে। জমির স্বল্পমেয়াদী বন্দোবস্তের দরুন এইভাবে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাজস্ব ব্যবস্থায় বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়।

পাঁচসালা ও একসালা বন্দোবস্তের কুফল

দশসালা বন্দোবস্ত

এই অব্যবস্থার প্রতিকারের জন্য লর্ড কর্নওয়ালিস প্রথমে জমিদারদের সঙ্গে দশসালা বন্দোবস্ত করেন। শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সম্মতি গ্রহণ করে তিনি ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ১৭৯৩ খ্রী:

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল সর্তগুলি এই ; এতদিন যাঁরা জমির ইজারা নিয়ে খাজনা আদায় করতেন, তাঁরা এখন জমির মালিক হয়ে বংশানুক্রমে জমিদারী করতে পারবেন। আর জমিদারদের কাছ থেকে কোম্পানি নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব পাবেন। নির্দিষ্ট দিনে ঠিক সময়ের মধ্যে খাজনা জমা না দিলে, জমিদারী বিক্রি করা হবে। কিন্তু জমিদাররা প্রজাদের কাছ থেকে কি পরিমাণ খাজনা তুলবেন, তা ঠিক মত বেঁধে দেওয়া হল না। বাঙলা বিহার ওড়িশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এই ভাবে প্রবর্তন করা হল। ১৯৫৪ সালে অবশ্য স্বাধীন ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করা হয়েছে। তবে ঐ এক শো যাট বছরে কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্তে কি ফল হয়েছিল, সে সম্বন্ধে কয়েকটি দরকারী কথা মনে রাখা উচিত। প্রথমতঃ এই ব্যবস্থায় জমির কিংবা প্রজার কোনও দিকেই উন্নতি হল না। কারণ যাঁরা জমিদার হয়ে বসলেন তাঁদের দৃষ্টি কেবল জমির আয়ের দিকে। অর্থাৎ কোম্পানিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রাপ্য রাজস্ব মিটিয়ে দেওয়া আর জমিদারী থেকে যত টাকা বেশি আদায় করা যায়, তার ব্যবস্থা করা।

দ্বিতীয়তঃ জমির উপর জমিদারদের কোনও টান থাকল না, প্রজাদেরও আগ্রহ কমতে লাগল, কেন না খাজনা কখন বেড়ে যাবে তার স্থিরতা নেই। খাজনা না

দিতে পারলে জমি কেড়ে নেওয়া হবে, এই তাদের ভয়। সুতরাং বেশি খাজনা ও বাকি খাজনার চাপে তাদের ঋণ ও দৈন্যদশা বেড়েই চলল।

তৃতীয়তঃ জমিদাররা বেশির ভাগ গ্রামাঞ্চল ছেড়ে শহরে এসে বাস করতে লাগলেন। দেশে নায়েব গোমস্তারা টাকা পাঠায়, তাঁরা বিনা পরিশ্রমে সেই আয় ভোগ করেন। ধরো, একটা জমিদারী থেকে কোম্পানিকে প্রতি বছর ১০,০০০ টাকা দিতে হবে। জমিদার তখন প্রজাদের উপর উঁচু হারে খাজনা চাপিয়ে বছরে ১৬,০০০ টাকা আদায় করলেন। ঐ বাড়তি ৬,০০০ টাকা তাঁর নিজস্ব আয়। এ ছাড়া, কর্মচারীরাও ভয় দেখিয়ে আরও বেশি কিছু টাকা তুলে নিজেরা নিত। এতে জমির ব্যবস্থা আর প্রজাদের অবস্থা কি করে ভালো হতে পারে।

আরও একটি কুফল দেখা গেল। পুরানো জমিদার ঘরগুলি লোপ পেতে বসল। আগে যে সব জমিদার দেশে থাকতেন, প্রজাদের সুখ-দুঃখ দেখতেন, তাঁরা অনেকেই চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। হাতে টাকাকড়ি না থাকাতে তাঁরা ঠিক সময়ে রাজস্বের মোট টাকা দাখিল করতে পারতেন না। পৈতৃক জমিদারী নিলামে উঠলে নতুন এক শ্রেণীর লোক নগদ টাকা ফেলে সে তালুক কিনে নিতেন। এই ভাবে এক নতুন জমিদার দল সৃষ্টি হল। তাতে প্রজাদের কোনও লাভ হল না, বরং নতুন মনিবের সঙ্গে সম্পর্ক ক্ষীণ হয়ে এল। এই সব নতুন জমিদার অনেকটা পরগাছার মত নিশ্চিন্ত অলস জীবনে অভ্যস্ত হতে থাকলেন। কোম্পানির অনুগ্রহে যাঁরা জমিদার হলেন, তাঁরা ইংরেজ সরকারকে খুশি রাখতে সর্বদা চেষ্টা করতেন। কর্নওয়ালিস ভেবেছিলেন বিলাতের জমি-ব্যবস্থা ভারতে আমদানি করলে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক চিরকাল স্থায়ী হবে আর সরকারও নির্দিষ্ট রাজস্ব পেয়ে যাবেন। তা হল না। কোম্পানিও শেষে বুঝলেন, এতে জমির আশা-অনুযায়ী উন্নতি হচ্ছে না আর উন্নতি হলেও রাজস্ব বাড়ানো যাচ্ছে না। কোম্পানি শেষ পর্যন্ত কেবল এক ধনী জমিদার-শ্রেণী সৃষ্টি করে সরকারী কাজে তাদের সমর্থন ও সাহায্য পেতে লাগলেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফল মোটের উপর এই রকম দাঁড়াল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা ঃ বাঙলায় যেমন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করা হ'ল, রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য, তেমনি অন্যান্য প্রদেশে অতিরিক্ত রাজস্বের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব ও মধ্য প্রদেশে ব্রিটিশ সরকার 'মহলওয়ারী' ব্যবস্থা চালু করে। অযোধ্যায় প্রথমে তালুকদারি ব্যবস্থা ছিল। পরে তালুকদারদের প্রভাব কমে গেলে সেখানেও 'মহলওয়ারী' ব্যবস্থা চালু করা হয়। এই ব্যবস্থায় জমিদারগণের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জমির বন্দোবস্ত করা হত না। জমি বন্দোবস্ত হত এক একটি গ্রামের সঙ্গে। গ্রামকে মহলও বলা হয়।

মহল-ওয়ারী বন্দোবস্ত

তাই এই ব্যবস্থা 'মহলওয়ারী' ব্যবস্থা নামে পরিচিত। মহল বা গ্রামের মোড়ল কোন একটি বিশেষ গ্রামের পক্ষে সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ রাজস্ব দেবার শর্তে চুক্তিতে স্বাক্ষর করত। চাষী এই মোড়ল বা লম্বাদারের কাছে তার দেয় রাজস্ব জমা দিত। কিন্তু এই ব্যবস্থায় লম্বাদার নিজের দখলে অধিক পরিমাণ জমি রেখে দিত। কখনও কখনও লম্বাদার ছোট চাষীদের উপর অত্যাচারও করত।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও সিন্ধু অঞ্চলে ইংরেজরা রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত চালু করে। এই ব্যবস্থায় সরকার সরাসরি চাষীর রাজস্বের পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিত। কিন্তু উচ্চহারে রাজস্ব নির্ধারিত হওয়ায় দরিদ্র চাষীর উপর চাপ পড়ত। উপরন্তু এই ব্যবস্থায় সরকারের রাজস্ব কর্মচারীদের হাতে কৃষকগণকে নিপীড়ন ও দুর্ব্যবহার সহ্য করতে হত।

কুফল

নতুন রাজস্ব-ব্যবস্থাসমূহের ফলাফল ঃ জমিদারী, মহলওয়ারী বা রায়তওয়ারী ব্যবস্থা ভারতের চিরাচরিত ভূমি বন্দোবস্ত ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। এই নতুন ব্যবস্থায় জমিদার বা কৃষককে জমির উপর ব্যক্তিগত মালিকানা দেওয়া হয়েছিল। প্রয়োজন হলে তারা জমি বন্ধক বা বিক্রি করতে পারত। এই নতুন ব্যবস্থাগুলির পশ্চাতে ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব আয় সুনিশ্চিত করা। জমিদারী প্রথার পূর্বে জমিদাররা রাজস্ব আদায়েরই অধিকারী ছিল। কিন্তু এই অবস্থায় তারা জমির মালিক হয়ে গেল। ফলে চাষীর কাজ হল শুধু রাজস্ব প্রদান করা। জমিদার কৃষককে কোন না কোন অজুহাতে জমি থেকে উৎখাত করতে পারত। নতুন রাজস্ব ব্যবস্থাগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল অধিক পরিমাণ রাজস্ব আদায় করা। উচ্চহারে রাজস্ব ধার্য হওয়ায় কৃষককুলের সর্বনাশ হল। প্রায়ই তাদের ভাগ্যে জুটত জমিদার অথবা সরকারী রাজস্ব-কর্মচারীগণের হাতে নির্যাতন ও দুর্ব্যবহার। দরিদ্র কৃষককে কখনও কখনও বেগার খাটতে হত। আবার কখনও কখনও তাদের কাছ থেকে অবৈধ খাজনাও আদায় করা হত। এছাড়া কৃষকদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে সমাজে সুদখোর মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব হ'ল। অত্যন্ত চড়া সুদে তারা দরিদ্র কৃষককে টাকা ধার দিত। অনাদায়ে তারা কৃষকের জমি বাজেয়াপ্ত করে নিত।

নতুন রাজস্ব ব্যবস্থা গুলির উদ্দেশ্য ছিল সর্বাধিক রাজস্ব আদায়

কৃষককুলের সর্বনাশ

সুদখোর মহাজন শ্রেণীর উদ্ভব

নতুন রাজস্ব ব্যবস্থায় সরকারী রাজস্ব বৃদ্ধি পেলেও সরকার কৃষিজমির উন্নতি সাধনে বা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে কোনও ব্যবস্থা নিল না। জমিদারগণও একই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। ফলে জমির উর্বরতা হ্রাস পেল এবং উৎপাদন কমে গেল।

জমির উর্বরতা ও উৎপাদন হ্রাস

[সাত] ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার এবং কয়েকটি দেশীয় শিল্পের অবনতি (১৭৬৫ খ্রীঃ—১৮৫৭ খ্রীঃ)

ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রথম এক শতকের সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল ভারতীয় বাণিজ্য ও দেশী শিল্পের অবনতি ও ধ্বংস। বহু যুগ ধরে ভারত শিল্প-বাণিজ্যে প্রায় সারা পৃথিবী জুড়ে যে খ্যাতি লাভ করেছিল, কোম্পানির শাসনের একশ' বছরের মধ্যেই তা সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়ে যায়। এর সূচনা ঘটেছিল বাঙলাদেশে যেখানে ইংরেজ শাসনের সর্বপ্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল। সতের শতকের শুরু থেকে পলাশীর যুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে বিভিন্ন য়ুরোপীয় বণিক-কোম্পানি বাঙলাদেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের পথ প্রশস্ত করেছিল।

বিভিন্ন ইউরোপীয় বণিক কোম্পানি কর্তৃক বাঙলার বহির্বাণিজ্যের প্রসার

আঠারো শতকের প্রথমার্ধে য়ুরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি ছাড়াও বাঙলাদেশে হিন্দু, আর্মেনিয়ান এবং মুসলিম বণিকগণ অন্তর্দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করেছিল। তারা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে এবং তুরস্ক, আরব, পারস্য ও তিব্বতে বাণিজ্যিক যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের উদ্বৃত্ত সর্বদা বাঙলার অনুকূলেই ছিল। এই সময়ে যে সকল পণ্য বাঙলাদেশ থেকে রপ্তানি করা হত তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল সূতীবস্ত্র, রেশমবস্ত্র, কাঁচা সিল্ক, চিনি, লবন, পাট, সোরা এবং আফিম। পৃথিবীর সর্বত্র বাঙলার সূক্ষ্ম সূতীবস্ত্র, বিশেষতঃ ঢাকাই মসলিনের খুব চাহিদা ছিল। য়ুরোপীয় বণিক কোম্পানিগুলি প্রচুর পরিমাণে বাঙলার সূতীবস্ত্র স্থলপথে ইসপাহান এবং সমুদ্রপথে বসরা, মোচা ও জেড্ডার বাজারগুলিতে রপ্তানি করত। জাপান, হল্যাণ্ড ও মধ্য এসিয়ায় কাঁচা সিল্ক রপ্তানি করা হত। এই সময়ে বাঙলাদেশ ছিল চিনি শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। এমন কি আঠার শতকের মধ্যভাগেও বাঙলাদেশ থেকে প্রচুর পরিমাণে চিনি বিদেশে রপ্তানি করা হত। বাঙলার পাট শিল্পও আঠার শতকের মধ্যভাগে সমৃদ্ধ হতে থাকে। সুতরাং ইংরেজ শাসনের পূর্ব মুহূর্তেও বাঙলার বৈদেশিক বাণিজ্য অত্যন্ত উন্নত ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্যের সমৃদ্ধি, বাঙলার বিশিষ্ট রপ্তানি দ্রব্যসমূহ

কিন্তু ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসে এক ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দিল। বিশেষতঃ ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে ক্লাইভ কর্তৃক দেওয়ানী প্রাপ্তির ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি রাজনৈতিক শক্তিতে পরিণত হয়। এর পরে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে অবনতির যুগ শুরু হয়। এই অবনতির জন্য দায়ী ছিল কোম্পানির আমলের অপশাসন ও বিশৃঙ্খলা এবং ইংরেজের অনুসৃত আর্থিক বিধি ব্যবস্থা।

কোম্পানির আমলে বাণিজ্য ও শিল্পের অবনতি

প্রথমতঃ, ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী লাভের ফলে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙলার উদ্বৃত্ত রাজস্ব ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করতে থাকে। রাজস্বের এই উদ্বৃত্ত টাকা দিয়ে কোম্পানি ভারতে পণ্যদ্রব্য ক্রয় করে বিদেশে রপ্তানি করত। চীনদেশে কোম্পানির রৌপ্য রপ্তানি এবং কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্যের জন্যও প্রচুর পরিমাণে সম্পদ বাঙলায় বাইরে চলে যায়। বিনিময়ে বিদেশ থেকে বাঙলাদেশে যা আমদানি করা হত তার পরিমাণ ছিল অতি নগণ্য। এর ফলে বাঙলার অর্থনীতি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বাঙলার-শিল্প বাণিজ্যে অবনতি শুরু হয়।

বাঙলার সম্পদের বহির্গমন

দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজদের অর্থনৈতিক নীতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের শিল্প ও ও বাণিজ্যকে ধ্বংস করে ভারতকে কাঁচা মাল সরবরাহের কেন্দ্রে পরিণত করা এবং ব্রিটিশ পণ্য ভারতে চড়া দামে বিক্রি করে অত্যধিক মুনাফা অর্জন করা। এছাড়া ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দের পরে কোম্পানি ধীরে ধীরে একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার কায়েম করে। গোড়ার দিকে ইংরেজ সওদাগরী হাউসগুলি এই বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করত। যাই হোক কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্য দেশীয় শিল্প-বাণিজ্যের প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। এছাড়া কোম্পানির কর্মচারীরা 'দস্তকের' অত্যধিক অপব্যবহার শুরু করলে দেশীয় শিল্প-বাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, একথা আগে বলা হয়েছে।

ইংরেজ অর্থ নৈতিক নীতির ঔপনিবেশিক চরিত্র, একচেটিয়া বাণিজ্য অধিকার

তৃতীয়তঃ, কোম্পানির কর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে বাঙলার তাঁত শিল্প ধ্বংস হয়ে গেল। বাঙলা দেশে তৈরি মিহি মোটা সব রকম সূতীর কাপড়ের চাহিদা ছিল বিদেশে। কোম্পানি লাভের লোভে এই কাপড়ের বাজার সম্পূর্ণ হাত করতে উঠে পড়ে লাগল। কি করে সেই একচেটিয়া দখল খাটানো হল, বলছি। বাঙলার তাঁতিদের কিছু আগাম টাকা দিয়ে চুক্তি করিয়ে নেওয়া হত যে নির্দিষ্ট দিনের মধ্যে তারা যত কাপড় বুনবে, সে সব কোম্পানিই নেবে। কিন্তু কেনবার সময়ে কোম্পানি দাম দিত অনেক কম। তাঁতিরা চুক্তিতে বাঁধা, কাজেই অন্য কারুর জন্য তারা কাপড় তৈরি করতে পারত না, আর কোথাও আর একটু ভালো দামে বিক্রিও করতে পারত না। তা ছাড়া, ভয় দেখিয়ে বেত মেরে তাঁতিদের ওপর প্রচণ্ড চাপ দেওয়া হত, যাতে তারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আরও বেশি কাপড় বুনে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের হাতে তুলে দেয়। সুতরাং অত্যাচার চলত দুদিক থেকে—আগাম কিছু টাকা বা 'দাদন' দিয়ে তাঁতিদের ন্যায্য দাম না দেওয়া, অর্থাৎ ঠকানো, আর তাদের উপর ফরমাস ও জুলুম করে অমানুষিক ভাবে খাটানো। শোনা যায়, তাঁতিরা কোম্পানির তাড়নার জ্বালায় দুঃখে বুড়ো আঙুল কেটে ফেলেছিল। গল্পকথা হলেও, অকথ্য অত্যাচারে তাঁতিরা অতিষ্ঠ হয়ে

বাঙলার বিখ্যাত তাঁত শিল্পের ধ্বংস সাধন

উঠেছিল, একথা সত্য। তার ফলেই বাঙলার বিখ্যাত বয়ন বা তাঁতশিল্পের চরম দুর্দশা হল।

চতুর্থতঃ, বাঙলার তাঁত শিল্পকে সম্পূর্ণভাবে খতম করার জন্য ইংলণ্ডের বস্ত্র-উৎপাদনকারীগণ অসম প্রতিযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করল। ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডে ভারতীয় সূতীবস্ত্র ও রেশমবস্ত্র রপ্তানি শুরু করলে, সেগুলি ইংলণ্ডে অত্যধিক জনপ্রিয় হয়ে উঠে। ফলে ব্রিটিশ বয়ন শিল্প বিপন্ন হয়ে পড়ে। এর ফলে ঈর্ষান্বিত ব্রিটিশ বস্ত্র-উৎপাদকগণ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনের সাহায্যে বাঙলার এই উন্নত শিল্পটির কণ্ঠরোধ করার জন্য এগিয়ে আসে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বাঙলার তাঁত-শিল্পের স্বার্থবিরোধী আইন

ভারতীয় বস্ত্র আমদানির উপর এরূপ আইনগত নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ফলে ইংলণ্ডের বয়ন শিল্পের দ্রুত প্রসার ঘটে। এছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংলণ্ডে বস্ত্র-উৎপাদন প্রণালীর আমূল পরিবর্তন ঘটে। যন্ত্রের সাহায্যে উৎপাদিত ব্রিটিশ বস্ত্রের উৎপাদন-খরচ কম হওয়ায়, ঐগুলির মূল্য কম ছিল। ফলে বাঙলার হস্তচালিত তাঁতশিল্প বিলাতী বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ হল। এছাড়া শুল্ক-নীতি সংক্রান্ত বৈষম্য এবং আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পণ্যের প্রতি পক্ষপাতিত্ব বাঙলার তাঁত শিল্পের সমাধি রচনা করে। এরপর ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের স্বার্থে ভারত থেকে কাঁচামাল সংগ্রহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কোম্পানি শিল্পজাত দ্রব্যের পরিবর্তে তুলা, কাঁচা সিল্ক প্রভৃতি কাঁচামাল ভারত থেকে ইংলণ্ডে রপ্তানি করতে থাকে। কিন্তু আইনের মাধ্যমে বা উন্নত শিল্প-কৌশলের সাহায্যে বাঙলার তাঁত শিল্পকে বাঁচানোর কোন চেষ্টা করা হল না।

বাঙলার তাঁত-শিল্পের সমাধি

এইভাবে পলাশীর পরে মাত্র অর্ধশতকের মধ্যেই বাঙলার শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হয়ে যায়। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে কৃষির গুরুত্ব বেড়ে যায়। ফলে কৃষিতে বিনিয়োগের আগ্রহ ও পরিমাণ বাড়তে থাকে। বণিক সম্প্রদায় কৃষি-জীবীতে রূপান্তরিত হয়। শেষ পর্যন্ত শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মূলধনের অভাব দেখা দেয়। এর ফলে শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ধীরে ধীরে ইংরেজদের কুক্ষিগত হয়। ১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদে ব্রিটিশ মূলধনী সম্প্রদায়ের দাবী মেনে নিয়ে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার বাতিল করা হয়। এরপরে কৃষি-প্রধান দেশ ভারত শিল্পোন্নত ইংলণ্ডের একটি অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত হয়। ভারত হয়ে গেল ইংলণ্ডের কাঁচামাল সরবরাহের কেন্দ্র।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের প্রতিক্রিয়া

১৮১৩ খ্রীস্টাব্দের সনদের প্রতিক্রিয়া

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য ইংরেজ শাসনের পূর্বে সমৃদ্ধ ছিল এবং কোম্পানির আমলে সেগুলির অবনতি ঘটে। অতি প্রাচীনকাল থেকেই শিল্প ও বাণিজ্য ভারতের সম্পদ সৃষ্টিতে সাহায্য করে এসেছে। ভারত থেকে শিল্পজাত পণ্য বিদেশে রপ্তানি করা হত। এছাড়া মুক্তা, সুগন্ধিদ্রব্য, রঙ, মসলা, চিনি, আফিম প্রভৃতি দ্রব্যও ভারত দূর দূরান্তের দেশে রপ্তানি করত। বিনিময়ে আমদানি হত সোনা, তামা, দস্তা, টিন, সীসা, মদ, ঘোড়া প্রভৃতি। কিন্তু আমদানির তুলনায় রপ্তানির পরিমাণ বেশি থাকায় ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্য. শিল্পজাত অন্যান্য রপ্তানি যোগ্য দ্রব্য

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের প্রধান শিল্প ছিল তাঁত শিল্প, রেশম শিল্প পশম শিল্প বাঙলা ছাড়া, লক্ষ্ণৌ, আমেদাবাদ, নাগপুর এবং মাদুরা ছিল বস্ত্র শিল্পের প্রধান কেন্দ্র। পাঞ্জাব, বিশেষতঃ কাশ্মীরে উন্নতমানের শাল তৈরি হত। ভারতের প্রায় সর্বত্রই কাঁসা, পিতল ও তাম্রশিল্প গড়ে উঠেছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রগুলি ছিল বারাণসী, তাঞ্জোর, পুণা, নাসিক এবং আমেদাবাদে। এছাড়া মণিমুক্তা শিল্প, প্রস্তর খোদাই শিল্প, সোনা রুপার তারের কারুকার্য, এবং চন্দন কাঠ, মার্বেল, হাতির দাঁত, কাঁচ প্রভৃতির উপর শিল্পকর্মের জন্যও ভারত খ্যাতি অর্জন করেছিল। চর্মশিল্প, সুগন্ধি দ্রব্য শিল্প ও কাগজ শিল্পও যথেষ্ট উন্নত ছিল।

তাঁত, রেশম ও পশম

কাঁসা, পিতল তামা, সৌখিন দ্রবাদি

এই সময়ে ভারতের পরিবহন-বাণিজ্য প্রধানতঃ ভারতীয়দের হাতেই ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত ভারতের জাহাজ-নির্মাণ শিল্প ইংলণ্ডের তুলনায় অধিক উন্নত ছিল। ভারতের বস্ত্র শিল্পের মত জাহাজ-নির্মাণ শিল্পও ব্রিটিশ জাহাজ-নির্মাণকারীদের ঈর্ষার সঞ্চার করেছিল। তাদের চাপে ব্রিটিশ সরকার আইন করে ভারতের জাহাজ নির্মাণ শিল্পের অগ্রগতির কণ্ঠরোধ করে।

জাহাজ নির্মাণ শিল্প

আঠারো শতকের শেষদিকে বাঙলাদেশের ন্যায় ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেও বাণিজ্য ও শিল্পে ভাঙন ধরে। ধীরে ধীরে ভারত কাঁচামাল উৎপাদনের এবং ইউরোপের সস্তা শিল্প-পণ্যের বাজারে পরিণত হয়। যে সকল কারণে বাঙলার শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছিল, সেই একই কারণে ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হয়েছিল। এই ভাঙনের মূলে ছিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নীতি, ব্রিটিশ কারখানার সস্তা পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতা এবং ভারতীয় শিল্প ও

ভারতের শিল্প ও বাণিজ্যের ভাঙন

বাণিজ্যকে রক্ষা করার ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের ইচ্ছার বা ক্ষমতার অভাব।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নীতি, ব্রিটিশ কারখানাজাত সস্তা পণ্যের প্রতিযোগিতা ও কোম্পানীর ঔদাসীন্য

এছাড়া ইংরেজের সংস্পর্শে এদেশের অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপান্তর ঘটে।। ফলে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যে ধ্বংস সাধনে সাহায্য করেছিল। ভারতে তৈরি পণ্যের চাহিদা হ্রাস পেয়েছিল এবং সস্তা ও সৌখিন ব্রিটিশ শিল্প পণ্যের জন্য উপযোগী বাজার ভারতে তৈরি হয়েছিল। ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে রক্ষার ব্যাপারে কোম্পানির ঔদাসীন্য কম দায়ী ছিল না। শিল্প ও বাণিজ্য ধ্বংস হওয়ার ফলে ভারতীয় অর্থনীতির মূল চরিত্র বদলে গেল। ভারতীয় অর্থনীতির চিরাচরিত কাঠামোর মূলে ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বয়ম্ভর গ্রাম। গ্রামের মানুষের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই উৎপন্ন হত। কিন্তু ইংরেজদের অনুসৃত অর্থনৈতিক নীতির ফলে এই কাঠামো ধসে গেল। কুটির শিল্পের সাথে যুক্ত অসংখ্য কারিগর জীবন ধারণের জন্য বাধ্য হয়ে কৃষি-শ্রমিকে পরিণত হল।

রুচি ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন, ভারতীয় অর্থনীতি চিরাচরিত কাঠামোর পরিবর্তন; কুটিরশিল্প ধ্বংস

ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যে ধারা প্রচলিত ছিল, এখন কোম্পানির আমলে তার রাজনীতি, পটভূমি কাঠামো এবং ছক বদলে যেতে লাগল। সতের ও আঠারো শতকে যে সব পণ্য ভারত থেকে রপ্তানি করা হত, এখন তার বদলে পাট ও পাটের তৈরি দ্রব্য, আফিম, চিনি এবং বিশেষ করে নীল প্রভৃতি দ্রব্যের রপ্তানি শুরু হল। পশ্চিম ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে এবং প্রধানতঃ বাঙলাদেশে এই সময়ে নীলচাষ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সুতরাং বলা চলে, ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতে বৈদেশিক বাণিজ্যের সংগঠন ও কার্যপ্রণালীর উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। বলা বাহুল্য, এই অর্থনৈতিক রূপান্তর ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তথা কোম্পানির স্বার্থেই সাধিত হয়েছিল কতকগুলি বিষয়ে কোম্পানির একচেটিয়া অধিকার, পরে অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রচলন এবং ব্রিটিশ মূলধনের বিনিয়োগ ঔপনিবেশিক ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের চেহারা পাল্টে দিয়েছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রচলিত কাঠামো ও ছকের পরিবর্তন

[আট] সাংস্কৃতিক চিত্র

শিক্ষা ঃ পুরাতন শিক্ষা ব্যবস্থা ঃ ইংরেজরা যখন বাংলার শাসনভার গ্রহণ করে তখন এদেশে উচ্চশিক্ষা বলতে বোঝাত সংস্কৃত আরবী এবং ফরাসী ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা। দেশীয় ভাষা ছিল দারুণভাবে অবহেলিত এবং পাঠ্য সূচীতে বিজ্ঞান অথবা গণিত, ইতিহাস, ভূগোল অর্থনীতি, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ের কোন স্থান ছিল

প্রাক্-ব্রিটিশ যুগে এদেশের শিক্ষার চিত্র

না। তখন উচ্চশিক্ষার পাঠ্যসূচীতে ছিল ব্যাকরণ ; প্রাচীন সাহিত্য, তর্কবিদ্যা, দর্শন, আইন এবং ধর্মশাস্ত্র। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য ছিল টোল, আর মুসলমানদের জন্য মাদ্রাসা। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে হিন্দুদের জন্য ছিল পাঠশালা আর মুসলনদের জন্য ছিল মক্তব।

ইংরাজীর মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ঃ ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি গোড়ায় দিকে এদেশের শিক্ষার উন্নতির ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখায় নি। এ ব্যাপারে সর্বপ্রথম আগ্রহ দেখিয়েছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। ১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপন করেন। এরপর ১৭৮৪ খ্রীস্টাব্দে স্যার উইলিয়ম জোনস্ কলকাতায় 'এশিয়াটিক সোসাইটি' স্থাপন করেন এবং ১৭৯২ খ্রীস্টাব্দে জোনাথান ডানকান বারণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেন।

গোড়ার দিকে শিক্ষা-ক্ষেত্রে কোম্পানীর ঔদাসীন্য
কলিকাতা মাদ্রাসা
এশিয়াটিক সোসাইটি

এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রসারের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম অনুভব করেন চার্লস্ গ্রাণ্ট। বিষয়টি তিনি ইংলণ্ডের ডিরেক্টর সভা ও পার্লামেণ্টের সদস্যদের দৃষ্টিতে আনেন, কিন্তু কোন ফল হয় নি। কিন্তু বেসরকারী প্রচেষ্টায় এদেশে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার কাজ শুরু হয়ে গেল। এ বিষয়ে খ্রীস্টান মিশনারীগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। উইলিয়ম কেরী শ্রীরামপুর মিশন থেকে বাঙলাভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করেন। ১৮১০ খ্রীস্টাব্দ থেকেই খ্রীস্টান মিশনের উদ্যোগে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন হয় সারা বাঙলার স্কুলগুলিতে।

চার্লস গ্রাণ্ট
মিশনারীদের প্রচেষ্টা

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপিত হওয়ার পর ঐ কলেজে ভারতীয় ও বিদেশী উভয়েই পরস্পরের ভাষা শিক্ষায় মনোযোগী হলেন। অবশ্য সাধারণভাবে ইংরাজী ভাষা প্রচারের কোনও উদ্দেশ্য এই কলেজের ছিল না। বেণ্টিঙ্কের সময়ই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে ইংরাজী শিক্ষার পৃষ্ঠপোষকতা গ্রহণ করলেন। কলকাতায় মেডিকেল কলেজ ও বোম্বাইয়ে এলফিন্স্টোন কলেজ স্থাপনও এই সময়কারই ঘটনা। ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। বাঙলায় তখন দুটি দল, প্রাচ্যশিক্ষার সমর্থক আর ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষ-দল। সংস্কৃত আরবী ফারসী প্রভৃতি প্রাচ্য ভাষায় শিক্ষাদানের সমর্থক হলেন সরকারের সেক্রেটারী প্রিন্সেপ আর ইংরাজী ভাষাকে মাধ্যম করতে চেয়েছিলেন ভারতের আইন-সদস্য লর্ড মেকলে। এক পক্ষে 'ওরিয়েণ্টালিস্ট', অপর পক্ষে 'অ্যাংলিসিস্ট',—এই দুয়ের মধ্যে প্রচুর তর্ক-বিতর্ক হয়। মেকলের ধারণা ছিল, ইংরাজী ভাষা গ্রহণ করলে ভবিষ্যতে বৃটিশ সরকারের সমর্থন দৃঢ়তর হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফল

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ
প্রাচ্য বনাম পাশ্চাত্য শিক্ষা
ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে যুক্তি

বিপরীতই হয়েছিল। রাজা রামমোহন স্বয়ং প্রাচ্যভাষায় যথেষ্ট পণ্ডিত হয়েও পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষাচর্চা সমর্থন করলেন, নানা বিষয় ও কারণ বিবেচনা করে, তিনি তাঁর বিখ্যাত পত্রে লর্ড আমহার্স্ট'কে লেখেন যে, ইংরাজীর মাধ্যমে গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতির চর্চায় দেশের প্রকৃত উন্নতি হবে। ধর্মযাজক শিক্ষাবিদ্ ডফ সাহেব ও লর্ড মেকলে এই নীতির অনুমোদন করলে ১৮৩৫ সাল থেকে ইংরাজী শিক্ষাধারার প্রসার শুরু হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার স্বপক্ষে এক বড় যুক্তি ছিল যে, ইংরাজী-শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সাহায্যেই দেশের বৃহত্তর জনসাধারণ শিক্ষিত হয়ে উঠবে। কিন্তু এই নীতির সব চেয়ে বড় ত্রুটি দেশীয় ভাষার অনাদর এবং একটি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদয়ে মুসলমান ও সাধারণ জনসমাজের ঔদাসীন্য। নব্য শিক্ষার অতিরিক্ত চর্চায় ধর্ম ও ঐতিহ্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং সমাজে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ প্রকট হয়ে উঠল। সে যুগের হিন্দু কলেজের বিখ্যাত শিক্ষক যুবক ডিরোজিওকে কেন্দ্র করে 'ইয়ং বেঙ্গল' দলের সৃষ্টি হয়। রামগোপাল ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র ও রামতনু লাহিড়ী ছিলেন এই দলের অগ্রণী। কিন্তু 'ইয়ং বেঙ্গলে'র উগ্র ইংরাজীপনায় শীঘ্রই মধ্যপন্থী সংস্কারকদল পৃথক কর্মনীতি গ্রহণ করেন। এই দলে ছিলেন 'তত্ত্ববোধিনী সভা'র প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত। রক্ষণশীল হিন্দুদলের নেতা ছিলেন রাজা রাধাকান্ত দেব। পাশ্চাত্য স্বাধীন চিন্তা ও শিক্ষাকে গ্রহণ করার ব্যাপারে একদিকে উচ্ছৃঙ্খল অনুকরণ, অপর দিকে বিরাগ ও প্রতিক্রিয়া। এই প্রাথমিক 'শক' বা সংঘাতের আতিশয্য ক্রমে কমে যায় এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে বুদ্ধি-বিচার দিয়ে যাচাই করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়। এইভাবে গ্রহণ-বর্জনের পালা দ্বারা পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তা ধারার উৎকর্ষগুলি ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত হয়। জিজ্ঞাসা ও চর্চার প্রবৃত্তি রামমোহনের মধ্যেই প্রথম লক্ষিত হয়।

দেশীয় ভাষার অনাদর

প্রতিক্রিয়া

ডিরোজিও এবং 'ইয়ং বেঙ্গল'

তত্ত্ববোধিনী

এর আগেই মিশনারী ও কয়েকজন প্রগতিবাদী ভারতীয়ের প্রচেষ্টায় 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও হিন্দু কলেজ প্রমুখ কয়েকটি ইংরাজী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ায় এ দেশের বালকেরা ইংরাজী শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিল। ইংরাজী শিক্ষা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির দান নয়, যদিও ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের পর থেকে ইংরাজী শিক্ষার জন্য কিছু কিছু অর্থব্যয় করা হত। এর পূর্বে ছাত্র, মিশনারী, দেশীয় হিতৈষী ব্যক্তি ও ইংরাজ মহোদয়দের দানের উপর নির্ভর করেই স্কুলগুলি চলছিল।

স্কুল বুক সোসাইটি

শিক্ষার খাতে ব্যয়

মহাত্মা ডেভিড হেয়ারের নাম ও কীর্তি এই প্রসঙ্গে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য তিনি অজস্র পরিশ্রম করেন এবং নিজের স্কুলে অনেক সময়ে বিনা বেতনে যোগ্য ছাত্রদের ভর্তি করতেন। তাঁর সম্পর্কে নানা কাহিনী প্রচলিত এবং তাঁর নামেই হেয়ার স্কুল আজও বর্তমান। হেয়ার সাহেবের স্কুল ছাড়াও শেরবোর্ন সাহেবেরও একটা স্কুল ছিল। এখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনের প্রথম যুগে অনেক সম্ভ্রান্ত ও মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারের ছেলেরা শিক্ষা পেয়েছেন।

হেয়ার ও শেরবোর্ন সাহেবের স্কুল

১৮৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত শতকরা প্রায় ৪৭ ভাগ অর্থই ছাত্রদের মাইনে ও ব্যক্তিগত সাহায্যে জোগানো হত। ক্রমে দেশীয় ভাষা শিক্ষার স্কুলগুলি সরকারের বিশেষ পরিদর্শনের ফলে বাড়তে থাকে। পাঁচ বছরের মধ্যে (১৮৩৬-৪০) বাঙলায় ইংরাজী শিক্ষার স্কুলগুলির সংখ্যা তিনগুণ বেড়ে গেল। ১৮৪৪ খ্রীস্টাব্দের ১০ই অক্টোবর লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণায় বলা হল যে ভবিষ্যতে চাকুরীর ক্ষেত্রে ইংরাজী স্কুলে শিক্ষিত প্রার্থীদেরই অন্যান্য প্রার্থী অপেক্ষা বেশি সুবিধা দেওয়া হবে। এই ঘোষণার ফলে ইংরাজী স্কুলগুলি আরও একটু উৎসাহ পেল। এর দশ বৎসর পরেই স্যার চার্লস উড্রের ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দের বিখ্যাত এডুকেশন ডেসপ্যাচের ভিত্তিতে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের আইনে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলা—এই তিনটি প্রেসিডেন্সীতে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির আদর্শে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রাথমিক থেকে উচ্চতম শিক্ষার একটি ক্রমোন্নত যুক্ত পদ্ধতির প্রবর্তন থেকেই ভারতে ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত।

লর্ড হার্ডিঞ্জের ঘোষণা

এডুকেশন ডেসপাচ

স্ত্রীশিক্ষা ঃ স্ত্রীশিক্ষার প্রসারের জন্য বৃটিশ শাসনের প্রথম দিকে সরকারী ভাবে কোনও চেষ্টা করা হয় নি। বে-সরকারী প্রচেষ্টায় মিশনারীদের উদ্যোগেই স্ত্রীশিক্ষার আরম্ভ হয়। মিশনারীদের সাহায্য করেছিলেন ডেভিড হেয়ার ও রাধাকান্ত দেব। ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে স্ত্রীশিক্ষার জন্য পাঁচটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে চার্চ মিশনারী সোসাইটির পরিচালনায় স্ত্রী-শিক্ষা ক্রমশঃ বিস্তৃত হতে থাকে। তদানীন্তন গভর্নর জেনেরাল লর্ড হেস্টিংসের পত্নীর আনুকুল্যে ও সহানুভূতিতে এই কার্য বিশেষভাবে অগ্রসর হয়। তখন মোট ৩০টি বিদ্যালয়ে ৬০০ ছাত্রী অধ্যয়ন করত। বীটন বা বেথুন কলেজ স্থাপন ও বিদ্যাসাগরের অক্লান্ত সহযোগিতা স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে স্মরণীয় ঘটনা। ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে নারী শিক্ষাব্রতী বেথুন সাহেব কলকাতায় এই কলেজের প্রতিষ্ঠা করেন। লর্ড ডালহৌসি বেথুন কলেজের ব্যয় নির্বাহের জন্য নিজ অর্জিত অর্থ থেকে সাহায্য করে গিয়েছেন। এছাড়া স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের কার্যে ব্রাহ্মসমাজ ছিল অগ্রণী। আর্যসমাজ, ভারত সেবক সমিতি

মিশনারী প্রচেষ্টা বালিকা বিদ্যালয়

বেথুন ও বিদ্যাসাগর, বেথুন কলেজ

স্ত্রীশিক্ষায় ব্রাহ্মসমাজ

(Servant of India Society) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যমও প্রশংসনীয়। পরবর্তীকালে বোম্বাইয়ে মহিলাদের একটি পৃথক বিশ্ব-বিদ্যালয় (Indian Women's University) স্থাপিত হয়।

পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে ভারতে নবজাগরণ : ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতের জন-জীবনে এক গভীর আলোড়ন দেখা দিল। ভারতবাসী জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভুলে গিয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে আর নিজেকে আবদ্ধ করে রাখল না। তাদের মনে যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি পাশ্চাত্য ভাবধারা গভীরভাবে রেখাপাত করল। শেষ পর্যন্ত শ্রেণীগত ও সম্প্রদায়গত সংকীর্ণতা দূরীভূত হয়ে তারা জাতীয় ঐক্যবোধের গুরুত্ব অনুভব করল এবং বিদেশী অপশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভের আকাঙ্ক্ষাও তাদের মধ্যে জাগ্রত হল।

যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদের জন্ম

এছাড়া দেশীয় সাহিত্যের উপর ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব ইংরাজী শিক্ষার আর একটি মহৎ ফল। শুধু ইংরেজী কেন, সমস্ত পাশ্চাত্য সাহিত্যের রত্ন-ভাণ্ডারই ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে আমাদের সামনে সহসা উন্মুক্ত হয়ে গেল। প্রথম ইংরাজী-শিক্ষিত ভারতীয়গণ পাশ্চাত্য দর্শন, ইতিহাস, সাহিত্য ও বিজ্ঞান অনুবাদের সাহায্যে দেশের মধ্যে প্রচারে বিশেষভাবে উদ্যোগী হন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, প্যারীচাঁদ মিত্র এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর —এঁরাই ছিলেন প্রথম পাশ্চাত্য সাহিত্য প্রভাবিত সুনামী লেখক। বাঙলা ভাষাকে সংস্কৃতের শৃঙ্খলমুক্ত করে গদ্য রীতি গঠনে ও নতুন রূপ দেওয়ার কাজে এঁরাই ছিলেন পথিকৃৎ। কিছুকাল পরেই আর একদল লেখক বাঙলা ভাষায় নিজস্ব শক্তি ও সামর্থ্যকে আবিষ্কার করলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক 'মেঘনাদ বধ' কাব্যের সাহসী কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত ছিলেন এঁদের পুরোভাগে। তারপর দীনবন্ধু মিত্র ও পরে স্বনামধন্য বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে এঁরা পাশ্চাত্য মনন ও সাহিত্যিক ভঙ্গীর এক আশ্চর্য রাসায়নিক মিশ্রণ ঘটিয়েছেন। দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্বে, প্রকাশের দক্ষতায় এবং প্রসঙ্গের নিপুণ নির্বাচনে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও, ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য ভারতীয় জীবনেরই এক উৎকৃষ্ট শিল্পরূপ। শুধু বাঙলা সাহিত্য নয়, এযুগে হিন্দী, মারাঠী, মালয়লম্ এবং উর্দু প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষা ও সাহিত্যেরও যথেষ্ট বিকাশ ও উন্নতি ঘটে। এছাড়া ঊনবিংশ শতাব্দীতে সুদীর্ঘকালের লুপ্তপ্রায় প্রাচীন বৈদিক ও বৌদ্ধ সাহিত্যেরও পুনরুদ্ধার হ'ল এবং সমাহিত হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রভাব

বাঙলা গদ্য

মাইকেল, দীনবন্ধু ও বঙ্কিমচন্দ্র

আঞ্চলিক সাহিত্য

প্রাচীন শাস্ত্র ও সংস্কৃতির চর্চা

আবিষ্কৃত হল। উইলিয়ম জোন্‌স, বোলেরূক, কাওয়েল, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি জ্ঞানানুরাগী পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গ এই প্রাচীন শাস্ত্রগুলি সম্পাদিত ও মুদ্রিত করে আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করলেন।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় ভাবধারা ও জাতীয় চেতনার বিকাশে সংবাদপত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত জেমস্‌ অগাস্টাস হিকির 'বেঙ্গল গেজেট'ই এদেশে ইংরাজীতে প্রথম সংবাদ পত্র। বাঙলা ভাষায় প্রথম মাসিক পত্রিকা 'দিগ্‌দর্শন' মার্শম্যানের সম্পাদনায় শ্রীরামপুর থেকে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়। দেশীয় ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশে পথিকৃৎ ছিলেন রামমোহন রায়। ধীরে ধীরে রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্যদের প্রচেষ্টায় আরো কয়েকটি সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' জাতীয়তাবাদী আদর্শ প্রচারের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

সংবাদ পত্র

কারুশিল্প প্রসঙ্গে একথা স্মরণ রাখা দরকার যে এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নানা রকম কুটির শিল্পের যথেষ্ট প্রচলন ছিল। বাঙলার পুতুল, তাঁতের কাপড়,, হাতির দাঁত ও পোড়ামাটির কাজ, কালীঘাটের পট, কাঁসার বাসন ইত্যাদির যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ওড়িশার রৌপ্য দ্রব্যে জালির কাজ, যুক্ত প্রদেশের চিকন, চুড়ি ও কাঁসা পিতলের কাজ, কাশ্মীরের শাল, পশম ও দারু শিল্প প্রভৃতির চাহিদা ও সমাদর ছিল। পাশ্চাত্য দেশের রসজ্ঞ মানুষ যখন ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য, প্রাচীন চিত্র, বিভিন্ন অঞ্চলের স্থানীয় শিল্পের কদর করলেন তখন ভারতবাসী তাদের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সচেতন হল। কাজেই লুপ্ত শিল্প গৌরবের ও দেশীয় শিল্প-রুচির পুনরুদ্ধার পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের একটি উল্লেখযোগ্য ফল।

দেশীয় শিল্প রুচির পুনরুদ্ধার

সমাজ সংস্কার ঃ সমাজ ও ধর্মের ব্যাপারে ইংরেজ সরকার প্রথম থেকেই নিরপেক্ষ ছিল, স্বার্থের খাতিরেই অকারণ হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী ছিল না। সরকারের পক্ষ থেকে ধর্মপ্রচারের বিশেষ চেষ্টা করা হয় নি। আর সমাজব্যবস্থা রক্ষণে ইংরেজ উৎসাহদানই করেছে। যেমন বলা যেতে পারে, খৃস্টধর্মে দীক্ষিত হিন্দুর উত্তরাধিকার ক্ষমতা থাকবে না—এই হিন্দু আইন ইংরেজ সরকারই পাস করেছে। কিন্তু ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের একটি আইনে এবং ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের একটি আইনে ধর্মান্তরের অসুবিধা দূর করা হল। ১৮৩৩ খ্রীস্টাব্দের বোর্ড অব্‌ কণ্ট্রোলের সভাপতি নির্দেশ দিলেন, যে, ভারতীয় সামাজিক উৎসবাদিতে সরকার কোনও প্রকার বিশেষ সুবিধা দেবেন না। লর্ড অকল্যাণ্ডের আমলে তীর্থকর-গ্রহণ ব্যবস্থা রোধ হল এবং মন্দিরের দাতব্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি আরও কয়েকটি নির্দেশ ঘোষিত হল।

সরকারের নিরপেক্ষ নীতি বর্জন

সমাজে যখন নতুন ভাবজাগরণ শুরু হচ্ছে তখন সরকারের পক্ষে নীতির দিক

থেকে নিরপেক্ষ ঔদার্য অবলম্বন করে বসে থাকা সদ্বিবেচনার কাজ নয়, বরং ঐ জাগরণের পরিপোষকরূপে সমাজ-জীবনে সহযোগিতা করতে হয়। সুতরাং নবজাগ্রত মনুষ্যত্ব-বোধের প্রভাবে সরকারও শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে প্রগতিশীল ভারতীয় সংস্কারকগণের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন। হিন্দু সমাজে যুগ-যুগ সঞ্চিত যে কুপ্রথা বিরাজ করছিল তা দূরীকরণের জন্য সরকার উদ্যোগী হলেন। শিশুহত্যা নিবারণের জন্য ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দের Regulation XXI অনুসারে বাঙলায় এবং ১৮০২ খ্রীস্টাব্দের Regulation VI অনুসারে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। ধর্মের নামে বহু নারীকে স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হতো। না্রীকে এই আত্মাহুতিতে প্রেরণা যোগাত স্বার্থপর কুচক্রী আত্মীয়-বর্গ। বৃটিশ রাজত্বের প্রথম থেকেই এই কুপ্রথা সম্পর্কে সরকার কর্মচারীদের কাছ থেকে নানাপ্রকার অভিযোগ শুনেছিলেন। ১৮১২, ১৮১৫ এবং ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দের আইনের দ্বারা এই প্রথার উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এই আইন প্রবর্তনের পর অবশ্য সতীদাহ-প্রথা সম্পূর্ণ নিবারিত হয় নি। সরকার এই প্রথা সম্পূর্ণ দূর করবার জন্য ধীরজাগ্রত দেশীয় চেতনার উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। রাজা রামমোহনের চেষ্টাতে অচিরেই সেই চেতনার উদ্বোধন হয়। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে বেণ্টিক Regulation XVII অনুযায়ী সতীদাহ-প্রথা রোধ করেন। এই আইনের প্রতিবাদ হয়েছিল কিন্তু রামমোহনের প্রাণপণ চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত তা নিষ্ফল হয়। লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে ভারতীয় রাজ্যগুলিতে এই প্রথা রহিত করা হয়।

সরকারী সহযোগিতা

শিশুহত্যা; সতীদাহ

ঠগীদমন বেণ্টিঙ্কের আমলের একটি স্মরণীয় ঘটনা। ঠগীরা নির্বিরোধ নিরীহ পথচারীদের শ্বাসরোধ করে হত্যা করত। সারা ভারতব্যাপী এই ঠগীদের অত্যাচার চলত। ১৮৩১-৩৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে উইলিয়াম শ্লীম্যান ও অন্যান্য ইংরাজ কর্মচারীদের সহায়তায় সরকার ঠগীদের উৎসাদিত করেন।

ঠগীদমন

আরও একটি স্মরণীয় আইন হল ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে দাসত্ব-প্রথা-নিবারক 'Act V'. দাসত্ব এদেশের খুব প্রাচীন প্রথা এবং ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দেও বহু লক্ষ দাস এই ভারতবর্ষেই ছিল। কিন্তু এই আইন প্রবর্তনের ফলে কোনও দিক থেকে কোনও প্রতিবাদ শোনা গেল না। এটি উদার ইংরাজীশিক্ষিত দেশের উচ্চ নীতিবোধের প্রমাণ। এ ছাড়া বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলতে থাকে এবং শেষকালে পুরাতনপন্থীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগরের কার্যকরী সহযোগিতায় 'বিধবা বিবাহ আইন' পাস হয়। ওড়িশার খণ্ডজাতি ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নরবলি দিত, তা হার্ডিঞ্জের আমলেই রহিত হয়।

দাসপ্রথা, বিধবা বিবাহ আইন, নরবলি প্রথা

ঊনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজে ও ধর্মে যে সমস্ত পরিবর্তন হচ্ছিল তার

মূলে ছিল কয়েকটি স্মরণীয় চরিত্র ও কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের আন্তরিক প্রয়াস ও আদর্শনিষ্ঠা। রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত আত্মীয় সভা (১৮১৫) এবং ব্রাহ্ম সভা (১৮২৮) ব্রাহ্ম সমাজে পরিণত হয়ে হিন্দুসমাজে নানাভাবে যুগোপযোগী পরিবর্তন এনেছিল। বাঙলা তথা ভারতের নবজাগরণে ব্রাহ্মসমাজ অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। নবাগত খৃস্টধর্মের বন্যা থেকে হিন্দু-সমাজকে রক্ষা করে সমাজের মধ্যেই প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের যুক্তিবাদী বিচার ও ব্যাখ্যায় তিনি এক উদার একেশ্বর মতবাদ স্থাপন করলেন। নানাভাবে স্ত্রীস্বাধীনতা, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার, সতীদাহ নিবারণ করে হিন্দুধর্মের অচলায়তনের প্রাকার ভেঙে দিল ব্রাহ্মসমাজ। ইংরাজী শিক্ষা ও সাহিত্যের সর্ববিধ স্বাধীন প্রচেষ্টায় তিনিই নবভারতের যুগপ্রবর্তক। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বিলাতে সুপ্রীম কোর্টে তাঁর যুক্তিপূর্ণ আবেদন, কেবল খৃস্টানদের জন্যই 'জুরি আইন' প্রয়োগের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ, কৃষকদের দুর্দশা সম্পর্কে পার্লামেণ্টে স্মারকলিপি প্রেরণ, আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও সহানুভূতি, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা আর বাঙলা ভাষায় ব্যাকরণ প্রকাশ ও গদ্য রীতির প্রবর্তন, এ সবই তাঁর মহত্ত্বের ও মননশক্তির পরিচায়ক।

ব্রাহ্মসমাজ

রামমোহনের অবদান

বাঙলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন আলোচিত হলো। এখন **মহারাষ্ট্রের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের** কথা বলা যাক।

নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি; ইংরাজী শিক্ষার প্রসার

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের পর ইংরেজরা বোম্বাই অধিকার করে এবং সেখানে ইংরাজী শিক্ষা প্রচলনে সচেষ্ট হয়। এলফিনস্টোন দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তার করার জন্য বোম্বাইতে 'নেটিভ এডুকেশন সোসাইটি' গঠন করেন। এই সোসাইটির অধীনস্থ বহু সংখ্যক স্কুলের কাজকর্ম পরিদর্শনের জন্য একটি শিক্ষা পর্যদ গঠন করা হয়। পর্যদের সভাপতি প্যারী সাহেবের প্রচেষ্টায় বোম্বাইয়ে ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রসারের নীতি গ্রহণ করা হয়। এরপর ধীরে ধীরে মিশনারীদের প্রচেষ্টাতে মহারাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র বহু স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে উড সাহেবের সুপারিশ অনুযায়ী বোম্বাইতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র একটি বিভাগও গঠন করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বাঙলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। মহারাষ্ট্রেও এই আন্দোলন প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার মহারাষ্ট্রের এই আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল। এই আন্দোলনে পুরোভাগে ছিল 'পরমহংসমণ্ডলী'। একেশ্বরবাদের আদর্শে গঠিত এই প্রতিষ্ঠান ১৮৪৯ খ্রীস্টাব্দে

বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, পরমহংস মণ্ডলী

স্টুডেণ্ট্স্ লিটারি এণ্ড সায়েন্টিফিক সোসাইটি

মহারাষ্ট্রে সমাজের বর্ণভেদ প্রথার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন শুরু করেছিল। এছাড়া এই সময় 'স্টুডেন্টস্ লিটারারি এণ্ড সায়েন্টিফিক সোসাইটি' সমকালীন সমাজ ও বিজ্ঞান চর্চায় ছাত্রদের উৎসাহিত করে। এই সোসাইটির সদস্য জ্যোতিবা ফুলে ও তাঁর স্ত্রী, স্ত্রী-শিক্ষা প্রসারের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। মহারাষ্ট্রে বিধবা-বিবাহ আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন জ্যোতিবা ফুলে। এছাড়া ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিতের প্রচেষ্টায় 'উইডো রিম্যারেজ এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে স্থাপিত 'প্রার্থণা সমাজ' মহারাষ্ট্রের সামাজিক আন্দোলনের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। মহাদেব গোবিন্দ রানাডের সফল নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠান অল্পকালের মধ্যে পশ্চিম ভারতে সামাজিক জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটায়।

জ্যোতিবা ফুলে, বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত, প্রার্থনা সমাজ

[নয়] কৃষক অসন্তোষ ও কৃষক অভ্যুত্থান

ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে দেওয়ানী লাভ করার পর ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপনের চেষ্টা শুরু করে। ক্লাইভ, হেস্টিংস ও কর্নওয়ালিস, তিনজনে ইংরেজ প্রভুত্ব স্থাপন করলেন। তারপর অনেক বড় লাট এলেন—লর্ড ওয়েলেসলি, লর্ড হেস্টিংস ইত্যাদি। সকলেরই চেষ্টা, ভারতে কিভাবে ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার করা যায়, এ দেশের শিল্প বাণিজ্যকে বাড়তে না দিয়ে নিজেদের স্বার্থ লাভ করা যায়। ভূমি বন্দোবস্তের ক্ষেত্রেও তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল, কিভাবে অধিক রাজস্ব আদায় করা যায়। তাঁরা মহারাষ্ট্র, মহীশূর প্রভৃতি রাজ্যগুলিকে অনেক যুদ্ধ করে পরাস্ত করেছেন, কখনও সন্ধি কখনও ফন্দি করে দেশী রাজ্যগুলিকে ইংরেজের আশ্রিত বা অধীন করেছেন। আর সাধারণ মানুষ, রায়ত ও শ্রমিকদের দুরবস্থা দিনের পর দিন বাড়তে থাকে। সুতরাং উন্নতির বদলে যেখানে ক্রমেই অবনতি হচ্ছে সব দিক দিয়ে সেখানে সুখে শান্তিতে থাকা অসম্ভব। মানুষের মনে একটা আক্রোশ জাগবেই। তাই অনেক বছর ধরে জমে-ওঠা অসন্তোষ প্রকাশ পেতে লাগল বিশেষ করে বাঙলা দেশে—যেখানে ইংরেজ প্রভুত্বের ঘাঁটি। নানা জায়গায় হিন্দু মুসলমান কৃষক প্রজারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। অর্থনৈতিক শোষণ ছাড়া ধর্মীয় হস্তক্ষেপের কারণেও তারা ব্রিটিশ বিরোধী হয়ে পড়ে। এই বিদ্রোহগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায়—(১) কৃষক বিদ্রোহ এবং (২) উপজাতি বিদ্রোহ।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদ

জনসাধারণের স্বার্থ উপেক্ষিত

কৃষক বিদ্রোহ ও উপজাতি বিদ্রোহ

কৃষক বিদ্রোহ ঃ ফরাজী আন্দোলন ঃ ফরিদপুরের বাহাদুরপুর গ্রামের অধিবাসী শরিয়ৎউল্লা ও তাঁর পুত্র দুদুমিঞা ফরাজী ধর্মমতের প্রবর্তক ছিলেন। এই ধর্মমতের অনুগামীরা নিজেদের 'ফরাজ' অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ অনুসরণকারী বলে প্রচার করে।

ফরাজ

শরিয়ৎউল্লা মাত্র ১৮ বছর বয়সে মক্কায় গিয়েছিলেন এবং সেখানে ২০ বছর বসবাস করেছিলেন। এই সময়ে তিনি ওয়াহাবী আদর্শে দীক্ষিত হয়েছিলেন। শরিয়ৎউল্লা ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে মক্কা থেকে ফিরে আসেন এবং মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। ব্রিটিশ শাসনাধীন বাঙলাকে তিনি 'দার-উল-হার্ব' অর্থাৎ শত্রুর দেশ রূপে চিহ্নিত করেন এবং এই কারণে তিনি মনে করতেন এদেশে ইসলামীয় আচরণবিধি পালন করার অনুকূল পরিবেশ নেই। তিনি আরও মনে করতেন যে এদেশে মুসলমানরা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা ও অধিকার থেকে বঞ্চিত। কাজেই পরবর্তীকালের ওয়াহাবী আন্দোলনের মতো ফরাজী আন্দোলনও রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা দ্বারা প্রেরণা লাভ করেছিল।

শরিয়ৎউল্লা

রাজনৈতিক চেতনা

আদর্শবাদী জীবনযাত্রার জন্য শরিয়ৎ উল্লা অনেকেরই শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন এবং শীঘ্রই তাঁর সহানুভূতিতে আকৃষ্ট হয়ে বহু কৃষক তাঁর সমর্থকে পরিণত হয়। এদের মধ্যে ছিল জমিদার শ্রেণীর হাতে নিপীড়িত কৃষক, এবং বেকার কারিগর শ্রেণী। শরিয়ৎউল্লা এরূপ প্রায় ১২,০০০ কৃষক ও কারিগর নিয়ে একটি সামরিক ধাঁচের দল গড়ে তুলেন। অবশ্য তাঁর জীবদ্দশায় ইংরেজদের সঙ্গে তার কোন সরাসরি সংঘর্ষ হয় নি।

শরিয়ৎ উল্লার কৃষক সংগঠন

শরিয়ৎউল্লার পুত্র মুহম্মদ মুশীন দুদুমিঞা নামে অধিক পরিচিত। তাঁর নেতৃত্বে ফরাজী আন্দোলন আরও বেশি রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে। তাঁর সাংগঠনিক প্রতিভা ছিল অসাধারণ। বাহাদুরপুরকে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত করে তিনি পূর্ববঙ্গকে কতকগুলি 'হলকা' বা বিভাগে পরিণত করেন। তিনি প্রতি বিভাগে একজন করে সহকারী বা 'খলিফা' নিযুক্ত করেন। খলিফাদের কাজ ছিল সংশ্লিষ্ট বিভাগের ফরাজী সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ রাখা এবং নতুন নতুন অনুগামীদের ধর্মান্তরিত করা। বারাসত, যশোহর, পাবনা, মালদহ ও ঢাকা জেলা থেকে দান সংগ্রহ করাও খলিফাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত ছিল। দুদুমিঞার উদ্দেশ্য ছিল জমিদার শ্রেণীর নিপীড়ন ও অন্যায়ভাবে অর্থ আদায়ের বিরুদ্ধে কৃষকশ্রেণীকে ঐক্যবদ্ধ করা। এই সময় অনেকের মনে একটা ধারণা জন্মেছিল যে দুদুমিঞা ও ফরাজী সম্প্রদায়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য এদেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়ন এবং

দুদুমিঞার নেতৃত্বে ফরাজী আন্দোলন

মুসলমান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। কোন হিন্দু, মুসলমান বা খ্রীস্টান প্রজা তাকে না জানিয়ে ইংরেজের আদালতে মামলা দায়ের করলে দুদুমিঞার কাছে শাস্তি পেত। তিনি জমিদারদের অবৈধ-ভাবে খাজনা গ্রহণের তীব্র নিন্দা করতেন। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে জমির মালিক ঈশ্বর, কাজেই জমিতে কর ধার্যের অধিকার কারও নেই। এই অবস্থায় জমিদারগণ ও নীলকরগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ এনে আদালতে মামলা করল। কিন্তু দুদুমিঞার ভয়ে আদালতে কেউ সাক্ষ্য দিত না; ফলে আদালত থেকে বরাবর তিনি খালাস পেতেন। তবে জমিদারগণ ক্রমাগত অভিযোগ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৭ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং রাজবন্দী হিসেবে আলিপুর জেলে আটক রাখা হয়। ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে বাহাদুরপুরে তাঁর মৃত্যু হয়।

দুদুমিঞার উদ্দেশ্য

গ্রেপ্তার, মৃত্যু

পূর্ববঙ্গের গ্রামাঞ্চলে স্বাধীন ধর্মরাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টা ফরাজী আন্দোলনকে বৈপ্লবিক চরিত্র দান করেছিল। কিন্তু এই আন্দোলন দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নি। তার কারণ ছিল ফরাজী আন্দোলনের ধর্মীয় সংস্রব, প্রকৃত রাজনৈতিক বোধ ও উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাব।

ব্যর্থতার কারণ

ওয়াহাবী আন্দোলন ঃ বাঙলার ফরাজী আন্দোলন ছিল পরবর্তী কালের উত্তরপ্রদেশের ওয়াহাবী আন্দোলনের অগ্রদূত। 'ওয়াহাব' শব্দটির অর্থ 'নবজাগরণ'। আঠার শতকের গোড়ার দিকে আরবে আবদুল ওয়াহাব মুসলমানদের কুসংস্কার দূর করে ইসলামকে নবরূপে গড়ার জন্য আন্দোলন করেছিলেন। ভারতের সৈয়দ আহম্মদ মক্কায় তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং পরে ভারতে ফিরে এসে 'ওয়াহাবী' আন্দোলনের সূচনা করেন। আরবের ওয়াহাবী আন্দোলনের চরিত্র ছিল ধর্মীয় আন্দোলন, কিন্তু ভারতে এই আন্দোলনের চরিত্র ছিল রাজনৈতিক। সৈয়দ আহম্মদের জন্ম উত্তরপ্রদেশের রায়বেরিলিতে। ১৮২০-১৮২১ খ্রীস্টাব্দে তিনি আরবের ওয়াহাবীদের মতো ইসলামের সংস্কারের জন্য প্রচার শুরু করেন। তিনি প্রচার করেন যে 'বিশুদ্ধ ইসলাম' থেকে বিচ্যুতি অপরাধ। সৈয়দ আহম্মদ বহু সংখ্যক অনুগামী নিয়ে একটি শক্তিশালী সংগঠন গড়ে তোলেন। ধীরে ধীরে এই আন্দোলন রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করে। তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ ঘোষণার আহ্বান জানিয়ে প্রচার পত্র বিলি করেন এবং তাঁর অনুগামীদের সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলেন। তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র হল উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সিতানাতে। শিখরা মুসল-মানদের পবিত্র স্থান অপবিত্র করেছে, এই অজুহাতে তিনি শিখদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এর চার বছর বাদে যুদ্ধে তিনি নিহত হন। সৈয়দ

আরবদেশের আবদুল ওয়াহাব

সৈয়দ আহম্মদ

সংগঠন ও প্রচার

আহম্মদের লক্ষ্য ছিল পাঞ্জাব থেকে শিখদের এবং বাঙলা দেশ থেকে ইংরেজদের বিতাড়িত করা এবং মুসলমান শাসন কায়েম করা। যাই হোক, এরপর ওয়াহাবীগণ ইংরেজদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অভিযান চালাতে থাকে।

মৃত্যু

পশ্চিমবঙ্গে বারাসতের কাছে চাঁদপুরের মীর নিসার আলী বা তীতু মীরের নেতৃত্বে ওয়াহাবী আন্দোলন পরিচালিত হয়। তীতু ছিলেন সৈয়দ আহম্মদের শিষ্য। তিনি এদেশে মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাঁর অনুগামীদের মধ্যে ছিল মুসলমান তাঁতি ও অন্যান্য নিম্নবর্ণের মানুষ। তীতু জমিদার শ্রেণীর বিরুদ্ধে কার্যকলাপ শুরু করেছিলেন। কৃষ্ণ রায় নামক স্থানীয় এক জমিদার তাঁর ওয়াহাবী মতাবলম্বী প্রজাদের উপর কর ধার্য করলে ওয়াহাবীগণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন। জমিদারদের কর্মচারীরা সরফরাজপুর গ্রামে কর আদায় করতে গেলে তীতুর অনুগামীরা বাধা দেয় এবং তাদের প্রহার করে। তারা ফিরে আসতে বাধ্য হয় (জুলাই, ১৮৩১ খ্রীঃ)। এই সাফল্যে তীতু আরো অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। তিনি ২৪ পরগনা জেলার নারকেল বেড়িয়া গ্রামে তাঁর প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন এবং 'বাঁশের কেল্লা' বানিয়ে সুরক্ষিত করেন। এরপর পাঁচশ' অনুগামী সহ তিনি ঐ জমিদারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেন, এরপর ওয়াহাবীরা ঘোষণা করে যে ব্রিটিশ রাজের অবসান হয়েছে এবং মুসলমান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওয়াহাবীরা বিভিন্ন গ্রামে লুঠতরাজ চালায় এছাড়া নদীয়া, ২৪-পরগনা ও ফরিদপুর জেলাতেও ওয়াহাবীরা সক্রিয় হয়েছিল। তীতুর এই অভিযানের সংবাদে কলকাতার ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এক সৈন্য বাহিনী নারকেল বেড়িয়ায় প্রেরণ করে। কিন্তু তীতুকে দমন করতে ব্যর্থ হয়। অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ এরপর একটি বড় সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে। তীতু ও তাঁর সহযোগীরা বাঁশের কেল্লার ভেতরে থেকে তীব্র লড়াই চালিয়েছিল। কিন্তু সুশিক্ষিত ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে তীতু এঁটে উঠতে পারলেন না। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি নিহত হলেন।

বাঙলায় ওয়াহাবী আন্দোলন ও তীতু মীর

জমিদার কৃষ্ণরায়ের সঙ্গে সংঘর্ষ

নারকেল বেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা

তীতুর বিরুদ্ধে ইংরেজ বাহিনী প্রেরণ

ওয়াহাবী আন্দোলন মূলতঃ বাঙলা, বিহার, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং মাদ্রাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর প্রভাব কিছু পরিমাণে দাক্ষিণাত্যেও পড়েছিল। ইংরেজ সরকারের দমন-নীতির ফলে ওয়াহাবী আন্দোলন ধীরে ধীরে স্তব্ধ হয়ে যায়। ভারতে ইংরেজ শক্তির বিরুদ্ধে মুসলমান সমাজের এই আন্দোলন এক অতুলনীয় ঐক্যবোধের জন্ম দিয়েছিল। এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার ও মহাজনশ্রেণীর বিরুদ্ধে আপসহীন প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল।

তাৎপর্য

ওয়াহাবী আন্দোলন ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন রূপে শুরু হলেও পরবর্তীকালে রাজনৈতিক চরিত্র অর্জন করেছিল। কিন্তু এর মূল লক্ষ্য ছিল ইংরেজের অর্থনৈতিক নীতিতে যে অত্যাচার, নিপীড়ন ও শোষণের ব্যবস্থা ছিল তার অবসান ঘটানো।

উপজাতি আন্দোলন

ব্রিটিশ শাসনের পূর্বে কোলদের অবস্থা

কোল বিদ্রোহ ঃ ১৮৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দের কোল বিদ্রোহ ছিল ইংরেজ কর্তৃক উপজাতিগুলির স্বাধীনতা ও অধিকার হরণের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে এক বলিষ্ঠ প্রতিরোধ। ইংরেজ শাসনের পূর্বে এই উপজাতিগুলির নিজস্ব আইন ছিল, নিজস্ব শাসনব্যবস্থা ছিল, আর ছিল জমির উপর আবহমান কালের অধিকার।

সিংভূমের রাজার প্রতিরোধ

কোলদের একটি শাখা ছিল সিংভূমের 'হো' সম্প্রদায়। তাঁরা দাবী করত যে তাদের নেতারা বাহান্ন পুরুষ ধরে স্বাধীনতা ভোগ করে আসছে। সিংভূমের রাজা (বা পোড়াহাটের রাজা) তাঁর রাজ্যে ইংরেজদের অনুপ্রবেশের সমস্ত প্রচেষ্টা প্রতিহত করেছিলেন; তাঁর 'হো' প্রজাবৃন্দ পরম আগ্রহে সীমান্ত পাহারা দিত এবং কোন অপরিচিত ব্যক্তিকে রাজ্যের ভেতরে ঢুকতে দিত না। কিন্তু সিংভূমের রাজাও ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে বশ্যতা স্বীকার করলেন।

১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের কোলবিদ্রোহ

কিন্তু উপজাতি নয় এরূপ বহিরাগত বসবাসকারীদের কার্যকলাপে কোলদের ভূমি সংক্রান্ত অসন্তোষ বৃদ্ধি পেল। সেই সঙ্গে ইংরেজ প্রবর্তিত নতুন ভূস্বামী-প্রজা সম্পর্ক ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে আর একটি বিদ্রোহের জন্ম দিল। বর্তমান রাঁচী জেলার প্রায় সর্বত্র কোলবিদ্রোহ দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়ল এবং তারপর হাজারিবাগে, পালামৌ-এর তোরি পরগনায় এবং মানভূমের পশ্চিম অংশেও বিদ্রোহ দেখা দিল। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের গ্রামগুলি লুণ্ঠিত হল এবং বহিরাগত বসবাসকারীদের হত্যা করা হল। তাদের আক্রোশ সরাসরি ফেটে পড়ল বিশেষ করে বিদেশী বসবাসকারীদের উপর এবং দেখা গেল প্রায় ৮০০ থেকে ১০০০ জনকে হত্যা করা হয়েছে অথবা বাড়ির মধ্যে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ১৮৩২ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দমন করা হয়।

বিদ্রোহীদের তাণ্ডব

বিদ্রোহের অবসান

কারণ

সাঁওতাল বিদ্রোহ ঃ সাঁওতালরা এক অত্যন্ত পরিশ্রমী আদিম উপজাতি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের পর এদের একটি দল জমিদারদের অত্যধিক খাজনার চাপে পূর্বপুরুষদের বাসভূমি পরিত্যাগ করে রাজমহল পাহাড়ের নিকটবর্তী সমতলভূমিতে চলে আসতে বাধ্য হয়। এখানে এসে তারা অত্যন্ত পরিশ্রম করে জঙ্গল কেটে বসতি স্থাপন করে।

কিন্তু বাঙলা, বিহার এবং উত্তর ভারতের মহাজন ও বণিকশ্রেণী তাদের উপর নির্যাতন শুরু করে। তারা অত্যন্ত চড়া সুদে সাঁওতালদের টাকা ধার দিত এবং অন্যায়ভাবে দশগুণ আদায় করত। এছাড়া পুলিশ ও রাজস্ব কর্মচারীরাও তাদের কাছ থেকে অবৈধ ভাবে টাকা আদায় করত। জমিদারগণ তাদের জমি অধিকার করে নিত এবং তারা ইংরেজদের হাতেও চরম অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করত। বিশেষ করে 'সাহিব লোকের' হাতে তাদের মহিলাদের অসম্মান সাঁওতালদের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ করে তুলেছিল। এই সব কারণে ১৮৫৫-৫৬ খ্রীস্টাব্দে এই অঞ্চলে সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয়। তারা প্রকাশ্যে ব্রিটিশ শাসন অস্বীকার করে।

সাঁওতালদের উপর অত্যাচার ও শোষণ

প্রধানতঃ অর্থনৈতিক কারণেই সাঁওতাল বিদ্রোহ দেখা দেয় এবং বিদ্রোহের শুরুতে এদের মধ্যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব ছিল না। সাঁওতালদের প্রধান আক্রোশ ছিল বাঙলা ও উত্তর ভারতের 'ভদ্রলোক'দের উপর। এই 'ভদ্রলোকেরা' দলে দলে তাদের অঞ্চলে ঢুকে পড়ে এবং তাদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে নির্মমভাবে শোষণ শুরু করে। সাঁওতালরা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে তখনই রুখে দাঁড়াল, যখন তারা দেখল যে অবিচারের প্রতিকার না করে বরং নির্যাতনকারীদের রক্ষা করার ব্যাপারেই ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরা বেশি আগ্রহী। কয়েকজন সাঁওতাল রাত্রে মহাজনদের বাড়িতে আক্রমণ চালালে তাদের বিচার হয় এবং শাস্তি দেওয়া হয়। কিন্তু নির্যাতনকারী মহাজনদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেওয়া হল না। এই ঘটনায় সাঁওতালরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে পড়ে। তারা বেশ বুঝতে পারে যে ইংরেজ সরকার তাদের এই নির্যাতনের কোন প্রতিকার করবে না।

সাঁওতালদের প্রথম ও প্রধান শত্রু

সাঁওতাল বিদ্রোহের সূত্রপাত

১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে সিধু ও কানহু-এই দু'ভাইয়ের নেতৃত্বে দশ-হাজার সাঁওতাল মিলিত হয় এবং 'দেশ অধিকার' ও নিজেদের 'শাসন প্রতিষ্ঠার' কথা ঘোষণা করে। এর ঠিক পরেই বিক্ষিপ্তভাবে তাদের লুঠতরাজ শুরু হয়ে যায়। ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে সাঁওতাল বিদ্রোহ ভয়াবহ আকার ধারণ করে। দশহাজার সাঁওতালের এক একটি দল বিভিন্ন অঞ্চলে সমবেত হয়। তারপর তারা ভাগলপুর এবং রাজমহলের মধ্যে ডাক ও রেলযোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেয়। এইভাবে সমস্ত অঞ্চলটির উপর সাঁওতালরা তাদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্থাপন করে। তারা ঘোষণা করে যে কোম্পানির শাসনের অবসান হয়েছে এবং তাদের 'সুবা'র রাজত্ব শুরু হয়েছে। এরপর তারা কুঠার ও বিষমাখা তীর নিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে অসংখ্য গ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে। প্রতিটি য়ুরোপীয় বাংলো আক্রান্ত হয়, সাঁওতালরা ইংরেজ নীলকর

বিদ্রোহের বিস্তার ও ভয়াবহতা

বিদ্রোহের তাণ্ডব-লীলা

ও রেলকর্মচারীদের হত্যা করতে থাকে। দেশীয় পুলিশ কর্মচারী, ব্যবসায়ী এবং তাদের স্ত্রী ও পুত্র-কন্যারাও তাদের হাতে নিহত হয়। এমনকি বীরভূম, রাজমহল এবং ভাগলপুর জেলার বড় বড় য়ুরোপীয় বসতিগুলির উপরও তারা পতঙ্গের মত দলে দলে ঝাঁপিয়ে পড়ে।

ঘটনার আকস্মিকতায় ইংরেজ কর্তৃপক্ষ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বিদ্রোহ দমনের জন্য সৈন্য পাঠানো হল ; কিন্তু দু'একটি বিচ্ছিন্ন ঘাঁটি দখল করা ছাড়া ইংরেজ সৈন্য বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারল না। বন্দুক-ধারী ইংরেজ সৈন্য দেখে সাঁওতালরা পার্শ্ববর্তী ঘন জঙ্গলে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করল। এখানে লুকিয়ে থেকে মাঝে মাঝে লুঠতরাজ ও আক্রমণ চালাতে তাদের কোন অসুবিধা হল না। কিছু সিপাহী যোদ্ধা সাঁওতালদের ভয়ে পিছু হঠে এল। মেজর বরোর নেতৃত্ব একটি ইংরেজ সৈন্যের দল সাঁওতালদের কাছে পরাজিত হল। কাজেই পরিস্থিতি বেশ সংকটজনক হয়ে দাঁড়াল। এই অবস্থায় উপদ্রুত জেলাগুলি সামরিক বাহিনীর দায়িত্বে ছেড়ে দেওয়া হল এবং সাঁওতাল বিদ্রোহ দমনের জন্য সামরিক অভিযানের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু ১৮৫৫ খ্রীস্টাব্দের আগস্ট মাসেও বিদ্রোহীদের সংখ্যা ত্রিশ হাজারেরও বেশি ছিল। বিদ্রোহীদের পক্ষ থেকে আত্মসমর্পণের কোন আভাস পাওয়া গেল না এবং ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সাঁওতালরা ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে সমানে লড়াই চালিয়ে গেল। তাহলে দেখা যায় সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত আগেও সাঁওতাল বিদ্রোহ সক্রিয় ছিল। এই সময়ে সাঁওতাল বিদ্রোহের নেতারা ইংরেজ সৈন্যের হাতে ধরা পড়ে গেল। বিদ্রোহীরা পরাজিত হওয়ার পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাঁওতালদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালিয়েছিল।

বিদ্রোহদমনে ইংরেজদের প্রাথমিক ব্যর্থতা

সামরিক অভিযান প্রেরণ

সাঁওতালদের প্রতিরোধ

পরাজয়

[দশ] ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের বিদ্রোহ

বিদ্রোহের কারণ : ডালহৌসির রাজ্যবৃদ্ধি আর নানাবিধ আইন ও সংস্কারের ফলে এদেশের লোকের মনে যথেষ্ট অসন্তোষ ও সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। পরবর্তী লাট ক্যানিং এর সময়ে ভারতে ভয়ঙ্কর গোলযোগ অচিরেই সমস্ত উত্তর ভারতে ছড়িয়ে গিয়ে মহাবিদ্রোহের আকার ধারণ করল। এই সময়ে পুরনো বন্দুকের বদলে নতুন **এনফিল্ড রাইফেল** ব্যবহারে দেশী সিপাহীদের মধ্যে দারুণ বিক্ষোভ সৃষ্টি হল। নতুন বন্দুকের টোটাগুলিতে চর্বি মাখানো থাকত এবং বন্দুকে পুরে নেওয়ার আগে টোটার একটি অংশ দাঁত দিয়ে কেটে ফেলতে হত। হিন্দু মুসলমান সকল

ডালহৌসির দায়িত্ব, এনফিল্ড রাইফেল

শ্রেণীর সিপাহীদের মধ্যে খবর প্রচারিত হল, ঐ চর্বি গরু ও শূকরের। জাতিনাশ ও ধর্মহানির ভয়ে সিপাহীরা শঙ্কিত হয়ে উঠল। এই টোটা প্রচলনকেই বিদ্রোহের প্রকৃত কারণ বলা হয়। কিন্তু এটি উপলক্ষ মাত্র, প্রকৃত কারণগুলি নেপথ্যে সঞ্চিত হচ্ছিল। বিক্ষোভের আসল কারণগুলি ডালহৌসির আমলেই তৈরি হয়। তিনি যে নীতি অনুসরণ করে রাজ্যগ্রাস করতে থাকেন, তাতে রাজচ্যুত ব্যক্তিদের আক্রোশ আর আশ্রিত রাজাদের আশঙ্কা মিলিত হল। উৎখাত ও দাবীহীন দেশী রাজারা ইংরেজ শাসনের ঘোর বিরোধী হয়ে উঠলেন। তাঁদের সৈনিক ও কর্মচারীরাও কর্মচ্যুত ও পদচ্যুত হল। সুতরাং ডালহৌসির কার্যকলাপ ভারতীয় বিদ্রোহের জন্য আংশিক ভাবে দায়ী।

জাতিনাশ ও ধর্মহানির ভয়, স্বত্ববিলোপ নীতি

শুধু হিন্দু নয়, মুসলমানদের মধ্যেও অনেকে দিল্লীর বাদশাহের প্রতি অমর্যাদা এবং অযোধ্যার নবাবের রাজ্য দখল ও বিতাড়ন দেখে খুব আহত হলেন। সুতরাং হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই অসন্তুষ্ট হতে লাগল। আবার জমিদারী বিষয়ে, রাজস্ব আদায়ের নতুন ব্যবস্থা চালু হওয়াতে অযোধ্যার জমিদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। এই সব কারণে ইংরেজ-বিদ্বেষ ক্রমেই ঘনীভূত হল। সাধারণ লোকের মনেও শাসন ও সমাজ-সংস্কারের নতুন আইনগুলি ঘোর সন্দেহ সৃষ্টি করল। সাধারণ মানুষ ভাবল, প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করে তারা এ দেশের প্রজাদের খ্রীস্টান করতে উৎসুক। নইলে দেশী খ্রীস্টানরা যাতে সম্পত্তিলাভের অধিকার পায়, তার জন্য আইন তৈরি করা হল কেন। খ্রীস্টান পাদরিদের তৎপরতাও লোকের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে লাগল।

দিল্লীর বাদশাহের প্রতি অমর্যাদা, অযোধ্যা দখল

নতুন আইনগুলির প্রতি সাধারণ মানুষের সন্দেহ, খ্রীস্টান পাদরিদের তৎপরতা

সৈন্যদলে দেশী সিপাহীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বিদ্বেষভাব জাগল। সিপাহীরা দেখল, গোরা সৈন্য সংখ্যায় তাদের চেয়ে অনেক কম। যুদ্ধবিগ্রহে তারাই বেশি কষ্ট করে, অথচ কোম্পানি তাদের মাহিনা বৃদ্ধির কোনও ব্যবস্থা করেন নি। এর উপর সিপাহীদের জাতি ও ধর্মনাশের আশঙ্কা বাড়ল। অধিকাংশ সিপাহী হিন্দু, তারা নিষিদ্ধ 'কালাপানি' পার হয়ে যুদ্ধের প্রয়োজনে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের বাইরে বিদেশে যেতে ঘোর আপত্তি জানায়। সিপাহীদের বোঝানো হল বিদ্রোহের এই সুযোগ নষ্ট করা উচিত নয়। রটনা করা হল, পলাশী যুদ্ধের পর একশ' বছর পরেই ভারতে ইংরেজ রাজত্ব শেষ হবে, তা নিশ্চিত। এই সময়ে ভারতে গোরা সৈন্য ছিল খুব কম, ইংরেজদের ভারত থেকে তাড়ানোর এই হল সুবর্ণ সুযোগ।

সিপাহীদের কম মাহিনা

সূচনা ও প্রসারঃ ২৩শে জানুয়ারি ১৮৫৭ সাল। দমদমে সিপাহীরা নতুন বন্দুকের টোটা ব্যবহার করতে সরাসরি অসম্মতি জানাল। দু মাস পরে

ব্যারাকপুরে এক সিপাহী মঙ্গল পাণ্ডে এক উচ্চপদস্থ ইংরেজকে কুচকাওয়াজের মাঠে হত্যা করতে গেলে অন্য সিপাহীরা দাঁড়িয়ে রইল। মঙ্গল পাণ্ডেকে গ্রেফতার করে ফাঁসি দেওয়া হলে ব্যারাকপুরে অগ্নিকাণ্ড শুরু হল। তখন যে সব অবাধ্য সিপাহী চাকরি থেকে বরখাস্ত হল, তারা নিজ নিজ দেশে ফিরে গিয়ে বিদ্রোহ প্রচার করতে থাকে। এর পরে ১০ই মে মীরাটে বিদ্রোহী সৈন্যরা ক্ষিপ্ত হয়ে নিজেদের কয়েক জন বন্দী নেতাকে মুক্ত করে নেয় এবং ইংরেজদের সেনাবাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। কয়েকজন ইংরেজকে তারা হত্যা করে। পরদিন তারা দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলে অন্যান্য সিপাহীদল তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। তারপর দিল্লীতে প্রবেশ করে প্রথমে তারা শেষ মুঘল বংশধর বাহাদুর শাহকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে এবং বিদ্রোহে নেতৃত্ব করার জন্য আহ্বান জানায়। ইতিমধ্যে দিল্লী শহর লুঠ হল এবং সিপাহীদের হাতে অনেক ইংরেজ প্রাণ হারালেন।

মঙ্গল পাণ্ডের ফাঁসি, ব্যারাকপুরে অগ্নিকাণ্ড, মীরাটে বিদ্রোহ

দিল্লী শহর লুঠ, বহু ইংরেজের প্রাণনাশ

ক্রমেই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ল বড় বড় নগরে এবং সিপাহীদের ছাউনিগুলিতে। তবে কানপুরে, লক্ষ্ণৌতে বিদ্রোহ সব চেয়ে তীব্র ও ভীষণ হয়ে দেখা দেয়। লক্ষ্ণৌ-এ বিদ্রোহী সিপাহীদের আক্রমণ বুঝতে না পেরে স্যার হেনরি লরেন্স 'রেসিডেন্সি'তে (দূতাবাস) আশ্রয় নিলেন। সিপাহীরা রেসিডেন্সি অবরোধ করে প্রচণ্ড গোলাগুলি বর্ষণ করতে লাগল। ঐ বাড়িটিতে গোলার দাগ এখনও দেখা যায়। অবরুদ্ধ ইংরেজরা তিন মাসকাল প্রাণপণে আত্মরক্ষা করতে লাগলেন, লরেন্স নিহত হলেন। ওদিকে কানপুর দখল করে বিদ্রোহী সিপাহীরা লোমহর্ষক কাণ্ড বাঁধাল। এখানকার নেতৃত্ব করেন নানা সাহেব। ইংরেজরা আত্মসমর্পণ করলে ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষরা এলাহাবাদে চলে যাওয়ার সময়ে সিপাহীরা গুলি চালিয়ে অনেককে মেরে ফেলে। মীরাট, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ ছাড়াও উত্তরভারতে আলিগড়, ফিরোজপুর, এটোয়া, আগ্রা ও গোয়ালিয়রে সিপাহীরা বিদ্রোহ করে। মধ্য ভারতে ও বুন্দেলখণ্ডেও সিপাহীদের বিদ্রোহ ইংরেজদের বিপন্ন করে তোলে। ১৮৫৭ সালে জুন মাসে ঝাঁসীতে সিপাহীরা ক্ষিপ্ত হয়ে ইংরেজ স্ত্রী ও পুরুষদের হত্যা করে। তারা রাজা গঙ্গাধর রাও-এর বিধবা পত্নী লক্ষ্মীবাঈকে রানী বলে ঘোষণা করে। লক্ষীবাঈ এই অঞ্চলে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দেন। অযোধ্যার তালুকদাররা এবং আরা-জগদীশপুরের জমিদার কুনওয়ার সিং বিদ্রোহে যোগ দেন। এই হল সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান ঘটনাবলী।

বিদ্রোহের বিস্তার, কানপুর, লক্ষ্ণৌ

আলিগড়, ফিরোজপুর, এটোয়া, আগ্রা ও গোয়ালিয়রে বিদ্রোহ

মধ্যভারত ও বুন্দেলখণ্ড লক্ষ্মীবাঈ, কুনওয়ার সিং

বিদ্রোহ দমন ঃ এই ভয়াবহ বিদ্রোহের মধ্যে বড়লাট ক্যানিং খুব ধীর স্থির ভাবে বিদ্রোহ দমনের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। হ্যাভলক, ক্যাম্বেল, আউটরাম, হিউ

রোজ প্রমুখ বিচক্ষণ সেনাপতিদের নিয়ে তিনি প্রতিরক্ষায় উদ্যোগী হলেন। সৌভাগ্যক্রমে বোম্বাই ও দক্ষিণ ভারতে বিদ্রোহ ছড়ায়নি এবং কাশ্মীর ও নেপালের রাজা, সিন্ধিয়া, ভূপালের বেগম ও নিজাম ইংরেজদের মিত্র পক্ষে ছিলেন। শিখ সৈন্যরাও ইংরেজদের যথেষ্ট সাহায্য করে। পাঞ্জাবের পাঠান সৈন্যদল ইংরেজদের হয়ে লড়াই করেছিল। কাজেই সেপ্টেম্বর মাস থেকে ইংরেজদের ভাগ্য পরিবর্তন হল। হ্যাভলক কানপুর থেকে নানা সাহেবকে বিতাড়িত করলেন, কিছুকাল পরে ক্যাম্বেল লক্ষ্ণৌ আবার ইংরেজদের দখলে নিয়ে এলেন। তারপর ঝাঁসীও অধিকার করা হল। রানী লক্ষীবাঈ ও তাঁতীয়া টোপী পিছু হঠে গোয়ালিয়র দখল করে নানা সাহেবকে পেশবা বলে ঘোষণা করলেন। তাই দেখে সিন্ধিয়া আগ্রায় পালিয়ে গেলেন। এদিকে ইংরেজ সৈন্য গোয়ালিয়রের দিকে অগ্রসর হল। রানী লক্ষীবাঈ পুরুষের বেশে প্রাণপণে যুদ্ধ করতে করতে যুদ্ধক্ষেত্রেই প্রাণ দিলেন। তাঁর অসীম বীরত্ব ইংরেজদেরও বিস্মিত করেছিল। এই বীর রমণীর অদম্য সাহসের কথা ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। তাঁতিয়া টোপী কিছুদিন পরে ধরা পড়েন, বিচারে তার প্রাণদণ্ড হয়। কিন্তু নানা সাহেবের কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি নেপাল সীমানায় তরাই অঞ্চলে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। দিল্লী অবশ্যই আগে ইংরেজ সৈন্য পুনরুদ্ধার করেছিল। ইংরেজরা প্রথমে দিল্লী শহর ঘেরাও করে রাখেন, তারপর ছয়দিন ধরে যুদ্ধ চালিয়ে মুঘলদের রাজধানী আবার দখল করে নেন। বৃদ্ধ বাহাদুর শাহ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। তাঁকে বন্দী করে রাখা হয়। যুদ্ধকালে হডসন নামে একজন ইংরেজ বাহাদুর শাহের দুই ছেলে ও এক পৌত্রকে বধ করে। বৃদ্ধ বাদশাহ রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন।

নানা সাহেব বিতাড়িত

গোয়ালিয়র দখল, রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্ব

তাঁতিয়া টোপীর প্রাণদণ্ড

বাহাদুর শাহ নির্বাসিত

ব্যর্থতার কারণ : বিদ্রোহ সফল হতে পারল না কেন,, এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, বিদ্রোহীরা দেশের সর্বত্র ও সকল শ্রেণীর কাছ থেকে সাহায্য বা সমর্থন পায় নি। বরং ইংরেজদের পক্ষে ছিলেন অনেক দেশীয় রাজা ও জমিদার। সাধারণ প্রজাবর্গ বিদ্রোহে অংশ গ্রহণ করে নি, শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দল অনেকটা উদাসীন, তার মধ্যে কেউ বা কোম্পানির শাসনে আস্থাবান ছিলেন। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ শাসনে, শিক্ষা ও সমাজ-সংস্কারের ফলে ভারতের উন্নতি হবে ও দেশবাসীরা অগ্রগতির পথে চলবে। অনেকেই তখন বুঝতে পারেন নি, ভারতকে উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং হবে। অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের চেহারা, চরিত্র ও আসল অভিপ্রায় তাঁদের বোধগম্য হয় নি। যাই হোক ইংরেজরা শেষকালে যে জয়ী হন ও বিদ্রোহ দমন করেন তার একটি বড়

বিক্ষিপ্ত চরিত্র, ইংরেজ পক্ষে দেশীয় রাজা ও জমিদারদের সাহায্য ও সমর্থন

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ঔদাসীন্য

কারণ তাঁরা তাড়াতাড়ি সৈন্য সরাতে বা জড়ো করতে পেরেছিলেন। বিদ্রোহীদের মধ্যে উপযুক্ত নেতার অভাবও আর একটি প্রধান কারণ। যাঁরা বিদ্রোহে নেমেছিলেন, তাঁরা ছাড়া ছাড়া ভাবে বিদ্রোহ চালিয়েছিলেন। পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগ, ঐক্যবদ্ধ ভাবে আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্য আগে থেকে পরিকল্পনা করতে পারেন নি। অপর পক্ষে ইংরেজদের অস্ত্রসজ্জা, রণকৌশল ও পরিকল্পনা ছিল অনেক বেশি উন্নত। তাদের দৃঢ়তা ও সংগঠন ক্ষমতার সামনে বিদ্রোহীরা দাঁড়াতে পারেন নি।

ইংরেজ পরিচালনার উৎকর্ষ, উপযুক্ত নেতার অভাব, পরিকল্পনার অভাব, ইংরেজদের উন্নত রণকৌশল

বিদ্রোহের প্রকৃতি ঃ সিপাহী বিদ্রোহকে ভারতে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলা হয়। ১৮৫৭ সালে যে বিস্ফোরণ ঘটে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে সেই প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবের কারণগুলি দেখানো হয়েছে। এখন এই বিদ্রোহের প্রকৃতি ও আসল রূপ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। ঐতিহাসিকরাও একমত নন। কেউ বলেন এটি পুরোপুরি সামরিক বিদ্রোহ ; নতুন বন্দুকে টোটার প্রবর্তনই তার প্রত্যক্ষ কারণ। কেউ বলেন, দেশের মধ্যে নানা অসন্তোষের সুযোগ নিয়ে এটি মুসলমানদের ষড়যন্ত্রের ফল। এই ষড়যন্ত্র কিন্তু আগে থেকেই ধূমায়িত হচ্ছিল, যথাসময়ে তা আত্মপ্রকাশ করে এবং বৃহৎ আন্দোলনে পরিণত হয়। কিন্তু এই মতগুলির কোনটিকেই সম্পূর্ণ সত্য বলে গ্রহণ করা চলে না। প্রধানতঃ সিপাহীদের বিদ্রোহ হলেও এই বিদ্রোহ এমন সময়ে এমন অবস্থায় ঘটে, দেশের মধ্যে তখন এত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অসন্তোষ জমে ওঠে যে এই আন্দোলন একটা নতুন রূপ নেয় ও বিশেষত্ব অর্জন করে। অতএব এই বিদ্রোহকে শুধু 'মিউটিনি' বা সামরিক বিক্ষোভ বলা যায় না। যদিও ডঃ মজুমদার একে সামরিক বিক্ষোভ বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ, ভেবে দেখো, যে কোনও বড় বিপ্লব কেবল মিলিটারি বা সামরিক কারণে হয় না। তার পিছনে সিভিল বা বে-সামরিক শ্রেণীদের বিক্ষোভও কাজ করে। ভারতেও তাই হয়েছিল। বিশ পঁচিশ বছর আগে থেকেই দেশের অনেক জায়গায় উৎপীড়িত প্রজাদের বিক্ষোভ আন্দোলনের নমুনা পাওয়া যাচ্ছিল, সে কথা আগে বলা হয়েছে। তার মধ্যে কৃষক ও সাধারণ প্রজাদের আন্দোলনের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। ডঃ শশিভূষণ চৌধুরী তাঁর গ্রন্থে এ কথা ভালো ভাবে দেখিয়েছেন। বিদ্রোহের সময় কোনও কোনও স্থলে জনসাধারণ বিদেশী শাসনের প্রতিরোধে আন্দোলন চালিয়েছিল। বিদ্রোহী এবং আন্দোলনকারী উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল দেশ থেকে বিদেশী শাসনের অপসারণ এবং নষ্ট স্বাধীনতার পুনরুদ্ধার। বাঙলা, বিহার, উত্তর প্রদেশের কয়েক জায়গায় এইরকম ছোট ছোট গণ-আন্দোলনের প্রমাণ আছে।

বিদ্রোহের প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ একমত নন

শুধু 'মিউটিনি' নয়

বাঙলা, বিহার, উত্তর প্রদেশে গণ-আন্দোলন

তাই মোটামুটি বলা যায়, এই বিদ্রোহ একান্তভাবে সামরিক বিদ্রোহ নয়, আবার পুরোপুরি জনগণের আন্দোলনও নয়। যে সব বে-সামরিক আন্দোলন হয়েছিল, তাদের মধ্যে গণ-আন্দোলনের সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কতক অঞ্চলে এটি জমিদার ও সামন্ত রাজাদের বিক্ষোভ, তাঁরা নিজেদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার জন্য বিদ্রোহে যোগ দেন। আবার উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেকগুলি জেলায় সিপাহীদের সঙ্গে সাধারণ অধিবাসীরা বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। এই বিদ্রোহ সারা ভারতে ছড়ায়নি, সে কথা সত্য। কিন্তু বিদ্রোহের মধ্যে সামরিক ও বে-সামরিক দুটি চরিত্রের মিশ্রণ দেখা যায়। উপযুক্ত নেতা, সুনির্দিষ্ট পন্থা, পরিকল্পিত যোজনা থাকলে এ বিদ্রোহ সর্বভারতীয় স্বাধীনতা যুদ্ধ হতে পারত। তবু একে স্বাধীনতা সংগ্রামের ভূমিকা বা প্রথম ধাপ বলে মেনে নিতে বাধা নেই।

উত্তর ও মধ্য ভারতের অনেকগুলি জেলায় সাধারণ মানুষের যোগদান

বিদ্রোহের ফল ও শাসনগত পরিবর্তন ঃ এক ইংরেজ লেখকের মতে '১৮৫৭ সালের' সিপাহী বিদ্রোহের চেয়ে আর কোনও সৌভাগ্যকর ঘটনা ভারতে ইংরেজ প্রাধান্যের ইতিহাসে ঘটে নি। এই মন্তব্যটি আপাতবিরোধী হলেও অনেকাংশে সত্য। সিপাহী বিদ্রোহের ফলে স্বার্থপর বাণিজ্যসর্বস্ব শাসন-ব্যবস্থার স্থলে অপেক্ষাকৃত উদারনৈতিক শাসনের সূচনা হল। ভারতীয় বাহিনীতে অধিকসংখ্যক য়ুরোপীয় কর্মচারী নিযুক্ত হলেন ভবিষ্যতে বিদ্রোহের পুনরাবৃত্তি আশঙ্কায়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় রাজ্যগুলির প্রতি বৃটিশ-দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন হল। নতুন রাজ্যজয়ের পালা শেষ হল, স্বত্বলোপ-নীতিও উঠে গেল এবং দিল্লী সাম্রাজ্যের উচ্ছেদ সাধন হল। এখন থেকে ভারতের স্বাধীনতা-আন্দোলন শান্ত ও নিয়মতান্ত্রিক পথ অবলম্বন করল। কারণ বিদ্রোহের ব্যর্থতা প্রমাণ করল যে, সামরিক বলে ইংরেজ শাসন ধ্বংস করা সম্ভব নয়। কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহের অকৃতকার্যতা ভারতীয় ও বৃটিশ জাতির মধ্যে বিশ্বাস, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার অন্তরায় সৃষ্টি করে।

শাসন নীতির পরিবর্তন

ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক য়ুরোপীয় কর্মচারী, স্বাধীনতা আন্দালনের নূতন পথ, পারস্পরিক সম্প্রীতি হ্রাস

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত ফল কোম্পানির শাসনের অবসান। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা নভেম্বর মহারানীর ঘোষণাপত্রে বৃটিশ পার্লামেণ্ট ভারতের শাসনভার গ্রহণ করল। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন' মহারানী ভিক্টোরিয়ার হস্তে ভারতের দায়িত্ব অর্পণ করল।

অব্যবহিত ফল, নূতন শাসন ব্যবস্থা

শাসনকার্যে ভারতীয়দের অংশ গ্রহণের অধিকার ধীরে ধীরে স্বীকৃত হল। এক কথায় শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের যুগ আরম্ভ হল।

শাসনতান্ত্রিক সংস্কার

পরিশিষ্ট ১

সিলেবাসের বাইরে কিছু অতিরিক্ত প্রসঙ্গ

(ক) **মৌর্য সাম্রাজের পতন :** অশোকের মৃত্যুর পর দ্রুতগতিতে মৌর্য সাম্রাজ্যের দুর্বলতা ও ভাঙন শুরু হল। কারণ হিসেবে অনেকে বলেন, ধর্ম ও প্রচারের দিকে অতিরিক্ত মন দেওয়ার জন্য রাজ্য রক্ষা কঠিন হয়ে পড়ে। কিন্তু শান্তিবাদ ও অহিংসা নীতি অনুসরণ করলেও অশোকের জীবিত কালে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ছিল না। তবে যুদ্ধ বর্জন করাতে তাঁর সুদক্ষ সেনা কিছু অলস ও অকর্মণ্য হয়ে পড়ে, তা অনুমান করা চলে। তার মৃত্যুর পর রাজ্য নিয়ে বংশধরদের মধ্যে ভাগাভাগি ও কলহ শুরু হয়। তাঁর এক ছেলে কাশ্মীরে স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করলেন, আর এক ছেলে মগধ অধিকার করে বসলেন। পর পর সাতজন রাজত্ব করলেন কিন্তু কেউই উপযুক্ত ছিলেন না। ওদিকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশ অমাত্যদের কুশাসনে বিক্ষুব্ধ হতে লাগল। কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেছেন, অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের ফলে ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় খুব অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এবং সেই আক্রোশে তাঁরা বিপ্লব ঘটায়। ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ শেষ মৌর্য রাজা বৃহদ্রথকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে বসেন, এটি তাঁরই প্রমাণ। ব্রাহ্মণদের অসন্তোষ অবশ্যই একটি কারণ, কিন্তু একমাত্র মুখ্য কারণ নয়। অশোক ব্রাহ্মণদের যে অসম্মান করতেন না অপর সম্প্রদায়ের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে শিক্ষা দেন, তাঁর শিলালিপি থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। এসব বিভিন্ন কারণে অশোকের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই বিশাল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে (আনুমানিক খৃঃ পূ ১৮৫)।

(খ) **শুঙ্গ ও কান্ব বংশ :** মৌর্যদের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে বধ করে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ হয়ে ব্রাহ্মণ্য ও সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করেন। প্রসিদ্ধ ব্যাকরণবিদ্ 'মহাভাষ্য' রচয়িতা পতঞ্জলি সম্ভবতঃ তার সমসাময়িক ছিলেন। পুষ্যমিত্র ও তার কয়েকজন বংশধর গ্রীকদের সঙ্গে যুদ্ধ করে শত্রুদের পূর্বদিকে আর অগ্রসর হতে দেন নি। শুঙ্গ বংশ কালে দুর্বল হয়ে পড়লে বাসুদেব কান্ব (খৃঃ পূঃ ৭৩) কান্ব বংশ স্থাপন করেন। মাত্র ৪৫ বছর রাজত্ব করে এই বংশের পতন ঘটে। শুঙ্গ আমলে ভারতীয় স্থাপত্য কলার আরও বিকাশ ও উন্নতি হয়। বিশেষ করে বৌদ্ধ স্থাপত্যের একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন হল সাঁচী স্তুপের দুটি আশ্চর্য তোরণ।

[গ] **মহম্মদ ঘুরি :** (১১৬ পৃষ্ঠায় 'পাঁচ-এর প্রথম অনুচ্ছেদের পর) ঘুরের সুলতান গিয়াসুদ্দিন গজনী রাজ্যকে উচ্ছেদ করলে সমগ্র আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব তাঁর রাজ্যভুক্ত হল।

এরপর গিয়াসুদ্দিনের ভাই মহম্মদ ঘুরী একে একে ভারতের সীমান্ত প্রদেশ ও পশ্চিম পাঞ্জাবের শহরগুলি তাঁর অধিকারে আনলেন। এই সময় কনৌজের গহড়বাল বংশের রাজা জয়চন্দ্র আজমীরের চৌহান রাজা পৃথ্বীরাজকে জব্দ করার জন্য মহম্মদ ঘুরীকে আহ্বান জানালেন। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের প্রথম যুদ্ধে ঘুরী পৃথ্বীরাজের কাছে পরাস্ত হলেন, কিন্তু ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি জয়ী হলেন।' এরপর ঘুরীর সেনাপতি কুতুবুদ্দিন আইবক ঝড়ের মতো হিন্দু রাজ্যগুলি দখল করতে লাগলেন।

পরিশিষ্ট ২

বিভিন্ন রাজবংশ ও প্রধান রাজাদের নাম

(ক) হিন্দু যুগ

উত্তর ভারত

১. **হর্যঙ্ক বংশ ঃ** বিম্বিসার (আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৫৩০), অজাতশত্রু (আঃ ৫০০ খৃঃ পূঃ)

২ **শিশুনাগ বংশ ঃ** শিশুনাগ (দশজন রাজা মোট ১৬৩ বছর)

৩ **নন্দ বংশ ঃ** দুই পুরুষ ১০০ বছর, মহাপদ্ম নন্দ (আঃ খৃঃ পূঃ ৩৫০) ও আটজন রাজা

৪. **মৌর্য বংশ ঃ** (আঃ খৃঃ পূঃ ৩২১-১৮৫) চন্দ্রগুপ্ত, বিম্বিসার, অশোক··· শেষ রাজা বৃহদ্রথ

৫. **সুঙ্গ বংশ ঃ** পুষ্যমিত্র (আঃ খৃঃ পূঃ ১৮৪) ও দশ জন রাজা, মোট ১১২ বছর

৬. **কাণ্ব বংশ ঃ** বাসুদেব, চারজন রাজা, মোট ৪৫ বছর

৭. **শক বংশ ঃ** চস্টন, রুদ্রদামন (১৫০ খৃস্টাব্দ)

৮ **কুশান বংশ ঃ** প্রথম ও দ্বিতীয় কদফিস, কণিষ্ক (৭৮ খৃস্টাব্দ)··· হুবিষ্ক···বাসুদেব

৯. **গুপ্ত বংশ ঃ** (৩২০-৫০০ খৃস্টাব্দ খ্রীঃ) ঃ প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, সমুদ্রগুপ্ত, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, কুমারগুপ্ত, স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত ইত্যাদি

১০. **পুষ্যভুতি বংশ ঃ** প্রভাকরবর্ধন, রাজ্যবর্ধন, হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খৃস্টাব্দ)

১১ **গুর্জর-প্রতিহার বংশ** (আঃ ৮১৬-১০১৮ খৃস্টাব্দ) ঃ বৎসরাজ দ্বিতীয় নাগভট্ট, মিহিরভোজ, মহেন্দ্রপাল ইত্যাদি

১২ **বাঙলার পাল বংশ** (আঃ ৭৫০-১১৫০ খৃস্টাব্দ ঃ গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল···প্রথম মহীপাল, দ্বিতীয় মহীপাল, রামপাল ইত্যাদি

১৩ **সেন বংশ** (আঃ ১০৫০-১২৩০ খৃস্টাব্দ) ঃ বিজয়সেন, বল্লাল সেন লক্ষ্মণ সেন ইত্যাদি

দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারত

১। **অন্ধ্র বা সাতবাহন বংশ ঃ** সিমুক, প্রথম সাতকর্ণি, গৌতমীপুত্র সাতকর্ণি, বশিষ্ঠপুত্র, পুলমায়ী, যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণি ইত্যাদি

২। **বাদামির চালুক্য বংশ ঃ** প্রথম পুলকেশী, কীর্তিবর্মণ, দ্বিতীয় পুলকেশী (আঃ ৬১১-৬৪২ খৃঃ)···দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য

৩। **পল্লব বংশ ঃ** সিংহবিষ্ণু···বিষ্ণুগোপ···প্রথম মহেন্দ্রবর্মণ···নরসিংহ-বর্মণ (৬৪০ খৃস্টাব্দ)

৪। **রাষ্ট্রকুট বংশ** (৭৫৩-৯৭৩ খৃস্টাব্দ) ঃ দন্তিদুর্গ···ধ্রুব···তৃতীয় গোবিন্দ (আঃ ৭৭৪ খৃঃ)

৫। **কল্যাণের চালুক্য বংশ ঃ** প্রথম তৈল…ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য (১০৭৬ খৃঃ) ইত্যাদি

৬। **চোল বংশ ঃ** আদিত্য…রাজরাজ (৯৮৫ খৃঃ) রাজেন্দ্র চোল (১০১২ খৃঃ) … দ্বিতীয় রাজেন্দ্র ইত্যাদি

(খ) তুর্ক-আফগান (পাঠান) যুগ

১। **অলবারি তুর্কী ('দাস') বংশ (১২০৬-৯০ খৃঃ) ঃ** কুতবউদ্দিন… ইলতুত্‌মিস, রাজিয়া, নাসিরুদ্দিন, গিয়াসউদ্দিন বলবন, কায়কোবাদ

২। **খল্‌জী বংশ (১২৯০-১৩২০ খৃঃ) ঃ** জালালউদ্দিন, আলাউদ্দিন, সিহাবুদ্দিন, মুবারক

৩। **তুঘলক বংশ (১৩২০-১৪১৩ খৃঃ) ঃ** গিয়াসুদ্দিন তুঘলক, মহম্মদ তুঘলক, ফিরুজশাহ…মামুদ শাহ

৪। **সৈয়দ বংশ (১৪১৪-১৪৫১ খৃঃ) ঃ** খিজির খাঁ মুবারক…আলাউদ্দিন

৫। **লোদী বংশ (১৪৫১-১৫২৬ খৃঃ) ঃ** বহলুল লোদী, সিকন্দর লোদী ইব্রাহিম লোদী

৬। **স্বাধীন মুসলিম রাজ্য ঃ** সিন্ধু, গুজরাট, খান্দেশ, বহমনি, মালব, জৌনপুর, বাঙলা ও কাশ্মীর রাজ্য

৭। **হিন্দু রাজ্য ঃ** মেবার ও বিভিন্ন রাজপুত রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, ওড়িশা ও বাঙলার ছোট ছোট সামন্ত রাজ্য (বারভুঁইঞা), বিজয়নগর (দক্ষিণ ভারত)

৮। **বহমনি রাজ্য (১৩৪৭-১৫২৬ খৃঃ) ঃ** বহমনি শাহ ফিরুজ শাহ… তৃতীয় মহম্মদ ; পরে পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত—আহম্মদনগর, বেরার, বিদর, বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা

৯। **বিজয়নগর রাজ্য (১৩৩৬-১৬০০ খৃঃ) ঃ** সঙ্গম বংশ, শালুভ বংশ, তুলুব বংশ—হরিহর…প্রথম দেবরায় দ্বিতীয় দেবরায় কৃষ্ণদেব রায় সদাশিব রায়।

(গ) মুঘল যুগ

১। **মুঘল সম্রাটগণ (১৫২৬-১৭০৭ খৃঃ) ঃ** বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, আওরঙজীব

(মধ্যে পাঠান শূরবংশ ঃ শেরশাহ (১৫৪০-৪৫ খৃঃ)

২। **মধ্য ও পশ্চিম ভারতের মারাঠা বংশ ঃ** শাহজী ভোঁসলা, শিবাজী (১৬২৭-৮০ খৃঃ). শম্ভুজী, রাজারাম (পত্নী তারাবাঈ), সাহু (দ্বিতীয় শিবাজী)

(ঘ) দশম শতাব্দী থেকে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশ

১। **উত্তর ভারত ঃ** পাঞ্জাবের গজনী বংশ, দিল্লী-আজমীরের চহমান (চৌহান) বংশ, মালবের পরমার বংশ, মধ্য ভারতের চৌদি ও চান্দেল্ল বংশ, কনৌজের গহড়বাল বংশ ইত্যাদি

২। **দাক্ষিণাত্য ঃ** দেবগিরির যাদব বংশ, ওড়িশার গঙ্গ ও চোড়গঙ্গ বংশ

৩। **দক্ষিণ ভারত ঃ** দ্বারসমুদ্রের হয়সালা বংশ, বরঙ্গলের কাকতীয় বংশ চোল ও পাণ্ড্য বংশ

পরিশিষ্ট ৩

সময়পঞ্জী

(ক) শিখ গুরুদের তালিকা

(১) নানক (১৪৬৯-১৫৩৮ খৃঃ), (২) অঙ্গদ (১৫৩৮-৫২ খৃঃ), (৩) অমরদাস (১৫৫২-৭৪ খৃঃ), (৪) রামদাস (১৫৭৪-৮১ খৃঃ), (৫) অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬ খৃঃ), (৬) হরগোবিন্দ (১৬০৬-৪৫ খৃঃ), (৭) হররায় (১৬৪৫-৬১ খৃঃ), (৮) হরকিষণ (১৬৬১-৬৪ খৃঃ), (৯) তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫ খৃঃ), (১০) গোবিন্দ সিংহ (১৬৬৫-১৭০৮)।

(খ) পেশবাগণ

(১) বালাজী বিশ্বনাথ (১৭১৩-২০ খৃঃ), (২) প্রথম বাজীরাও (১৭২০-৪০ খৃঃ), (৩) বালাজী বাজীরাও (১৬৪০-৬১ খৃঃ), বিশ্বাসরাও (নিহত ১৭৬১ খৃঃ), (৪ প্রথম মাধবরাও (১৭৬১-৭২ খৃঃ), (৫) নারায়ণরাও (১৭৭২-৭৩ খৃঃ), (৬) রঘুনাথ রাও (রাঘোবা) (১৭৭৩-৭৪ খৃঃ), (৭) মাধবরাও (দ্বিতীয়) নারায়ণ (১৭৭৪-৭৬ খৃঃ), (৮) দ্বিতীয় বাজীরাও (১৭৭৬-১৮১৮ খৃঃ)—নানা সাহেব (দত্তক পুত্র) পেশবা হন নি। ইংরেজরা পেশবার পদ উঠিয়ে দিয়ে তাঁর বৃত্তি দিতে অস্বীকার করেন।

ভারতবর্ষের রেখা মানচিত্রের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থানগুলির অবস্থানসহ নির্দেশ কর।

১। উজ্জয়িনী, ২। কনৌজ, ৩। সারনাথ, ৪। কাশী, ৫। গয়া, ৬। পুণা, ৭। কলিঙ্গ, ৮। হলদিঘাট, ৯। সুরাট, ১০। চন্দননগর, ১১। চোল, ১২। তক্ষশীলা, ১৩। চণ্ডীগড়, ১৪। দিল্লী, ১৫। এলাহাবাদ, ১৬। কর্ণসুবর্ণ, ১৭। গৌড়, ১৮। কলকাতা, ১৯। মহেঞ্জোদড়ো, ২০। সোমনাথ, ২১। মথুরা, ২২। পুরুষপুর, ২৩। তাম্রলিপ্ত, ২৪। পলাশী, ২৫। পানিপথ, ২৬। আহমদনগর, ২৭। থানেশ্বর, ২৮। কালিকট, ২৯। দেবগিরি, ৩০। আলিগড়, ৩১। পাটলিপুত্র, ৩২। অমৃতসর, ৩৩। পণ্ডিচেরী, ৩৪। আগ্রা, ৩৫। হায়দরাবাদ, ৩৬। হুগলী, ৩৭। মাদ্রাজ, ৩৮। বোম্বাই, ৩৯। রাজগৃহ, ৪০। রায়গড়, ৪১। নবদ্বীপ, ৪২। গান্ধার, ৪৩। প্রয়াগ, ৪৪। কাঞ্চি, ৪৫। শ্রীরঙ্গপত্তন, ৪৬। ঝাঁসী, ৪৭। কামরূপ, ৪৮। অজন্তা, ৪৯। বৈশালী।

ভুল সংশোধন

পৃঃ ৪৪ দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের পঞ্চম লাইন, 'দোষ পরিহার' এরপরে এই লাইন বাদ পড়েছে ঃ—ধমমের সদর্থক গুণ হল সত্য শুচি দয়া দান এবং প্রাণী-অহত্যা, মাতাপিতা স্থবিরদের শুশ্রূষা ও মিত্র, জ্ঞাতি দাস-ভৃত্যদের প্রতি সম্প্রীতি। নঞর্থে বর্জনীয় দোষগুলি হল চণ্ডতা, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ আর পরধর্মের প্রতি অশ্রদ্ধা।

চতুর্থ অনুচ্ছেদের চতুর্থ লাইন—'পাঠালেন' এর পরে বাদ পড়েছে ঃ—যে সব বিদেশী রাজার কাছে অশোক দূত প্রেরণ করেন, তাঁরা হলেন সিরিয়ার রাজা অন্তিয়োক, মিশরের তুরময়, ম্যাসিডনের 'অন্তেকিন, সাইরিনের 'মগা' এবং এপিরাসো 'অলিকাসুদর'। এর ফলে ঐ সব বিদেশী রাজ্যে ধর্মপ্রচার হয়তো সম্ভব হয়নি, কিন্তু ভারতের সঙ্গে তাদের বাণিজ্যক যোগসূত্র স্থাপিত হয়।

অনুশীলনী

প্রথম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। ভারতের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

২। ভারতের জাতিগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৩। ভারতের ইতিহাসের উপর প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। 'ভারতবর্ষে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য বর্তমান'—আলোচনা কর।

৫। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানগুলি কয়ভাগে ভাগ করা যায়। এই উপাদানগুলির পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের বিবরণ দাও। (২) ভারতের ইতিহাসে হিমালয়ের প্রভাব বর্ণনা কর। (৩) ভারত ইতিহাসে বিন্ধ্যপর্বতের প্রভাব বর্ণনা কর। (৪) সাগর ও সমতলভূমি ভারতের ইতিহাসে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে? (৫) কি কারণে ভারতবর্ষকে 'জাতিসমূহের যাদুঘর' বলা হয়? (৬) ভারতের ইতিহাসে কোন কোন ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখা যায়? (৭) কি কি উপাদান ভারতের জাতীয় ঐক্যের পথ প্রস্তুত করেছে? (৮) ভারতবর্ষের গিরিপথগুলি ভারতের ইতিহাসে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে? (৯) ভারতবর্ষের ইতিহাসে 'রাজনৈতিক ঐক্য বলতে কি বোঝায়? (১০) ভারতের আত্মিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্য আলোচনা কর। (১১) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় যে কোন তিনটি উপাদান সম্পর্কে আলোচনা কর। (১২) প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় উপাদান হিসাবে লিপি ও মুদ্রার গুরুত্ব আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভারতবর্ষকে কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়? (খ) কোন পর্বতমালা ভারতবর্ষকে এসিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে আলাদা করে রেখেছে? (গ) কোন পর্বত উত্তর ভারতকে দক্ষিণাপথ থেকে আলাদা করে রেখেছে? (ঘ) কোন পথ ধরে বিদেশীরা বার বার ভারতে প্রবেশ করেছে? (ঙ) ভারতের কয়েকটি প্রধান গিরিপথের নাম লেখ। (চ) ভারতীয় জনগোষ্ঠীকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়? (ছ) 'একরাট্' কথাটির অর্থ কি? (জ) রামচরিত গ্রন্থের লেখক কে? (ঝ) 'রাজতরঙ্গিনী' কে রচনা করেন? (ঞ) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে কোন গ্রীক দূত ভারতে এসেছিলেন? (ট) 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থটি কে রচনা করেন? (ঠ) 'অর্থশাস্ত্র' কে রচনা করেন? (ড) দু'জন চৈনিক পরিব্রাজকের নাম লেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। সিন্ধু সভ্যতার উৎপত্তি কোথায়, বিস্তার কতদূর? কোন্ কোন্ জায়গায় এ সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে? নাগরিক সভ্যতার নমুনাগুলি কি?

২। হরপ্পার নাগরিক সভ্যতার বিবরণ দাও।

৩। হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

৪। হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন বর্ণনা কর।

৫। হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে বহির্জগতের যোগাযোগ কিরূপ ছিল?

৬। হরপ্পায় প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে সিন্ধু অঞ্চলের অধিবাসীদের জীবনধারার বিবরণ দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

(১) পুরাতন প্রস্তর যুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্রগুলি কিরূপ ছিল ? (২) 'মেসোলিথিক' যুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্রপাতি বর্ণনা কর (৩) নতুন প্রস্তর যুগের মানুষের অস্ত্রশস্ত্রগুলি কিরূপ ছিল। (৪) মহেঞ্জোদড়ো কে ও কখন আবিষ্কার করেন ? (৫) ভারতবর্ষের প্রাক্-আর্য যুগের সভ্যতার নাম কি ? ঐ সভ্যতার পতনের কারণ কি ? (৬) হরপ্পা সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতার মধ্যে তুলনা কর। (৭) হরপ্পা সভ্যতা কাদের সৃষ্টি ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) হরপ্পা সভ্যতার লোকেরা কি ধাতু ব্যবহার করত ? (খ) হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী সভ্যতা কি নামে পরিচিত ? (গ) হরপ্পা সভ্যতা কত বছর আগে গড়ে উঠেছিল ?

তৃতীয় অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। আর্য কারা ? তাদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল ?
২। আর্যরা কি ভাবে ভারতে বসতি বিস্তার করে ?
৩। বৈদিক সাহিত্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।
৪। আর্যদের ধর্মীয় জীবন বর্ণনা কর।
৫। বৈদিকযুগে ও পরবর্তী বৈদিকযুগে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।
৬। আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী ঃ

(১) প্রত্যেকটি বেদে কি কি বিষয় আছে ? (২) বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞ কি ভাবে হত ? (৩) উপনিষদ, পিতৃষদ, ব্রহ্মবাদিনী, শব্দগুলির অর্থ কি ? (৪) রাজকুৎ কাদের ও কেন বলা হত ? (৫) বেদাঙ্গ ও ষড়দর্শন কাকে বলে ? (৬) বৈদিক যুগে জাতিভেদ প্রথা কিভাবে দেখা দেয় ? (৭) 'চতুরাশ্রম' কি ? (৮) মহাকাব্য দুটি থেকে প্রাচীন সমাজের কি পরিচয় পাও ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

(ক) সপ্তসিন্ধু কোন অঞ্চলকে বলা হয় ? (খ) আর্যদের প্রাচীনতম সাহিত্য কি ? (গ) বেদ কয় ভাগে বিভক্ত ও কি কি ? (ঘ) বৈদিক যুগে প্রধানতঃ কোন ধাতু ব্যবহৃত হত ? (ঙ) লৌহের ব্যবহার কখন থেকে শুরু হয় ? (চ) 'আর্য' শব্দটির প্রকৃত অর্থ কি ? (ছ) বৈদিক মুদ্রার নাম কি ? (জ) 'সভা' ও 'সমিতি' সম্বন্ধে যা জান লেখ।

চতুর্থ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে ধর্মে ও সমাজে যে প্রতিবাদ আন্দোলনের কারণগুলি আলোচনা কর।
২। মহাবীরের ধর্মমত আলোচনা কর।
৩। গৌতম বুদ্ধের জীবনী ও বাণী আলোচনা কর।
৪। হিন্দুধর্মের সঙ্গে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের তুলনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। টীকা লেখ—(ক) শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর, (খ) অষ্টাঙ্গিক মার্গ, (গ) মহাযান ধর্মমত ও হীনযান ধর্মমত। (২) বৌদ্ধধর্মের মূল নীতিগুলি কি ?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) তীর্থঙ্কর কথাটির অর্থ কি? (২) শেষ দু'জন জৈন তীর্থঙ্করের নাম কর। (৩) পূর্বে মহাবীরের কি নাম ছিল? (৪) মহাবীর কখন জন্মগ্রহণ করেন? (৫) জৈনরা কয়টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত? বিভাগগুলি কি কি? (৬) 'জিন' কথাটির অর্থ কি? (৭) গৌতম বুদ্ধ কখন জন্মগ্রহণ করেন? (৮) মহাপরিনির্বাণ কথাটির অর্থ কি?

পঞ্চম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

২। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কৃতিত্ব পর্যালোচনা কর।

৩। কলিঙ্গ যুদ্ধ সম্বন্ধে যা জান লেখ। অশোক কেন আক্রমণাত্মক নীতি পরিত্যাগ করেছিলেন?

৪। অশোকের 'ধম্ম' কি? ধর্ম প্রচারের জন্য অশোক কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন।

৫। অশোকের কৃতিত্ব আলোচনা কর। তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

৬। কুষাণ রাজা কণিষ্ক সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৭। মৌর্যোত্তর যুগের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন পর্যালোচনা কর।

৮। ভারতীয় সংস্কৃতিতে কুষাণদের অবদানের বিবরণ দাও।

৯। সাতবাহনদের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১০। সমুদ্রগুপ্তের কার্যাবলী ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

১১। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কি কারণে ইতিহাসে খ্যাতি লাভ করেন।

১২। গুপ্তযুগকে কেন 'স্বর্ণযুগ' বলা হয়।

১৩। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

১৪। ফা-হিয়েনের বিবরণ সংক্ষেপে আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন :

(১) ভারতে পারসীক আক্রমণের ফলাফল আলোচনা কর। (২) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল? (৩) ষোড়শ মহাজন পদগুলির নাম লেখ। (৪) টীকা লেখ :—(ক) কৌটিল্য, (খ) মেগাস্থিনিস, (গ) কলিঙ্গ যুদ্ধ, (ঘ) গান্ধার শিল্প, (ঙ) হিউয়েন সাঙ, (চ) অশোকের ধম্ম, (ছ) মৌর্য শিল্প-কলা, (জ) নবরত্ন, (ঝ) অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি, (ঞ) মিনান্দার, (ট) রুদ্রদামন, (ঠ) গণ্ডোফারনিস, (ড) গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, (ঢ) বিম্বিসার থেকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য পর্যন্ত সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র রূপে মগধের অভ্যুত্থানের ইতিহাস, (ণ) এলাহাবাদ প্রশস্তি, (ত) কালিদাস।

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

(১) আলেকজাণ্ডার কত খৃষ্টপূর্বাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন? (২) ধননন্দ কে ছিলেন? (৩) নন্দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? (৪) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য কত খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। (৫) মৌর্য বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (৬) সেলিউকস কে? (৭) কোন গ্রীক শাসক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন? (৮) চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের আমলে কোন গ্রীক দূত এদেশে এসেছিলেন? (৯) 'ইণ্ডিকা' কে রচনা করেন? (১০) অর্থশাস্ত্রের রচয়িতা কে? (১১) অশোক কত খৃষ্ট পূর্বাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন? (১২) শেষ মৌর্য সম্রাট কে? (১৩) কণিষ্ক কোন অব্দের প্রচলন করেন? (১৪) কণিষ্কের রাজধানীর নাম কি? (১৫) গুপ্ত বংশ কে প্রতিষ্ঠা করেন? (১৬) কাকে 'ভারতীয় নেপোলিয়ন' বলা হয়? (১৭) শেষ বৌদ্ধ মহাসম্মেলন

কোথায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল? (১৮) কোন গুপ্ত সম্রাট 'পরাক্রমাঙ্ক' উপাধিধারণ করেছিলেন? (১৯) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে কোন বিদেশী পরিব্রাজক এদেশে এসেছিলেন; (২০) কত খৃষ্টাব্দে এবং কার নেতৃত্বে ভারতে পারসীক আক্রমণ হয়েছিল? (২১) আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণের সময় তক্ষশীলার রাজা কে ছিলেন? (২২) বিম্বিসার কোন বংশের রাজা ছিলেন? (২৩) কুষাণ বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট কে ছিলেন? (২৪) গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? (২৫) কোন গুপ্ত সম্রাট 'শকারি' উপাধি গ্রহণ করে ছিলেন? (২৬) দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের আমলে যে চৈনিক পরিব্রাজক ভারতে এসেছিলেন তার নাম কি?

ষষ্ঠ অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। পুষ্যভূতি বংশীয় হর্ষবর্ধনের সময়ে কনৌজের উত্থান বর্ণনা কর।
২। প্রতিহার সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
৩। ধর্মপাল ও দেবপালের আমলে পাল রাজ্যের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।
৪। দ্বিতীয় পুলকেশী থেকে দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য পর্যন্ত বাদামীর চালুক্য শক্তির ইতিহাস লেখ।
৫। রাষ্ট্রকূট বংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস লেখ।
৬। কল্যাণের চালুক্যবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।
৭। কাঞ্চির পল্লব বংশের উত্থান ও পতনের ইতিহাস লেখ।
৮। চোল রাজবংশের ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

সংক্ষিপ্ত-রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। টীকা লেখ—(ক) যশোধর্মণ, (খ) শশাঙ্ক, (গ) নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, (ঘ) হিউয়েন সাঙ, (ঙ) ধর্মপাল, (চ) দেবপাল ও প্রথম মহীপাল, (ছ) রামপাল, (জ) বিজয় সেন, (ঝ) লক্ষ্মণ সেন, (ঞ) তৃতীয় গোবিন্দ, (ট) তৃতীয় কৃষ্ণ, (ঠ) ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য, (ড) প্রথম রাজরাজ (ঢ) প্রথম রাজেন্দ্র ২। হূণ কারা? ৩। হর্ষবর্ধনকে কি সমস্ত উত্তর ভারতের সম্রাট বলা চলে? ৪। হর্ষের শাসন পদ্ধতি কেমন ছিল? ৫। প্রয়াগের দান মেলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। ৬। হিউয়েন সাঙ্ মধ্যদেশের অবস্থা সম্বন্ধে কি বলেছেন? ৭। চালুক্যদের সম্পর্কে হিউয়েন সাঙ কি মন্তব্য করেছেন? হর্ষবর্ধনের পর উত্তর ভারতের কিরূপ অবস্থা ছিল। ৯। হর্ষ-শশাঙ্ক প্রতিযোগিতা বর্ণনা কর। ১০। হর্ষ-পুলকেশী দ্বন্দ্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ১১। হর্ষের রাজ্য-সীমা বর্ণনা কর। ১২। হর্ষের ধর্মমত ও শিক্ষা-নীতি সম্পর্কে কি জান? ১৩। পাল-প্রতিহার-রাষ্ট্রকূট দ্বন্দ্বের বিবরণ দাও। ১৪। পালবংশ বাঙলায় কেন ও কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১৫। কৈবর্ত বিদ্রোহ সম্বন্ধে কি জান। ১৬। চালুক্য-রাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যজয় ও কৃতিত্ব আলোচনা কর। ১৭। রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের কৃতিত্ব আলোচনা কর। ১৮। পল্লব-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। ১৯। চোলরাজ প্রথম রাজ রাজ ও প্রথম রাজেন্দ্রের নৌ ও ঔপনিবেশিক নীতি আলোচনা কর। ২০। চোল শাসন ব্যবস্থা আলোচনা কর।

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। তোরমান কে ছিলেন? ২। মিহিরকুল কে ছিলেন? ৩। হর্ষবর্ধন কোন বংশের রাজা। ৪। প্রভাকর বর্ধনের কন্যার নাম কি? ৫। হর্ষের রাজধানী কোথায় ছিল? ৬। শশাঙ্কের মিত্র রাজা কে ছিলেন? ৭। হর্ষবর্ধন কোন সময়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন? ৮। হর্ষের সভাকবি কে ছিলেন? ৯। 'শীলাদিত্য' কার উপাধি? ১০। দেবগুপ্ত কে ছিলেন? ১১। হিউয়েন সাঙ কে? ১২। 'ভিক্ষু' 'সিদ্ধিবস্তু', 'দ্বার পণ্ডিত'—শব্দগুলির অর্থ লেখ। ১৩। হর্ষবর্ধনের আমলে কোন পরিব্রাজক ভারত পরিভ্রমণ করেন? ১৪। দক্ষিণ ভারতের কোন রাজার কাছে হর্ষবর্ধন পরাজিত হন? ১৫। 'হর্ষচরিতের' রচয়িতা কে? ১৬। গৌড়ের রাজা শশাঙ্কের রাজধানী কোথায় ছিল? ১৭। বাঙলার প্রথম নির্বাচিত রাজা কে। ১৮। পাল বংশের

প্রথম রাজা কে ছিলেন? ১৯। বাংলায় সেন বংশের শেষ সম্রাট কে? ২০। বাঙলাদেশে মৎস্যন্যায় বলতে কি বোঝ? কে এটির অবসান ঘটান? ২১। কৌলিন্য প্রথা কে প্রচলন করেন? ২২। বখতিয়ার খলজী কে ছিলেন? ২৩। শীলভদ্র কে ছিলেন? ২৪। হিউয়েন- সাঙের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত বিষয়ক পুস্তকটির নাম কি? ২৫। 'রামচরিত' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ২৬। 'গীত-গোবিন্দ' কাব্যের রচয়িতা কে? ২৭। হলায়ুধ কে ছিলেন? ২৭। বিক্রমশিলা বিহারটি কে প্রতিষ্ঠা করেন? ২৮। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ কে ছিলেন? ২৯। শীলরক্ষিত কে ছিলেন? ৩০। দ্বিতীয় পুলকেশী কোন বংশের রাজা ছিলেন? ৩১। দ্বিতীয় পুলকেশীর সভাকবির নাম কি? ৩২। আইহোল শিলালিপি কে রচনা করেন? ৩৩। দ্বিতীয় পুলকেশীর বিখ্যাত লিপির নাম কি? ৩৪। উত্তর ভারতের কোন রাজার সঙ্গে দ্বিতীয় পুলকেশীর যুদ্ধ হয়? ৩৫। রাষ্ট্রকূট বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? ৩৬। পল্লব রাজধানীর নাম কি? ৩৭। বিষ্ণুগোপ কোন বংশের রাজা ছিলেন? ৩৮। প্রতিহার বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে? ৩৯। চোল রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখ। ৪০। কোন চোলরাজা বাঙলা অভিযান করেন? ৪১। চোল বংশের কোন রাজা শৈলেন্দ্র রাজাকে পরাস্ত করেন? ৪২। 'গঙ্গাইকোণ্ড' উপাধি কে গ্রহণ করেন?

সপ্তম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। পাল ও সেনযুগে বাঙলাদেশের সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা কর।

২। চালুক্য শিল্প সম্পর্কে কি জান লেখ?

৩। রাষ্ট্রকূট শিল্পের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

৪। পল্লব শিল্প সম্পর্ক একটি প্রবন্ধ লেখ।

৫। চোল আমলে শিল্পকলার ইতিহাস সংক্ষেপে লেখ।

৬। চান্দেল্ল শিল্প সম্পর্কে কি জান?

৭। ওড়িশার গঙ্গরাজাদের আমলের শিল্পকলা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

৮। বাইরের জগতের সঙ্গে ভারতের যোগযোগ হয়েছিল কি সূত্রে? কোন কোন অঞ্চলে ভারতীয় সভ্যতার প্রসার হয়?

৯। শৈলেন্দ্র বংশের আমলে সুবর্ণদ্বীপের সভ্যতা ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন :

১। টীকা লিখ:—(ক) পাল যুগের বিশ্ববিদ্যালয়, (খ) পালযুগে বাংলা ভাষা; (গ) পাল-যুগে স্থাপত্য, (ঘ) পাল যুগে শিল্পকলা (ঙ) সেন যুগের সাহিত্য, (চ) হলায়ুধ (ছ) মহবলী-পুরম, (জ) কাঞ্চি, (ঝ) আইহোল, (ঞ) বাদামি, (ট) ইলোরা, (ঠ) তাঞ্জোর (ড) ভুবনেশ্বর (ঢ) কোনার্ক, (ণ) গীত গোবিন্দ, (ত) ধোয়ী, (থ) চর্যাপদ, (দ) পাহাড়পুর, (ধ) শ্রীজ্ঞান, (ন) ধীমান, (প) যবদ্বীপ, (ফ) তাম্রলিপ্ত, ২। বল্লাল সেন ও লক্ষ্মণসেনের আমলে চারজন পণ্ডিত ও কবির নাম কর এবং তাঁদের লেখা বইয়ের নাম উল্লেখ কর। ৩। পাল ও সেন যুগে বাঙলায় কোন কোন শিল্পকলার উন্নতি হয়? ৪। সুবর্ণভূমি কোন অঞ্চল? (৫) চম্পায় ও কম্বোজে সভ্যতার কি কি নিদর্শন আছে? ৬। বরবুদুর কি জন্য বিখ্যাত? ৭। আঙ্কোর ভাট কেন বিখ্যাত?

বিষয়মুখী প্রশ্ন :

১। পাল রাজারা কোন ধর্মাবলম্বী ছিলেন? ২। সেন আমলে কোন ধর্ম রাজাদের পৃষ্টপোষকতা লাভ করেছিল? ৩। বল্লালসেনের লেখা দু'টি বইয়ের নাম লেখ। ৪। জয়দেব

কে ছিলেন? ৫। সোমপুর ও ওদন্তপুরী কোথায়? সেখানে কি ছিল? ৬। সপ্তরথ কি ও কোথায় অবস্থিত? ৭। আইহোলের দুর্গামন্দির কোন আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়? ৮। কৈলাস মন্দির সম্পর্কে কি জান? ৯। গো-পুরম কি? ১০। ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দির কোন রাজার আমলে স্থাপিত হয়েছিল? ১১। পুরীর জগন্নাথ মন্দির কে প্রতিষ্ঠা করেন? ১২। কোনার্কের সূর্য মন্দির কার আমলে নির্মিত হয়েছিল? ১৩। যশোধরপুর কোথায়? সেখানকার বড় মন্দিরগুলির নাম কর। ১৪। 'গ্রেটার ইণ্ডিয়া' কোথায়? ১৫। ইণ্ডিয়া মাইনর কোথায়?

অষ্টম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। আরবদের সিন্ধু বিজয়ের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লেখ। সিন্ধু বিজয়ের ফলাফল কি হয়েছিল?

২। সুলতান মামুদের অভিযানের প্রাক্কালে উত্তর-ভারতের রাজনৈতিক অবস্থা কেমন ছিল? তাঁর অভিযানগুলির গুরুত্ব নির্ণয় কর।

৩। দাস বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? সুলতান হিসাবে তাঁর কার্যাবলী আলোচনা কর।

৪। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে প্রধান সমস্যাগুলি কি? তিনি কিভাবে ঐ সমস্যাগুলির সমাধান করেছিলেন? তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৫। গিয়াসুদ্দিন বলবনের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৬। বিজেতা ও শাসক হিসাবে আলাউদ্দিন খলজীর বিবরণ দাও।

৭। আলাউদ্দিন খলজীর দক্ষিণ ভারত অভিযানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও।

৮। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের কার্যাবলী সমালোচনা কর। তাঁর ব্যর্থতার কারণ কি?

৯। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের জন্য মহম্মদ-বিন-তুঘলক কতদূর দায়ী ছিলেন?

১০। ফিরোজ শাহ তুঘলকের চরিত্র ও কৃতিত্ব বিচার কর।

১১। তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণ ও তার ফলাফল আলোচনা কর।

১২। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের প্রধান প্রধান কারণগুলি আলোচনা কর।

১৩। সৈয়দ বংশ ও লোদী বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১৪। বাঙলার ইলিয়াস শাহী বংশের ভূমিকা নির্ণয় কর।

১৫। হুসেন শাহী বংশের আমলে বাঙলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১৬। ইলিয়াস শাহী ও হুসেন শাহী বংশের বাঙলার সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন বর্ণনা কর।

১৭। বাহমনী ও বিজয়নগর সাম্রাজ্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১৮। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

১৯। বিজয়নগর সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা, সামাজিক, অর্থ নৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা কর।

২০। ভক্তিবাদ বলতে কি বোঝায়? ভক্তিবাদী প্রচারক হিসাবে রামানন্দ, চৈতন্য এবং কবীর সম্পর্কে যা জান লেখ।

২১। ভারতের শিল্প, সাহিত্য ও ধর্মীয় জীবনের উপর ইসলাম ধর্মের প্রতিক্রিয়া আলোচনা কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। চেঙ্গিস খাঁ কেন ভারত আক্রমণ করেছিলেন? ২। আলবিরুণী কি জন্য বিখ্যাত? ৩। মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য গিয়াসুদ্দিন বলবন কিভাবে চেষ্টা করেন? ৪। মহম্মদ-বিন-তুঘলকের একটি পরিকল্পনার বিবরণ দাও। ৫। মহম্মদ-বিন-তুঘলক কেন তামার নোট প্রত্যাহার করেন? ৬। সুফীদের সম্বন্ধে কি জান? ৭। টীকা লেখ:—(ক) রামানন্দ,

(খ) শ্রীচৈতন্যদেব (গ) কবীর, (ঘ) নানক, (ঙ) সুলতান মামুদ, (চ) কুতবউদ্দিন আইবক (ছ) রাজিয়া, (জ) ফিরুজ তুঘলক, (ঝ) তালিকোটার যুদ্ধ। ৮। 'বিপরীতের মিশ্রণ'. এ কথা কেন বলা হয়, কার সম্পর্কে বলা হয়? ৯। সুলতানি যুগে উর্দু সাহিত্যের বিকাশ সম্বন্ধে কি জান?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। সিন্ধুর রাজা দাহির কার কাছে পরাস্ত হয়? ২। আল বিরুণী কোন সময়ে ভারতে আসেন? ৩। সোমনাথের মন্দির কে লুণ্ঠন করেন? ৪। আরবরা কত খ্রীষ্টাব্দে সিন্ধু জয় করেন? ৫। তরাইনের প্রথম যুদ্ধ (১১৯১) মহম্মদ ঘুরীর প্রতিপক্ষ কে ছিলেন? ৬। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে ও কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৭। দিল্লী সুলতানি কখন শুরু হয়েছিল? ৮। দাস বংসের প্রতিষ্ঠাতা কে? ৯। দাস বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান কে? ১০। কুতবউদ্দিন কোন বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন? ১১। খলজী বংশের প্রতিষ্ঠা কে করেন? ১২। তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ১৩। দিল্লীতে কুতুব মিনার কে নির্মাণ করেন? ১৪। ইবন বতুতা কে ছিলেন? ৫। দিল্লীর কোন সুলতান 'খাম-খেয়ালী রাজা' নামে পরিচিত? ১৬। চেঙ্গিস খাঁ কে ছিলেন? ১৭। বাহমনি রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কে? ১৮। মালিক কাফুর কার সেনাপতি ছিলেন? ১৯। সৈয়দ বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ২০। লোদী বংশের শেষ সুলতানের নাম লেখ। ২১। তৈমুর লঙ্ কে ছিলেন? ২২। মামুদ গাওয়ান কে ছিলেন? ২৩। তুলুব বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা কে ছিলেন? ২৪। তালিকোটার যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ২৫। আথেনোসিয়াস নিকিতিন কে ছিলেন? ২৬। 'অষ্ট দিগ্‌গজ' কাদের বলা হয়? ২৭। আদিনা মসজিদ কার সময়ে নির্মিত হয়েছিল? ২৮। মালাধর বসু কে ছিলেন? ২৯। আমীর খসরু কে ছিলেন? ৩০। তুর্কীরা কোথাকার লোক? ৩১। দুজন বিখ্যাত সুফীর নাম কর। ৩২। বাংলার প্রথম স্বাধীন সুলতান কে?

নবম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। প্রথম মুঘল সম্রাট বাবর সম্পর্কে কি জান লেখ?

২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধের (১৫২৬ খ্রীঃ) কি ফলাফল হয়েছিল?

৩। শের শাহের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর। তিনি ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

৪। শের শাহ কে ছিলেন? তিনি কোন দুটি যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাস্ত করেছিলেন? কিরূপে তিনি দিল্লীর শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন?

৫। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজ্যজয় সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৬। আকবরের রাজপুত নীতি ও ধর্মনীতি আলোচনা কর।

৭। মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রূপে আকবরের কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৮। আকবর ইতিহাসে বিখ্যাত কেন?

৯। শাহজাহানের রাজত্বকাল কি মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতির যুগ? কেন?

১০। আওরঙজীবের দাক্ষিণাত্য-নীতি আলোচনা কর।

১১। আওরঙজীবের ধর্মনীতি সম্বন্ধে যা জান লেখ। তুমি কি মনে কর যে আওরঙজীবের ধর্মনীতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল?

১২। ভারতের ইতিহাসে শিবাজীর কৃতিত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১৩। শাসক হিসাবে আওরঙজীবের কৃতিত্ব পর্যালোচনা কর।

১৪। শিবাজীর শাসনব্যবস্থা ও কার্যাবলীর বিবরণ দাও।

১৫। মুঘল যুগের শাসনব্যবস্থা বর্ণনা কর।

১৬। মুঘল যুগের সামাজিক, অর্থ নৈতিক সাংস্কৃতিক জীবন কিরূপ ছিল?

সংক্ষিপ্ত রচনা-ধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। টীকা লেখ :—(ক) বাবরের আত্মজীবনী, (খ) পানিপথের প্রথম যুদ্ধ, (গ) খানুয়ার যুদ্ধ, (ঘ) ঘোগরার যুদ্ধ, (ঙ) হলদিঘাটের যুদ্ধ, (চ) শাহজাহানের জাঁকজমক প্রিয়তা। ২। পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বাবরের জয়লাভের কারণ কি? ৩। আকবর রাজপুতদের প্রতি কি নীতি গ্রহণ করেছিলেন? ৫। আকবরের কোন সংস্কার সবচেয়ে বিখ্যাত? সেই বিষয়ে তিনি কার কাছে ঋণী। ৫। আকবরকে কেন জাতীয় বা ভারতীয় সম্রাট বলা হয়? ৬। মুঘল যুগে কোন কোন বিদেশী পর্যটক ভারতে আসেন? আকবরের ধর্মমত সম্বন্ধে কি জান? ৮। রানা প্রতাপ কে ছিলেন? তিনি আকবরের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন নি কেন? এর ফল কি হয়েছিল?

বিষয়মুখী প্রশ্ন ঃ

১। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে যে পোর্তুগীজ নাবিক কালিকটে পৌছেছিলেন তাঁর নাম কি? ২। প্রথম পানিপথের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৩। খানুয়ার যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল। ৪। ঘোগরার যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৫। মোগল বংশের প্রতিষ্ঠাতা কে? ৬। শেরশাহের সেনাপতির নাম কি? ৭। 'আকবরনামা' কে রচনা করেন। ৮। 'আইন-ই-আকবরি' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ৯। আবুল ফজল রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ দু'খানি কি কি? ১০। দ্বিতীয় পানিপথের যুদ্ধ কত খ্রীষ্টাব্দে হয়েছিল? ১১। হলদিঘাটের যুদ্ধে মুঘলদের প্রধান সেনাপতি কে ছিলেন? এই যুদ্ধ কার কার মধ্যে ঘটেছিল? ১১। টোডরমল কি জন্য বিখ্যাত? ১৩। 'দীন-ইলাহি' কে প্রবর্তন করেন? ১৪। কোন ইংরেজ রাজদূত জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আসেন? ১৫। 'রামচরিত মানস' গ্রন্থের রচয়িতা কে? ১৬। আওরঙজীবের বড় ভাইয়ের নাম কি? ১৭। শিবাজীর রাজধানীর নাম কি? ১৮। কোন্ বছর শিবাজীর অভিষেক হয়? ১৯। 'ছত্রপতি' উপাধি কে ধারণ করেন? ২০। পুরন্দরের সন্ধি (১৬৬৫) কাদের মধ্যে হয়েছিল? ২১। আফজল খাঁ কার সেনাপতি ছিলেন? ২২। আওরঙজীবের কত সালে মৃত্যু হয়? ২৩। কাফী খাঁ কে ছিলেন? ২৪। ফতেপুর সিক্রি কে নির্মাণ করেন? সেখানে কি আছে? ২৫। সেকেন্দ্রায় কার সমাধি? ২৬। কলকাতার পত্তন কে করেন? ২৭। ইউরোপের কোন কোন দেশের বণিক ভারতে আসে?

দশম অধ্যায়

রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণগুলি আলোচনা কর।

২। গুরু গোবিন্দের সময় পর্যন্ত পাঞ্জাবে শিখ শক্তির অভ্যুত্থানের কাহিনী লেখ।

৩। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। মারাঠাদের পতনের কারণ কি?

৪। দাক্ষিণাত্যে ইঙ্গ ফরাসী সংঘর্ষের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর। ফরাসীদের পরাজয়ের কারণ কি?

৫। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির বাণিজ্যের প্রসার আলোচনা কর।

৬। পলাশীর যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

৭। মীরকাশিমের সঙ্গে ইংরেজদের সংঘর্ষের কারণ কি? বক্সারের যুদ্ধের ঐতিহাসিক তাৎপর্য আলোচনা কর।

৮। হায়দরআলির চরিত্র ও কৃতিত্ব আলোচনা কর।

৯। হায়দরআলি ও টিপু সুলতানের অধীনে মহীশূরের ইতিহাসের পরিচয় দাও।

১০। প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বিশ্লেষণ কর।

১১। দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল আলোচনা কর।

১২। প্রথম ও দ্বিতীয় ইঙ্গ-শিখ যুদ্ধের কারণ ও ফলাফল বর্ণনা কর।

১৩। বশ্যতামূলক নীতি বলতে কি বুঝায়? ওয়েলেসলি এই নীতি কিভাবে প্রয়োগ করেন?

১৪। লর্ড ডালহৌসী বিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য কি কাজ করেন?

১৫। দেওয়ানী লাভ ও দ্বৈত শাসনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

১৬। ওয়ারেন হেস্টিংসের রাজস্ব ও বিচার বিভাগীয় সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

১৭। কর্নওয়ালিস কি কারণে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন?

১৮। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুফল ও কুফলগুলি আলোচনা কর।

১৯। কর্ণওয়ালিসের বিচার-বিভাগীয় ও পুলিশ-বিভাগীয় সংস্কারগুলি আলোচনা কর।

২০। ১৭৬৫ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার ও কয়েকটি দেশীয় শিল্পের অবনতির ইতিহাস লেখ।

২১। ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবর্তন ও ভারতীয় সমাজে তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২২। ফরাজী, ওয়াহাবী আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি আলোচনা কর।

২৩। কোল বিদ্রোহ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখ।

২৪। সাঁওতাল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ।

২৫। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের কারণ ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

সংক্ষিপ্ত রচনাধর্মী প্রশ্ন ঃ

১। টীকা লেখ ঃ (ক) নাদির শাহ, (খ) আহমদ শাহ আবদালী, (গ) দেওয়ানি লাভ, (ঘ) দ্বৈত শাসন, (ঙ) ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, (চ) চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের দোষ ও গুণ, (ছ) অধীনতা-মূলক মিত্রতা, (জ) স্বত্ববিলোপ নীতি, (ঝ) সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ (১৮২৯). (ঞ) বিধবা বিবাহ আইন (১৮৫৬), (চ) বিদ্যাসাগর, (ছ) ডিরোজিও, (জ) ব্রাহ্ম সমাজ, (ঝ) মুর্শিদ কুলি খাঁ, (ঞ) কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যক্তিগত বাণিজ্য, (ট) আলিবর্দি খাঁ।

২। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৩। পলাশীর যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৪। বক্সারের যুদ্ধের গুরুত্ব আলোচনা কর। ৫। কর্নাটের যুদ্ধে ফরাসীদের পরাজয়ের কারণগুলি আলোচনা কর। ৬। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের যে কোন তিনটি কারণ আলোচনা কর। ৭। সিরাজের সঙ্গে ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সংঘর্ষের কারণ কি? ৮। পলাশীর যুদ্ধের কারণগুলি আলোচনা কর। ৯। মীরকাশিমের সঙ্গে কোম্পানির বিরোধের কারণ কি? ১০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে, কবে ও কেন প্রবর্তন করেন? ১১। ওয়ারেন হেস্টিংসের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর। ১২। ফোর্ড কর্নওয়ালিস কাকে বলে। ১৩। কর্নওয়ালিসের বিচার বিভাগীয় ও পুলিশ-বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা কর। ১৫। বেন্টিঙ্কের শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার সংক্ষেপে আলোচনা কর। ১৫। রাজা রামমোহন ইংরাজী শিক্ষার জন্য কি কাজ করেন? ১৬। সুরাটের সন্ধি কি? এই সন্ধি কলিকাতা কর্তৃপক্ষ কেন নাকচ করেন? ১৭। বেসিনের সন্ধির শর্তগুলি আলোচনা কর? ১৮। রঞ্জিৎ সিংহের উত্থানের পূর্বে শিখদের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল? ১৯। ফরাসী আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি আলোচনা কর। ২০। ওয়াহাবী আন্দোলনের লক্ষ্য ও প্রকৃতি কিরূপ ছিল? ২১। বাঙলার তাঁত ও সুতীবস্ত্র শিল্পের ক্রমিক অবনতি ও ধ্বংসের ইতিহাস সংক্ষেপে লিখ। ২২। সিপাহী বিদ্রোহের ব্যর্থতার কারণগুলি আলোচনা কর। ২৩। কোল বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখ। ২৪। সিপাহী বিদ্রোহের প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

বিষয়-মুখী প্রশ্ন ঃ

১। নাদির শাহ কখন ভারত আক্রমণ করেন? ২। কলকাতা নগরীর গোড়াপত্তন কে ও কখন করেন? ৩। কলকাতা ফোর্ট উইলিয়মের কেন এইরকম নামকরণ করা হয়? ৪। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ কোন সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৬। শিখদের পবিত্র গ্রন্থের নাম কি?

৬। পানিপথে মারাঠারা কাদের হাতে পরাস্ত হয়। ৭। অমৃতসরের সন্ধি (১৮০৯) কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল? ৮। শ্রীরঙ্গপত্তনের সন্ধি (১৭৯২) কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৯। 'শিখ' কথাটির অর্থ কি? ১০। 'খালসা' কে সৃষ্টি করেন? ১১। শেষ মুঘল সম্রাট কে ছিলেন? ১২। শেষ শিখগুরু কে ছিলেন। ১৩। কর্নাটের প্রথম যুদ্ধ কত সালে হয়? ১৪। কর্নাটের যুদ্ধে ফরাসীদের নেতা কে ছিলেন? ১৫। কর্নাটের যুদ্ধে কারা পরাজিত হয়েছিল? ১৬। পলাশীর যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ১৭। বক্সারের যুদ্ধ কত সালে হয়েছিল? ১৮। ইংরেজ ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কত সালে 'দেওয়ানী' লাভ করে? ১৯। দ্বৈতশাসন কে প্রতিষ্ঠা করেন? ২০। রেগুলেটিং-অ্যাক্ট কত সালে পাশ হয়েছিল? ২১। বাঙলার প্রথম গভর্নর কে ছিলেন? ২২। বাঙলার প্রথম গভর্নর জেনেরাল কে ছিলেন? ২৩। ভারতের প্রথম গভর্নর জেনেরাল কে ছিলেন? ২৪। ভারতের প্রথম ভাইসরয় কে ছিলেন? ২৫। আলিনগরের সন্ধি কত সালে এবং কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? ২৬। কোন ইংরেজ রাজদূতের চেষ্টায় জাহাঙ্গীরের আমলে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি মুঘল সাম্রাজ্যের কয়েকটি অঞ্চলে কুঠি নির্মাণের অনুমতি পায়? ২৭। ভারতে কোথায় সর্বপ্রথম ফরাসী বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। ২৮। তৃতীয় কর্নাটের যুদ্ধ কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ২৯। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কত খ্রীষ্টাব্দে দেখা দেয়? ৩০। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কে এবং কত সালে প্রবর্তন করেন? ৩১। অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি কে প্রবর্তন করেন? ৩২। স্বত্ব বিলোপ নীতি কে প্রবর্তন করেন? ৩৩। সতীদাহ প্রথা কে উচ্ছেদ করেন? ৩৪। চিলিয়ান-ওয়ালাতে ডালহৌসির শত্রু পক্ষ কে ছিলেন? ৩৫। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কে এবং কত সালে প্রতিষ্ঠা করেন? ৩৬। সলবাই-এর সন্ধি কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৩৭। বেসিনের সন্ধি কত সালে এবং কাদের মধ্যে হয়েছিল? ৩৮। সিপাহী বিদ্রোহ কত সালে শুরু হয়? ৩৯। ফররুকশিয়ার কত সালে ঈষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে ফরমান দেন? ৪০। বাঙলায় স্বাধীন নবাবীর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন? ৪১। পলাশীর যুদ্ধ কত সালে কত তারিখে হয়? ৪২। বক্সারের যুদ্ধ কাদের মধ্যে ও কত সালে হয়? ৪৩। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর বাঙলা কত সালে হয়? ৪৪। পাঁচসালা বন্দোবস্ত কে প্রচলন করেন? ৪৫। কলকাতা মাদ্রাসা কে প্রতিষ্ঠা করেন? ৪৬। ভারতে ডাক ও তার বিভাগ এবং রেলপথ কোন গভর্নর জেনেরাল প্রবর্তন করেন? ৪৭। কোন গভর্নর জেনেরালর আমলে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়? ৪৮। এসিয়াটিক সোসাইটি কত খ্রীষ্টাব্দে কে স্থাপন করেন? ৪৯। উড্স্ ডেসপ্যাচ কোন সালে প্রকাশিত হয়? ৫০। ব্রাহ্ম-সমাজ কে কবে প্রতিষ্ঠা করেন? ৫১। হিন্দু পেট্রিয়ট কত সালে কাহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়? ৫২। কোন সন্ধির দ্বারা প্রথম ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়? ৫৩। ম্যাঙ্গালোরের সন্ধি কোন খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়? ৫৪। কত সালে এবং কোন সন্ধির দ্বারা তৃতীয় ইঙ্গ মহীশূর যুদ্ধের অবসান হয়? ৫৫। পুনার সন্ধি কোন খ্রীষ্টাব্দে স্বাক্ষরিত হয়? ৫৬। সগৌলির সন্ধি কাদের মধ্যে এবং কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? ৫৭। ইয়ান্দাবোর সন্ধি কত সালে স্বাক্ষরিত হয়? ৫৮। অমৃতসরের সন্ধি কত সালে এবং কাদের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়? ৫৯। শাহ ওয়ালি উল্লাহ ও সৈয়দ আহমদ কে ছিলেন? ৬০। দুদু মিঞা ও তীতুমীর কে ছিলেন? ৬১। কোল বিদ্রোহ কত সালে হয়? ৬২। সাঁওতাল বিদ্রোহ কত সালে হয়? ৬৩। সাঁওতাল বিদ্রোহের দুজন নেতার নাম কর। ৬৪। 'দস্তক' কথাটির অর্থ কি? ৬৫। কত সালে ভারতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার খর্ব হয়? ৬৬। রায়তওয়ারী বন্দোবস্ত কোথায় প্রবর্তন করা হয়? ৬৭। মহলওয়ারী বন্দোবস্ত কি ও কোথায় প্রবর্তন করা হয়? ৬৮। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে কোন নারী অতুলনীয় বীরত্বের পরিচয় দেন? ৬৯। নানা সাহেব কে ছিলেন? ৭০। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে সিপাহীরা প্রথম কোথায় বিদ্রোহ আরম্ভ করে? ৭১। কোন আইনের দ্বারা ভারতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটানো হয়? ৭২। সতীদাহ প্রথা কে উচ্ছেদ করেন? ৭৩। বিধবা বিবাহ আইন কোন বৎসর কার্যকরী হয়?